অমিতাভ ঘোষ
ভাটির দেশ

জল-জঙ্গলের দেশ সুন্দরবন। সে দেশে জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ। আর আছে বাঘ-কুমিরের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকা সবহারানো কিছু মানুষ। গত শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে এই কাদামাটি আর বাদাবনের দেশেই এক সাহেব আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের সেই স্বপ্নের সূত্র ধরেই লেখা শুরু হল ভাটির দেশের নতুন ইতিহাস। অলিখিত বিধি-নিষেধের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে বাদাবনের সমাজ-সংস্কৃতি। ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক পিয়ালি রয় আর দিল্লির কেতাদুরস্ত ব্যবসায়ী কানাই দত্তের সেখানে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে টলমল করে ওঠে সে পটভূমির সূক্ষ্ম ভারসাম্য।
কানাইয়ের মাসি নীলিমা স্থানীয় এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্ণধার। নীলিমার স্বামী, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নির্মল ছিল প্রগতিশীল রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী। ১৯৭৯ সালে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু বিতাড়নের ঘটনার ঠিক পর পরই রহস্যময় পরিস্থিতিতে মৃত্যু হয় তার।
পিয়া সুন্দরবনে এসেছে সেখানকার বিরল প্রজাতির ডলফিনদের বিষয়ে গবেষণার জন্য। তার পথপ্রদর্শক স্থানীয় জেলে ফকির। লুসিবাড়িতে ঘোরাঘুরির সময় পিয়ার দোভাষীর কাজ করে দেওয়ার জন্য তাদের সঙ্গ ধরল কানাই। আর তার পরেই ঘুরতে শুরু করল কাহিনির মোড়।
মহাকাব্যপ্রতিম এই উপন্যাসে আরেকবার ভাটির দেশের জীবন আর প্রকৃতি, ইতিহাস আর লোকপুরাণকে জীবন্ত চেহারায় উপস্থিত করেছেন অমিতাভ ঘোষ।

৩০০.০০

ISBN 978-81-7756-847-9

ভাটির দেশ

অমিতাভ ঘোষ

অনুবাদ : অচিন্ত্যরূপ রায়

ভাটির দেশ

অমিতাভ ঘোষ

অনুবাদ : অচিন্ত্যরূপ রায়

প্রচ্ছদ: সুব্রত চৌধুরী

প্রথম প্রকাশ: ২০০৪

অন্তর্জাল ইপাব সংস্করণ

লীলাকে

লেখকের কথা

এই উপন্যাসের সব চরিত্রই কাল্পনিক। প্রধান দুই পটভূমি—লুসিবাড়ি এবং গর্জনতলারও বাস্তবে কোনও অস্তিত্ব নেই। কাহিনিতে উল্লিখিত অন্য কয়েকটা স্থাননাম, যেমন ক্যানিং, গোসাবা, সাতজেলিয়া, মরিচঝাঁপি এবং এমিলিবাড়ি, অবশ্য লেখকের কল্পনাপ্রসূত নয়। উপন্যাসে যেমনভাবে লেখা হয়েছে, সেইভাবেই একদিন গড়ে উঠেছে এইসব জায়গা।

আমার জ্যাঠামশাই শ্রী সতীশ চন্দ্র ঘোষ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের প্রতিষ্ঠা করা গোসাবার রুরাল রিকন্সট্রাকশন ইনস্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৯৬৭ সালে তার অকালমৃত্যুর আগে শেষ কয়েক বছর জ্যাঠামশাই হ্যামিলটন এস্টেটের ম্যানেজারের কাজও করেছেন। বহু বছর আগে দেখা ভাটির দেশের যে স্মৃতি আমার মনের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল তার জন্য তার কাছে এবং তাঁর পুত্র সুব্রত ঘোষের কাছে আমি ঋণী।

পৃথিবীর প্রথম সারির সিটোলজিস্টদের মধ্যে অন্যতম, জেমস কুক ইউনিভার্সিটির শিক্ষিকা প্রফেসর হেলেন মার্শ, সম্পূর্ণ অচেনা এক লেখকের ই-মেলের জবাবে অকৃপণ ভাবে উজাড় করে দিয়েছেন তার জ্ঞানভাণ্ডার। তাঁর ছাত্রী, ওকালেয়া ব্রেভিরোস্ট্রিস বিশেষজ্ঞ ইসাবেল বিসলির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেওয়ায় অধ্যাপক মার্শের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অবধি নেই। ইসাবেলের সঙ্গে মেকং নদীতে এক পর্যবেক্ষণ অভিযানে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাওয়ার ফলে ইরাবড়ি ডলফিন এবং সিটোলজিস্টদের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। ইসাবেলের মনোবল এবং নিষ্ঠার প্রতি আমার শ্রদ্ধাই একমাত্র তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতাকে ছাপিয়ে যেতে পারে।

ভাটির দেশের নানা অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করার সময় সঙ্গ পেয়েছি অনু জেলের। অনু সেই বিরল প্রজাতির জ্ঞানসাধকদের মধ্যে একজন, যাঁদের মধ্যে সমন্বয় ঘটেছে অসীম সাহস, অসাধারণ ভাষাজ্ঞান এবং বৌদ্ধিক শক্তির। সুন্দরবন অঞ্চলের ইতিহাস এবং সংস্কৃতি বিষয়ে তার গবেষণালব্ধ ফল অদূর ভবিষ্যতেই প্রামাণিক বলে গণ্য হবে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। চরিত্রের ঋজুতা এবং অন্যকে নিজের জ্ঞানের অংশভাক করে নেওয়ার ঔদার্যের যে পরিচয় আমি পেয়েছি তার জন্য অনুর প্রতি আমার ঋণ এবং কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

এক সময় পুরনো হ্যামিলটন এস্টেটের অংশ ছিল রাঙাবেলিয়া নামের একটি দ্বীপ। সেখানে তুষার কাঞ্জিলালের সঙ্গে আলাপ করার সৌভাগ্য হয় আমার। বাঙালি পাঠকের সঙ্গে নতুন করে তুষারবাবুর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এই অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের পরিচালনায় টেগোর সোসাইটি অব রুরাল ডেভেলপমেন্ট (টি এস আর ডি) আজ ভাটির দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের চেহারা পালটে দিয়েছে। রাঙাবেলিয়ার টি এস আর ডি হাসপাতালে অত্যন্ত যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করা হয় রোগীদের। এখানকার কর্মীদের নিষ্ঠাও পৃথক উল্লেখের দাবি রাখে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে যার কথা আমার মনে পড়ছে তিনি হলেন ডাক্তার অমিতাভ চৌধুরী। ভাটির দেশে যাতায়াতের সূত্রে যখনই ডাক্তার চৌধুরীকে দেখেছি, আদর্শবাদের মূর্ত প্রতীক বলে তাকে মনে হয়েছে আমার। উল্লেখ করা প্রয়োজন, টি এস আর ডি-র কর্মক্ষেত্র এখন আর শুধু পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই সীমিত নেই। নারী অধিকার রক্ষা থেকে শুরু করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য বা কৃষি উন্নয়নের মতো নানা ক্ষেত্রে অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছে এই সংস্থা। সে কাজের ক্রমবর্ধমান বিস্তার এবং কার্যকারিতাই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতাদের প্রতি সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধার্ঘ্য।

সত্তরের দশকের শেষের দিকে মরিচঝাঁপির ঘটনা কলকাতার বাংলা এবং ইংরেজি সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার পেয়েছিল। বর্তমানে একটিমাত্র ইংরেজি লেখায় সে ঘটনার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। সেটি হল রস মল্লিকের লেখা **Refugee Resettlement in Forest Reserves : West Bengal Policy Reversal and the Marichjhapi Massacre (The Journal of Asian Studies,**

1999, 58:1, pp. 103-125) নীলাঞ্জনা চ্যাটার্জির অসাধারণ গবেষণাপত্র, Midnight's Unwanted Children: East Bengali Refugees and the Politics of Rehabilitation (Brown University) কখনও প্রকাশিত হল না, সে আমাদের দুর্ভাগ্য। মরিচঝাঁপি বিষয়ে অনু জেলেও একটি প্রবন্ধ লিখেছেন : Dwelling on Marichjhampi

রাইনের মারিয়া রিলকের দুইনো এলিজির যে কয়টি বঙ্গানুবাদ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলির বেশিরভাগই কবি বুদ্ধদেব বসুর অনুদিত। চমৎকার এই অনুবাদগুলি উনিশশো ষাটের দশকে প্রথম প্রকাশিত হয়। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা সংগ্রহের পঞ্চম খণ্ডে (সম্পাদনা মুকুল গুহ, ১৯৯৪, দে'জ প্রকাশনী, কলকাতা) কবিতাগুলি পাওয়া যায়।

আরও যাঁদের কাছ থেকে নানা ধরনের সাহায্য এবং আতিথেয়তা পেয়েছি তারা হলেন: লীলা এবং হরেন মণ্ডল, সান্টা ম্যাডালেনা ফাউন্ডেশন, মোহনলাল মণ্ডল, অনিল কুমার মণ্ডল, অমিতেশ মুখোপাধ্যায়, পরীক্ষিৎ বর, জেমস সিম্পসন, ক্লিন্ট সিলি, এডওয়ার্ড ইয়াজিজিয়ান, অভিজিৎ ব্যানার্জি এবং ডাক্তার গোপীনাথ বর্মন। বিশেষ ধন্যবাদের দাবি রাখেন আমার বোন, ড. চৈতালী বসু। এ ছাড়াও যাদের কাছে আমার ঋণের অন্ত নেই, তারা হলেন জ্যানেট সিলভার, সুসান ওয়াট, কার্ল ব্লেসিং, অ্যাগনেস ক্রুপ এবং কার্পফিঙ্গার এজেন্সির বার্নি কার্পফিঙ্গার—যাঁদের সযত্ন প্রয়াস ছাড়া মূল ইংরেজি বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হত না।

লিখতে গিয়ে সব সময় যাঁদের অমূল্য সহায়তা পেয়েছি তারা হলেন আমার স্ত্রী দেবী, কন্যা লীলা এবং পুত্র নয়ন। এঁদের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

অনুবাদ প্রসঙ্গে

তারপর, যেতে যেতে যেতে যেতে এক নদীর সঙ্গে দেখা। এক নয়, অনেক। শত শত শাখাপ্রশাখা নিয়ে ছড়িয়ে রয়েছে দখিন বাংলার সীমানা জুড়ে। ছোট বড় একশোরও বেশি দ্বীপ জড়িয়ে, ডাইনে ঘুরে বয়ে বেঁকে এই মোহনা সেই মোহনার জল গায়ে মেখে অবশেষে সাগরে গিয়ে যাত্রা শেষ হয়েছে তাদের। পথের দু'ধারে কোথাও জেলেদের গাঁ, কোথাও গঞ্জ, আর বেশির ভাগটাই জুড়ে রয়েছে বাঘ-কুমিরে ভরা বাদাবন–সুন্দরবন। ভয়ানক সেই গহিন অরণ্য। দিনমানেও সেখানে ঢুকতে কেঁপে ওঠে অতি বড় সাহসীর বুক।

এই নদী-খাঁড়িতে জড়ানো আঠারো ভাটির দেশকে ঘিরে গড়ে উঠেছে যে কাহিনির কাঠামো, সে কাহিনি পড়তে পড়তে কখনও মনে হয়নি যে তা কোনও বিদেশি ভাষায় লেখা হয়েছে। পড়া শেষ হওয়ার পর, রেশ কিছুটা কাটলে মনে হয়েছে কেমন হত সত্যি সত্যিই যদি বাংলাতেই লেখা হত এই বই? এইভাবেই অনুবাদের চিন্তা এসেছিল মাথায়। তারপর নানা জায়গায় খোঁজ করে লেখকের ঠিকানা জোগাড় করা এবং অনুমতি চেয়ে চিঠি লেখা–সে আরেক পর্ব।

অনুমতি অবেশেষে মিলল, উপন্যাসের প্রথম কয়েক পাতার বাংলা করে লেখককে । পাঠানোর পর। কোনও ঝুঁকি না নিয়ে দু'রকম ভাবে অনুবাদ করা হয়েছিল সেই কয়েক পাতা– একটি আক্ষরিক অনুবাদ, আর অন্যটিতে এমনভাবে লেখার চেষ্টা করা হয়েছিল। যাতে পড়তে পড়তে কখনও মনে না হয় যে পাঠক আর গল্পের মাঝখানে অন্য কোনও ভাষার আবছায়া কোনও পরদা রয়ে গেছে।

অনুবাদের দ্বিতীয় ধরনটিই পছন্দ হয়েছিল অমিতাভ ঘোষের। পরের চিঠিতে লেখক জানালেন, "I just finished reading your sample pages. I wanted to write at once to let you know that I liked them very much–especially the second version where you took a somewhat more impressionistic approach (although ideally it might be best to aim for a mix of the literal and the impressionistic).

"It was a strange and exhilarating experience for me to read my own words translated into Bangla. When I was writing this book, I often felt that I had trans lated these words from Bangla into English. Having read your pages I can tell that to see this book translated into Bangla will give me more joy than I can express."

লেখকের ইচ্ছানুযায়ী literal এবং impressionistic এই দুই ধারার মাঝামাঝি পথেই চলার চেষ্টা করা হয়েছে এই অনুবাদে। সে চেষ্টা কতদূর সফল হয়েছে তার বিচারের দায় পাঠকের।

অনুবাদ শুরু করার পর থেকে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের হাতে তুলে দিতে সময় লেগেছে প্রায় সাড়ে তিন বছর। আর এই পুরো সময়টাতেই অনবচ্ছিন্ন ভাবে অনুবাদককে উৎসাহ জুগিয়ে গেছেন লেখক –অধিকাংশ অনূদিত পরিচ্ছেদ পড়েছেন মন দিয়ে, কখনও পরিবর্তন করতে বলেছেন কিছু শব্দ, বাদ দিতে বলেছেন অপ্রয়োজনীয় কিছু পঙক্তি। অনুবাদ যাতে মূলের সুরকে ঠিকমতো ধরতে পারে তার জন্য একাধিকবার সুন্দরবনে ঘুরে আসতে পরামর্শ দিয়েছেন অনুবাদককে, সঙ্গে করে নিয়েও গেছেন একটি দ্বীপে, আলাপ করিয়ে দিয়েছেন স্থানীয় জেলে পরিবারের সঙ্গে, উপন্যাসটি লেখার সময় যাদের খড়ে-ছাওয়া ছোট্ট বাড়িতে মাসাধিককাল কাটিয়েছিলেন লেখক।

এ সব কিছুই ঋদ্ধ করেছে অনুবাদককে নানা ভাবে, সহজ করে দিয়েছে অনুবাদের কাজ। সে বাবদে লেখকের কাছে অনুবাদকের যে ঋণ জমা হয়েছে তা শোধ হওয়ার নয়।

অনুবাদকর্ম চলাকালীন ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহায়তায় চার্লস ওয়ালেস ইন্ডিয়া ট্রাস্টের এক ফেলোশিপে বিলেতে গিয়ে মাস তিনেক কাজ করার সুযোগ ঘটেছিল অনুবাদকের। ইস্ট

অ্যাংলিয়া ইউনিভার্সিটিতে ব্রিটিশ সেন্টার ফর লিটারারি ট্রানস্লেশন-এ ট্রানস্লেটর ইন রেসিডেন্স হয়ে কাটানোর সময় বারো সপ্তাহে একটানা অনুবাদ করা হয়ে গিয়েছিল বেশ কিছু পাতা। তা না হলে পুরো সময়ের সাংবাদিক এই অনুবাদকের পক্ষে বইয়ের কাজ শেষ করে উঠতে দেরি হত আরও বেশ কয়েক মাস। এই সুযোগ পাওয়ার জন্য চার্লস ওয়ালেস ইন্ডিয়া ট্রাস্ট এবং ব্রিটিশ সেন্টার ফর লিটারারি ট্রান্সস্লেশন (বি সি এল টি)-এর কাছে অনুবাদক কৃতজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে উল্লেখ করতে হবে একজনের নাম–বি সি এল . টি-র ডিরেক্টর আমান্ডা হপকিনসন। শ্রীমতী হপকিনসনের সস্নেহ সহযোগিতা না থাকলে প্রবাসে নির্ভার মনে লেখার কাজ এতটা এগোনো অনুবাদকের পক্ষে সম্ভব হত না।

আরও যে কিছু মানুষের উৎসাহ সব সময় অনুবাদকর্মে প্রেরণা জুগিয়েছে তাদের মধ্যে অনুবাদকের পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও রয়েছেন মার্কিন দেশ প্রবাসী বন্ধু প্রণবকুমার ভট্টাচার্য। প্রতিটি পরিচ্ছেদ অনুবাদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোৎসাহে তার প্রুফ দেখেছেন প্রণব, ধরিয়ে দিয়েছেন খুঁটিনাটি অনেক ত্রুটি। এই মানুষগুলির কাছ থেকে যে উৎসাহ এবং সাহায্য পাওয়া গেছে অনুবাদক তা নিজের পাওনা হিসেবেই গ্রহণ করেছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা কখনও মনে হয়নি।

আর যে তিনজনের কাছে ঋণ রয়ে গেছে, তারা হলেন কবি বুদ্ধদেব বসু, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং মুকুল গুহ। রিলকের দুইনো এলিজির যে কটি পঙক্তি এই বইয়ে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি এই তিন কবির অনুবাদ (দে'জ কর্তৃক প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসু কবিতাসংগ্রহ, ৫ম খণ্ড এবং রাইনার মারিয়া রিলকের দুইনো এলিজি, ভাষান্তর শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও মুকুল গুহ)।

'উপহার' অধ্যায়ে জহুরানামার দীর্ঘ উদ্ধৃতি ভাটির দেশে প্রচলিত আব্দুর রহিম সাহেবের পুস্তিকা 'বনবিবির কেরামতি' অর্থাৎ 'বনবিবি জহুরানামা' থেকে নেওয়া হয়েছে। আব্দুর রহিম সাহেবের কাছে এ জন্য অনুবাদকের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

অচিন্ত্যরূপ রায়

কলকাতা

আবেদন

নুক্, কিন্ডেল, কোবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে, পিডিএফ-এ বেশীরভাগ সময় থাকে না।) ইত্যাদি প্রথমদিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই ভাবতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।

ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।

প্রথম পর্ব – ভাটা

ভাটির দেশ

স্টেশনে পা দিয়েই মেয়েটাকে দেখতে পেল কানাই। ছোট করে ছাটা চুল, ঢিলে ট্রাউজার্স আর ঢোলা সাদা জামা পরা—যে কেউ দেখলেই হঠাৎ আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে বলে ভুল করবে। কিন্তু কানাইয়ের হল জহুরির চোখ। স্টেশনের ওই চা-ওয়ালা আর চানাচুর-ওয়ালাদের ভিড়ের মধ্যেও ঠিক নজর করেছে। ব্যাপারটা ভেবে মনে মনে একটু অহংকারই বোধ করল কানাই। মেয়েদের চেনার ব্যাপারে ওর জুড়ি খুঁজে পাওয়া কঠিন। চেহারাটা মন্দ নয় মেয়েটার—সরু লম্বাটে মুখ, হাতে চুড়ি বালা কিছু নেই বটে, কপালে টিপও নেই, তবে রোদে পোড়া চামড়ার ওপর কানের রুপোলি দুলদুটো ঝকঝক করছে, এত দূর থেকেও চোখে পড়ছে সেটা।

কিন্তু মেয়েটার ভাবভঙ্গিতে কেমন একটা অচেনা ছাঁদ রয়েছে। যে ভাবে পা দুটো ফাঁক করে লাইটওয়েট বক্সারের মতো দাঁড়িয়ে আছে—ঠিক চেনা মেয়েলি ভঙ্গি তো এটা নয়। বিদেশি কি? শুধু গায়ের রঙে আর নাকের নথে কীই বা বোঝা যায়? অথবা হয়তো জন্মসূত্রে ভারতীয়, কিন্তু বহুদিনের প্রবাসী। হতেই পারে। পার্ক স্ট্রিটের কলেজের মেয়েদের ভিড়ে ওকে দেখলে হয়তো কানাইয়ের এরকম মনে হত না, কিন্তু এই ধুলো আর জঞ্জালে ভরা ঢাকুরিয়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ওর অচেনা ভঙ্গিটা খুব বেশি করে চোখে পড়ছে। তবে বিদেশিই যদি হয় তো এইখানে কী করছে মেয়েটা? টুরিস্ট ক্যানিং যাবার এই রেলরাস্তা তো ডেইলি প্যাসেঞ্জাররাই বেশি ব্যবহার করে। টুরিস্টরা তো আজকাল সুন্দরবন যাবার জন্য কলকাতা থেকেই লঞ্চ-টঞ্চ ভাড়া করে বলে শুনেছে কানাই। তা হলে কী করছে ও এখানে?

ঘাড় ঘুরিয়ে পাশের লোকটাকে কী যেন একটা জিজ্ঞেস করল মেয়েটা। খুব লোভ হল কানাইয়ের, ও কী বলছে সেটা শোনার। আড়াল থেকে লোকেদের কথাবার্তা শুনতে ওর বেশ মজা লাগে। মানুষের কথাবার্তা, ভাষা, এইসব নিয়েই তো ওর কারবার। আর শুধু তো পেশা নয়, এটা ওর নেশাও বটে।

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ঠেলেঠুলে কাছাকাছি পৌঁছে ও মেয়েটার প্রশ্নের শেষটুকু শুধু শুনতে পেল। শুধু শেষ ক'টা শব্দ—"ট্রেন টু ক্যানিং?"

পাশে দাঁড়ানো লোকটি হাতমুখ নেড়ে ওকে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছিল, কিন্তু সে বলছিল বাংলায়, আর মেয়েটা তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারছে বলে মনে হল না কানাইয়ের। লোকটাকে থামিয়ে দিয়ে খানিকটা ক্ষমাপ্রার্থীর মতো ও বলল, "আমি বাংলা জানি না।"

যে অদ্ভুত উচ্চারণে মেয়েটা বাংলা শব্দগুলি বলল, তাতেই কানাই পরিষ্কার বুঝতে পারল যে ও মিথ্যে বলছে না। সাধারণত সর্বত্রই বিদেশিরা যা করে, ও-ও তাই করেছে—নিজের বোধের অক্ষমতাটুকু জানিয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শব্দক'টা শিখে নিয়েছে।

এই প্ল্যাটফর্মে অবশ্য কানাইও একজন 'বাইরের লোক', আর বহিরাগত হিসেবে সেও যে নিত্যযাত্রীদের খানিকটা মনোযোগ আকর্ষণ করেনি তা নয়। উচ্চতায় মাঝারি, এই বিয়াল্লিশ বছর বয়সেও যথেষ্ট ঘন চুল, জুলফির উপরে অল্প পাক ধরেছে। কানাইয়ের ঘাড় হেলানো আর দাঁড়ানোর ভঙ্গির মধ্যে রয়েছে একটা নিশ্চিত ভাব, যে-কোনও পরিস্থিতির টক্কর নেওয়ার মতো একটা দৃঢ় প্রত্যয় ওর সারা শরীরে যেন ফুটে বেরোচ্ছে। মুখে বয়সের ছাপ পড়েনি বিশেষ, চোখের কোনার চামড়ায় সামান্য ভাঁজ পড়েছে মাত্র। সেটাও ওর প্রাণোচ্ছল ভাবটাই আরও বেশি করে ফুটিয়ে তুলছে। একসময়ে রোগাপাতলা থাকলেও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কোমর একটু ভারী হয়েছে, কিন্তু চলাফেরার ক্ষিপ্রতা তাতে যায়নি। আর তার সাথে আছে এক ধরনের সতর্ক ভাব, একটা পর্যটকসুলভ মুহূর্তযাপনের প্রবৃত্তি।

কানাইয়ের সঙ্গে ছিল টানা-হাতল আর চাকা লাগানো একটা এয়ারলাইন ব্যাগ। ক্যানিং লাইনের ফিরিওয়ালাদের কাছে ওই ব্যাগ কানাইয়ের মাঝবয়সি চাকচিক্য আর শহুরে স্বাচ্ছল্যের একটা অংশ—ওর সানগ্লাস, কর্ডুরয় ট্রাউজার্স আর সোয়েডের জুতোরই মতো। ফলে হকার, ভিখিরি আর চাঁদা-তোলা ছেলেছোকরার দল ওকে ছেঁকে ধরল। অবশেষে সবুজ-হলুদ রঙের ইলেকট্রিক ট্রেনটা ঘস ঘস করে স্টেশনে ঢোকার পর ওদের হাত থেকে

রেহাই পেল কানাই।

গাড়িতে ওঠার সময় কানাই লক্ষ করল বিদেশি মেয়েটা চলাফেরায় যথেষ্ট অভ্যস্ত। ট্রেন স্টেশনে ঢুকতেই ও চট করে ওর বিশাল পিঠব্যাগদুটো নিজেই তুলে নিয়ে গোটাছয়েক কুলিকে পাশ কাটিয়ে দিব্যি এগিয়ে গেল। ওই ছোটখাটো দেখতে হলে কী হবে, হাতে-পায়ে শক্তিও আছে মেয়েটার। আর যে ভাবে ব্যাগদুটোকে ট্রেনের কামরায় তুলে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ঠেলেঠুলে এগিয়ে গেল অনায়াসে, তাতে বোঝাই গেল এরকম একা চলাফেরার অভ্যাস ওর আছে। কানাই একবার ভাবল ওকে বলবে কিনা যে মেয়েদের জন্যও একটা আলাদা কামরা আছে এই ট্রেনে, কিন্তু কিছু বলার আগেই গাড়ির ভিড় মেয়েটাকে গিলে ফেলল। ওকে আর দেখতেই পেল না কানাই।

ঠিক তক্ষুনি হুইসল বেজে উঠল আর কানাই নিজেও ধাক্কাধাক্কি করে উঠে পড়ল কামরাটায়। একটু ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়েই একটা খালি সিট দেখতে পেয়ে বসে পড়ল টুপ করে। ও ঠিক করেছিল এই ট্রেন জার্নির সময় কয়েকপাতা পড়ে নেবে, কিন্তু সুটকেস থেকে কাগজপত্রগুলো বের করতে গিয়েই টের পেল সিটটা মোটেই সুবিধের নয়। খুব একটা আলোও আসছে না, আর ঠিক ডানদিকেই এক মহিলার কোলে একটা বাচ্চা হাত-পা ছুঁড়ে সমানে চাঁচাচ্ছে। সারাপথ যদি ওই বাচ্চার খুদে হাত-পায়ের ঘুষি-লাথি সামলাতে সামলাতে যেতে হয়, তবে তো পড়ার দফা রফা। বাঁদিকের সিটটায় বসতে পারলে চমৎকার হত। দিব্যি আরামে পড়তে পড়তে যাওয়া যেত জানালার ধারে বসে। কিন্তু সেখানে একটা লোক বসে নিবিষ্ট মনে একটা বাংলা খবরের কাগজ পড়ে যাচ্ছে। লোকটাকে একটু মেপে নিল কানাই। নিরীহগোছের বয়স্ক মানুষ—একটু চাপাচাপি করলেই সরে যাবে মনে হয়।

"দাদা, একটু শুনবেন?" হাসি হাসি মুখে কানাই জিজ্ঞেস করল লোকটাকে। ভদ্রলোক কাগজ থেকে মুখ তুলে তাকাতেই ভারী ভালমানুষের মতো বলল, "আপনার অসুবিধা না থাকলে আমার সঙ্গে সিটটা চেঞ্জ করবেন? আমাকে আসলে একগাদা কাজ করতে হবে, জানালার কাছে বসলে আলোটাও একটু বেশি পাব—কাগজপত্রগুলো পড়তে সুবিধা হবে।" লোকটা একটু আশ্চর্য হয়ে ওর দিকে তাকাল। মুহূর্তের জন্য মনে হল বোধহয় মুখের ওপর 'না' বলে দেবে। কিন্তু কানাইয়ের পোশাক-আশাক চেহারাছবি দেখে শেষপর্যন্ত মনে হল মত পালটাল লোকটা। হয়তো ভাবল, কে জানে বাবা এর হাত কত লম্বা, হয়তো পুলিশ-দারোগা নেতা-টেতা চেনাশোনা আছে— কিছুই বলা যায় না। ঝামেলায় গিয়ে কাজ নেই, তার থেকে সিটটা পালটে নেওয়াই ভাল। মানে মানে সরে গিয়ে কানাইয়ের জন্য জায়গা করে দিল লোকটা।

যাক বাবা, বিশেষ ঝামেলা ছাড়াই সিটটা পাওয়া গেল। মাথা নেড়ে লোকটাকে ধন্যবাদ জানাল কানাই। মনে মনে ঠিক করল চা-ওয়ালা এলে ওকে একটা চা অফার করবে। গুছিয়ে বসে সুটকেসের সামনের ফ্ল্যাপ থেকে এক গোছা কাগজ টেনে বের করল ও। খুদে খুদে অক্ষরে বাংলা লেখা। হাঁটুর ওপর পেতে হাত দিয়ে পাতাগুলো সমান করে নিয়ে পড়তে শুরু করল কানাই।

"কথিত আছে, মহাদেব যদি তার জটার মধ্যে গঙ্গার প্রবল স্রোতকে সংযত না করতেন, তা হলে মর্তে অবতরণের সময় নদীর তীব্র গতি পৃথিবীকে চূর্ণ চূর্ণ করে দিত। এই কাহিনি থেকে গঙ্গার একটি বিশেষ রূপ কল্পনা করা যায় : যেন স্বর্গ থেকে নেমে আসা বিশাল এক জলের বেণী এলিয়ে পড়েছে এক শুষ্ক, তৃষ্ণার্ত সমভূমির ওপর। কিন্তু এই নদীকাহিনিতে যে কোথাও একটা মোচড় থাকতে পারে, গঙ্গার গতিপথের একেবারে শেষ পর্যায়ে আসার আগে সেটা বোঝাই যায় না। তবে গল্পের সেই চমকপ্রদ শেষাংশ কেউ কোথাও লিখে যাননি। হয়তো কল্পনাই করেননি কেউ। আমার মনে হয়, এইভাবে তা লেখা যেতে পারে : এই এলিয়ে পড়া জলরাশির বেণী এক সময় সম্পূর্ণ খুলে যায় এবং মহাদেবের জটপাকানো কেশগুচ্ছ ছড়িয়ে পড়ে বিস্তীর্ণ এক অঞ্চল জুড়ে। একটা সময় নদী সব বাঁধন ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়ে শত শত—হয়তো বা সহস্রাধিক—পরস্পরগ্রন্থিত জলধারায়।

"এখানে সমুদ্র এবং বাংলার সমতলভূমির মধ্যে সংযোগসাধন করেছে এক বিশাল দ্বীপপুঞ্জ। তার বিশাল বিস্তার চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। প্রায় তিনশো কিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে আছে এই দ্বীপগুলি—পশ্চিমবঙ্গের হুগলি নদী থেকে শুরু করে বাংলাদেশের মেঘনার তীর পর্যন্ত।

"এই দ্বীপগুলি যেন ভারতমাতার বস্ত্রের প্রান্তভাগ, যেন তার লুটিয়ে পড়া শাড়ির আঁচল—সমুদ্রের লোনা জলে আধো ভেজা। হাজার হাজার এইরকম দ্বীপ ছড়িয়ে আছে এই অঞ্চলে। তাদের মধ্যে কয়েকটির আয়তন বিশাল, আবার কয়েকটি ছোট্ট বালির চর মাত্র। কিছু দ্বীপ আছে লিখিত ইতিহাসের সমান বয়সি, কিছু আবার গজিয়ে উঠেছে মাত্র দু'-এক বছর আগে। এই দ্বীপগুলি যেন মাটির পৃথিবীর কাছে জলের ক্ষতিপূরণ—সারা যাত্রাপথে ধরিত্রীমায়ের কাছ থেকে সে যা গ্রহণ করেছে, এখানে সাগরে পড়ার আগে সে যেন সেই ঋণ শোধ করে দিয়ে যেতে চায়। তবে এই দানের ওপর জল কিন্তু তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। তার স্রোতধারা ছড়িয়ে থাকে সমস্ত স্থলভাগের ওপর সূক্ষ্ম এক জালের মতো। এখানে জল-স্থলের সীমা সর্বদাই পরিবর্তনশীল—সতত অনিশ্চিত।

"নদীপ্রণালীগুলির মধ্যে কয়েকটি আয়তনে বিশাল—এক তীর থেকে অন্য তীর দেখা যায় না। আবার অনেকগুলি মাত্র কয়েকশো মিটার চওড়া, লম্বায় খুব বেশি হলে দু-তিন কিলোমিটার। তবুও এদের প্রত্যেকেই একেকটি নদী, প্রতিটির একটি করে আশ্চর্য দ্যোতনাময় নামও রয়েছে। এই নদীগুলি যেখানে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়—একটা দুটো নয়, চার পাঁচটা, এমনকী কখনও কখনও ছ'টা পর্যন্ত—সে সঙ্গমস্থলের বিস্তার প্রায় দিগ্বলয়কে স্পর্শ করে। দূরে আবছায়া দেখা যায় জঙ্গল, দিগন্তের কাছে স্থলভূমির প্রতিধ্বনির মতো। কথ্য ভাষায় এই সঙ্গমের নাম মোহনা—এক আশ্চর্য মনোমুগ্ধকর শব্দ, প্রায় মাদকতাময়।

"এইখানে মিঠেজল আর লোনাজল, নদী আর সমুদ্রের মধ্যে কোনও সীমারেখা নেই। জোয়ারের স্রোত উজানে তিনশো কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছয়, আর প্রতিদিন বানের সময় হাজার হাজার একর জঙ্গল চলে যায় জলের তলায়। ভাটা এলে জল নেমে যায়, আবার মাথা তুলে ওঠে অরণ্য। জলের স্রোত এমনই তীব্র যে দ্বীপগুলির আকৃতি প্রায় প্রতিদিনই বদলে যায়। কোনওদিন হয়তো গোটা একটা উপদ্বীপ বা ছোটখাটো অন্তরীপ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় স্রোতের টানে, আবার কখনও বা জলের মধ্যে। হঠাৎ জেগে ওঠে একটা নতুন চর।

"এইভাবে জোয়ার-ভাটার টানে যখনই একটা নতুন চর মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, প্রায় রাতারাতি সেখানে গজিয়ে উঠতে থাকে ম্যানগ্রোভ জাতীয় গাছ। পরিবেশ যদি অনুকূল হয়, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই ঘন জঙ্গলে ছেয়ে যায় পুরো দ্বীপ। এই ম্যানগ্রোভ অরণ্য যেন সম্পূর্ণ আলাদা এক জগৎ—অন্য কোনও বনজঙ্গলের সঙ্গে কোনও মিলই নেই এর। অন্য জঙ্গলের মতো কোনও আকাশছোঁয়া গুল্মশোভিত গাছ এখানে নেই, ফার্ন বা জংলা ফুল নেই, কাকাতুয়ার মতো পাখিও এখানে চোখে পড়ে না। ম্যানগ্রোভ জাতীয় গাছের পাতা হয় পুরু এবং শক্ত। গ্রন্থিল শাখা এবং ঘন পল্লবরাজির জন্য এ ধরনের জঙ্গল হয় একেবারে দুর্ভেদ্য। বনের গভীরে আলো প্রায় ঢোকে না বললেই চলে। ফলে দিনের বেলাতেও সামান্য দূরের জিনিস কষ্ট করে ঠাহর করতে হয়। বাতাসও এখানে নিশ্চল আর পূতিগন্ধময়। এ বনে ঢোকা মাত্রই যে কারও মনে হবে এ এক ভয়ংকর শত্রুপুরী। জীবন্ত এক ধূর্ত প্রাণীর মতো যেন তেন প্রকারেণ এই জঙ্গল আগন্তুককে হয় প্রাণে মারতে চায়, নয়তো দূর করে দেয় তার ত্রিসীমানা থেকে। প্রতি বছরই এই দুর্ভেদ্য অরণ্যে প্রাণ দেয় বহু মানুষ হয়—বাঘের হাতে, নয়তো কুমির বা সাপের কামড়ে।

"এ অরণ্যে এমন কিছুই নেই কোনও বহিরাগতের কাছে সুন্দর বলে মনে হতে পারে। তবুও সারা পৃথিবী এই দ্বীপপুঞ্জকে 'সুন্দরবন' নামেই জানে। অনেকে মনে করে ম্যানগ্রোভজাতীয় সুন্দরী গাছ—হেরিটেরিয়া মাইনর—এখানে বেশি আছে বলে এ বনের নাম সুন্দরবন। তবে এ জঙ্গলের নাম বা ইতিহাস খুঁজে বের করা এক কঠিন কাজ, কেননা মুঘল আমলের নথিপত্রে এই জায়গার প্রসঙ্গে কোনও বিশেষ গাছের নাম করা হয়নি, বরং উল্লেখ

করা হয়েছে নদীর স্রোতবিশেষের–ভাটির। এখানকার দ্বীপবাসীরাও এ দেশকে ভাটির দেশ বলেই জানে। জোয়ার নয়, সমুদ্রমুখী জলের টান, অর্থাৎ ভাটা থেকেই এ জায়গা তার নাম পেয়েছে। কেননা জোয়ার যখন আসে, এ অঞ্চলের অধিকাংশই তখন চলে যায় জলের তলায়। কেবল মাত্র ভাটার সময়ই জল থেকে জন্ম নেয় জঙ্গল। অরণ্যের এই জন্মপ্রক্রিয়া (যেখানে ধাইয়ের কাজটা করে চাঁদ) লক্ষ করলেই বোঝা যাবে যে 'ভাটির দেশ' নামটি শুধু যথার্থই নয়, এটাই আসল নাম হওয়া উচিত এই অঞ্চলের। কারণ রিলকের কবিতার হ্যাজেল গাছ থেকে ঝুলন্ত তন্তুজাল বা কালো মাটির ওপর বসন্তের বৃষ্টির মতো, ভাটার স্রোতের দিকেও যখন আমরা তাকাই,

এই আমরা, যারা আনন্দকে জেনেছি উদীয়মান, ঊর্ধ্বগামী, আমাদেরও হয় অনুভূত
সেই সূক্ষ্ম আবেগ, যা প্রায় বিহ্বল করে যখন আনন্দময় কোনো-কিছু পড়ে যায়।"

আমন্ত্রণ

শহুরে এলাকা ছাড়িয়ে মিনিট বিশেক চলার পর ট্রেনটা একটা স্টেশনে এসে থামতেই কপালজোরে জানালার পাশের সিটটা পেয়ে গেল পিয়া। এতক্ষণ ও ঘুপচিমতো একটা কোনার দিকে ভিড়ে ঠাসা বেঞ্চির ওপর কোনওরকমে আলগাভাবে বসেছিল। সামনে পড়েছিল গন্ধমাদনের মতো বিশাল পিঠব্যাগগুলো। জানালার পাশে এসে এবার একটু হাঁফ ছাড়ার সুযোগ পেল। বাইরে তাকিয়ে দেখল স্টেশনটার নাম চম্পাহাটি। প্ল্যাটফর্মটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে কতগুলো নোংরা ঝুপড়ির কাছে, তারপর ডুব দিয়েছে একটা এঁদো ডোবার মধ্যে। ডোবার ঘোলাটে জলে থকথকে ময়লা ফেনা ভাসছে। কামরার ভেতরে এখনও তিলধারণের জায়গা নেই। তার মানে ক্যানিং পর্যন্ত এইরকমই চলবে। রেললাইন বরাবর ঝুপড়ি-বস্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে ও ভাবছিল, কে বলবে যে সুন্দরবনের প্রায় দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে ট্রেনটা?

প্ল্যাটফর্মে একটা লোক চা বিক্রি করছে। জানালা দিয়ে হাত বার করে ইশারায় ওকে ডাকল পিয়া। দাম মিটিয়ে জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে গরম ভাড়টা যেই ও হাতে নিয়েছে, সামনের সিটে বসা লোকটা কীসের যেন একটা পাতা ওলটাল, আর তার হাতের ধাক্কায় ভাড় থেকে চলকে পড়ল খানিকটা চা। চট করে হাত ঘুরিয়ে নিয়ে পিয়া চেষ্টা করল যাতে বেশিরভাগটাই জানালার বাইরে পড়ে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কয়েকটা ফোঁটা গিয়ে পড়ল লোকটার হাতের কাগজে। "ওহ, আই অ্যাম সো সরি"—একেবারে মরমে মরে গেল পিয়া। কামরার সবগুলো লোকের মধ্যে বেছে বেছে এই লোকটার সঙ্গেই এরকম হল! ঢাকুরিয়া স্টেশনেই ওকে লক্ষ করেছিল পিয়া। লোকটার ঘাড় হেলিয়ে দাঁড়ানোর মধ্যে এমন একটা আত্মতুষ্ট ভাব ছিল যে সেটা নজর না করে পারেনি ও। স্টেশনের অন্যদের থেকে একেবারে আলাদা করে চোখে পড়ছিল লোকটাকে; অসংকোচে চারপাশের প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে দেখছিল—প্রতিটা লোককে খুঁটিয়ে নজর করে, যেন মনে মনে মেপেজুপে আলাদা আলাদা করে রেখে দিচ্ছিল যার যার নিজের জায়গায়। অন্যকে নিজের গুরুত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার একটা অনায়াস দক্ষতাও আছে লোকটার, লক্ষ করেছিল পিয়া, যখন পাশের ভদ্রলোককে জানালার কাছের সিটটা থেকে সরিয়ে দিল ও। ওকে দেখে নিজের কয়েকজন কলকাতার আত্মীয়র কথা মনে পড়ছিল পিয়ার। মনে হচ্ছিল তাদেরই মতো অনেকটা এই লোকটা, এরা মনে করে যেন পৃথিবীর যাবতীয় সুখসুবিধা এদেরই প্রাপ্য (শ্রেণিগত কারণ, না শিক্ষা?), আশা করে যেন ছোটখাটো সমস্যা-টমস্যাগুলো ওদের সুবিধার জন্য আপনা থেকেই সরে যাবে।

"এই নিন," লোকটার দিকে একমুঠো টিস্যু পেপার এগিয়ে দিল ও। "আমি হেল্প করছি আপনাকে কাগজগুলো মুছতে।"

"দরকার নেই। একেবারে বারোটা বেজে গেছে।" বিরক্ত মুখ করে দুমড়ে মুচড়ে কাগজগুলো জানালার বাইরে ছুঁড়ে দিল লোকটা।

একটু থতমত খেয়ে গেল পিয়া। মিনমিন করে বলল, "খুব একটা ইম্পর্ট্যান্ট কিছু ছিল না তো?"

"সেরকম অপূরণীয় ক্ষতি কিছু হয়নি। একটা লেখার জেরক্স কপি ছিল ওগুলো।"

এক মুহূর্তের জন্য পিয়ার মনে হল লোকটাকে বলে যে ওরই হাতের ধাক্কায় পড়েছিল চা-টা, কিন্তু ওর মুখ দিয়ে শুধু বেরোল, "আমি খুবই দুঃখিত। কিছু মনে করলেন না আশা করি।"

"মনে করেও কি লাভ আছে কিছু?" ব্যঙ্গের চেয়ে চ্যালেঞ্জের ভাবই যেন বেশি প্রশ্নটার মধ্যে। "আজকের দুনিয়ায় আমেরিকানদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে কেউ কি সুবিধা করতে পারে?"

ঝগড়া করার ইচ্ছে ছিল না, তাই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল পিয়া। বদলে একটা তারিফের ভাব দেখিয়ে চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করল, "কী করে বুঝলেন?"

"কী বুঝলাম?"
"যে আমি আমেরিকান? আপনার চোখ আছে বলতে হবে।"
একটু যেন শান্ত হয়ে লোকটা আরাম করে সিটে হেলান দিল। "বোঝার কিছু নেই, আমি জানতাম।"
"কী করে জানতেন? আমার উচ্চারণ শুনে?"
"হ্যাঁ," মাথা নাড়ল লোকটা। "উচ্চারণ শুনে লোক চিনতে ভুল আমার কমই হয়। আসলে আমি ট্রান্সলেটর। দোভাষীর কাজও করি। এটাই আমার পেশা। উচ্চারণের সামান্য তফাতও সেই জন্যে আমি চট করে ধরে ফেলতে পারি।"
"সত্যি?" পিয়া হাসল। ওর ডিমাকৃতি শ্যামলা মুখে সাদা দাঁতগুলো ঝিকিয়ে উঠল। "কটা ভাষা জানেন আপনি?"
"ছ'টা। ডায়লেক্টগুলো বাদ দিয়ে।"
"ওয়াও!" সত্যি সত্যি তারিফের সুর এবার পিয়ার গলায়। "আমি তো শুধু ইংরেজিটাই জানি, আর সেটাও যে খুব একটা ভাল জানি তা নয়।"
একটু আশ্চর্য হল লোকটা। "আপনি বলছিলেন আপনি ক্যানিং যাচ্ছেন, তাই না?"
"হ্যাঁ।"
"কিন্তু পথঘাট চেনেন না, বাংলা-হিন্দি না জানলে ওখানে গিয়ে তো মুশকিলে পড়বেন।"
"মনে হয় না। এসব অভ্যেস আছে আমার," হেসে ফেলল পিয়া। "কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা হয়েই যায়। তা ছাড়া আমার যা কাজ তাতে কথাবার্তার বিশেষ কোনও দরকারও পড়ে না।"
"কী কাজ করেন আপনি, জানতে পারি?"
"আমি সিটোলজিস্ট। মানে—" ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে যাচ্ছিল পিয়া, কিন্তু মাঝপথে ওকে থামিয়ে দিল লোকটা।
"সিটোলজিস্ট মানে আমি জানি। আপনাকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। আপনি জলচর স্তন্যপায়ী প্রাণীদের নিয়ে কাজ করেন, তাই তো?"
"হ্যাঁ," মাথা নাড়ল পিয়া। "আপনি তো অনেক কিছু জানেন দেখছি। জলচর স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ওপরই গবেষণা করি আমি—ডলফিন, তিমি, ডুগং এইসব। কাজের জন্য অনেকটা সময়ই আমাকে জলের ওপর কাটাতে হয়। কথা বলার মতো ধারে কাছে কেউ থাকেই না। অন্তত ইংরেজি বলার মতো কেউ তো নয়ই।"
"তা হলে কাজের সূত্রেই আপনি ক্যানিং যাচ্ছেন?"
"হ্যাঁ। সুন্দরবনের এইসব জলচর প্রাণীদের স্টাডি করার ইচ্ছে আছে আমার। আশা করি কোনওরকমে পারমিট একটা জোগাড় হয়ে যাবে।"
এবার একটু থমকাল লোকটা। একটুই অবশ্য। "সুন্দরবনে এরকম প্রাণী আছে নাকি? আমি তো জানতামই না।"
"আছে। মানে একসময় ছিল তো বটেই। প্রচুরই ছিল।"
"তাই? সুন্দরবন মানেই তো আমাদের ধারণা শুধু বাঘ আর কুমির।"
"জানি। সুন্দরবনের অন্য সব জলচর প্রাণীর কথা লোকে প্রায় ভুলেই গেছে। কারণটা বলা মুশকিল। হতে পারে যে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে জীবগুলো। অথবা, এদের নিয়ে কখনও কোনও গবেষণা হয়নি, সে কারণে সাধারণ মানুষ এদের কথা জানে না, তাও হতে পারে। এমনকী ঠিকমতো সার্ভেও কখনও করা হয়নি।"
"কেন?"
"হয়তো পারমিশন পাওয়া যায় না বলে। গত বছর একটা টিম এসেছিল এখানে সার্ভের জন্য। বেশ কয়েকমাস ধরে ওরা প্রস্তুতি করেছিল, দরকারি কাগজপত্র ঠিকঠাক পাঠিয়েছিল, কিন্তু শেষে যেতেই পারল না নদী পর্যন্ত। একেবারে লাস্ট মোমেন্টে পারমিট বাতিল করা হল।"

"আপনার ক্ষেত্রেও তো একই ব্যাপার ঘটতে পারে?"

"একা থাকলে কঁকফোকর গলে বেরিয়ে যাওয়াটা অনেক সোজা।"

একটু থেমে মুচকি হাসল পিয়া—"তা ছাড়া কলকাতায় আমার এক কাকা আছেন বেশ উঁচু সরকারি পদে। উনি ক্যানিং-এ ফরেস্ট অফিসে একজনের সঙ্গে কথা বলে রেখেছেন। এখন দেখা যাক কী হয়।"

"আই সি!" পিয়ার এই অকপট অথচ চালাক-চতুর ভাবটা লোকটার ভাল লেগেছে মনে হল। "তা হলে ক্যালকাটায় আত্মীয়স্বজন আছে আপনার?"

"হ্যাঁ। আমার নিজের জন্মও ওখানেই। আমার বাবা-মা দেশ ছেড়েছেন যখন আমার এক বছর বয়স।" কথাটা বলেই লোকটার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল ও ভুরু তুলে বলল, "আপনিও দেখছি ক্যালকাটা বলেন। আমার বাবাও এখনও বলেন ক্যালকাটা।"

মাথা নেড়ে ভুলটা স্বীকার করল কানাই। "ঠিকই বলেছেন, একটু খেয়াল রাখতে হবে নামটা বলার সময়।" হেসে হাতটা বাড়িয়ে দিল ও—"পরিচয়টা সারা যাক। আমার নাম কানাই দত্ত।"

"আমি পিয়ালি রয়। সবাই পিয়া বলেই ডাকে।"

ওর এমন পরিষ্কার বাংলা নাম শুনে কানাই একটু আশ্চর্য হয়েছে বুঝতে পারল পিয়া। আরও বিশেষ করে এইজন্য যে পিয়া নিজে ভাষাটা জানে না। কানাই হয়তো ভেবেছিল পিয়ার বাবা-মা ইন্ডিয়ার অন্য কোনও অঞ্চলের লোক হবে।

"আপনার নামটা তো দেখছি বাঙালি, কিন্তু আপনি বাংলা জানেন না?"

"দোষটা ঠিক আমার নয়," তাড়াতাড়ি বলল পিয়া। "আমি আমেরিকায় বড় হয়েছি। আর আমরা যখন দেশ ছেড়ে গেছি তখন আমি এত ছোট যে ভাষাটা শেখার সুযোগই পাইনি।"

"সেরকম হিসেব করলে তো আমারও ইংরেজি বলার কথা নয়। কারণ আমি বড় হয়েছি কলকাতায়।"

"আসলে ভাষার ব্যাপারে আমার মাথা বিশেষ কাজ করে না..." কথাটা শেষ করল না ও, যেন বাতাসে ভাসিয়ে দিল। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পালটে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আপনি কেন ক্যানিং যাচ্ছেন, মিস্টার দত্ত?"

"কানাই—আমাকে কানাই বলে ডাকতে পারেন।"

"কান-আয়," একটু হোঁচট খেয়ে উচ্চারণ করল পিয়া। ওকে শুধরে দেওয়ার জন্য কানাই বলল, "হাওয়াই-এর সঙ্গে মিলিয়ে বলতে পারেন।"

"কানাই?"

"দ্যাটস রাইট। এবার আপনার প্রশ্নের জবাব দিই—আমি আমার এক মাসির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।"

"উনি ক্যানিং-এ থাকেন?"

"না। উনি থাকেন লুসিবাড়ি বলে একটা ছোট্ট দ্বীপে। ক্যানিং থেকে বহুদূর।"

"ঠিক কোন জায়গায়?" পিঠব্যাগের চেন খুলে একটা ম্যাপ বের করল পিয়া। "জায়গাটা কোথায় এই ম্যাপে একটু দেখিয়ে দিন আমাকে।"

ম্যাপটা খুলে ধরে আঙুল দিয়ে একটা লম্বা আঁকাবাকা কাল্পনিক রেখা টানল কানাই। "ট্রেনে করে এলে ক্যানিং হল সুন্দরবনে ঢোকার দরজা। আর লুসিবাড়ি হল এই যে, এইখানে—একেবারে শেষপ্রান্তে। এর পরে আর কোনও দ্বীপে মানুষ থাকে না। অ্যানপুর, জেমসপুর, এমিলিবাড়ি ছাড়িয়ে আরও বেশ কিছুটা নদীপথে গেলে আপনি লুসিবাড়ি পৌঁছবেন।"

ম্যাপ দেখতে দেখতে ভুরু কোঁচকাল পিয়া, "অদ্ভুত সব নাম।"

"সুন্দরবনের কত জায়গার নাম যে ইংরেজি থেকে এসেছে জানলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন। লুসিবাড়ি মানে হল লুসির বাড়ি।"

"লুসির বাড়ি?" অবাক হয়ে তাকাল পিয়া। "মানে লুসি নামের কোনও মেয়ের বাড়ি?"

“একজ্যাক্টলি,” কানাইয়ের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। “আপনি একবার এসে দেখে যেতে পারেন জায়গাটা। লুসিবাড়ি নামটা কী করে হল আপনাকে শোনাব।”

“নিমন্ত্রণ করছেন?” মুচকি হেসে পিয়া জিজ্ঞেস করল।

“অবশ্যই। চলে আসুন। আপনি এলে আমারও বনবাসের ভার একটু কমে।”

পিয়া হাসল। শুরুতে মনে হচ্ছিল কানাই একেবারেই আত্মকেন্দ্রিক একটা লোক, কিন্তু এখন মনে হল আরেকটু উদারভাবে দেখা যেতে পারে মানুষটাকে। কোথাও যেন একটা বৈপরীত্য রয়েছে ওর চরিত্রের মধ্যে। আর তার জন্যেই ওর আত্মকেন্দ্রিক ভাবটাও খানিকটা ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠেছে। অন্তত পিয়া প্রথমে যা ভেবেছিল তার তুলনায় তো বটেই।

“কিন্তু আপনাকে পাব কোথায়? কোথায় গিয়ে খুঁজব?”

“আপনি সোজা লুসিবাড়ি হসপিটাল চলে যাবেন। সেখানে গিয়ে মাসিমার খোঁজ করলেই লোকে আপনাকে আমার মাসির কাছে নিয়ে যাবে। আর মাসির সঙ্গে দেখা করলেই আমার খোঁজ পেয়ে যাবেন।”

“মাসিমা?” পিয়া জিজ্ঞেস করল। “মাসিমা তো আমারও একজন আছেন। মাসিমা মানে মায়ের বোন তো, তাই না? শুধু মাসিমা বললেই হবে? আরও অনেকেরই নিশ্চয়ই মাসিমা থাকতে পারেন ওখানে?”

“আপনি যদি হসপিটালে গিয়ে মাসিমার কথা বলেন, যে কেউ বুঝবে আপনি কার সঙ্গে দেখা করতে চান। ওই হসপিটালটা আমার মাসিই শুরু করেছিলেন, আর যে সংস্থা ওটা চালায়—বাদাবন ট্রাস্ট—উনি তার সর্বেসর্বা। ওঁর নাম নীলিমা বোস, কিন্তু সবাই ‘মাসিমা বলেই ডাকে ওখানে। আমার মেসো আর মাসি ছিলেন একেবারে যাকে বলে রাজযোটক—ওখানকার সকলের সার’ আর ‘মাসিমা।”

“সার? তার মানে?”

কানাই হেসে ফেলল। “ওটা হল sir বলার বাংলা ধরন। আসলে উনি ছিলেন ওখানকার স্কুলের হেডমাস্টার। তাই সব ছাত্ররা ওনাকে sir-ই বলত। লোকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল ওনার একটা আসল নাম আছে—নির্মল বোস।”

“আপনি ওনার বিষয়ে পাস্ট টেন্স-এ কথা বলছেন যে?”

“হ্যাঁ। উনি বহুদিন হল মারা গেছেন।” মুখটা একটু বিকৃত করল কানাই; যেন মনে মনে স্বীকার করতে চায় না ব্যাপারটাকে।

“তবে এই মুহূর্তে কী মনে হচ্ছে আমার জানেন তো? মনে হচ্ছে মেসো যেন বেঁচেই আছেন এখনও।”

“কী রকম?”

“কারণ উনি প্রায় কবর খুঁড়ে উঠে এসে ডেকে পাঠিয়েছেন আমাকে,” হাসল কানাই। “আসলে মারা যাওয়ার সময় মেসো কিছু কাগজপত্র আমার জন্য রেখে গিয়েছিলেন। এত বছর সেগুলোর কোনও হদিশ ছিল না, কিন্তু রিসেন্টলি পাওয়া গেছে। সেইজন্যই আমি লুসিবাড়ি যাচ্ছি। মাসির খুব ইচ্ছে আমি একবার গিয়ে কাগজগুলো দেখি।”

ওর কথার মধ্যে ক্ষীণ একটা বিরক্তির আভাস পেল পিয়া। “মনে হচ্ছে আপনার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না আসার?”

“ধরেছেন ঠিক। আদৌ ইচ্ছে ছিল না,” বলল কানাই। “হাতে এমনিতেই প্রচুর কাজ, আর এই সময়টাতে কাজের চাপ খুবই বেশি থাকে। এখন এক সপ্তাহ ছুটি নেওয়া—”

“ও। এই প্রথম আপনি যাচ্ছেন ওখানে?”

“না, প্রথম নয়। অনেক বছর আগে আরেকবার আমাকে ওখানে পাঠানো হয়েছিল।”

“পাঠানো হয়েছিল? কেন?”

“সে গল্প বলতে গেলে একটা ইংরেজি শব্দের কথা টানতে হয়, বুঝলেন?” হাসল কানাই। “রাস্টিকেট’ শব্দটা জানেন তো?”

“না। কখনও শুনেছি বলে মনে পড়ছে না।”

“এটা আসলে ছিল একটা শাস্তির ব্যবস্থা, দুষ্ট্র স্কুলছাত্রদের জন্য, কানাই বলল। “আগেকার দিনে এরকম দুরন্ত ছেলেদের সব গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হত গেঁয়ো, মানে রাস্টিক, লোকেদের কাছে। যখন ছোট ছিলাম, আমার ধারণা ছিল অনেক কিছুই আমি আমার মাস্টারমশাইদের থেকে বেশি জানি। একবার আমি একজন টিচারকে সবার সামনে অপদস্থ করেছিলাম। সে ভদ্রলোক কিছুতেই ‘লায়ন’ শব্দটা ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারতেন না। বলতে গিয়ে জিভ জড়িয়ে ফেলতেন, ফলে অদ্ভুত শোনাত শব্দটা, খানিকটা ‘গ্রয়েন’-এর সঙ্গে ছন্দে মিলত। আমার বয়স তখন দশ। তো, তারপর অনেক ঝামেলা-টামেলা হল, স্কুল থেকে আমার বাবা-মাকে জানানো হল যে আমাকে রাস্টিকেট করা হবে। সেই সময়ে আমাকে মাসি-মেসোর কাছে লুসিবাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল,” ঘটনাটা মনে করে হাসি পেল কানাইয়ের। “সে কতকাল আগের কথা, ১৯৭০।”

ট্রেনের গতি কমতে শুরু করেছিল; কানাইয়ের কথার মাঝখানেই হুইসল বাজল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে স্টেশনের হলুদ সাইনবোর্ডটা দেখতে পেল ও–”ক্যানিং।”

“এসে গেছি,” ট্রেনের আলাপ এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাওয়ায় হঠাৎ যেন মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল কানাইয়ের। এক টুকরো কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে খসখস করে কয়েকটা শব্দ লিখে ও পিয়ার হাতে দিল–”এটা রাখুন, আমাকে খুঁজে বার করতে কাজে লাগবে।”

ট্রেন থামতেই কামরার সব লোক হুড়মুড় করে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। পিয়াও দাঁড়িয়ে উঠে পিঠব্যাগগুলো কাঁধে ঝোলাল। “আবার হয়তো দেখা হয়ে যাবে।”

“আশা করি।” হাত নাড়ল কানাই। “মানুষখেকো বাঘ আছে কিন্তু, সাবধানে থাকবেন।”

“আপনিও ভাল থাকবেন। চলি।”

ক্যানিং

প্ল্যাটফর্মের ভিড়ের মধ্যে মিশে যাওয়া পিয়ার পিঠের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে রইল কানাই। বিয়ে-টিয়ে এখনও করেনি যদিও, কিন্তু নিজেকে ও বলে "রেয়ারলি সিঙ্গল"—কদাচিৎ সঙ্গিনীহীন। গত কয়েক বছরে বেশ কিছু মহিলা ওর জীবনে এসেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সম্পর্কগুলো একটা মধুর আন্তরিকতায় শেষ হয়েছে—অথবা টিকে রয়েছে। শেষবারের বিচ্ছেদের ঘটনাটা অবশ্য খুব একটা মধুর হয়নি। মেয়েটি ছিল বিখ্যাত এক কমবয়সি ওড়িশি নৃত্যশিল্পী। সপ্তাহ দুয়েক আগে প্রচণ্ড রেগেমেগে কানাইয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সে ওকে ফোনে আর যোগাযোগ করতে বারণ করেছিল। ব্যাপারটা তখন খুব সিরিয়াসলি নেয়নি কানাই। কিন্তু তারপরে যখন মেয়েটির মোবাইলে ফোন করল, দেখল সেটা ও ওর ড্রাইভারকে দিয়ে দিয়েছে। ঘটনাটায় বেশ জোরালো একটা ধাক্কা খেয়েছিল কানাইয়ের অহমিকা। তারপর থেকেই সেই ভাঙা অহংকারকে জোড়া দিতে ও যে-কোনও একটা সংক্ষিপ্ত সম্পর্কে জড়ানোর চেষ্টা করছে—এমন একটা সম্পর্ক, যার শুরু আর শেষের চাবিকাঠি ওরই হাতে থাকবে। কিন্তু এ যাবৎ সে চেষ্টায় বিশেষ কোনও ফল হয়নি। লুসিবাড়ি ভ্রমণের সময়টায় কানাই ভেবেছিল এই বান্ধবী খোঁজার চেষ্টায় একটা সাময়িক বিরতি দেবে। তবে এটাও ও জানে যে জীবনে অনেক সম্ভাবনারই জন্ম হয় খুব অপ্রত্যাশিত ভাবে। যেমন, পিয়ার সঙ্গে আজ ট্রেনের আলাপটা। এরকম প্রায় ঘঁচে-ফেলা আদর্শ একটা সিচুয়েশন খুব সহজে মেলে না : নদিন পরে ওকে ফিরতেই হবে, কাজেই কেটে পড়ার রাস্তাও পরিষ্কার। আর পিয়া যদি ওর নিমন্ত্রণ রাখতে লুসিবাড়ি শেষপর্যন্ত যায়, তা হলে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলারও কোনও মানে হয় না।

ট্রেনের ভিড় পাতলা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল কানাই। তারপর প্ল্যাটফর্মে নেমে এসে সুটকেসটা দুপায়ের মাঝে রেখে ধীরেসুস্থে চারিদিকে তাকাল।

নভেম্বর শেষ হয়ে আসছে। মিঠে রোদ্দুর আর ঠান্ডা বাতাসে বেশ একটা খড়খড়ে ভাব। হাওয়া বইছে, তবে খুব জোরে নয়। কিন্তু কীরকম যেন একটা ক্লান্ত মরকুটে ভাব স্টেশনটার, যেন ক্ষয়টে মাটি-বেরোনো ঘাসহীন একটা শহুরে পার্ক। চকচকে রেললাইন বরাবর স্তরে স্তরে জমে আছে পেচ্ছাপ পায়খানা আর যত রাজ্যের আবর্জনা; আর প্ল্যাটফর্মটাকে দেখে মনে হচ্ছে কেমন যেন মাটিতে গেঁথে বসে গেছে মানুষের পায়ের চাপে।

এই স্টেশনে প্রথম ও এসেছিল তিরিশ বছরেরও বেশি আগে, কিন্তু এখনও কানাই পরিষ্কার মনে করতে পারে কেমন আশ্চর্য হয়ে ও মাসি-মেসোকে জিজ্ঞেস করেছিল, "এখানে এত লোক থাকে?"

মজা পেয়ে হেসেছিল নির্মল। "তুমি কী ভেবেছিলে? শুধু জঙ্গল থাকবে?"

"হ্যাঁ।"

"লোকজন ছাড়া ওরকম জঙ্গল শুধু সিনেমাতেই হয়। এখানে একেকটা জায়গা আছে যেখানে একেবারে কলকাতার বাজারের মতো ভিড়। আর কোনও কোনও নদীতে যত নৌকো দেখতে পাবে, গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডেও তত ট্রাক থাকে না।"

নিজের সমস্ত গুণের মধ্যে কানাইয়ের সবচেয়ে গর্ব ওর স্মৃতিশক্তি নিয়ে। লোকে যখন এতগুলো ভাষা জানার জন্য ওর প্রশংসা করে, কানাইয়ের ধরাবাঁধা জবাব হল পরিষ্কার কান আর ভাল স্মৃতিশক্তি থাকলেই যে-কোনও ভাষা শেখা যায়; আর ওর সৌভাগ্য যে এ দুটোই ওর আছে। তাই এতগুলো বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও নির্মলের গলার স্বর আর কথা বলার ধরন স্পষ্ট মনে আছে দেখে বেশ একটু আত্মতৃপ্তি অনুভব করল কানাই।

শেষ যেবার নির্মলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেবারের কথা মনে পড়তে বেশ একটু হাসিই পেল ওর। সেটা সত্তরের দশকের শেষ দিক, কানাই তখন কলকাতায় কলেজে পড়ে। ক্লাসে যেতে দেরি হয়ে গেছে বলে ও তাড়াহুড়ো করে হাঁটছিল। ইউনিভার্সিটির ফুটপাথে পুরনো

বইয়ের দোকানগুলোর সামনে দিয়ে প্রায় দৌড়ে যাওয়ার সময় একটা লোকের গায়ে গোঁত্তা খেল কানাই। ভদ্রলোক দোকানে দাঁড়িয়ে একটা বই উলটে পালটে দেখছিলেন। কানাইয়ের আচমকা ধাক্কায় বইটা হাত থেকে উড়ে গিয়ে পড়ল পথের পাশে জমা জলে। "রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াতে পারো না বোকাচোদা"—বলে লোকটাকে খিস্তি করতে গিয়েই মোটা ফ্রেমের চশমার আড়ালে মেসোর হকচকিয়ে যাওয়া চোখদুটো ওর নজরে এল।

"আরে কানাই নাকি?"

"আরে তুমি!" নিচু হয়ে মেসোকে প্রণাম করার সময় জলে-পড়া বইটাও তুলে নিল ও। বিধ্বস্ত মলাটটায় চোখ পড়ল কানাইয়ের—ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের Travels in Mughal Empire.

দোকানদার ততক্ষণে চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে—"এত দামি বইটার বারোটা বাজিয়ে দিলেন মশাই, এটার দাম দিয়ে যেতে হবে আপনাকে।" মেশোর কাঁচুমাচু মুখের দিকে একঝলক তাকিয়েই কানাই বুঝতে পারল এত পয়সা মেশোর সঙ্গে নেই। ঘটনাচক্রে ও নিজে সেদিনই কিছু টাকা পেয়েছিল—একটা প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে কাগজে, তার পারিশ্রমিক। পকেট থেকে ওয়ালেট বার করে দাম মিটিয়ে বইটা নির্মলের হাতে গুঁজে দিল কানাই। পুরো ব্যাপারটাই ঘটে গেল লহমার মধ্যে। অপ্রস্তুত মেসোকে কোনও কৃতজ্ঞতার কথা বলার সুযোগ না দেওয়ার জন্য ও তড়বড় করে বলল, "আমাকে এখন দৌড়োতে হবে, ক্লাসের দেরি হয়ে যাচ্ছে।" একলাফে জল-জমা একটা গর্ত পেরিয়ে সেখান থেকে হাওয়া হয়ে গেল কানাই।

এরপর কতবার ওর মনে হয়েছে আবার কখনও ঠিক এভাবেই দেখা হয়ে যাবে মেশোর সঙ্গে—দোকানে দাঁড়িয়ে কোনও দামি বই নেড়েচেড়ে দেখবে নির্মল, সে বই হয়তো তার কেনার সামর্থ্য নেই, আর কানাই তখন এসে বইটা মেসোকে কিনে দেবে। কিন্তু সেরকম কিছু আর ঘটেনি। কলেজ স্ট্রিটের সেই দুপুরের প্রায় দু'বছর পরে দীর্ঘদিন রোগে ভুগে লুসিবাড়িতে মারা গেল নির্মল। মৃত্যুশয্যায় মেসোর ওর কথা মনে পড়েছিল, নীলিমার কাছ থেকে পরে শুনেছে কানাই। নিজের কোনও একটা লেখা কানাইকে পাঠিয়ে দিতে বলেছিল। কিন্তু মারা যাওয়ার বেশ কয়েকমাস আগে থেকেই মেসোর কথাবার্তা অসংলগ্ন হয়ে গিয়েছিল, তাই নীলিমা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি কী করবে। নির্মল যাওয়ার পর সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিল—যদি কোথাও কিছু থেকে থাকে। কিছুই পাওয়া যায়নি। নীলিমারও তাই মনে হয়েছিল ওসব লেখা-টেখার কথা হয়তো প্রলাপের ঘোরেই বলা। শেষের দিকে এমনিতেই তো অকারণে বিড়বিড় করত মানুষটা।

কিন্তু মাসদুই আগে একদিন সকালে দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কের ফ্ল্যাটে হঠাৎ মাসির একটা ফোন পেল কানাই। নীলিমা ফোন করেছিল গোসাবার একটা বুথ থেকে—লুসিবাড়ির কাছেই আধা শহর-আধা গঞ্জ একটা জায়গা। ফোনটা যখন বাজল, কানাই তখন ব্রেকফাস্টের অপেক্ষায় খাওয়ার টেবিলে বসে।

"কানাই বলছিস?"

দু'-একটা এটা সেটা কথা, কুশল প্রশ্নের পরেই ওর মনে হল মাসির গলায় কেমন একটা বাধোবাধো সুর। যেন কী একটা বলতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। "কিছু হয়েছে নাকি মাসি?

তুমি কি কিছু বলবে আমাকে?" কানাই জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ রে, একটা কথা বলার ছিল," নীলিমার স্বর একটু অপ্রতিভ।

"কী ব্যাপার? বলো না।"

"আমি ভাবছিলাম, মানে, তুই যদি একবার কয়েকদিনের জন্য লুসিবাড়িতে আসতে পারিস খুব ভাল হয় রে কানাই। তুই কি পারবি?"

একটু অবাকই হল কানাই। ঠিকই, নীলিমার ছেলেপুলে নেই, নিকট আত্মীয় বলতে একমাত্র ও-ই, কিন্তু এরকম দাবি মাসি আর কখনও করেছে বলে মনে পড়ল না ওর। নীলিমা বরাবরই একটু চাপা প্রকৃতির, কারও কাছে কোনও অনুগ্রহ চাওয়া তার স্বভাবে নেই। "কেন বলো তো?" আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল কানাই।

ফোনের ওপারে কয়েকমুহূর্ত কোনও শব্দ নেই। তারপর নীলিমা বলল, "তোর মনে আছে কানাই, অনেক বছর আগে আমি বলেছিলাম নির্মল তোর জন্য একটা লেখা রেখে গেছে?"

"হ্যাঁ, মনে তো আছেই। কিন্তু সে লেখাটা তো পাওয়া যায়নি?"

"সেটাই তো," বলল নীলিমা। "মনে হয় শেষপর্যন্ত পেয়েছি। তোর নাম লেখা একটা মোটা প্যাকেট খুঁজে পাওয়া গেছে।"

"কোথায় পেলে?"

"নির্মলের পড়ার ঘরে। আমি যেখানে থাকি, ট্রাস্টের গেস্টহাউসে, তার ছাদের ওপর। ও মারা যাওয়ার পর এত বছর ধরে ঘরটা তালাবন্ধ পড়েছিল। কিন্তু এবার ওটা ভেঙে ফেলতে হবে, বাড়িটা আর একতলা বাড়াব। দু'একদিন আগে সেজন্য ঘরটা পরিষ্কার করতে গিয়ে পেলাম প্যাকেটটা।"

"ভেতরে কী ছিল?"

"নিশ্চয়ই ওইসব প্রবন্ধ, কবিতা-টবিতা যা লিখেছিল এত বছর ধরে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, আমি জানি না। আমার মনে হয় ও থাকলে তোকেই প্রথম ওগুলো পড়াতে চাইত। আমার লিটারারি জাজমেন্টের ওপর ওর কখনওই কোনও ভরসা ছিল না, আর আমিও সত্যি সত্যিই কিছু বুঝি না ওসব। তাই ভাবছিলাম তুই যদি একবার আসিস। হয়তো তুই লেখাগুলো ছাপানো-টাপানোরও ব্যবস্থা করতে পারবি। তোর তো অনেক পাবলিশারের সঙ্গে জানাশোনা আছে।"

"তা আছে," কানাই বলল। মাথার মধ্যে কেমন সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল ওর।

"কিন্তু এখন লুসিবাড়িতে যাওয়া—এতদূরে–দিল্লি থেকে যেতেই তো দু'দিন লাগবে। মানে, গেলে ভালই লাগবে, কিন্তু–"

"তুই এলে আমি খুব খুশি হব, কানাই।"

নীলিমার কথা বলার এই শান্ত অথচ দৃঢ় ভঙ্গিটা কানাই খুব চেনে। কিছু একটা করবে বলে মনস্থির করলেই ওর কথা বলার ধরনটাই যেন পালটে যায়। কানাই বুঝতে পারছিল মাসি সহজে ছাড়বে না। ওদের পরিবারে তো নীলিমা তার জেদের জন্যই বিখ্যাত। আর ওই ছিনে-জোঁকের মতো লেগে থাকার ক্ষমতা আছে বলেই ও আজকের এই বাদাবন ট্রাস্ট গড়ে তুলতে পেরেছে। গ্রামের মানুষদের নিয়ে যেসব এনজিও কাজ করে, তাদের মধ্যে এই ট্রাস্টকে এখন আদর্শ বলে জানে সবাই।

"প্যাকেটটা ডাকে পাঠিয়ে দেওয়া যায় না, মাসি?" শেষ চেষ্টা কানাইয়ের।

"এরকম একটা জিনিস আমি ডাকে পাঠাব? কোথায় হারিয়ে যাবে তারপর!"

"মানে, ব্যাপারটা কী জানো তো, এখন আমাদের খুব কাজের চাপ। এক্কেবারে দম ফেলার সময় পাচ্ছি না।"

"তুই তো সব সময়ই ব্যস্ত।"

"সেটা ঠিকই।" কানাইদের ফার্মটা ছোট হলেও চড়চড় করে উন্নতি করছে। এই কোম্পানি ওর নিজের হাতে গড়া, আর ও-ই এটার হর্তাকর্তা-বিধাতা। দিল্লির বিভিন্ন দূতাবাস, বহুজাতিক সংস্থা আর দাঁতব্য প্রতিষ্ঠানের কাজে যে সমস্ত বিদেশি লোকজনেরা আসে, ওর কোম্পানির লোকেরা তাদের জন্য অনুবাদ আর দোভাষীর কাজ করে। এই ধরনের আর কোনও সংস্থা দিল্লিতে নেই বলেই এ লাইনে ওদের প্রায় একচেটিয়া দখল, আর চাহিদাও প্রচণ্ড। ফলে অফিসের লোকেদের সবাইকেই মুখে রক্ত তুলে খাটতে হয়; কানাইকে পরিশ্রম করতে হয় সবচেয়ে বেশি।

"তুই তা হলে আসছিস তো?" নীলিমা আবার জিজ্ঞেস করল। "প্রতি বছরই বলিস আসবি, কিন্তু শেষপর্যন্ত আর আসিস না। আমারও তো বয়স হচ্ছে, নাকি?"

একটু আগেও কানাই ভাবছিল কোনওরকমে কাটিয়ে দেবে নীলিমাকে, কিন্তু মাসির গলায় অনুনয়ের সুরটা শুনে মত পালটাল ও। বরাবরই কানাই নীলিমার একটু ন্যাওটা। মা মারা যাওয়ার পর টানটা আরও বেড়েছে। চেহারায়, স্বভাবে ওর মায়ের সঙ্গে এই মাসির

খুবই মিল। মাসির জন্য কানাইয়ের শ্রদ্ধায়ও কোনও খাদ নেই। নিজের ব্যবসাটা গড়ে তুলতে গিয়ে ও হাড়ে হাড়ে বুঝেছে বাদাবন ট্রাস্টের মতো একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য কী ঝড়টা সামলাতে হয়েছে নীলিমাকে। আর ওর ব্যবসার তুলনায় নীলিমার কাজ ছিল আরও অনেক কঠিন, কারণ বাদাবন ট্রাস্ট লাভের জন্য কাজ করে না। প্রথমবার লুসিবাড়িতে গিয়ে তো ও নিজের চোখেই দেখেছে কী নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটায় ভাটির দেশের মানুষরা। আর ওরা যাতে একটু অন্তত ভাল থাকতে পারে তার জন্যই নিজের জীবনটা বিলিয়ে দিয়েছে মাসি। নীলিমার এই গুণটার কোনও তুলনা খুঁজে পায় না কানাই। কেন এই জীবন মাসি বেছে নিল তারও কোনও ব্যাখ্যা ও খুঁজে পায় না। নিজের কাজের জন্য নীলিমা কোনও স্বীকৃতি পায়নি তা নয়—এই গত বছরই তো রাষ্ট্রপতির সম্মানপদক আর বড়সড় একটা উপাধি পেল। কিন্তু তাও কানাই ভাবে, যে পরিবেশ থেকে তার মাসি এই বাদাবনে এসেছিল, তাতে তার পক্ষে লুসিবাড়িতে এতগুলো বছর কাটিয়ে দেওয়াটা একটা আশ্চর্য ঘটনা। মা-র কাছ থেকে কানাই শুনেছে, তার মামাবাড়িতে আরাম-বিলাসের কোনও কমতি ছিল না। আর সে তুলনায় লুসিবাড়িতে তো সাধারণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যেরও কোনও ব্যবস্থা নেই।

বন্ধুদের কাছে কানাই কতবার গল্প করেছে, তার মাসি কত স্বার্থত্যাগ করেছে সাধারণ মানুষের জন্য—যেন নীলিমা কোনও স্বর্ণযুগের এক চরিত্র, যে যুগে বড়লোকদের মধ্যে এত সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা ছিল না। এই সমস্তকিছুই মনের মধ্যে কাজ করছিল বলে মাসির অনুরোধটা শেষপর্যন্ত ফেরাতে পারল না কানাই।

"ঠিক আছে, তুমি যখন যেতে বলছ, তা হলে তো করার আর কিছু নেই, যেতেই হবে।" একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই ও বলল। "দিনদশেকের জন্য যাওয়ার চেষ্টা করছি। আমাকে কি আজকালের মধ্যেই রওয়ানা হতে বলছ?"

"না না," নীলিমা তাড়াতাড়ি বলল। "এক্ষুনি আসার কোনও দরকার নেই।"

"তা হলে অবশ্য অনেক সহজ হয়ে যায় ব্যাপারটা আমার পক্ষে," স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল কানাই। সেই ওড়িশি শিল্পীর সঙ্গে ওর টক-ঝাল সম্পর্কটা তখন একটা ইন্টারেস্টিং মোড় নিচ্ছিল। সেই মুহূর্তে তার ছন্দপতন ঘটানোর মতো একটা ত্যাগ স্বীকার করতে মন চাইছিল না। শেষপর্যন্ত সেটা করতে হল না ভেবে খুশি হল কানাই। "ঠিক আছে। মাস দুয়েকের মধ্যেই পৌঁছে যাব আমি। এদিকটা একটু গুছিয়ে নিয়েই তোমাকে জানাব।"

"ওকে। আমি অপেক্ষা করে থাকব।"

আর এখন, এই ক্যানিং স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কানাই দেখল শেডের নীচে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে তার মাসি—প্রায় জনাবিশেক লোক তাকে ঘিরে রয়েছে। তাদের কেউ কেউ নীলিমার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে, আর কেউ রয়েছে বৃত্তের বাইরের দিকে, ভিড় ঠেলে ভেতরে পৌঁছতে পারছে না। চুপচাপ হেঁটে গিয়ে কানাই ভিড়টার পাশে দাঁড়াল। লোকগুলোর কথাবার্তা শুনে মনে হল এরা কেউ এসেছে কিছু কাজের খোঁজে, আর উঠতি নেতাগোছের কিছু লোক এসেছে নীলিমার সাহায্যের আশায়। কিন্তু জটলাটার বেশিরভাগ লোকই স্রেফ শুভাকাঙ্ক্ষী। তারা শুধু নীলিমাকে একবার চোখের দেখা দেখতে চায়, তার সান্নিধ্যের ছোঁয়া নিতে চায়। আর কিছু না।

এই ছিয়াত্তর বছর বয়সে নীলিমা বোস আকারে প্রায় গোল, তার টোল-পড়া গোল ঘঁদের মুখে পূর্ণিমার চাঁদের আদল। গলার স্বর নরম, কিন্তু চেরা বাঁশের গায়ে টোকা দিলে যেমন আওয়াজ বের হয় সেরকম, একটু ভাঙা। ছোট্টখাট্টো মানুষটি, মাথার চুল এখনও যথেষ্ট কালো—পেছনদিকে পুঁটলি করে বাঁধা। পরনে সর্বদাই বাদাবন ট্রাস্টে বোনা সুতির কাপড়, পাড়ে বাটিকের কাজ করা। এরকমই একটা আটপৌরে সরু কালো পাড় শাড়ি পরে নীলিমা চলে এসেছে, কানাইকে রিসিভ করতে।

এমনিতে নীলিমার ব্যবহারে সব সময়ই একটা আলগা প্রশ্রয়ের ভাব থাকে, কিন্তু দরকার পড়লেই বেরিয়ে আসে ভেতরের কঠিন মানুষটা—সে সময় তাকে অমান্য করার সাহস কারও নেই। কারণ সবাই ভাল করেই জানে, সব মা-মাসিদের মতোই নীলিমা একদিকে যেমন

স্নেহময়ী, তেমনি দোষীদের কখনও ছেড়ে কথা বলা তার ধাতে নেই।

ভিড়ের বাইরে কানাইয়ের চেহারাটা নজরে আসতেই হাতের ইশারায় লোকগুলোকে থামিয়ে দিল নীলিমা। আর জটলাটা যেন মন্ত্রবলে দু'ভাগ হয়ে গিয়ে কানাইয়ের জন্য পথ করে দিল।

"কানাই! কোথায় ছিলি এতক্ষণ? আমি তো ভাবছি ট্রেন মিস করলি বোধ হয়"–প্রণাম করার জন্য নিচু হতেই হাত দিয়ে ওর চুলগুলো এলোমেলো করে দিল নীলিমা।

"ঠিক সময়েই পৌঁছে গেছি তো।" একহাতে মাসিকে জড়িয়ে ধরে দাঁড় করাতে করাতে কানাই ভাবছিল কী রকম বুড়িয়ে গেছে নীলিমা এই ক'বছরে। মাসির কনুইটা ধরে ধীরে ধীরে স্টেশনের গেটের দিকে এগোল ও। জটলার লোকগুলো মালপত্র নিয়ে আসতে লাগল পেছন পেছন।

"তুমি আবার খামকা ক্যানিং পর্যন্ত ঠেঙিয়ে আসতে গেলে কেন বলো তো? আমি ঠিকই পৌঁছে যেতে পারতাম।" এ কথাটা অবশ্য নিছক ভদ্রতার খাতিরেই বলা, কারণ একা খুঁজে খুঁজে লুসিবাড়ি যেতে হলে বেশ একটু মুশকিলেই পড়তে হত ওকে। আর ক্যানিং-এ এসে যদি দেখত ওকে নিতে কেউ আসেনি, মেজাজটা একেবারে খাট্টা হয়ে যেত কানাইয়ের।

নীলিমা অবশ্য অতশত বোঝেনি। "ভাবলাম চলে আসি। লুসিবাড়ি থেকে মাঝে মধ্যে বেরোতে পারলে ভালই লাগে। কিন্তু সে যাকগে, ট্রেনে কোনও অসুবিধা হয়নি তো? বোর হসনি তো একা একা?"

"না না। আসলে একটা ইন্টারেস্টিং মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল, কথা বলতে বলতে চলে এলাম। আমেরিকান মেয়ে একটা।"

"তাই? এখানে কী করতে এসেছে?" জিজ্ঞেস করল নীলিমা।

"ওই ডলফিন-টলফিন জাতীয় প্রাণীদের ওপর রিসার্চ করছে। আমি ওকে বলেছি পারলে একবার লুসিবাড়ি ঘুরে যেতে।"

"বেশ করেছিস। আসবে আশা করি।"

"হ্যাঁ, আশা করি," বলল কানাই।

চলতে চলতে আচমকা থমকে গিয়ে কানাইয়ের কনুইটা খামচে ধরল নীলিমা। উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আমি তোকে নির্মলের একটা লেখা পাঠিয়েছিলাম, তুই কি পেয়েছিলি?"

"হ্যাঁ," মাথা নাড়ল কানাই। "সেটাই তো ট্রেনে পড়তে পড়তে এলাম। মেসো আমার জন্য যে প্যাকেট রেখে গেছে ওটা কি তার মধ্যে পেলে?"

"না না, এই লেখাটা তো বহুকাল আগের। একটা সময়–বেশ কিছুদিন–তোর মেসো সারাদিন কেমন মনমরা হয়ে থাকত। তখন আমি ভাবলাম যদি কিছু একটা কাজে ওকে জড়িয়ে রাখা যায় তা হলে হয়তো মনটা একটু ভাল লাগবে। তাই বললাম সুন্দরবন নিয়ে টুকটাক কিছু লিখতে তো পারো। ভেবেছিলাম পরে ওগুলোকে আমাদের ব্রোশিওর-টোশিওরে লাগিয়ে দেব। কিন্তু শেষপর্যন্ত ও যেগুলো লিখল, সেগুলো একটু অন্য ধাঁচের। তোর ভাল লাগতে পারে ভেবে তোকে পাঠিয়েছিলাম।"

"ও। আমার কেন জানি মনে হয়েছিল ওই প্যাকেটের থেকে বের করে ওগুলো তুমি। পাঠিয়েছ।"

"না না। প্যাকেটটা আমি খুলিইনি," বলল নীলিমা। "যেমন আঠা লাগিয়ে বন্ধ করা ছিল সেরকমই আছে। আমি জানি নির্মল চেয়েছিল তুই-ই ওই লেখাগুলো প্রথম পড়িস। আমাকেও ও তাই বলেছিল, মারা যাওয়ার ঠিক আগে।"

কানাই একটু ভুরু কোঁচকাল। "তোমার কখনও কৌতূহল হয়নি?"

মাথা নাড়ল নীলিমা। "কানাই, তুই যখন আমার বয়সে পৌঁছবি, দেখবি যেসব ভালবাসার মানুষরা চলে গেছে তাদের স্মৃতিমাখানো জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করতে কীরকম মন খারাপ লাগে। সেজন্যই আমি তোকে আসতে বলেছিলাম।"

স্টেশন চত্বর ছেড়ে ধুলোভরা একটা রাস্তায় নেমে এল ওরা। রাস্তার দু'ধারে গায়ে গায়ে লাগানো পানবিড়ি তেলেভাজার দোকান, আরও কত ছোটখাটো দোকান।

"কানাই, তুই যে শেষপর্যন্ত এসেছিস তাতে আমি কী খুশি যে হয়েছি—" নীলিমা বলল। "কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।"

"কী কথা?"

"তুই ক্যানিং দিয়ে কেন আসতে চাইলি? বাসন্তী হয়ে এলে কত সুবিধা হত। আজকাল তো এই রুটে কেউ আসেই না প্রায়।"

"তাই নাকি? কেন আসে না?"

"নদীর জন্য। নদীটা একেবারে পালটে গেছে তো।"

"পালটে গেছে? কীরকম?"

কানাইয়ের মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে নীলিমা বলল, "একটু অপেক্ষা কর, দেখতে পাবি এক্ষুনি।"

"যে-কোনও বড় নদীর কাছে গেলেই পুরনো দিনের কোনও না কোনও স্মৃতিচিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে।"

মেসো এর পর ওকে যে লম্বা লিস্টি শুনিয়েছিল তা পরিষ্কার মনে আছে কানাইয়ের :

মানাওসের অপেরা হাউস, কার্নাকের মন্দির, প্যাগানদের দশ হাজার প্যাগোডা... ক্যানিংকেও ওই তালিকায় তুলে দিয়েছিল মেসো, ভেবে হাসি পেল কানাইয়ের। "আমাদের এই মাতলার পাশের ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন হল পোর্ট ক্যানিং।"

ক্যানিং বাজার অঞ্চলের চেহারাটা একই রকম রয়ে গেছে দেখল কানাই—সরু সরু গলি, ঘেঁষাঘেষি দোকানপাট, নোনাধরা ঘরবাড়ি। ছোট ছোট দোকানে নানারকম পেটেন্ট ওষুধ বিক্রি হচ্ছে, ব্যথাবেদনা আর পেটের রোগের। বিচিত্র সব নাম ওষুধগুলোর হজমোজাইন, দর্দোসাইটিন। বাড়িঘরের মধ্যে চোখে পড়ার মতো আছে একমাত্র কিছু সিনেমা হল। বিশাল বিশাল হল সব, বালির বস্তার মতো কুৎসিত চেহারা নিয়ে চেপে বসে আছে জায়গাটার ওপর। যেন মাতলা যাতে শহরটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে না পারে সেইজন্যই ওগুলিকে বসিয়ে রাখা হয়েছে এখানে।

একটা ইটবাঁধানো রাস্তায় গিয়ে শেষ হয়েছে বাজারটা। রাস্তাটা চলে গেছে শহর থেকে নদীর দিকে; কিন্তু খানিকটা গিয়েই শেষ হয়ে গেছে—নদীতে পৌঁছনোর বেশ কিছুটা আগেই। রাস্তার একদম শেষপ্রান্তে এসে কানাই বুঝতে পারল নীলিমা কেন বলছিল নদী পালটে গেছে। ওর স্মৃতিতে যে মাতলা আছে সে এক বিশাল নদী, সেরকম আর কখনও ও জীবনে দেখেনি। কিন্তু এখন সামনে বেশ কিছুটা দূরে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটাকে বড়জোর একটা সরু খাল বলা যেতে পারে। ভাটা অনেকক্ষণ শুরু হয়ে গেছে, আর প্রায় কিলোমিটারখানেক চওড়া খাতের ঠিক মাঝখান দিয়ে তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে মাতলা। জলের ধার বরাবর সদ্য জমা পলি রোদে চকচক করছে, মনে হচ্ছে যেন পরতে পরতে জমে থাকা গলন্ত চকলেট। মাঝে মাঝেই এখানে ওখানে নদীর গভীর থেকে দু'-একটা বুদবুদ ভেসে উঠেই ফেটে যাচ্ছে, বৃত্তাকার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে বার্নিশ করা জলের ওপর। বুদবুদের শব্দগুলো যেন অস্ফুটে বলা কোনও কথার মতো মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন পৃথিবীর গভীর থেকে ভেসে আসা কোনও কণ্ঠস্বর আপন মনে বকবক করে চলেছে।

"ওই দেখ," নীলিমা বলল দুরের দিকে একটা আঙুল দেখিয়ে। ভাটার মাতলার ওপর দিয়ে জল ছিটিয়ে এগিয়ে আসছে একটা নৌকো। মিটার নয়েকের বেশি লম্বা নয়, কিন্তু শখানেকের বেশি মানুষ গাদাগাদি করে উঠেছে ওটার ওপর। কানায় কানায় ভর্তি নৌকোটা, কিনারাগুলো জলের ওপর কোনওরকমে মাত্র ইঞ্চি ছয়েক জেগে রয়েছে। নদীর ধারে এসে নৌকোর গতি কমতেই মাঝিদের একজন একটা লম্বা তক্তা বের করে পাড়ের কাদায় খুঁজে দিল। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল কানাই। কী হবে এখন? এতগুলো লোক এই তলতলে কাদার সমুদ্র পেরিয়ে পাড়ে এসে পৌঁছবে কী করে?

নৌকোয় ততক্ষণে অবশ্য তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। মহিলারা শাড়ি গুটিয়ে, আর পুরুষরা যার যার লুঙ্গি, প্যান্ট হাঁটুর ওপর তুলে কাদায় নামার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তক্তা বেয়ে লোকগুলো এবার এক এক করে নামতে লাগল। হাঁ করে দেখছিল কানাই, মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকে কীভাবে আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে থকথকে কাদায়। ঘন ডালের বাটিতে চামচ রাখলে সেটা যেমন ধীরে ধীরে ডুবতে থাকে, কাদায় ডুবন্ত যাত্রীদের ঠিক সেরকম মনে হচ্ছিল। বেশ কয়েকটা দীর্ঘ মুহূর্ত—কাদা একেকজনের প্রায় পাছা পর্যন্ত পৌঁছনোর পর শুরু হল ওদের সামনের দিকে এগোনোর পালা। প্রত্যেকের পা-ই কাদার নীচে, মানুষগুলোর শুধু ধড়টুকু দেখা যাচ্ছে—শরীরে মোচড় দিতে দিতে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে আসছে শুকনো ডাঙার দিকে।

ভুরু কুঁচকে ওদের দিকে তাকিয়ে ছিল নীলিমা। "এদের দেখেই তো আমার হাঁটুতে ব্যথা করছে। আগে আমিও পারতাম রে এরকম কাদা ঠেলে আসতে, কিন্তু এখন আর পায়ে সে জোর নেই। আর মুশকিল কী জানিস তো? নদীতে জলও ভীষণ কমে গেছে আজকাল। ভাটার সময় তো থাকে না বললেই চলে। তোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আজকে আমরা ট্রাস্টের লঞ্চ নিয়ে এসেছি, কিন্তু আরও অন্তত ঘণ্টা দুয়েকের আগে লঞ্চ এই অবধি আসতেই পারবে না।" একটু অভিযোগের দৃষ্টিতে বোনপোর দিকে তাকাল নীলিমা। "তুই যদি বাসন্তী দিয়ে আসতিস কত সহজ হত জার্নিটা বল তো?"

"আমি তো জানতাম না," খেদের সুর কানাইয়ের গলায়। "তুমি যদি একবার বলতে... আমি তো এই রুটে এসেছি কারণ ১৯৭০-এ যখন লুসিবাড়ি গেলাম তখনও আমরা ক্যানিং হয়েই গিয়েছিলাম।"

চারিদিকে তাকিয়ে দৃশ্যগুলো যেন মনের মধ্যে গেঁথে নিচ্ছিল কানাই। ওর স্পষ্ট মনে পড়ল আকাশের গায়ে বিরাট একটা সারসের মতো দেখতে নির্মলের সিলুয়েট। পাখির উপমাটা মনে এসেছিল মেসোর পোশাক আর ছাতাটার জন্য। নদীর হাওয়ায় নির্মলের ধুতি-পাঞ্জাবি পতপত করে উড়ছিল পালকের ডানার মতো। আর সরু ছাতাটাকে মনে হচ্ছিল ঠিক যেন লম্বা ছুঁচলো পাখির ঠোঁট।

"ঠিক এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে ছিল, আমরা যখন নৌকোর জন্য অপেক্ষা করছিলাম।"

"কে, নির্মল?"

"হ্যাঁ। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, হাতে ছাতা।"

হঠাৎ ওর কনুইটা শক্ত করে চেপে ধরল নীলিমা, "চুপ কর, চুপ কর কানাই, আর বলিস না।"

থমকে থেমে গেল কানাই। "এখনও তোমার এত মন খারাপ হয়ে যায় মেসোর কথা শুনলে? এত বছর পরেও?"

নীলিমা যেন শিউরে উঠল। "এই জায়গাটায়—ঠিক এই জায়গাটাতেই ওকে পাওয়া গিয়েছিল, জানিস? এই ক্যানিং-এর বাঁধের ওপর। তারপর আর কয়েকমাস মাত্র বেঁচে ছিল। নিশ্চয়ই বৃষ্টিবাদলের মধ্যে বাইরে বাইরে ঘুরেছিল—নিউমোনিয়া হয়ে গিয়েছিল তো।"

"আমি তো এতসব জানতাম না! কিন্তু মেসো ক্যানিং এসেছিলই বা কেন?"

"এখনও ঠিক জানি না কেন এসেছিল। শেষের দিকে ওর চালচলন কীরকম খাপছাড়া হয়ে গিয়েছিল—সব সময় যেন একটা চাপের মধ্যে থাকত। রিটায়ার করল হেডমাস্টার হয়ে, আর মাত্র কয়েকমাসের মধ্যেই চোখের সামনে কেমন বদলে গেল চেনা মানুষটা। যখন তখন কিছু না বলে কয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যেত। আর সে সময়টাতেই মরিচঝাঁপির গণ্ডগোলও শুরু হয়েছে, আমি তো ভয়ে কাঠ হয়ে থাকতাম।"

"তাই নাকি?" কানাই একটু অবাক। "মরিচঝাঁপির ব্যাপারটা কী যেন? আমার ঠিক মনে নেই।"

"মরিচঝাঁপি ছিল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একটা দ্বীপ। রিফিউজিরা এসে দখল করে নিয়েছিল। সরকার যেই বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল, অমনি শুরু হয়ে গেল মারদাঙ্গা।

গভর্নমেন্ট ওদের জোর করে মধ্যভারতের একটা উদ্বাস্তু শিবিরে ফেরত পাঠাতে চাইছিল। প্রচুর বাস-ট্রাক বোঝাই করে মানুষগুলোকে নিয়ে যাচ্ছিল সেখানে। এদিকে সারা তল্লাটে তো নানা গুজব ছড়াতে লাগল। আমি ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি—নির্মলকেও যদি নিজের মনে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে দেখে ওরা, কী যে হবে! শেষে মনে হয় ওকেও জোর করে ওরকম একটা বাসেই তুলে দিয়েছিল।"

"তাই নাকি?"

"আমার তাই ধারণা," নীলিমা বলল। "পরে হয়তো কেউ ওকে চিনতে পেরে কোথাও একটা নামিয়ে দিয়েছে। তারপর ও কোনওরকমে ক্যানিং-এ চলে এসেছে। এখানেই তো ওকে দেখা গিয়েছিল—ঠিক এই বাঁধের ওপর।"

"তুমি জিজ্ঞেস করনি কোথায় গিয়েছিল?"

"জিজ্ঞেস করেছি রে কানাই। কিন্তু সে সময় ওর ঠিকমতো কোনও কথার জবাব দেওয়ার অবস্থাই চলে গিয়েছিল। মাথামুণ্ডু কী যে বকত... তারপর থেকে একবারই মাত্র সজ্ঞানে কথা বলেছিল—যখন তোকে ওই প্যাকেটটা দিতে বলল। আমি তো ভেবেছিলাম তখনও ভুল বকছে। কিন্তু পরে দেখলাম তা নয়।"

মাসিকে একহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল কানাই৷ "খুব কষ্টে কেটেছে তোমার সেই সময়টা, না?"

চোখ মুছে নীলিমা বলল, "এখনও আমার পরিষ্কার মনে আছে ওকে যখন নিতে এসেছিলাম ক্যানিং-এ, সেই দিনটার কথা। ঠিক এখানটাতে দাঁড়িয়ে ও চিৎকার করছিল, 'মাতলা জেগে উঠবে! মাতলা জেগে উঠবে!' জামাকাপড় সব ধুল্কুড়ে ময়লা, হাতে মুখে কাদা—সে চেহারাটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না।"

বহুদিনের চাপা-পড়া একটা স্মৃতি কানাইয়ের মাথার মধ্যে চাড়া দিয়ে উঠল। "মাতলা জেগে উঠবে বলছিল? মেসো নিশ্চয়ই সেই গল্পটার কথা ভাবছিল।"

"কোন গল্প রে?" একটু চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল নীলিমা।

"তোমার মনে নেই? সেই যে লাটসাহেব এখানে বন্দর বানিয়েছিল, আর পিডিংটন বলে এক সাহেব—ওই যে, সাইক্লোন' শব্দটা যার তৈরি—সে কীরকম ভবিষ্যৎবাণী করল যে মাতলা জেগে উঠবে আর পোর্ট ক্যানিং ভাসিয়ে নিয়ে যাবে?"

"চুপ কর!" প্রায় চেঁচিয়ে উঠে হাত দিয়ে দু'কান চেপে ধরল নীলিমা। "আর বলিস না রে কানাই। এই স্মৃতিগুলো মনে এলেই আমার বুকের ভেতরটা যেন কুরে কুরে খেতে থাকে। সেজন্যই ওই প্যাকেটটা আমি নিজে খুলিনি, তোর হাতে দিয়ে দিতে চেয়েছি। ওসব কথা ভাবার মতো মনের জোরই নেই আমার।"

"সত্যি, খুবই কঠিন তোমার পক্ষে এ ঘটনাগুলো মনে করা,"কানাইয়ের গলায় অনুতাপ। "ঠিক আছে, এই প্রসঙ্গটা আমি আর তুলব না।"

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কানাইয়ের মনে পড়ল আগেরবারেও এই বাঁধের ওপর অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল ওদের। ভাটার জন্য নয়, স্রেফ লুসিবাড়ির দিকে যাওয়ার কোনও নৌকো পাওয়া যাচ্ছিল না বলে। ও নীলিমার সঙ্গে একটা চায়ের দোকানে বসেছিল, আর নির্মলকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল বাঁধের ওপর, নৌকোর খোঁজ করতে। সে কাজে অবশ্য নির্মলের মন ছিল না খুব একটা। কলকাতার একটা বইয়ের দোকান থেকে সদ্য কেনা রাইনার মারিয়া রিলকের দুইনো এলিজির একটা অনুবাদ তার হাতে ছিল। কবিতাগুলো অনুবাদ করেছিলেন কবি বুদ্ধদেব বসু—নির্মলের এক সময়কার পরিচিত। নৌকোর জন্য নদীর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল বটে, কিন্তু নির্মলের মন পড়ে ছিল ওই বইটার ওপর। নীলিমার ভয়ে খুলে পড়তে পারছিল না, তবে বুকের মধ্যে তেরচাভাবে চেপে ধরা বইটার দিকে সুযোগ পেলেই একবার তাকিয়ে নিচ্ছিল চুপি চুপি।

শেষপর্যন্ত অবশ্য নৌকোর জন্য নির্মলের ওপর ভরসা করতে হয়নি। এক মাঝি নিজের থেকেই এসে ওদের উদ্ধার করল। "আরে মাসিমা, আপনি এখানে?" গলাটা শুনে ওরা ফিরে

তাকানোর আগেই বছর কুড়ি-বাইশের একটা ছেলে বাঁধের ঢাল বেয়ে দৌড়ে উঠে এসে নীলিমাকে প্রণাম করল।

"হরেন না? হরেন নস্কর তো তুই?" ছেলেটার মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল নীলিমা।

"হ্যাঁ মাসিমা।" বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা চেহারা ছেলেটার, চওড়া চ্যাপটামতো মুখ, রোদে কুঁচকে আছে চোখদুটো। পরনে খুব সাধারণ একটা লুঙ্গি আর গায়ে কাদার ছোপ লাগা গেঞ্জি।

"তুই ক্যানিং-এ কী করতে এসেছিস?" নীলিমা জিজ্ঞেস করল।

"কাল জঙ্গল করতে বেরিয়েছিলাম মাসিমা। বনবিবির দয়ায় অনেকটা মধু পেয়ে গেছি—তা প্রায় দু'বোতল হবে। তো সেইগুলোকে বেচতে এনেছি ক্যানিং-এ।"

হরেনের কথা শুনে নীলিমার কানে কানে ফিসফিস করে কানাই জিজ্ঞেস করেছিল, "মাসি, বনবিবি কে?"

"বনবিবি হলেন জঙ্গলের দেবী। এখানকার লোকেরা বিশ্বাস করে যে উনিই সমস্ত জঙ্গল আর জন্তু জানোয়ারকে শাসন করেন," ফিসফিস করেই জবাব দিয়েছিল নীলিমা।

"ও!" এতবড় জোয়ান লোকটা এইরকম একটা গাঁজাখুরি গল্প বিশ্বাস করে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল কানাই। গুরগুর করে একটা হাসির দমক উঠে এসেছিল গলা বেয়ে।

"কানাই!" এক বকা দিয়েছিল নীলিমা। "এই সবজান্তা ভাবটা ছাড়ো। এটা তোমার কলকাতা শহর নয়, মনে রেখো।"

হাসির শব্দটা হরেনের কানে গিয়েছিল। নিচু হয়ে কানাইকে ভাল করে দেখে ও জিজ্ঞেস করেছিল, "এটা কে, মাসিমা?"

"আমার বোনপো। স্কুলে বাঁদরামি করেছিল বলে ওর বাবা-মা এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে, একটু শিক্ষা দিতে।"

"তা হলে ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন মাসিমা," একগাল হেসে বলেছিল হরেন।

"আমার বাড়িতেও তো তিনটে বাচ্চা আছে; বড় ছেলেটার বয়স এর কাছাকাছিই হবে। এরকম ছেলেদের শিক্ষা দিতে খুব ভাল পারি আমি।"

"শুনলি তো কানাই?" ভয় দেখিয়েছিল মাসিমা। "এবার কোনও ঝামেলা করলে কিন্তু আমি তাই করব—একেবারে হরেনের বাড়ি দিয়ে আসব তোকে।"

সঙ্গে সঙ্গে মুখের হাসি-টাসি উবে গিয়ে কানাই একেবারে যাকে বলে সুবোধ বালক। হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল ও যখন প্রসঙ্গটা এখানেই শেষ হল আর নীলিমার মালপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল হরেন।

"আপনারা নৌকোর জন্য অপেক্ষা করছেন তো মাসিমা?"

"হ্যাঁ রে হরেন, অনেকক্ষণ ধরেই তো বসে আছি এখানে, কিছুই পাচ্ছি না।"

"তালে চলুন আমার সঙ্গে" নীলিমাকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়েই একটা ভারী ব্যাগ কাঁধে তুলে নিয়েছিল হরেন। "আমার নৌকো আছে, আমিই আপনাদের লুসিবাড়ি পৌঁছে দেব।"

কানাইয়ের মনে পড়ল, হরেনকে বাধা দেওয়ার একটা ক্ষীণ চেষ্টা করেছিল তার মাসি। "তোর তো অনেক ঘোরা হবে হরেন? কেন খামখা যাবি এত ঘুরপথে?"

"খুব একটা বেশি ঘোরা হবে না মাসিমা। আপনি আমাদের কুসুমের জন্য এত করেছেন, আর আমি আপনার জন্য এইটুকু করতে পারব না? আপনারা দাঁড়ান এখানে, আমি নৌকোটা নিয়ে আসি।"

চটপট পা চালিয়ে বাঁধের ওপর দিয়ে চলে গেল হরেন। ও একটু দূরে যেতেই কানাই জিজ্ঞেস করল নীলিমাকে, "লোকটা কে গো মাসি? ও কী বলছিল? কুসুম কে?"

হরেন আসলে একজন জেলে, নীলিমা ওকে বুঝিয়েছিল। লুসিবাড়ির কাছেই সাতজেলিয়া বলে একটা দ্বীপে থাকে। ওকে দেখে যেরকম মনে হয় তার থেকেও ওর বয়স অনেক কম, কুড়িও হয়নি হয়তো। কিন্তু এই ভাটির দেশের লোকেরা খুব কম বয়সেই

ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেয়। হরেনেরও বছর চোদ্দোতে বিয়ে হয়েছিল। এই বয়সেই তাই ও তিন বাচ্চার বাপ হয়ে গেছে।

কুসুম ওদেরই গাঁয়ের একটা মেয়ে। বছর পনেরো বয়েস। লুসিবাড়ির মহিলা সমিতির কাছে ওকে দিয়ে গেছে হরেন, দেখাশোনা করার জন্য। কুসুমের বাবা জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে মারা যাওয়ার পর পেটের দায়ে ওর মা শহরে গিয়ে কাজ নিল। "মেয়েটা একা একা থাকত, কখন কী বিপদ আপদ ঘটে, তাই ওকে লুসিবাড়িতে দিয়ে গেছে হরেন," নীলিমা বলেছিল। "কত রকমের লোকজন ওর ওপর নজর দিচ্ছিল। একজন তো ওকে বিক্রিই করে দেওয়ার তালে ছিল। হরেন না বাঁচালে কী যে হত ওর..."।

কানাইয়ের জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল হয়ে উঠেছিল। "কী হত মাসি?"

বিষণ্ন হয়ে উঠেছিল নীলিমার চোখ। মানুষের যে দুঃখকষ্টের সমাধান তার হাতের বাইরে, সেগুলির কথা মনে এলেই এরকম একটা করুণ কোমল ছায়া নেমে আসে মাসির চোখে, সেটা কানাই আগেও দেখেছে। "কী হত? কুসুমকে ওর মান-ইজ্জত খোয়াতে হতে পারত। কত গরিবঘরের মেয়ের যে ওরকম সর্বনাশ হয়েছে..."

"ও," কানাই গম্ভীরভাবে বলেছিল। একটু অকালপক্ক ও ছিল ঠিকই, তবে নীলিমার কথার ইশারা ইঙ্গিতগুলো সব বুঝতে পারেনি তখন। কিন্তু কথার ভাবটুকু যতটা ওর মাথায় ঢুকেছিল, তাতেই শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি বেড়ে গিয়েছিল।

"এখন কী করে মেয়েটা?" সাগ্রহে জিজ্ঞেস করেছিল কানাই।

"লুসিবাড়িতেই থাকে। মহিলা সমিতি ওর দেখাশোনা করে। দেখতেই পাবি গেলে।"

মাসির কথা শেষ হতে না হতেই বাঁধের গা বেয়ে দৌড় লাগিয়েছিল কানাই—একেবারে নির্মল যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে পৌঁছে ব্যগ্র চোখে নদীর দিকে তাকিয়ে খুঁজতে শুরু করেছিল কোথায় হরেনের নৌকো। এতক্ষণ পর্যন্ত লুসিবাড়ি যাওয়ার ব্যাপারে ওর মনে একটা বিরক্তি মেশানো আপত্তির ভাব ছিল, কিন্তু কুসুমের কথা শুনে সে ভাবটা একেবারে কেটে গেল।

লঞ্চে

ক্যানিং বাজারের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বাড়িটার সামনে এসে থমকে গেল পিয়া। কাজের সূত্রে ওকে বনেজঙ্গলে নদীনালায় ঘুরতেই হয়, তাই বহু বছরের অভিজ্ঞতায় ফরেস্ট বা ফিশারিজ ডিপার্টমেন্টগুলোর সম্পর্কে একটা তিতিবিরক্ত ভাব জন্মে গেছে পিয়ার মনে। এখানে আসার সময়ও ও ভাবছিল হয়তো দেখবে কতগুলো ঘুপচি নোংরা অফিসঘরে কিছু লোক বসে কলম পিষছে। কিন্তু তার বদলে ঝকঝকে রং-করা বাংলোটা দেখে একটু হকচকিয়েই গেল পিয়া। তবুও, গেট ঠেলে ঢুকতে ঢুকতে মনটাকে শক্ত করে নিল ও : হাজার হোক সরকারি অফিস, কত আর তফাত হবে?

কিন্তু যেরকম ভেবেছিল শেষপর্যন্ত ততটা খারাপ দাঁড়াল না ব্যাপারটা। হ্যাঁ, দারোয়ানকে পেরিয়ে অফিসঘরের ভেতর ঢোকার জন্য ঝাড়া একঘণ্টা অপেক্ষা করতে হল, কিন্তু একবার ঢোকার পরে একেবারে ঝটপট হয়ে গেল সব কাজ। দেখা গেল কাকার যোগাযোগে কাজ হয়েছে–ঢুকতে না ঢুকতেই একজন ওকে সোজা নিয়ে গেল সিনিয়র রেঞ্জারের কাছে। ক্লান্ত চেহারার নম্র ভদ্রলোক এটা সেটা দু-একটা ভদ্রতার কথা বলার পর জুনিয়র অফিসারকে বললেন ওর ব্যাপারটা দেখে দিতে। সে ভদ্রলোকের পেছন পেছন ঘুরতে হল বেশ খানিকক্ষণ–এ করিডোর, ও করিডোর, বড় ঘর থেকে ছোট ঘর, আরও ছোট ঘর, এ টেবিল, সে টেবিল। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ চা-পানের বিরতি আর পানের ছোপ-লাগা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করার পালা চলল বেশ কিছুক্ষণ, কিন্তু সব মিলিয়ে ঘণ্টাচারেকের মধ্যেই দরকারি সমস্ত কাগজপত্র হাতে পেয়ে গেল ও।

জয়ের আনন্দে আত্মহারা হয়ে অফিস থেকে বেরোতে গিয়েই একটা ধাক্কা খেল পিয়া। সরকারি নিয়মকানুনের পালা এখনও শেষ হয়নি। সার্ভের কাজের জন্য জলেজঙ্গলে যেতে হলে ওকে একজন ফরেস্ট গার্ড নিতেই হবে। মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল পিয়ার। আগের অভিজ্ঞতায় ও দেখেছে এইসব সরকারি লোকজন সঙ্গে থাকলে অনেক সময় বেশ অসুবিধাই হয়, কখনও কখনও সার্ভের থেকে ওদের দিকেই বেশি মনোযোগ দিতে হয়। একা যেতে পারলেই সবচেয়ে ভাল হত–শুধু নৌকো চালানো আর রাস্তা দেখানোর জন্য একটা লোক থাকলেই চলত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সে সম্ভাবনা দূর অস্ত। এমনকী ইতিমধ্যে ওর জন্য একজন গার্ড ঠিকও হয়ে গেছে, সে-ই ওকে পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবে, নৌকো ভাড়া করে দেবে, অন্যান্য যা যা দরকার সেসব ব্যবস্থাও করবে। যাক, এ নিয়ে আর ঝামেলা করে লাভ নেই, অন্তত পারমিট-টারমিটগুলো তো তাড়াতাড়ি পাওয়া গেছে।

সদ্য ভাঁজ-ভাঙা খাকি পোশাক-পরা ছুঁচোমুখো গার্ড লোকটা বিনয়ী হাসি হেসে সামনে এসে দাঁড়াল। মানুষটাকে দেখে অবশ্য খুব একটা খারাপ মনে হল না। কিন্তু যেই ও রাইফেল আর কার্তুজের পেটিটা বের করল, কেমন একটু অস্বস্তি লাগল পিয়ার। বন্দুক-টন্দুকের আবার কী দরকার? অফিসারের সঙ্গে কথা বলার জন্য সোজা অফিসঘরে ফিরে গেল ও। অফিসার বুঝিয়ে বললেন যেহেতু ওকে টাইগার রিজার্ভের মধ্যে দিয়েই যেতে হবে, তাই বন্দুক ছাড়া একেবারেই চলবে না। কারণ যে-কোনও সময়েই অ্যাটাক হতে পারে। কী আর করা যাবে। পিঠব্যাগ কাঁধে তুলে গার্ডের পেছন পেছন ফরেস্ট অফিস থেকে বেরিয়ে এল পিয়া।

খানিকদূর যেতে না যেতেই লোকটার হাবভাব অন্যরকম হয়ে গেল। একটু আগের বিগলিত হাসি-টাসি কোথায় মিলিয়ে গেল, চুপচাপ গম্ভীরভাবে ও পিয়াকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে চলল। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে সেসব জানানোর ধার দিয়েই গেল না। একটু বাদে বাঁধের ওপর একটা চায়ের দোকানে এসে থামল ওরা। একটা ডাকাত-ডাকাত চেহারার লোক সেখানে বসেছিল। ওদের কথাবার্তা পিয়া কিছু বুঝছিল না, কিন্তু যদ্দূর মনে হল লোকটার নাম মেজদা। গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, বিশাল থলথলে মুখ, গলায় আবার অনেকগুলো চকচকে চেন আর মাদুলি ঝুলছে। মেজদা বা গার্ড কেউই ইংরেজি বলতে পারে না, কিন্তু

আশেপাশের দু'-একজনের ভাঙা ভাঙা অনুবাদে পিয়া যা বুঝল তা হচ্ছে—মেজদা একটা লঞ্চের মালিক। আর নাকি খুব ভাল গাইড, সুন্দরবনের নদীনালা সব ওর নখদর্পণে।

মেজদার লঞ্চটা একবার দেখতে চাইল পিয়া, কিন্তু জানা গেল সেটা এখন সম্ভব নয়। লঞ্চটা নাকি বেশ কিছুটা দূরে নোঙর করা আছে। সেখানে নৌকো করে যেতে হবে। ভাড়া যা বলল সেটাও যথেষ্ট বেশি। পিয়া পরিষ্কার বুঝতে পারছিল এই লোকগুলির মধ্যে যোগসাজস আছে। একটা শেষ চেষ্টা চালাল ও এদের খপ্পর থেকে বেরিয়ে অন্য লঞ্চওয়ালার খোঁজ করার, কিন্তু খুব একটা লাভ কিছু হল না। মেজদা আর গার্ডকে দেখে ধারেকাছে ঘেঁষলই না কেউ।

পিয়া ভেবেচিন্তে দেখল ওর সামনে দুটো রাস্তা খোলা আছে এখন। এক হল ফরেস্ট অফিসে ফিরে গিয়ে এদের নামে কমপ্লেন করা, আর নয়তো এরা যা বলছে তাতেই রাজি হয়ে গিয়ে সার্ভের কাজ শুরু করে দেওয়া। কিন্তু সারাটা দিন যে অফিসটায় কাটিয়েছে সেখানে ফিরে যেতে আর মন চাইল না। শেষপর্যন্ত মেজদার লঞ্চ ভাড়া করাই ঠিক করল ও।

লঞ্চের দিকে যেতে যেতে একটু একটু খারাপ লাগছিল পিয়ার। মনে হচ্ছিল এ লোকগুলো হয়তো ততটা মন্দ নয়, হয়তো ও ওদের ভুল বুঝেছে। হতেই পারে ওরা সুন্দরবন সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। দেখাই যাক না কতটা কাজ হয় ওদের দিয়ে।

এবারের সার্ভের জন্য পিয়া একটা ডিসপ্লে কার্ড নিয়ে এসেছে, দু'রকম ডলফিনের ছবি আঁকা—গ্যাঞ্জেটিক আর ইরাবড়ি। এই দু'রকম ডলফিনই এই অঞ্চলের নদীতে পাওয়া যায়।

ডিসপ্লে কার্ডের ছবিগুলি অবশ্য খুব একটা ভাল নয়, আঁকা ছবি, ১৮৭৮ সালের একটা প্রবন্ধ থেকে কপি করা। পিয়া নিজেই এর থেকে অনেক ভাল ভাল ছবি দেখেছে—হাতে-আঁকা ছবি, ফটোগ্রাফ, দু'রকমই। কিন্তু কেন কে জানে, এই ছবিগুলো লোককে দেখিয়েই সবচেয়ে ভাল ফল পেয়েছে ও। লোকে অনেক সহজে এগুলো দেখে চিনতে পারে। অনেক সময় এমনকী ফটোগ্রাফেও এত ভাল কাজ হয় না।

এর আগে অন্যান্য নদীতে কাজ কররার সময় এই ধরনের ডিসপ্লে কার্ডগুলো খুব কাজে দিয়েছে। যেসব জায়গায় ভাষার সমস্যা ছিল না, সেখানে কার্ডের ছবি দেখিয়ে ও জেলেদের জিজ্ঞেস করেছে এরকম প্রাণী তারা কোথায় দেখেছে, কোন কোন জায়গায় থাকে এরা, প্রাণীগুলোর স্বভাব কীরকম, বছরের কোন সময় বেশি দেখা যায়—এই সব। আর যেখানে দোভাষীর সাহায্য পাওয়া যায়নি, সেই সব জায়গায় ও জেলেদের ওই কার্ডের ছবিগুলো দেখিয়ে জবাবের অপেক্ষা করেছে। বেশিরভাগ সময়ই কায়দাটা কাজে এসেছে। প্রাণীগুলোকে চিনতে পেরেছে জেলেরা, তারপর ওকে ইশারায় দেখিয়ে দিয়েছে কোনদিকে গেলে তাদের দেখা যাবে। কিন্তু ছবি দেখে প্রাণীটাকে চিনতে পেরেছে শুধু সবচেয়ে ঝানু পোড়খাওয়া জেলেরাই। একটা গোটা ডলফিনের চেহারা আর ক'টা জেলেই বা চোখে দেখেছে? বেশিরভাগই তো দেখেছে শুধু জলের ওপর ভেসে ওঠা পিঠের পাখনা বা নাকের ফুটো। তাই ছবিগুলো দেখানোর পর অনেকসময়ই অনেক জেলে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা বলেছে। কিন্তু মেজদা যা বলল সেরকম প্রতিক্রিয়া পিয়া তার এতদিনের অভিজ্ঞতায় কখনও দেখেনি। কার্ডটাকে হাতে নিয়ে তো প্রথমে সেটা উলটো করে ধরল। তারপর নানাদিক থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার পর গ্যাঞ্জেটিক ডলফিনের ছবিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল ওটা কোনও পাখি কি না। পিয়া কথাটা বুঝতে পারল কারণ ইংরেজিতে একটা শব্দ বারবার বলছিল মেজদা—"বার্ড? বার্ড?"

পিয়া এত আশ্চর্য হয়ে গেল যে ও নিজে ছবিটা আবার নতুন করে দেখল। ওটার সঙ্গে পাখির সাদৃশ্যটা কোথায় সেটাই বোঝার চেষ্টা করল খানিকক্ষণ ধরে। শেষে যখন ডলফিনটার লম্বা নাক আর সরু ছুঁচোলো দাঁতগুলোর দিকে মেজদা আঙুল দিয়ে দেখাল, তখন পিয়ার মাথায় ঢুকল ব্যাপারটা। ইশনিস্ট ড্রয়িং-এর মতো ওর চোখের সামনেও যেন ডলফিনের ছবিটা পালটে যেতে থাকল। পিয়ার মনে হল ও যেন মেজদার চোখ দিয়ে ছবিটা

দেখছে। কেন লোকটা ভুল বুঝেছিল সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারল ও এতক্ষণে—জন্তুটার গোলগাল শরীরটা অনেকটা ঘুঘুপাখির মতো, আর লম্বা চামচের মতো ঠোঁটটার সঙ্গে বকজাতীয় পাখির কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। তা ছাড়া গ্যাঞ্জেটিক ডলফিনের সেরকম কোনও পিঠের পাখনাও নেই। বেচারা মেজদার আর কী দোষ! কিন্তু ডলফিনকে পাখি বলে ভুল করা—ব্যাপারটা এত হাস্যকর যে তাড়াতাড়ি কার্ডটা ফেরত নিয়ে হাসি লুকোনোর জন্য অন্যদিকে মুখ ঘোরাল পিয়া।

নৌকোয় যেতে যেতে বারবারই ঘটনাটা মনে পড়ছিল, আর নিজের মনে হেসে ফেলছিল পিয়া। কিন্তু মেজদার লঞ্চের চেহারাটা চোখে পড়তেই ওর মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেল। লঞ্চ বলে যেটাকে চালাতে চেষ্টা করছে লোকগুলো, সেটা আসলে একটা জরাজীর্ণ ডিজেল স্টিমার। টুরিস্টদের জন্য সারেং-এর ঘরের পেছনে কয়েকটা চেয়ার পাতা, মাথার ওপরে ঝুলকালো একটা তেরপল। এর থেকে তো একটা আউটবোর্ড মোটর লাগানো ফাইবারগ্লাসের ডিঙি নিলেই ভাল হত। ওরকম ছোট নৌকোতেই সার্ভের কাজ করতে বেশি সুবিধা। মেজদা আর গার্ডের কথায় রাজি হয়ে যাওয়ার জন্য এতক্ষণে একটু অনুশোচনা হল পিয়ার। কিন্তু আর ফেরার উপায় নেই এখন।

তক্তা বেয়ে লঞ্চে উঠতে উঠতে ডিজেলের গন্ধটা সপাট একটা থাপ্পড়ের মতো মুখে এসে লাগল পিয়ার। ওপরে জনা কয়েক ছোকরা হেলপার লঞ্চের ইঞ্জিনটা খুলে মেরামত করার চেষ্টা করছিল। অবশেষে সেটা যখন চালু হল, যা আওয়াজ বেরোল তাতে ডেকের ওপরেই কান প্রায় কালা হবার জোগাড়।

ছেলেগুলোকে ডেকে লঞ্চ থেকে নেমে যেতে বলল মেজদা। ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেল পিয়া। তার মানে শুধু মেজদা আর গার্ড—এই দুটো মাত্র লোক লঞ্চটা চালিয়ে নিয়ে যাবে? বেশ একটু গোলমেলে ঠেকল ব্যাপারটা। ছেলেগুলো যখন এক এক করে লঞ্চ থেকে নেমে গেল কেমন একটু ভয় ভয় করতে লাগল পিয়ার। দুশ্চিন্তাটা আরও বাড়ল মেজদার মূকাভিনয় দেখে। ব্যাপারটা হল, ঘটনাচক্রে পিয়া আর মেজদা একই রংয়ের পোশাক পরেছিল—নীল ট্রাউজার্স আর সাদা শার্ট। ও নিজে প্রথমে খেয়াল করেনি ব্যাপারটা, কিন্তু মেজদা ঠিক লক্ষ করেছিল। নানারকম ইশারায়, অঙ্গভঙ্গিতে নিজের দিকে আর পিয়ার দিকে দেখিয়ে ওদের মধ্যে মিল-অমিলগুলো ও বোঝানোর চেষ্টা করছিল—দু'জনের একইরকম পোশাক, একইরকম গায়ের রং, কালো চোখ আর ছোট করে কাটা কোঁকড়া চুল। তবে সবশেষে যে ভঙ্গিটা মেজদা করল সেটা বেশ একটু গোলমেলে আর অশ্লীল মনে হল। একবার নিজের জিভের দিকে আর একবার ঊরুসন্ধির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে হো হো করে হাসতে লাগল মেজদা। এই অদ্ভুত ইশারার মানেটা ঠিক ধরতে না-পেরে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মুখটা তাড়াতাড়ি অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল পিয়া। বেশ খানিকটা পরে ওর মাথায় এল যে ওটা আসলে ওদের দুজনের ভাষা আর লিঙ্গের পার্থক্যের রহস্যের বিষয়ে মেজদার নিজস্ব ভাষ্য।

কিন্তু তারপরে যে হাসির হররাটা উঠল তাতেই আরও অস্বস্তি লাগল পিয়ার। এমনিতে সরকারি নজরদারির মধ্যে ও আগে কখনও কাজ করেনি এমন নয়; মাত্র বছরখানেক আগেই ইরাবড়ি নদীতে যখন সার্ভে করছিল তখন সরকারি আদেশে (কাগজে-কলমে যদিও 'পরামর্শ') তিনটে বাড়তি লোককে নিতে হয়েছিল ওর নৌকোয়। লোক তিনটের হুবহু একরকম পোশাক—গল্ফ শার্ট, চেক-কাটা সারং আর স্টিল ফ্রেমের অ্যাভিয়েটর সানগ্লাস। পরে ও শুনেছিল ওরা ছিল মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের লোক—সরকারের স্পাই। কিন্তু ওদের সঙ্গে থেকে কাজ করতে ওর কখনও অস্বস্তি লাগেনি, কোনও বিপদের আশঙ্কাও হয়নি। আসলে ও যা কাজ করে, ওই ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রচণ্ড রোদের মধ্যে টলমলে নৌকোয় খাড়া দাঁড়িয়ে দুরবিন চোখে জলের দিকে তাকিয়ে থাকা আর আধঘণ্টা পর পর ডেটাশিট ভর্তি করা—সে কাজের ধরনটাই যেন একটা নিরাপত্তাবেষ্টনীর মতো ওকে সবসময় ঘিরে রাখে বলে মনে হয় পিয়ার। ইরাবড্ডি, মেকং বা মহাকাম নদীতে কাজ করার সময় অবশ্য আরও

একটা জিনিস ওর পক্ষে বর্মের মতো কাজ করেছিল; সেটা হল ওর বিদেশি চেহারা। পিয়া নিজে অবশ্য তখন ব্যাপারটা লক্ষ করেনি, তবে ওর মুখের আদল, ছোট করে কাটা কালো চুল আর রোদেপোড়া গায়ের রঙে স্পষ্ট বোঝা যেত যে ও ওই অঞ্চলের লোক নয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, এই সুন্দরবনে–যেখানে ওর নিজেকে সবচেয়ে বেশি পরদেশি বলে মনে হচ্ছে, ওর সেই বিদেশি চেহারার বর্ম আর কাজ করছে না। ওর জায়গায় যদি আজ একজন সাদা চামড়ার ইয়োরোপিয়ান বা জাপানি মেয়ে থাকত তা হলে কি এই লোকগুলো এরকম ব্যবহার করার সাহস পেত? মনে হয় না। এমনকী ওর কলকাতার আত্মীয়দের সঙ্গেও এরা কোনও দুর্ব্যবহার করতে পারত না। কারণ ওদের চেহারার মধ্যে একটা উচ্চমধ্যবিত্ত কালচারের ছাপ-মারা রয়েছে। সেটাই প্রায় লেসার-গাইডেড মিসাইলের মতো এইসব জায়গায় ওদের রক্ষা করে। আর সে অস্ত্র এইসব লোকেদের ওপর কীভাবে প্রয়োগ করতে হয় সেটা ওরাও ভাল করেই জানে। ওদের সামাজিক হিসাবে কার কোথায় জায়গা সেটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এই বিশাল এবং সূক্ষ্ম সমাজ সংস্থানের মধ্যে ওর নিজের জায়গাটাই পিয়া ঠিক করে জানে না, অন্যে পরে কা কথা।

আর ওর সেই অজ্ঞতারই সুযোগ নিচ্ছে এই লোকগুলো–সেটা এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছিল পিয়া।

লুসিবাড়ি

কানাই আর নীলিমাকে নিয়ে ট্রাস্টের লঞ্চ যখন লুসিবাড়ির ঘাটে গিয়ে ভিড়ল, নদীতে তখন ভাটার টান। জল এত নীচে যে দ্বীপের ধার বরাবর টানা বাঁধটাকে পাহাড়ের মতো উঁচু মনে হচ্ছিল। বাঁধের ওপারের কিছুই দেখা যাচ্ছিল না লঞ্চ থেকে। ডাঙায় নেমে পাড় বেয়ে ওঠার পর নীচে তাকিয়ে তবে অবশেষে দেখা গেল গ্রামটাকে। সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিতে আঁকা একটা ম্যাপ যেন খুলে গেল মাথার ভিতর, আর কানাই দেখতে পেল গোটা লুসিবাড়িটা ওর চোখের সামনে ছড়িয়ে রয়েছে।

লম্বায় প্রায় দু' কিলোমিটার দ্বীপটা দেখতে অনেকটা শখের মতো। দক্ষিণ থেকে শুরু হয়েছে ঘন ম্যানগ্রোভ জঙ্গল। চওড়ায় পঞ্চাশ কিলোমিটার সেই গভীর বন শেষ হয়েছে একেবারে বঙ্গোপসাগরের প্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে। আর এই পঞ্চাশ কিলোমিটারের মধ্যে আর একটি দ্বীপেও কোনও জনবসতি নেই। আশেপাশে দ্বীপ আরও বেশ কয়েকটা আছে বটে, কিন্তু চারটে নদী চারদিক থেকে ঘিরে লুসিবাড়িকে তাদের থেকে আলাদা করে রেখেছে। নদীগুলোর মধ্যে দুটো মাঝারি মাপের, আর একটা এতই ছোট যে ভাটার সময় জল প্রায় থাকেই না। কিন্তু দ্বীপের ছুঁচলো দিকটা—মানে শাঁখের একেবারে মুখের কাছটা—যে নদীতে গিয়ে শেষ হয়েছে, তার থেকে বড় নদী এই ভাটির দেশে কমই আছে। সে নদীর নাম রায়মঙ্গল।

জোয়ারের সময় লুসিবাড়ি থেকে দেখলে রায়মঙ্গলকে নদী বলে মনেই হয় না, মনে হয় যেন ওটা সাগরেরই অংশ, একটা উপসাগর, নিদেন একটা বিশাল নদীমুখ। আসলে পাঁচটা নদী এসে মিশেছে এখানে, ফলে একটা বিশাল মোহনার সৃষ্টি হয়েছে যার এপার ওপার প্রায় দেখাই যায় না। এখন ভাটার সময় অবশ্য দূরে দূরে অন্য নদীর মুখগুলো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে—সেগুলোকে মনে হচ্ছে যেন বিরাট বড় গোল একটা সবুজ গ্যালারির মধ্যে মধ্যে লোক যাতায়াতের জন্য দৈত্যাকার প্রবেশপথ। তবে কানাই জানে যে জোয়ারের সময় এই পুরো অঞ্চলটারই চেহারা বদলে যাবে একেবারে। জঙ্গল, নদী আর নদীমুখ সবই চলে যাবে ঘোলাটে জলের নীচে। ওপরে জেগে থাকবে মাত্র কয়েকটা কেওড়া গাছের মাথা। ওগুলো না থাকলে মনে হত যেন চোখের সামনের আদিগন্ত এই জলরাশির কোনও শুরু শেষ নেই। জোয়ারের তারতম্য অনুসারে এই দৃশ্য কখনও অপূর্ব, কখনও ভয়ংকর। ভাটার সময় যখন বাঁধের অনেক নীচে নেমে যায় জল, তখন লুসিবাড়িকে মনে হয় বিশাল এক মাটির জাহাজের মতো, স্থির হয়ে ভাসছে। কিন্তু জোয়ার এলেই পরিষ্কার দেখা যায় নদীর জল দ্বীপের মাটির অনেক ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই যে দ্বীপকে মনে হচ্ছিল বিশাল জাহাজ, সেটাকে তখন মনে হয় যেন একটা ছোট্ট থালা, টলমল করে ভাসছে জলের ওপর। যে-কোনও সময় সেটা উলটে গিয়ে ঘুরতে ঘুরতে চলে যাবে নদীর তলায়।

দ্বীপের সরু দিকটা থেকে একটা মাটির চড়া বের হয়ে জলের মধ্যে বেশ কিছুটা চলে গেছে। বাতাসের গতিপথ বোঝার জন্য অনেকসময় বড় নৌকো বা জাহাজের মাস্তুলে যে হালকা উইন্ডসক ঝোলানো থাকে, এই চড়াটাও যেন অনেকটা সেরকম—স্রোতের দিক বদলের সাথে সাথে সরে সরে যায়। তবে স্থান পালটালেও গোড়াটা কিন্তু সবসময়ই লেগে থাকে দ্বীপের সঙ্গে। নৌকোর মাঝি বা লঞ্চওয়ালাদের অবশ্য খুব সুবিধা হয়েছে ওটা থাকায়, আলাদা করে আর জেটির দরকার হয় না; মালপত্র কি প্যাসেঞ্জার নামানোর জন্য চড়াটাই ওরা ব্যবহার করে। এমনিতে লুসিবাড়িতে কোনও ডক বা জেটি তৈরি করাও যায়নি নদীর তীব্র স্রোতের জন্য।

দ্বীপের সবচেয়ে বড় গ্রামটার নামও লুসিবাড়ি। গ্রাম শুরু হয়েছে চড়াটার একেবারে গোড়ার দিকটায়, বাঁধের আড়ালে। বাঁধের ওপর থেকে প্রথম দর্শনে লুসিবাড়িকে বাংলাদেশের আর পাঁচটা গ্রামের মতোই লাগে—সেই পরপর ছাঁচের বেড়ার ঘর, খুপরি খুপরি দোকান, খড় বা হোগলাপাতায় ছাওয়া। কিন্তু একটু ভাল করে নজর করলেই সাধারণ গ্রামের

সাথে তফাতটা চোখে পড়ে।

গ্রামের ঠিক মাঝখানে রয়েছে একটা বড় মাঠ। রুলে-টানা নিখুঁত চতুর্ভুজ না হলেও মোটামুটি চৌকোনাই বলা চলে। মাঠের একধারে অনেকটা জায়গা জুড়ে হাট—গায়ে গায়ে লাগা পরপর সব দোকানঘর। শনিবার জমজমাট হাট বসে, সপ্তাহের অন্যদিন খালি পড়ে থাকে চালাগুলো। হাটের ঠিক উলটোদিকে স্কুল। মাঠের ধার ঘেঁষে যেন প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে স্কুলের বাড়িটা। নতুন লোকেদের কাছে এই স্কুলটাই এ গাঁয়ের সবচেয়ে বড় চমক। এমনিতে খুব কিছু বিশাল না হলেও, চারপাশের ঝুপড়ি বস্তি আর কুঁড়েঘরের মধ্যে স্কুলবাড়িটাকে হঠাৎ দেখলে আকাশছোঁয়া প্রকাণ্ড একটা গির্জার মতো মনে হয়। বাড়িটাকে ঘিরে ইটের পাঁচিল, মেনগেটে স্কুলের নাম আর প্রতিষ্ঠার বছর লেখা—স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন হাই স্কুল, ১৯৩৮। সামনের দিকে একটা লম্বা ঢাকা বারান্দা, মাঝে মাঝে পলকাটা থাম, দরজা-জানালার ওপরের দিকগুলো তিনকোনা নিওক্লাসিকাল ঢঙের। খানিকটা আরবি ধরনের খিলান আর সে আমলের স্কুলবাড়ির স্থাপত্যের আরও দু-একটা টুকিটাকি চিহ্ন এদিক ওদিকে। ঘরগুলো বড় বড়, প্রচুর আলো-হাওয়া, লম্বা লম্বা জানালাগুলিতে খড়খড়ি বসানো।

স্কুলের কাছেই একসারি গাছের আড়ালে রয়েছে আরেকটা ঘেরা চত্বর। জায়গাটার ঠিক মাঝখানে একটা বাড়ি, স্কুলবাড়ির থেকে অনেকটা ছোট। এমনিতে চোখের আড়ালে থাকলেও, এটার চেহারা অনেক বেশি নজরকাড়া। পুরো কাঠের তৈরি বাড়িটা মিটার দুয়েক উঁচু কয়েকটা খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ধাঁচটা অনেকটা পাহাড়ি বাংলোর মতো, ভাটির দেশে একটু যেন বেমানান। চালাটা খাড়াই পিরামিডের মতো—সারি সারি খুঁটি, পিলার, জানালা আর পিল্লের ওপর বসানো। দেওয়াল জোড়া বিশাল বিশাল জানালা, মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত খড়খড়ি দেওয়া। পুরো বাড়িটার চারদিক ঘিরে ঢাকা বারান্দা। সামনে একটা শালুক ফুলে ভরা পুকুর, পাড় ঘেঁষে ইট বাঁধানো পথ—শ্যাওলা-ধরা।

কানাইয়ের মনে পড়ল, ১৯৭০ সালে এ বাড়িটা ছিল একেবারে নির্জন, শুনশান। গাঁয়ের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় হলেও, আশেপাশে ঘরবাড়ি বিশেষ ছিল না তখন। খানিকটা যেন সম্ভ্রমের বশেই দ্বীপের অন্য বাসিন্দারা এই কুঠিবাড়িটার থেকে একটু দূরে দূরে থাকত। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবই পালটে গেছে। একনজরেই বোঝা যায় এই উঠোন দিয়ে এখন যথেষ্ট লোক চলাচল হয়। আঙিনার চারপাশ ঘিরে গজিয়ে উঠেছে নতুন ঘরবাড়ি, পান-বিড়ির গুমটি আর মিষ্টির দোকান। পাশের আঁকাবাঁকা রাস্তাটা গমগম করছে ফিল্মি গানের সুরে, বাতাসে সদ্য-ভাজা জিলিপির গন্ধ।

আড়চোখে তাকিয়ে কানাই দেখল নীলিমা মহিলা সমিতির দুই কর্ত্রীর সঙ্গে ট্রাস্টের কাজকর্ম নিয়ে কথা বলছে। পাশ থেকে চুপি চুপি সরে এল ও। বাইরের গেটটা ঠেলে ঢুকে পড়ল চত্বরটায়, তারপর শ্যাওলা-ঢাকা পথ দিয়ে মূল বাড়িটার দিকে এগোল। আঙিনাটায় ঢোকামাত্র একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল কানাইয়ের। বাইরে এত আওয়াজ, কিন্তু ভেতরে তার কিছুই প্রায় শোনা যাচ্ছে না। হঠাৎ মনে হল সময়টা যেন থমকে থেমে গেছে। বাড়িটাকে এই মনে হচ্ছে খুব পুরনো আবার পরক্ষণেই মনে হচ্ছে আনকোরা নতুন। কাঠগুলো বহু বছরের রোদে জলে অনেক পুরনো কোনও গাছের বাকলের মতো একটা রুপোলি রং নিয়েছে। সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ায় প্রায় স্বচ্ছ মনে হচ্ছে সেগুলোকে খানিকটা গিলটি-করা ধাতুর ওপরের পাতলা ছালের মতো। পড়ন্ত বিকেলের আকাশের ছায়ায় গোটা কুঠিটা একটা নীলচে আভা ছড়াচ্ছে।

খুঁটিগুলোর সামনে এসে বাড়ির নীচের দিকটা একবার উঁকি দিয়ে দেখল কানাই। একরকম রয়ে গেছে আলোছায়ার জ্যামিতিক নকশাগুলো। কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে কুঠির দরজার সামনে যেতেই যেন মেসোর গলা শুনতে পেল ও।

“ওদিক দিয়ে ঢোকা যাবে না, মনে নেই?” নির্মল বলছিল। “সামনের দরজার চাবি তো কবেই হারিয়ে গেছে। বাড়ির পেছনের দিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে ঢুকতে হবে আমাদের।”

আগেরবার কোথা দিয়ে গিয়েছিল মনে করে করে বারান্দা ধরে এগোতে লাগল কানাই। ব্যালকনির কোনাটা ঘুরে কুঠির পেছন দিকটায় গিয়ে একটা ছোট দরজা। আলতো করে ঠেলতেই খুলে গেল পাল্লাদুটো। ঘরে ঢুকেই প্রথম যে জিনিসটা কানাইয়ের চোখে পড়ল সেটা হল কাঠের সিট-ওয়ালা পুরনো ঢঙের একটা কমোড়। পোর্সেলিনের। তার পাশেই বিশাল একটা লোহার বাথটাব, ধারটা গোল করে বাঁকানো, পায়াগুলো নখওয়ালা থাবার প্যাটার্নে ঢালাই করা। মাথার কাছে একটু ঝুঁকে আছে ঝাঁঝরি, নরম বোঁটার ওপর ঝিমিয়ে পড়া ফুলের মতো।

যা দেখে গিয়েছিল তার থেকে একটুও বদলায়নি জিনিসগুলো, শুধু আর একটু বেশি মরচে ধরেছে। ছোটবেলায় প্রথমবার এসে ঘরের জিনিসপত্রগুলো যেন চোখ দিয়ে গিলছিল ও, মনে পড়ল কানাইয়ের। সেবার লুসিবাড়িতে এসে থেকেই নির্মল আর নীলিমার মতো ওকেও পুকুরেই স্নান করতে হচ্ছিল, ঝাঁঝরিটা দেখে তাই প্রচণ্ড লোভ হয়েছিল ওটার নীচে গিয়ে দাঁড়ানোর।

"এটা হল সাহেবি চৌবাচ্চা, বুঝলে? সাহেবরা এটাতে বসে স্নান করে", টাবটা দেখিয়ে ওকে বলেছিল নির্মল। বাথটবের এই বর্ণনাটা কানাইয়ের মন্দ লাগেনি। কিন্তু মেসো এমন করে কথাটা বলেছিল যেন ও এক্কেবারে গেঁয়ো, এসব কখনও দেখেনি। মনে মনে তখন একটু রাগই হয়েছিল কানাইয়ের। "আমি জানি, এটা বাথটাব," নির্মলকে বলেছিল ও।

বাথরুমের অন্যদিকের আরেকটা দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতর দিকটায় যাওয়া যায়। পাল্লাটা ঠেলা দিয়ে খুলে গুহার মতো বিশাল একটা ঘরে এসে পড়ল কানাই। ঘরের দেওয়ালগুলো কাঠ দিয়ে বাঁধানো। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে সামান্য আলো এসে পড়েছে। ভেতরে। আলোর সেই রেখাগুলির মধ্যে ঘন ধুলো যেন জমাট বেঁধে আছে। মাঝখানে পড়ে আছে লোহার তৈরি বিরাট একটা পালঙ্কের কাঠামো। দেওয়ালে দেওয়ালে মোটা ফ্রেমে বাঁধানো বিশাল বিশাল সব পোর্ট্রেট ঝুলছে—লম্বা পোশাক-পরা মেমসাহেব, হাঁটু অবধি ব্রিচেসওয়ালা সাহেব। বহুদিনের অযত্নে রং জ্বলে ঝাপসা হয়ে এসেছে ছবিগুলো। ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে একটা পোর্ট্রেটের সামনে এসে থেমে গেল কানাই। ছবিটা একটা কমবয়েসি মেয়ের, লেস-লাগানো পোশাক পরা। ছোট ছোট হলুদ ফুলে ভরা একটা ঘাসজমির ওপর পা মুড়ে বসে আছে মেয়েটা, খাড়াই উঠে গেছে পেছনের জমি, তার খাঁজে খাঁজে বেগনি রংয়ের ঝোঁপড়া গাছ। দূরে পাহাড়ের মাথায় বরফ জমে আছে। ছবির নীচে ময়লাটে একটা পেতলের পাতের ওপর লেখা, 'লুসি ম্যাককে হ্যামিলটন, আইল অব অ্যারান।

"লুসি হ্যামিলটন কে ছিল?" কানাই যেন নিজের ছেলেবেলার গলার আওয়াজ শুনতে পেল।

"ওর নামেই নাম দেওয়া হয়েছে এই দ্বীপটার।"

"ও এখানে থাকত? এই বাড়িটায়?"

"না। ইউরোপ থেকে এখানে আসার পথেই জাহাজডুবি হয়ে মারা গিয়েছিল। এ বাড়িটা ও চোখেই দেখেনি। কিন্তু ওর জন্যই যেহেতু এটা বানানো হয়েছিল, লোকে তাই এটাকে বলত লুসির বাড়ি। পরে মুখে মুখে সেটা হয়ে গেল লুসিবাড়ি। আস্তে আস্তে গোটা দ্বীপটার নামই লুসিবাড়ি হয়ে গেল। এই বাড়িটাকে কিন্তু আর কেউ ওই নামে ডাকে না। লোকের কাছে এটা এখন হ্যামিলটনের কুঠি।"

"কেন?"

"কারণ এটা বানিয়েছিল যে সাহেব তার নাম ছিল স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিলটন, লুসির কাকা। হ্যামিলটন সাহেবের নাম দেখনি তুমি স্কুলের দরজায়?"

"উনি কে ছিলেন?"

"ওনার কথা জানতে চাও তুমি?"

"শোনো তা হলে," গাঁট-পাকানো তর্জনী তুলে বলেছিল মেসো। "শুনতে চেয়েছ যখন, তা হলে বলি। মন দিয়ে শুনবে। একবর্ণও কিন্তু বানানো গল্প নয়।"

পতন

সন্ধে প্রায় ঘনিয়ে এসেছে, এমন সময় দূরে একটা নৌকো নজরে এল পিয়ার। শুরুতে একেবারে বিন্দুর মতো দেখা যাচ্ছিল নৌকোটাকে—দিগন্তের কাছে অনেকগুলি নদীর মোহনায় যেন স্থির একটা কালো দাগ। খানিক বাদে দাগটা একটু বড় হতে বোঝা গেল সেটা একটা ছইওয়ালা ছোট্ট মাছধরা ডিঙি। দুরবিন চোখে লাগিয়ে একজনই মাত্র জেলেকে দেখতে পাচ্ছিল পিয়া। নৌকোর ওপর সোজা দাঁড়িয়ে লোকটা একটা জাল ছুঁড়ে দিচ্ছে, একটু পরে আবার নিচু হয়ে টেনে টেনে তুলছে।

তিন ঘণ্টা হয়ে গেল লঞ্চের সামনের দিকটায় ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে পিয়া। দূরবিনটা একবারও নামায়নি চোখ থেকে, জলের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করেছে যদি একটা শুশুক কোথাও দেখা যায়। তবে লাভ কিছু হয়নি এখনও পর্যন্ত। একবার মুহূর্তের জন্য একটু আশা জেগেছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা গেল জল থেকে যেটা লাফিয়ে উঠেছে সেটা আসলে একটা শংকর মাছ। শূন্যের মধ্যে লেজওয়ালা প্রাণীটাকে মনে হচ্ছিল যেন একটা উড়ন্ত ঘুড়ি। তার মিনিট দুয়েক পরেই হঠাৎ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওপরে দৌড়ে এল মেজদা। ওর প্রপেলারের মতো হাত-পা নাড়া দেখে পিয়ার মনে হল নিশ্চয়ই শুশুক-টুশুক কিছু একটা দেখতে পেয়েছে। কিন্তু এবারেও ব্যর্থ আশা। পাড়ে শুয়ে রোদ পোয়ানো কয়েকটা কুমির দেখানোর জন্যে দৌড়ে এসেছে মেজদা। তবে ওর উৎসাহের কারণটা বোঝা গেল এর পর। ডান হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুলে ইশারা করে ও জানাল এই গুরুদায়িত্ব সম্পাদনের জন্যে কিছু বকশিস লাগবে। খুব রাগ হল পিয়ার। বিরক্ত একটা ভঙ্গি করে ও বুঝিয়ে দিল বকশিস-টকশিস কিছু হবে না।

মেজদা দেখানোর অনেক আগেই কুমিরগুলো নজরে এসেছিল পিয়ার। দূরবিন দিয়ে বেশ কয়েক কিলোমিটার দূর থেকেই ওদের দেখতে পেয়েছিল ও। দানবের মতো বিশাল চারখানা সরীসৃপ, সবচেয়ে বড়টা লম্বায় প্রায় এই লঞ্চটার সমান। এগুলির একটার মুখোমুখি পড়লে কী যে হবে ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল পিয়ার।

কুমির আর শংকরমাছ ছাড়া এই তিন ঘণ্টায় আর কিছুই চোখে পড়ল না। কিছু যে দেখা যাবেই ঠিক সেরকম যে আশা করেছিল পিয়া তা নয়, তবে সারা দুপুরটা এইরকম নিষ্ফলা যাবে তাও ভাবেনি। এই অঞ্চলের নদীতে একসময় যে প্রচুর শুশুক ছিল সে বিষয়ে তো কোনও সন্দেহ নেই। ঊনবিংশ শতকের অনেক প্রাণিবিজ্ঞানীই এদের বিষয়ে লিখে গেছেন। গ্যাঞ্জেটিক ডলফিনের আবিষ্কর্তা' উইলিয়াম রক্সবার্গের লেখায় রয়েছে, মিষ্টিজলের শুশুকরা "কলকাতার দক্ষিণ এবং দক্ষিণপূর্বের নদী-খাড়িগুলিতে থাকতে পছন্দ করে"। অথচ এই অঞ্চলটাতেই এতক্ষণ ঘোরাঘুরি করেও কিছুই চোখে পড়ল না। পিয়া ভেবেছিল পথে কোনও পোড়-খাওয়া জেলের সঙ্গে দেখা হলেও কিছু খোঁজখবর হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু সেরকম জেলে নৌকোও খুব বেশি নজরে পড়েনি আজ সারাদিনে। ভিড়ে ঠাসা খেয়া

নৌকো আর স্টিমার দেখা গেছে বেশ কয়েকটা, তবে জেলে নৌকো এতই কম চোখে পড়েছে যে একেক সময় মনে হয়েছে হয়তো এই অঞ্চলে মাছ ধরা নিষেধ। এই জেলে ডিঙিটা তো, দেখা গেল বেশ অনেকক্ষণ পর। ওরা মনে হয় নৌকোটার কয়েকশো মিটার মাত্র দূর দিয়ে যাবে। লঞ্চটা একটু ঘুরিয়ে ওটার কাছাকাছি নিয়ে যেতে বলবে কিনা ভাবছিল পিয়া।

বেল্ট থেকে রেঞ্জফাইন্ডারটা খুলে হাতে নিল ও। খানিকটা দূরবিনের মতো দেখতে যন্ত্রটার একদিকে দুটো আইপিস, আর অন্যদিকে একটা সাইক্লোপিয়ান লেন্স। ডিঙিটার দিকে ফোকাস করে একটা বোতাম টিপল, কয়েক মুহূর্ত পরেই বিপ করে একটা আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে নৌকো আর লঞ্চের মধ্যের দূরত্বটা ভেসে উঠল যন্ত্রের পর্দায়—১.১ কিলোমিটার।

ডিঙির ওপর মাছ ধরতে ব্যস্ত লোকটাকে এতদূর থেকে খুব একটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু ও যে পাকা জেলে সেটা দিব্যি বোঝা যাচ্ছিল। থুতনি আর গালে সাদা ছোপ ছোপ দুরবিন দিয়ে দেখে মনে হল খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি। মাথায় পাগড়ি মতো কিছু একটা

জড়ানো, কিন্তু সারা গা খালি; শুধু কোমরে একটুকরো কাপড় মালকেঁচার মতো করে বাঁধা। শরীরটা কঙ্কালসার ক্ষয়টে মতো, নোনা হাওয়া আর রোদ্দুরে যেন দেহের সব চর্বি-মাংস খেয়ে গেছে—সারাজীবন জলে জলে কাটালে যেমন হয়। অন্য অনেক নদীতে এরকম জেলেদের দেখেছে পিয়া, এদের কাছ থেকেই বেশিরভাগ সময় ভাল খোঁজখবর পাওয়া যায়। ও ঠিক করল একটু ঘুরে গিয়ে লোকটাকে একবার ওর ফ্ল্যাশকার্ডগুলো দেখিয়ে নেবে। যদি কিছু লাভ হয়।

এর আগেও দু'বার পিয়া মেজদাকে এদিকে-সেদিকে লঞ্চ ঘোরাতে বলেছিল, কিন্তু ওই কুমিরের ব্যাপারটার পর থেকে কীরকম একটু তিরিক্ষি হয়ে আছে লোকটা। আর বিশেষ পাত্তা-টাত্তা দিচ্ছে না ওকে। কিন্তু এবারে পিয়া ঠিক করেছে যে-কোনও ভাবেই হোক লঞ্চটাকে নিয়ে যাবে ওই নৌকোর কাছে।

কাঁচ-লাগানো সারেংএর ঘরটার মধ্যে পাশাপাশি বসেছিল মেজদা আর গার্ড—মেজদার হাতে স্টিয়ারিং। লঞ্চের সামনের দিকটা থেকে সরে এসে ওদের দিকে এগোল পিয়া। ওকে দেখেই চট করে চোখটা নামিয়ে নিল মেজদা। ওর চোর চোর ভাবটা দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল ওকে নিয়েই ওরা আলোচনা করছিল এতক্ষণ।

একটা ফ্ল্যাশকার্ড বার করে সারেং-এর ঘরের সামনে এসে মেজদার ঠিক মুখোমুখি দাঁড়াল পিয়া। কাঁচের ওপর একটা হাত রেখে বলল, "স্টপ!" ওর আঙুল বরাবর তাকাতেই দূরের ডিঙি নৌকোটার দিকে নজর পড়ল মেজদার; ডিঙিটাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখন। "ওই দিকে চলুন—ওই নৌকোটার দিকে। এই ছবিটা ও চিনতে পারে কিনা দেখব," হাতের কার্ডটা তুলে দেখাল পিয়া।

সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে খুলে গেল সারেং-এর ঘরের দরজাটা, আর খাকি প্যান্টটা টেনে তুলতে তুলতে বাইরে বেরিয়ে এল ফরেস্ট গার্ড। ডেকের সামনের দিকে লঞ্চের একেবারে কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল লোকটা, এক হাতে রোদ্দুর আড়াল করে ঝুঁকে পড়ে ডিঙিটার দিকে তাকিয়ে রইল। দেখতে দেখতে ভুরু কুঁচকে উঠল গার্ডের, বিড়বিড় করে কিছু একটা বলল সারেংকে। দু'জনে কী বলাবলি করল খানিকক্ষণ, তারপরে মাথা নেড়ে তাড়াতাড়ি স্টিয়ারিং ঘোরাল মেজদা। আস্তে আস্তে লঞ্চের মুখ ঘুরতে লাগল ডিঙিটার দিকে।

"গুড," খুশি হল পিয়া। কিন্তু গার্ডটা কোনও পাত্তাই দিল না ওকে। তার সমস্ত মনোযোগ এখন ওই নৌকোটার দিকে। লোকটার হাবভাবের একাগ্রতা দেখে একটু আশ্চর্য হল পিয়া। কেমন একটা হিংস্র ভাব ওর চোখেমুখে। দেখে একটুও মনে হল না যে স্রেফ পিয়ার কথা রাখার জন্যই নৌকোটার দিকে যাচ্ছে ওরা।

ডিঙির জেলেটা তখন আরেকবার জাল ফেলার জন্য তৈরি হচ্ছে। নৌকো একই জায়গায় স্থির, একটু একটু করে আকারে বড় হয়ে উঠছে। এখনও এক কিলোমিটারের বেশি দূরে রয়েছে ডিঙিটা।

লঞ্চের মুখ ঘোরার পর একবারও ওটার দিক থেকে দূরবিন সরায়নি পিয়া। জেলেটা এতক্ষণ খেয়াল করেনি ওদের, কিন্তু লঞ্চের দিক বদলানোর সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল টের পেল ও, সতর্ক হয়ে বন্ধ করল জাল ফেলা। ঘুরে তাকাল ওদের দিকে, চোখেমুখে ভয়ের ছাপ। দূরবিন দিয়ে ওর চোখদুটো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল পিয়া। পাশের দিকে মুখ ফেরাল লোকটা, ঠোঁটদুটো নড়ে উঠল, মনে হল কাউকে কিছু বলছে। পাশে ফোকাস করে পিয়া দেখল ও একা নয়, আরও একজন আছে ডিঙিটাতে। একটা বাচ্চা ছেলে, হয়তো নাতি বা ভাইপো-ভাগনে কেউ হবে। ডিঙির আগায় গুটিসুটি মেরে বসে আছে বাচ্চাটা। পিয়ার মনে হল ও-ই লঞ্চটা দেখতে পেয়ে লোকটাকে বলেছে। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে এখনও লঞ্চটারই দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে ছেলেটা।

দুজনেই ওরা খুব ভয় পেয়েছে মনে হল। লোকটা তাড়াতাড়ি ভেতর থেকে একজোড়া বৈঠা বের করে ঊর্ধ্বশ্বাসে নৌকো বাইতে শুরু করল, আর ছেলেটা দৌড়ে ডিঙির পেছন দিকে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল ছইয়ের আড়ালে। মিটার পঞ্চাশেক দূরের সরু একটা খাঁড়ির

মুখের দিকে এখন সোজা এগোচ্ছে নৌকোটা। ভরা জোয়ারের সময় খাঁড়ির দু' ধারের ঘন জঙ্গল অর্ধেক ডুবে আছে জলে, আর একবার যদি সে বনের মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে পারে, কোনও লঞ্চের সাধ্য হবে না ওই খুদে ডিঙিকে খুঁজে বের করে। জল এখন বেশ গভীর, নৌকোটা খুব সহজেই জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে পালাতে পারবে।

ব্যাপারটা বেশ একটু অদ্ভুত লাগল পিয়ার। ইরাবড়ি বা মেকং-এ ও অনেক সময় দেখেছে যে জেলেদের সাথে কথা বলতে গেলে তারা অচেনা লোক বা সরকারি লোকেদের দেখে ভয় পেয়েছে, কিন্তু কোনও জেলেই কখনও ডিঙি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেনি।

ডানদিকে মুখ ফিরিয়ে পিয়া দেখল লঞ্চের সামনের দিকে দাঁড়িয়ে আছে ফরেস্ট গার্ড– কাঁধে রাইফেল। পিয়া যখন একদৃষ্টে নৌকোটার দিকে দেখছিল সেই সময়ে ভেতরে গিয়ে বন্দুকটা নিয়ে এসেছে ও। এতক্ষণে বোঝা গেল কেন পালাচ্ছে ডিঙিটা। পিয়া গার্ডের দিকে ফিরল। আঙুল দিয়ে বন্দুকটাতে খোঁচা মেরে বলল, "এটা কেন এনেছেন? কী করবেন রাইফেল দিয়ে? যান, রেখে আসুন ওটা।" ঝটকা মেরে পিয়ার হাতটা সরিয়ে দিয়ে লোকটা মেজদাকে চেঁচিয়ে কী একটা বলল। সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের ধকধকানি বেড়ে গেল, আর তিরবেগে লঞ্চটা এগিয়ে চলল নৌকোর দিকে।

পিয়া বুঝতে পারল ওর নিজেরই শুরু করা ঘটনাক্রম এখন আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। কী যে হচ্ছে, সেটাই ভাল করে মাথায় ঢুকছিল না। এক হতে পারে এটা নিষিদ্ধ এলাকা আর ওই জেলে বেআইনিভাবে মাছ ধরছিল, তাই ফরেস্ট গার্ড ওকে তাড়া করেছে। তাই যদি হয় তা হলে যে-কোনও ভাবেই হোক এই ইঁদুর-বেড়াল খেলাটা এক্ষুনি বন্ধ করতে হবে। কারণ একবার যদি খবর রটে যায় যে ও স্থানীয় লোকেদের পেছনে লেগেছে, সার্ভের কাজের একেবারে বারোটা বেজে যাবে।

সারেং-এর ঘরের দিকে ফিরে ও মেজদাকে বলল, "লঞ্চ থামান, আর যেতে হবে না। থামুন বলছি।" কথাটা শেষ করে কেবিনটার দিকে এগোতে গিয়েই শুনল ফরেস্ট গার্ড চিৎকার করে নৌকোর জেলেটাকে ধমকাচ্ছে। ওদিকে চেয়ে দেখল রাইফেলটা কাঁধের কাছে তুলে ধরে ডিঙির দিকে তাক করছে লোকটা, মনে হল যে-কোনও সময়ে গুলি চালিয়ে দেবে।

মাথায় রক্ত উঠে গেল পিয়ার। "ভেবেছেনটা কী আপনারা? যা ইচ্ছে তাই করবেন নাকি?" দৌড়ে গিয়ে একহাত দিয়ে গার্ডের কনুই ধরে আরেক হাতে বন্দুকের নলটা অন্যদিকে ঠেলে দিতে চেষ্টা করল ও। কিন্তু লোকটা অনেক বেশি ক্ষিপ্র। কিছু বোঝার আগেই ওকে কনুই দিয়ে প্রচণ্ড একটা গুতো মারল কাঁধের হাড়টার কাছে। ছিটকে পড়ল পিয়া ডেকের ওপর, হাত থেকে ডিসপ্লে কার্ডটা উড়ে গিয়ে পড়ল খানিকটা দূরে।

ডিঙির লোকটা ওদিকে দাঁড় টানা থামিয়ে দিয়েছে। মেজদাও লঞ্চের ইঞ্জিন বন্ধ করল। হঠাৎ করে যেন চারপাশটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে নৌকোর পাশে গিয়ে স্থির হল লঞ্চটা। চেঁচিয়ে কিছু একটা বলে গার্ড ডিঙিটার ওপর একটা দড়ি ছুঁড়ে দিল। দড়িটা ধরে নিয়ে নৌকোর সঙ্গে বেঁধে দিল জেলেটা। পিয়া দেখতে পেল ছইয়ের আড়ালের আবছা অন্ধকার থেকে জুলজুল করে তাকিয়ে রয়েছে বাচ্চাটা।

গার্ডের ধমক খেয়ে বিড়বিড় করে কী যেন একটা বলল নৌকোর লোকটা। জবাবটা মনোমতো হয়েছে মনে হল, কারণ মেজদার দিকে ফিরে একটা আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল গার্ড। তারপর খানিক গুজগুজ করে কী সব বলাবলি করল দু'জনে, শেষে পিয়ার সামনে এসে ফরেস্ট গার্ড খানিকটা অভিযোগের সুরে বলল, "পোচার"।

"কী?" একেবারে হাঁ হয়ে গেল পিয়া। বলে কী লোকটা? এ তো রাতকে দিন করে দিতে পারে! মাথা নেড়ে ও বলল, "হতেই পারে না। ও স্রেফ মাছ ধরছিল।"

"পোচার", গার্ড তার বক্তব্যে অনড়। রাইফেল দিয়ে জেলেটার দিকে দেখিয়ে আবার বলল, "পোচার"।

কী ঘটেছে এতক্ষণে বুঝতে পারছিল পিয়া। এই লোকটা নিশ্চয়ই নিষিদ্ধ এলাকায় মাছ

ধরছিল; এমন একটা জায়গাও তাই বেছে নিয়েছিল দরকার হলে যেখান থেকে খুব সহজেই পালানো যেতে পারে। পিয়াদের লঞ্চটাকে ও মনে হয় ভেবেছিল সাধারণ টুরিস্ট লঞ্চ, তার মধ্যে যে একজন সশস্ত্র ফরেস্ট গার্ড থাকতে পারে সেটা বুঝতে পারেনি। এখন বাঁচতে হলে ওকে হয় ফাইন দিতে হবে, নয়তো ঘুষ দিতে হবে।

ক্লান্ত চেহারার লোকটা দাঁড়ে ভর দিয়ে খাড়া দাঁড়িয়েছিল নৌকোর ওপর। কাছ থেকে ওকে দেখে চমকে গেল পিয়া। দুরবিন দিয়ে দেখে যেরকম মনে হয়েছিল লোকটা আদৌ সেরকম সাদা দাড়িওয়ালা বুড়ো নয়। বয়সে ওর কাছাকাছিই হবে, খুব বেশি হলে সাতাশ-আটাশ। শরীরের কাঠামোটাও মোটেই ক্ষয়টে ধরনের নয়, শুধু একটু বেশি রোগা। লম্বা লম্বা হাত-পাগুলোতে এতটুকু চর্বি বা বাড়তি মাংসের চিহ্ন নেই, হাড়ের ওপর দড়ির মতো পাকিয়ে পাকিয়ে আছে পেশিগুলো। দূর থেকে যেগুলোকে দেখে পিয়া পাকা দাড়ি ভেবেছিল, সেই সাদা সাদা কুচিগুলো আসলে শুকনো নুনের গুঁড়ো—সারাদিন নোনা জলের ওপর কাটানোর ফল। লোকটার মুখটা সরু তিনকোনা মতো, আর এত ভীষণ রোগা যে তার ওপর চোখগুলোকে বিশাল বড় বড় মনে হচ্ছে। হতদরিদ্র চেহারাটা আরও ফুটে বেরোচ্ছে কোমরে জড়ানো আধময়লা ত্যানাটার জন্য। তবু ওর এই আপাত প্রতিরোধহীন হাড়-বেরোনো চেহারার মধ্যেও কোথাও একটা বিদ্রোহের ভাব রয়েছে মনে হল পিয়ার। একটু সতর্ক চোখে গার্ডের দিকে তাকিয়ে দেখছে লোকটা, যেন কত টাকা খোয়াতে হবে সেটা আঁচ করার চেষ্টা করছে। অন্তত এক সপ্তাহের রোজগার তো হবেই, মনে মনে ভাবল পিয়া; এক মাসেরও হতে পারে।

লঞ্চের ডেকের ওপর থেকে ডিসপ্লে কার্ডটা তুলে নিল ফরেস্ট গার্ড—মনে হল যেন পিয়ার এখানে কী কর্তব্য সেটা খেয়াল করিয়ে দিতে চায় ওকে। শিকার জালে পড়ে গেছে, তাই ওর ভাবভঙ্গিতে আর ব্যস্ততার চিহ্নমাত্র নেই। ধীরেসুস্থে কার্ডটা পিয়ার হাতে দিয়ে নৌকোর দিকে ইশারা করল জেলেটাকে একবার দেখিয়ে নেওয়ার জন্য।

লোকটা ওকে ওর কাজ চালিয়ে যেতে বলছে, যেন কিছুই ঘটেনি! ব্যাপারটা বিশ্বাসই করতে পারছিল না পিয়া। মাথা নেড়ে হাত সরিয়ে নিল ও। কিন্তু নিরস্ত না হয়ে আবার কার্ডটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল গার্ড। ওর হাতের সঙ্গে সঙ্গে এবার বন্দুকটাও মনে হল এগিয়ে এল, যেন গুঁতিয়ে ওকে পাঠাবে জেলেটার দিকে। "ঠিক আছে তা হলে," কাঁধ আঁকাল পিয়া। কোমর থেকে যন্ত্রপাতির বেল্টটা খুলে নিল ও, তারপর দূরবিন-টুরবিন সুদ্ধ ওটাকে ঠেসে ঢোকাল পিঠব্যাগটার মধ্যে। ডিসপ্লে কার্ডটা তুলে নিয়ে লঞ্চের মুখের দিকে এগিয়ে গেল। পিয়ার ঠিক নীচে এখন নৌকোটা, লঞ্চের একেবারে গায়ের কাছে দড়ি দিয়ে বাঁধা। জেলেটার মুখটা ঠিক ওর হাঁটুর সামনে।

হঠাৎ মুখের সামনে পিয়াকে দেখে যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল লোকটা। এতক্ষণ আসলে ওর সমস্ত মনোযোগটাই ছিল গার্ডের দিকে, লঞ্চে যে কোনও মহিলা থাকতে পারে সেটা ভাবতেই পারেনি। এখন পিয়াকে দেখতে পেয়ে হঠাৎই ও আত্মসচেতন হয়ে উঠল। মাথায় যে কাপড়ের টুকরোটা জড়ানো ছিল এক টান মেরে নামিয়ে আনল সেটাকে। গোটানো কাপড়টা খুলে গিয়ে পর্দার মতো গায়ের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কোমরের কাছে একটা গিট মেরে বেঁধে দেওয়ার পর পিয়া বুঝতে পারল এতক্ষণ যে পাকানো কাপড়টাকে ও পাগড়ি বলে ভাবছিল সেটা আসলে লুঙ্গি। লোকটার বিবেচনা আছে দেখা যাচ্ছে। আর ওর উপস্থিতিকে স্বীকৃতি দেওয়ার ভাবটাতেও মনে মনে খানিকটা স্বস্তি পেল পিয়া। মনে হল লঞ্চে ওঠার পর থেকে এতক্ষণে এই প্রথম ও একজন স্বাভাবিক মানুষের কাছাকাছি এল। তবে এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতেও কিন্তু ওর মাথার মধ্যে একটাই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে—কখন জেলেটাকে দেখাবে ফ্ল্যাশকার্ডটা।

এক হাঁটু ভাঁজ করে পায়ের ওপর ভর দিয়ে নিচু হয়ে জেলেটার মুখোমুখি বসল পিয়া। দু'জনের মাথা এক উচ্চতায় আসার পর কার্ডটা ওর সামনে ধরল। একটু হাসারও চেষ্টা করল ওকে আশ্বস্ত করার জন্য, কিন্তু কিছুতেই ওর চোখের দিকে তাকাল না লোকটা। তবে

ছবিগুলোর দিকে নজর পড়তেই হাত তুলে ও নদীর উজানের দিকে একটা জায়গা দেখিয়ে দিল। এত দ্রুত আর দ্বিধাহীন প্রতিক্রিয়া দেখে পিয়ার একবার মনে হল লোকটা বোধহয় বুঝতে পারেনি ও কী জানতে চাইছে। ব্যাপারটা বোঝার জন্য সরাসরি চোখে চোখে তাকাতেই মাথা নাড়ল ও, যেন বলতে চায়, হ্যাঁ, ঠিক ওই জায়গাতেই এরকম শুশুক দেখেছি আমি। কিন্তু কোন ধরনের শুশুক ও দেখেছে সেটা ঠিক বোঝা গেল না। আবার কার্ডটা এগিয়ে দিল পিয়া, মনে মনে ভাবল নিশ্চয়ই গ্যাঞ্জেটিক ডলফিনের ছবিটার দিকে দেখাবে ও। কারণ এই প্রজাতির শুশুকই বেশি দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্য, লোকটা ইশারা করল অন্য ছবিটার দিকে। মানে ও ইরাবড্ডি ডলফিন দেখেছে এই নদীতে? ওর্কায়েলা ব্রেভিরোসি? এবার মুখ খুলল লোকটা। বাংলায় কী একটা বলে দু'হাতের ছ'টা আঙুল তুলে দেখাল।

"ছ'টা?" পিয়া উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছিল না। "তুমি ঠিক দেখেছ?"

হঠাৎ একটা বাচ্চার কান্নার আওয়াজে ওর কথা থেমে গেল। তাকিয়ে দেখল ওদের কথাবার্তার সুযোগ নিয়ে কখন নৌকোটায় নেমে গেছে ফরেস্ট গার্ড। ছইয়ের ভেতর রাখা পোঁটলা-পুঁটলিগুলো হাতের রাইফেলটা নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখছে। বাচ্চাটা এক কোনায় গুটিসুটি মেরে বসে আছে, হাত দুটো বুকের কাছে মুঠো করে ধরা। আচমকা যেন ছোঁ মেরে ওকে টেনে তুলল গার্ড। জোর করে আলগা করল মুঠি। দেখা গেল সামান্য কয়েকটা টাকা ওর হাতে, সেগুলোকেই লুকোনোর চেষ্টা করছিল এতক্ষণ। গার্ড ওর কাছ থেকে টাকাগুলো ছিনিয়ে নিয়ে নিজের পকেটে পুরল, তারপর ধীরেসুস্থে লঞ্চে গিয়ে উঠল।

ওপর থেকে দেখতে দেখতে হঠাৎ নিজের কোমরের বেল্টে বাঁধা টাকার ব্যাগটার কথা মনে পড়ল পিয়ার। চুপি চুপি সেটার চেন খুলে একগোছা টাকা বের করে আনল ও। টাকাগুলোকে পাকিয়ে শক্ত করে মুঠোর মধ্যে ধরে অপেক্ষা করতে লাগল লঞ্চটা চালু হওয়ার জন্য। গার্ড পেছন ফিরতেই ঝুঁকে পড়ে হাতটা বাড়িয়ে দিল ও জেলেটার দিকে। প্রায় ফিসফিস করে বলল, "এই যে, এদিকে তাকাও একবার"। কিন্তু ইঞ্জিনের ভটভট শব্দে ওর গলা চাপা পড়ে গেল। চলতে শুরু করেছে লঞ্চ, নৌকো আর লঞ্চের মাঝে জল দেখা যাচ্ছে নীচে, কিন্তু পিয়ার মনে হল আর খানিকটা উঁচুতে দাঁড়াতে পারলেই টাকাটা ছুঁড়ে দিতে পারবে ও। একটা প্লাস্টিকের চেয়ার ছিল কাছে, সেটাকে লঞ্চের ধারে টেনে নিয়ে এল। ওটার ওপর কোনওরকমে ব্যালান্স করে দাঁড়িয়ে ছুঁড়ে দিল টাকাটা নৌকোর দিকে। "এদিকে তাকাও, এদিকে," বলেই একটা জোরালো হিসহিসে আওয়াজ করল মুখ দিয়ে। এবার শুনতে পেল জেলেটা, চমকে প্রায় লাফিয়ে উঠল। কিন্তু শব্দটা কানে যেতে গার্ডও তিরবেগে দৌড়ে এল ডেকের অন্য প্রান্ত থেকে। লোকটার একটা পা এসে লাগল চেয়ারটায়, আর ভারসাম্য রাখতে না পেরে শূন্যে ছিটকে গেল পিয়া। টের পেল ও পড়ে যাচ্ছে, ঘোলাটে বাদামি জল দ্রুত এগিয়ে আসছে ওর মুখের দিকে।

স্যার ড্যানিয়েল

“ভাটির দেশের সঙ্গে মরুভূমির অনেক মিল আছে”, বলেছিল নির্মল। “যেমন ধরো, মরুভূমির মতো এখানেও মরীচিকা দেখা যায় যা নেই তাও দেখতে পায় মানুষ। স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটনও দেখেছিলেন। ভাটির দেশের কাঁকড়ায় ভরা নদীতীর দেখে স্কটল্যান্ড থেকে আসা সাহেবের মনে হয়েছিল কাদামাটি নয়, সোনার চেয়েও ঝকমকে কিছু দিয়ে তৈরি এ জায়গাটা। কত দাম হতে পারে এখানকার এই কাদার, বলেছিলেন উনি। ‘বাংলাদেশের এক একর জমি পনেরো মণ ধান ফলাতে পারে। কিন্তু এক বর্গমাইল সোনায় কী ফসল হবে? কিছুই না।’ “

আঙুল তুলে দেওয়ালে ঝোলানো একটা পোর্ট্রেট দেখিয়েছিল নির্মল। “দেখো, এই হল ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের নাইটহুড পাওয়ার দিনের ছবি। এইদিন থেকেই স্যার উপাধি বসল ওঁর নামের আগে—উনি হলেন স্যার ড্যানিয়েল।”

ছবির সাহেবের পায়ে মোজা, বকলস-বাঁধা জুতো, হাঁটু অবধি ব্রিচেস আর পরনে জ্যাকেট, পেতলের বোতাম আঁটা। নাকের নীচে ঝুপো সাদা গোঁফ, কোমরে বেল্টের সঙ্গে মনে হয় একটা তলোয়ার বাঁধা; সেটার বাঁটটা শুধু দেখা যাচ্ছে। চোখদুটো দেখলে মনে হয় সরাসরি তাকিয়ে আছে দর্শকের দিকে, মায়ামাখা দৃষ্টিতে খানিকটা কঠোরতার ছায়া। তার সঙ্গে মিশে আছে একটু রূঢ়তা আর কিছুটা খ্যাপামি। সব মিলিয়ে চোখদুটোতে এমন একটা কিছু ছিল, যে অস্বস্তি হচ্ছিল কানাইয়ের। ছবির হ্যামিলটনের নজর এড়ানোর জন্যে মেসোর আড়ালে সরে গিয়েছিল ও।

“স্যার ড্যানিয়েলের শিক্ষা শুরু হয়েছিল স্কটল্যান্ডে,” বলে চলেছিল নির্মল। “সে দেশের প্রকৃতি ছিল রুক্ষ আর পাথুরে, প্রচণ্ড ঠান্ডা আর নির্মম। ইস্কুলে মাস্টারমশাইদের কাছে উনি শিখেছিলেন কঠোর পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই। একমাত্র পরিশ্রম দিয়েই সবকিছুকে জয় করা যায়—পাহাড় পাথর সবকিছু। কাদামাটিও। তো, সে সময়কার বেশিরভাগ স্কটল্যান্ডবাসীর মতো ড্যানিয়েল হ্যামিলটনও একদিন বের হলেন ভাগ্যের সন্ধানে। যাওয়ার জায়গা ছিল একটাই—স্বপ্নের দেশ, সোনার দেশ ভারতবর্ষ। এসে পৌঁছলেন কলকাতায়। পারিবারিক যোগাযোগের সূত্রে কাজও জুটে গেল একটা, ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জিতে। ম্যাকিন ম্যাকেঞ্জি তখন পি অ্যান্ড ও জাহাজ কোম্পানির জন্য টিকিট বেচত। জাহাজের ব্যবসায় সেকালের দুনিয়ায় পি অ্যান্ড ও-র ধারেকাছে কেউ ছিল না। হ্যামিলটনের জোয়ান বয়স, খাটতেও পারতেন খুব, দিনরাত পরিশ্রম করে প্রচুর টিকিট বিক্রি করে দিলেন—ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস, স্টিয়ারেজ—সবরকমের টিকিট। কলকাতা বন্দর থেকে একেকটা জাহাজ ছাড়ত আর শত শত টিকিট বিক্রি হত। টিকিট এজেন্ট মাত্র একজন। কাজেই হ্যামিলটনের তো পোয়াবারো। উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠতে উঠতে কিছুদিনের মধ্যেই একেবারে কোম্পানির কর্তা হয়ে বসলেন। বিশাল ধনসম্পত্তির মালিক হ্যামিলটন হয়ে উঠলেন ভারতের সবচেয়ে ধনী লোকেদের একজন। উনি ছিলেন, যাকে বলে মনোপলি ক্যাপিটালিস্ট। এত ধনসম্পদ উপার্জন করার পর অন্য যে-কোনও লোক হয় এখানকার পাততাড়ি গুটিয়ে দেশে ফিরে যেত, নয়তো আরাম-বিলাসে পয়সা ওড়াত—এটাই ছিল সে সময়ের দস্তুর। কিন্তু স্যার ড্যানিয়েল ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া।”

“কেন?”

“ধীরে বৎস, ধীরে। সে কথায় আসব আমরা। তার আগে একবার দেওয়ালের ওই ছবির দিকে তাকাও, তারপর চোখ বন্ধ করে কল্পনা করো, এই সায়েব, স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন, খাড়া দাঁড়িয়ে আছেন পি অ্যান্ড ও কোম্পানির জাহাজের ডেকে, ভেঁপু বাজিয়ে জাহাজ কলকাতা ছেড়ে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে বঙ্গোপসাগরের দিকে। সহযাত্রী অন্য সাহেব-মেম যাঁরা আছেন তারা যে যার মতো হাসছেন গাইছেন পানভোজন ফুর্তিতে মেতে আছেন। স্যার ড্যানিয়েল কিন্তু সেসবের মধ্যে নেই। ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি তখন দু’ চোখ ভরে পান

করছেন চারপাশের দৃশ্য—এই বিশাল নদী, এই কাদামাটির চর, এই ম্যানগ্রোভে ঢাকা দ্বীপ। দেখতে দেখতে সাহেবের মনে হল, 'এই জায়গাগুলো খালি পড়ে আছে কেন? কেন কেউ এই দ্বীপগুলিতে থাকে না? এতসব জমি শুধু পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে?' জংলা দ্বীপগুলোর দিকে সাহেবকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে দেখে জাহাজের এক খালাসি এগিয়ে এল। আঙুল তুলে দূরে ইশারা করে বলল, "ওই দেখুন স্যার, জঙ্গলের মধ্যে একটা মন্দির দেখা যাচ্ছে। আর ওইদিকে দেখুন, একটা মসজিদ। এসব জায়গায় একসময় মানুষের বাস ছিল, কিন্তু ঝড়-ঝঞ্ঝা আর বাঘ-কুমিরের উপদ্রবে লোকে টিকতে পারেনি। তাই নাকি? স্যার ড্যানিয়েল বললেন, 'একসময়ে যদি এখানে মানুষের বাস থেকে থাকে, তা হলে তো নতুন করে আবার বসতি গড়ে তোলাই যায়। আর এমন কিছু দূরধিগম্যও নয় জায়গাটা, ভারতের প্রবেশপথই বলা যেতে পারে বিশাল একটা উপমহাদেশে ঢোকার দরজায় একেবারে। পুবদিক থেকে এসে যারাই গাঙ্গেয় সমভূমিতে ঢোকার চেষ্টা করেছে তাদের প্রত্যেককে এখান দিয়ে যেতে হয়েছে, সে তোমার আরাকানিদেরই বললো, কি খমেরদেরই বলো অথবা যবদ্বীপের লোকেদের, কি ওলন্দাজ, মালয়ি, চিনে, পর্তুগিজ, ব্রিটিশ সক্কলকে। অনেকেই জানে এই ভাটির দেশের সবকটা দ্বীপে মানুষ থাকত কোনওনা-কোনও সময়। কিন্তু দেখে বলবে কার সাধ্যি? আসলে ম্যানগ্রোভ অরণ্যের বৈশিষ্ট্যই হল এই। শুধু দ্বীপের পর দ্বীপ গিলে ফেলেই ক্ষান্ত হয় না, সময়কে একেবারে মুছে ফেলে দেয় এ জঙ্গল। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নতুন নতুন প্রেতের জন্ম দিয়ে চলে।

"কলকাতায় ফিরে এসেই হ্যামিলটন খোঁজ শুরু করলেন, কার কাছে এইসব জায়গার সম্পর্কে আরও খবর পাওয়া যায়। বিভিন্ন লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে জানতে পারলেন ওখানকার সব সমস্যার চেয়ে বড় সমস্যা হল খোদ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। পুরো সুন্দরবনটাকে ওরা ওদের জমিদারি মনে করে। কিন্তু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে গোড়াই কেয়ার করেন হ্যামিলটন। ১৯০৩ সালে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে ভাটির দেশের দশ হাজার। একর জমি কিনে নিলেন উনি।"

"দশ হাজার একর! সেটা কতটা জায়গা?"

"সে বহু দ্বীপ কানাই, বহু বহু দ্বীপ। সরকার অবশ্য খুশি হয়েই বেচে দিয়েছিল সেগুলি। ফলে গোসাবা, রাঙ্গাবেলিয়া, সাতজেলিয়া—এইসব জায়গা চলে এল হ্যামিলটনের দখলে। এই নামগুলির সঙ্গে পরে যোগ হল আমাদের এই দ্বীপের নাম, এই লুসিবাড়ির। সায়েব অবশ্য চেয়েছিলেন তার নতুন জমিদারির নাম হবে অ্যান্ড্রুপুর, স্কটল্যান্ডের সেন্ট অ্যান্ড্রুর নামে। এই সেন্ট অ্যান্ড্রু শুরুতে ছিলেন খুব গরিব, সোনাদানা তার কিছুই ছিল না। পরবর্তী জীবনে তিনি প্রচুর টাকার মালিক হন। কিন্তু অ্যান্ড্রুপুর নামটা চলল না। লোকের মুখে মুখে জমিদারির নাম হল হ্যামিলটনাবাদ। দিনে দিনে তোক যত বাড়তে লাগল, নতুন নতুন সব গ্রাম গজিয়ে উঠল, আর স্যার ড্যানিয়েল সেগুলোর নতুন নতুন নাম দিতে লাগলেন। যেমন একটা গ্রামের নাম দিয়েছিলেন সব নমস্কার', আরেকটার নাম 'রজত জুবিলি', এইরকম। এই দ্বিতীয় নামটা বোধহয় কোনও রাজা মহারাজার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে দেওয়া হয়েছিল। এর পরে সাহেব তার আত্মীয়স্বজনদের নামে বিভিন্ন গ্রামের নাম দিতে শুরু করলেন—জেমসপুর, অ্যানপুর, এমিলিবাড়ি। এই লুসিবাড়ির নামটাও সেভাবেই হয়েছে।"

"কারা থাকত এইসব জায়গায়।"

"শুরুতে কেউই থাকত না। একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে—সে সময় এই জায়গাগুলি ছিল গভীর বন। কোনও লোকজন ছিল না, বাঁধ ছিল না, খেতজমি কিছু ছিল । শুধু কাদার বাদা আর ম্যানগ্রোভের জঙ্গল। জোয়ারের সময় বেশিরভাগ অঞ্চল জলে ডুবে যেত। আর চারদিকে হিংস্র বন্য জন্তু—বাঘ, কুমির, কামট, লেপার্ড।"

"তা হলে লোকে কেন এল এখানে?"

"জমির জন্য এল। একটা সময় ছিল যখন লোকে এক-দু' বিঘা জমির জন্য নিজেদের বিক্রি করে দিত। আর এই জায়গাটা তো দেশেরই মধ্যে, কলকাতা থেকে বেশি দূরেও নয়।

জাহাজে করে বার্মা কি মালয় কি ফিজি কি ত্রিনিদাদ তো যেতে হল না। আর সবচেয়ে বড় কথা এখানে জমি পাওয়া যাচ্ছিল বিনে পয়সায়, একেবারে মুফতে।”

“সেইজন্য লোকে চলে এল?”

“শুধু চলে এল নয়, হাজারে হাজারে এল, আসতেই থাকল। হ্যামিলটন সাহেব বলেছিলেন যে কেউ গতরে খাটতে রাজি থাকবে সেই জমি পাবে। তবে হ্যাঁ, একটা শর্তে। ওইসব বিভেদ-বিবাদ জাতপাত এখানে চলবে না। তুমি বামুন কি শুদ্র, বাঙালি কি উড়িয়া সেসব ভুলে যেতে হবে। সবাইকে একসঙ্গে থাকতে হবে, একসঙ্গে খেটে যেতে হবে। যেই না এ খবর ছড়িয়ে পড়ল, অমনি স্রোতের মতো মানুষ আসতে লাগল উত্তর উড়িষ্যা থেকে, পুব বাংলা থেকে, সাঁওতাল পরগণা থেকে। নৌকো করে এল, ডিঙি করে এল, হাতের সামনে যা পেল তাতে করেই চলে এল। হাজারে হাজারে। ভাটার সময় তারা দা-কাটারি দিয়ে জঙ্গল সাফ করত, আর জোয়ার এলে মাচার ওপর বসে অপেক্ষা করত কখন জল নামবে। রাত্তিরে তারা উঁচু গাছের ওপর দোলনার মতো বানিয়ে তার ওপর ঘুমোত, জোয়ারের জলে যাতে ভেসে না যায়।

অবস্থাটা একবার কল্পনা করার চেষ্টা করো: প্রতিটা দ্বীপে অসংখ্য নদী-খাঁড়ি আর জঙ্গলে বাঘ, কুমির, সাপ কিলবিল করছে। তাদের তো একেবারে ভোজ লেগে গেল। শত শত লোককে বাঘে খেল, কুমিরে নিল, সাপে কাটল। এত লোক মরতে লাগল যে স্যার ড্যানিয়েলকে পুরস্কার ঘোষণা করতে হল। যে-ই একটা বাঘ বা কুমির মারতে পারবে সে-ই পুরস্কার পাবে।”

“কিন্তু কী দিয়ে মারবে?”

“খালি হাতে মারবে, ছুরি দিয়ে মারবে, বাঁশের তৈরি বর্শা দিয়ে মারবে। যা পাবে তাই দিয়ে মারবে। হরেনকে মনে আছে তোমার? যে আমাদের ক্যানিং থেকে নৌকো করে নিয়ে এল?”

“মনে আছে,” মাথা নাড়ল কানাই।

“ওর কাকা বলাই একবার মাছ ধরতে যাওয়ার সময় একটা বাঘ মেরেছিল। স্যার ড্যানিয়েল ওকে দু’ বিঘে জমি দিলেন, এই লুসিবাড়িতে। তারপর তো বহু বছর বলাই এ দ্বীপে বীরের সম্মান পেত।”

“কিন্তু স্যার ড্যানিয়েল কেন করেছিলেন এসব? টাকার জন্যে?”

“না। টাকার আর দরকার ছিল না সাহেবের। উনি চেয়েছিলেন একটা নতুন ধরনের সমাজ গড়তে, একটা নতুন দেশ গড়তে। ওঁর ইচ্ছে ছিল সে দেশটা চলবে সমবায় পদ্ধতিতে। সেখানে প্রত্যেকের জন্য জমি থাকবে, কেউ কাউকে শোষণ করবে না। এ নিয়ে মহাত্মা গাঁধী রবীন্দ্রনাথের মতো সব বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন স্যার ড্যানিয়েল। বুর্জোয়ারা তার সঙ্গে একমত হলেন। ঠিক হল একেবারে অন্যরকম একটা দেশ তৈরি হবে এখানে একটা আদর্শ দেশ।”

“কিন্তু এটা দেশ কী করে হবে? তখন তো কিছুই নেই এখানে রাস্তাঘাট নেই, ইলেকট্রিসিটি নেই...”

নির্মল একটু হেসেছিল। “সে সবই হয়েছিল।” দেওয়ালের দিকে দেখিয়ে বলেছিল, “ওইদিকে একবার তাকাও।” কানাই তাকিয়ে দেখল দেওয়ালের ধার ঘেঁষে একটা রং জ্বলে যাওয়া ইলেকট্রিকের তার চলে গেছে ঘরের একদিক থেকে অন্যদিকে। “দেখেছ তো? বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেছিলেন স্যার ড্যানিয়েল। শুরুর দিকে একটা বিশাল জেনারেটর ছিল এখানে, ঠিক স্কুলটার পাশে। পরে ওটা খারাপ হয়ে যায়। তদ্দিনে সাহেবও মারা গেছেন, আর অন্য কেউ উদ্যোগ নিয়ে ওটা সারাবার ব্যবস্থা করেনি।”

একটা টেবিলের পাশে নিচু হয়ে বসে আরেক গোছা তার দেখিয়েছিল নির্মল। “এই দেখো। টেলিফোনও ছিল এখানে। এমনকী কলকাতাতেও ফোন চালু হওয়ার আগে গোসাবায় টেলিফোন এনেছিলেন স্যার ড্যানিয়েল। সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করেছিলেন সাহেব

এই দ্বীপগুলিতে, কিচ্ছু বাকি রাখেননি। গোসাবায় একটা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ছিল, এমনকী আলাদা টাকাও ছিল—গোসাবা মুদ্রা।"

দেওয়ালের গায়ে সারি সারি বইয়ের তাকগুলোর কাছে গিয়ে একটা ধূলিধূসরিত ঘেঁড়া কাগজের টুকরো নামিয়ে এনেছিল নির্মল। "এই দেখ, একটা ব্যাঙ্কনোট। কী লেখা আছে দেখেছ? 'এ শুধু নিষ্প্রাণ মুদ্রা নয়, এই নোটের পেছনে আছে জীবিত মানুষ। এমনিতে এর দাম কানাকড়িও নয়, কিন্তু এর প্রকৃত মূল্য প্রচুর—যতটা জঙ্গল সাফাই হবে, যতগুলি পুকুর কাটা হবে, যতগুলি ঘরবাড়ি তৈরি হবে, তার একশো শতাংশ। এক সুস্থ, পরিপূর্ণ জীবনের সমান এ ব্যাঙ্কনোটের মূল্য।"

কাগজটা কানাইয়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল নির্মল। "ভাল করে দেখে নাও। পড়ে মনে হয় যেন খোদ কার্ল মার্ক্স লিখেছেন। এ তো পরিষ্কার লেবার থিয়োরি অব ভ্যালু। কিন্তু নীচে সইটা দেখো। কী লেখা আছে? স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিলটন।"

কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে উলটে পালটে দেখছিল কানাই। "কিন্তু উনি কীসের জন্য করেছিলেন এইসব? পয়সা রোজগারের দরকার না থাকলে এত কষ্ট কেন করতে গেলেন হ্যামিলটন? আমার তো মাথায় ঢুকছে না।"

"তোমার কী মনে হয় কানাই?" জিজ্ঞেস করেছিল নির্মল। "আসলে সাহেবের একটা স্বপ্ন ছিল। যারা স্বপ্নের পেছনে ছোটে তারা যা চায়, স্যার ড্যানিয়েলও তাই চেয়েছিলেন। উনি চেয়েছিলেন একটা দেশ গড়তে যেখানে কোনও শোষণ-বঞ্চনা থাকবে না, সমাজে উঁচু-নিচু ভেদ থাকবে না, তুচ্ছ সব বিষয় নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদ থাকবে না। উনি স্বপ্ন দেখেছিলেন এমন একটা জায়গার যেখানে সব্বাই পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সক্কলে—সকালবেলায় হবে চাষি, দুপুরে কবি, আর সন্ধ্যাবেলায় ছুতোরমিস্ত্রি।"

হো হো করে হেসে উঠেছিল কানাই। "কী হাল হয়েছে সেই স্বপ্নের। রয়ে গেছে শুধু কতগুলো পোকায়-খাওয়া ইঁদুরে-কাটা দ্বীপ।"

এইটুকু একটা বাচ্চা ছেলের থেকে এতটা বিদ্রূপ ঠিক আশা করেনি নির্মল। একটু হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। খানিকটা খাবি খাওয়ার মতো ভাব করে শেষে বলেছিল, "হেসো না কানাই। আসলে এসব কিছুর জন্য তখনও প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারেনি এই ভাটির দেশ। কে বলতে পারে, হয়তো কোনওদিন সত্যি হয়ে উঠতে পারে হ্যামিলটন সাহেবের সেই স্বপ্ন।"

স্নেল'স উইন্ডো

খোলা সমুদ্রের পরিষ্কার জলে যখন সূর্যের আলো পড়ে তা সমুদ্রতল থেকে একটু তেরচা ভাবে নীচে গিয়ে ঢোকে। জলের ভেতর থেকে ওপরে তাকালে সে আলো একটা উলটানো শঙ্কুর মতো চোখে এসে পড়ে। স্বচ্ছ বৃত্তের মতো সেই শঙ্কুর ভূমি ঝুলতে থাকে দর্শকের মাথার ওপরে, মনে হয় ঠিক যেন এক ভাসমান জ্যোতির্বলয়। সমুদ্রের নীচের আলোর তৈরি এই জ্যামিতিক আকারের নাম স্নেলস উইন্ডো। এই আলোর জানালা দিয়েই ডলফিনরা সমুদ্রগর্ভ থেকে বাইরের পৃথিবীকে দেখে। জলের তলায় যেদিকেই তারা যায়, ঝকঝকে রুপোলি রং-এর অনন্ত এক ঝাপসা বিস্তারের মধ্যে সেই ভাসমান আলোকবৃত্ত তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে।

গঙ্গা বা ব্রহ্মপুত্রের মতো নদীতে কিন্তু এই আলোর জানালা ঢাকা থাকে ভারী পলির পর্দায়। পলির পরিমাণ এই নদীগুলিতে এতটাই বেশি যে জলের মধ্যে মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার যাওয়ার পরেই সূর্যের আলো পথ হারিয়ে ফেলে। সেই ভাসমান পলির স্রোতের মধ্যে একহাত দূরেও দৃষ্টি চলে না। পথ দেখাবার মতো কোনও আলোকবৃত্তও থাকে না বলে খুব সহজেই দিক ভুল হয়ে যেতে পারে। ওপরে না নীচে, আগে না পেছনে কোন দিকে যেতে হবে সেটা বুঝে ওঠা যায় না। এই সমস্যার জন্যই মনে হয় গ্যাঞ্জেটিক ডলফিনরা সাঁতরায় কাত হয়ে—নদীর তলের সমান্তরালে। একদিকের পাখনা ঝুলে থাকে নীচের দিকে, নোঙরের মতো; সেটা দিয়ে নদীর তলার সেই অন্ধকারের রাজ্যে ওরা দিশা ঠিক রাখে।

পিয়া যদি নৌকো থেকে সমুদ্রের জলে পড়ত, তা হলে সামলে উঠতে ওকে বেশি বেগ পেতে হত না। এমনিতে ও যথেষ্ট ভাল সাঁতার জানে, স্রোতের টানের মুখেও নিজেকে ভাসিয়ে রাখার ক্ষমতা আছে। কিন্তু সুন্দরবনের নদীর ঘোলা জলের নীচে ঝাপসা আলোয় দিশাহারা হয়ে ভয় পেয়ে গেল পিয়া। দম দ্রুত ফুরিয়ে আসছে আর মনে হচ্ছে অদ্ভুত উজ্জ্বল একটা পলির স্তর আস্তে আস্তে ওকে ঢেকে নিচ্ছে, কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না কোন দিকে গেলে ভেসে ওঠা যাবে। মাথার ভেতরে কেমন একটা ঘ্রাণের বোধ, অথবা ঘ্রাণ ঠিক নয়, যেন একটা ধাতব স্বাদ। রক্তের স্বাদ নয়, সেটা এই অবস্থাতেও বোঝা যাচ্ছিল—কাদামাটি ঢুকে গেছে মুখে। নাকে চোখে গলার মধ্যে—সর্বত্র মাটি, একটা পলিমাটির পর্দা যেন নেমে আসছে চারদিক থেকে, ঘোলাটে সেই চাদর ধীরে ধীরে জড়িয়ে নিচ্ছে ওকে। এই শেষ তা হলে? একটা মরিয়া চেষ্টা করল পিয়া পলির চাদরটা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার—আঁচড়ে, ঘুষি মেরে, লাথি মেরে—কিন্তু পিচ্ছিল দেওয়ালের মতো সেটা বার বার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ পিঠের ওপর যেন কর্কশ কিছুর একটা ঘষা লাগল। মুহূর্তের জন্য মনে হল সেটা কোনও সরীসৃপের ছুঁচোলো নাক। আঁকুপাঁকু করে উঠল পিয়া, ঘাড় ফেরাল পেছনে, কিন্তু জলের দুর্ভেদ্য ঘোলাটে রং ছাড়া আর কিছুই নজরে এল না। বাতাসের অভাবে শক্ত হয়ে আসছে শরীর, তাও শেষ শক্তিটুকু দিয়ে প্রবল চেষ্টায় হাত ছুড়ল। এবার মনে হল তীব্র বেগে কিছু একটা এগিয়ে আসছে মুখের ওপর; পিয়া বুঝতে পারল কেউ ওকে জলের মধ্যে টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছে সামনের দিকে, কিন্তু বাধা দেওয়ার শক্তি ওর ফুরিয়ে গেছে। এরপর হঠাৎই যেন হালকা হয়ে গেল মাথাটা, সারা শরীরে একটা ফুরফুরে ভাব—বাতাসের ছোঁয়া। কিন্তু জলে আর কাদায় বন্ধ হয়ে আছে মুখ নাক, নিশ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা আর নেই।

জলের ওপর হাতের চাপড় মেরে উঠে আসার চেষ্টা করল পিয়া, সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা প্রচণ্ড ঝাঁপটা লাগল মুখে। কোথা থেকে একজোড়া হাত এসে ওর বুকের চারপাশে জড়িয়ে ধরল। একটা ঝাঁকি দিয়ে কেউ ওর মাথাটা হেলিয়ে দিল পেছনের দিকে। পিয়া বুঝতে পারল নিজের দু'পাটি দাঁতের মধ্যে অন্য কারও দাঁত চেপে বসে যাচ্ছে। মুখের মধ্যে থেকে মনে হল কেউ কিছু শুষে নিচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে কী যেন উঠে আসছে গলা বেয়ে। শ্বাসনালিতে যেই বাতাসের স্পর্শ টের পাওয়া গেল, আরও দম নেওয়ার জন্য খাবি খেতে লাগল পিয়া। একটা হাত এখনও শক্ত করে তুলে ধরে রেখেছে ওকে জলের ওপর,

বাঁদিকের কাঁধের ওপর কাটাকাটা কিছুর খোঁচা লাগছে। শ্বাস নেওয়ার জন্য হাঁসফাস করতে করতেও আবছায়া চৈতন্যে পিয়ার মনে হল ওই ডিঙি নৌকোর জেলেটাই ধরে আছে ওকে, আর ওরই দাড়ির ঘষা লাগছে কাঁধের কাছে। ওই খোঁচা খোঁচা ভাবটাতেই ওর মাথাটা যেন অনেকটা সাফ হয়ে গেল। জোর করে ভয়ে শক্ত হয়ে যাওয়া পেশিগুলোকে আলগা করে দিল পিয়া, শরীরটাকে শান্ত করে রাখল, যাতে ওকে বয়ে নিয়ে সাঁতার কাটতে লোকটার অসুবিধা না হয়।

স্রোতের টানে বেশ খানিকটা দূরে ভেসে চলে এসেছিল ওরা। স্থির হয়ে না থাকলে নৌকো পর্যন্ত ওকে টেনে নিয়ে যাওয়া কঠিন হবে। জলের ওপর গড়িয়ে গিয়ে তাই চিত হল পিয়া, পিঠটা একটু বাঁকিয়ে দিল আর-একটা হাত জেলেটার হাতের মধ্যে গলিয়ে দিয়ে শরীরটাকে প্রায় ভারশূন্য করে ভেসে রইল। কিন্তু নদীর স্রোত এখানে প্রায় মাধ্যাকর্ষণের মতো তীব্র। পিয়াকে টেনে নিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোতেও প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছিল লোকটার, মনে হচ্ছিল যেন একটা ভারী মাল ঘাড়ে ধীরে ধীরে চড়াই ভেঙে উঠতে হচ্ছে ওকে।

অবশেষে নৌকোর সামনের দিকটা পিয়ার হাতের নাগালে এল। জলের মধ্যে জেলেটা কর্কস্ক্রুর মতো ঘুরে গেল একপাক, নীচ থেকে চাপ দিয়ে পিয়ার শরীরটাকে ঠেলে তুলল ডিঙির ওপর। উপুড় হয়ে পড়ল পিয়া, আর সঙ্গে সঙ্গে পেট থেকে ফোয়ারার মতো জল উঠে এসে দম বন্ধ করে দিল। হঠাৎ মনে হল আবার যেন ডুবে যাচ্ছে ও, নাকমুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে জল। দু'হাত দিয়ে গলার কাছটা চেপে ধরল পিয়া, হাঁসফাস করে খামচাতে লাগল, যেন একটা ফাস আটকে আছে সেখানে, আর সেটাকে ও আলগা করার চেষ্টা করছে। আবার জেলেটা দুহাতে শক্ত করে চেপে ধরল ওর কাঁধ দুটো, ওর শরীরটাকে উলটে দিয়ে একটা পা আড়াআড়ি রাখল কোমরের কাছে। আস্তে আস্তে চাপ দিতে থাকল, মুখে মুখ লাগিয়ে পিয়ার গলার ভেতর থেকে শুষে নিতে থাকল জল আর সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া পাম্প করতে থাকল ফুসফুসে।

পিয়ার শ্বাসনালিতে বায়ু চলাচল আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে আসতে মুখ সরিয়ে নিল লোকটা। শুয়ে শুয়ে শুনতে পাচ্ছিল পিয়া, থুতু ফেলছে ও মুখের থেকে পিয়ার বমির স্বাদ ধুয়ে পরিষ্কার করছে।

ধীরে ধীরে শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাভাবিক ছন্দ ফিরতে লাগল, কানে এল কথাবার্তার আওয়াজ। আস্তে আস্তে চোখ খুলল পিয়া। দেখল লঞ্চের রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফরেস্ট গার্ড আর মেজদা। আড়চোখে ওর দিকে দেখছে আর ফিসফিস করে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। ওকে চোখ মেলতে দেখে নিজের ঘড়ির দিকে আর আকাশের দিকে ইশারা করল গার্ড। সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমে, সারা আকাশ লালে লাল। লোকটা কী বলতে চাইছে প্রথমে ঠিক ধরতে পারেনি পিয়া। শেষে যখন হাত নেড়ে ডাকতে লাগল, তখন ওর মাথায় ঢুকল ব্যাপারটা : সন্ধে নেমে আসছে, তাই ও চাইছে পিয়া তাড়াতাড়ি লঞ্চে উঠে আসুক, তারপর যেখানে যাওয়ার যাওয়া যাবে।

এই অবস্থার মধ্যেও গার্ডের এই তাড়া দেওয়া দেখে গা জ্বলে গেল পিয়ার। লোকটা ধরেই নিয়েছে যে এখন ওর আর গত্যন্তর নেই, ওদের কথা শুনেই ওকে চলতে হবে এবার, যা বলবে তাই মেনে নিতে হবে। প্রথম থেকেই এই লোকদুটোকে নিয়ে পিয়ার মনে একটা অস্বস্তির ভাব ছিল। এখন লঞ্চে ফিরে গেলে তো ওদের কাছে নিজের অসহায় ভাবটাই প্রকাশ করা হবে। আর এই পরিস্থিতিতে এই গার্ড আর মেজদার খপ্পরে পড়া মানে ওরা বুঝে যাবে যে পিয়া এখন ওদের হাতের মুঠোর নিরীহ শিকার। নাঃ, কোনওমতেই আর ফেরা চলবে না লঞ্চে। কিন্তু কী করবে ও তা হলে? আর কী রাস্তা খোলা আছে?

হঠাৎ বিদ্যুৎঝলকের মতো একটা শব্দ মনে এল পিয়ার। এত অপ্রত্যাশিত ভাবে মাথায় এল কথাটা যে একটু আশ্চর্যই হয়ে গেল ও। তাড়াতাড়ি উঠে বসে জপ করার মতো বিড়বিড় করে বার বার বলতে লাগল শব্দটা, যাতে হারিয়ে না যায়। মুখ ফিরিয়ে দেখল জেলেটা এখন ডিঙির সামনের দিকটায় উবু হয়ে বসে আছে। খালি গা, শুধু কোমরে একটুকরো

কাপড় জড়ানো। জলে ঝাঁপ দেওয়ার সময় লুঙ্গিটা ছিঁড়ে খুলে ফেলেছিল, সেটা দিয়ে বাচ্চা ছেলেটা এখন ওর মাথা মুছিয়ে দিচ্ছে। পিয়া উঠে বসতে বাচ্চাটা ফিসফিস করে কিছু বলল। ঘুরে তাকাল লোকটা। চোখাচোখি হতেই মাথার মধ্যে শব্দটা হারিয়ে যাওয়ার আগে সময় নষ্ট না করে বলে ফেলল পিয়া, লুসিবাড়ি?' ভুরু কোঁচকাল লোকটা, যেন বলতে চায় ঠিক শুনতে পায়নি কথাটা। তাই আবার পিয়া বলল, 'লুসিবাড়ি?' আর একটা শব্দও জুড়ে দিল, 'মাসিমা?' এবার মাথা নাড়ল লোকটা। নামগুলো ওর চেনা।

বিস্ময়ে গোল গোল হয়ে গেল পিয়ার চোখ। এই লোকটা চেনে ওই মহিলাকে? সন্দেহ নিরসনের জন্য আবার বলল ও, 'মাসিমা?' আবার লোকটা মাথা নাড়ল, একটু হাসির আভাসও দেখা গেল ঠোঁটের কোনায়। যেন বলতে চায় ও ঠিকই বুঝতে পেরেছে কার কথা বলতে চাইছে পিয়া। কিন্তু এখনও ধাঁধা রয়ে গেছে পিয়ার মনে, ওর পুরো বক্তব্যটা কি লোকটা বুঝেছে? এবার একটা অন্য রাস্তা নিল ও। লোকটা নৌকোয় করে ওকে লুসিবাড়িতে পৌঁছে দিতে পারবে কি না সেটা বোঝাতে একবার নিজের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল, আর একবার দেখাল দূরে, দিগন্তের দিকে। আবার মাথা নাড়ল ও, ব্যাপারটা যে বুঝেছে সেটা জানানোর জন্যই যেন মুখেও বলল, 'লুসিবাড়ি'।

'হ্যাঁ।' এতক্ষণে একটা নিশ্চিন্ত স্বস্তির শ্বাস ফেলল পিয়া। চোখ বন্ধ করল, অবসাদে শিথিল হয়ে এল পেশিগুলো।

ওদিকে লঞ্চের ওপর থেকে হাত বাড়িয়ে তুড়ি দিচ্ছিল ফরেস্ট গার্ড, যেন ঘুম থেকে জাগানোর চেষ্টা করছে ওকে। কোনওরকমে নৌকোর ছইটা ধরে উঠে দাঁড়াল পিয়া, ইশারায় লোকটাকে ওর পিঠব্যাগগুলো নামিয়ে দিতে বলল। প্রথম ব্যাগটা চুপচাপ নামিয়ে দিল লোকটা, কিন্তু দ্বিতীয়টার জন্য হাত বাড়াতেই ও বুঝল যে পিয়া আর লঞ্চে ফিরবে না। মুহূর্তে গার্ডের হাসি হাসি ভাবটা মিলিয়ে গেল, চোখ রাঙিয়ে ও জেলেটাকে চিৎকার করে ধমকাতে শুরু করল। জেলেটা কিন্তু নির্বিকার, শুধু বিড়বিড় করে কী একটা বলল। তাতে আরও খেপে গেল গার্ড, ঘুষি পাকিয়ে ভয় দেখাতে লাগল, পারলে তেড়ে আসে এরকম একটা ভাব।

ভীষণ রাগ হল পিয়ার। চেঁচিয়ে বলল, "ওকে ধমকাচ্ছেন কেন? ওর কী দোষ?" এবার অপ্রত্যাশিত একটা সমর্থন পেল পিয়া। লঞ্চের ওপর থেকে মেজদাও মনে হল আপত্তি করল, পশ্চিমের সূর্যের দিকে আঙুল দেখিয়ে গার্ডকে কিছু একটা বলল। তাতে যেন সম্বিত ফিরে পেল লোকটা, ফের মনোযোগ দিল পিয়ার দিকে। দ্বিতীয় পিঠব্যাগটা একহাতে তুলে ধরে অন্য হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের ইশারায় বোঝাল কিছু টাকা না খসালে ওটা ও হাতছাড়া করবে না।

এতক্ষণে টাকাপয়সার কথা খেয়াল হল পিয়ার। ভাগ্যিস ওর ওয়াটারপ্রুফ টাকার ব্যাগটা বেল্টের সঙ্গে বাঁধা ছিল। ব্যাগের চেনটায় হাত দিয়ে হাঁফ ছাড়ল পিয়া। যাক বাবা, এত কাণ্ডের পরও সব ঠিকঠাকই আছে। নৌকোর ভাড়া আর গার্ডের একদিনের পারিশ্রমিক হিসেব করে কিছু টাকা গুনে বের করল ব্যাগটা থেকে। টাকাটা গার্ডের হাতে দিতে গিয়েও কী মনে করে আরও কয়েকটা নোট জুড়ে দিল সঙ্গে। যথেষ্ট হয়েছে একদিনের পক্ষে, যত তাড়াতাড়ি এই ঝঞ্ঝাট থেকে রেহাই পাওয়া যায় ততই মঙ্গল। লোকটা চুপচাপ হাত বাড়িয়ে টাকাগুলো নিল, তারপর ব্যাগটা ছুঁড়ে দিল নৌকোর ওপর।

এত সহজে ঝামেলা মিটে যাবে আশাই করেনি পিয়া। ও ভেবেছিল আরও খানিকটা চিৎকার চেঁচামেচি করবে লোকগুলো, হয়তো আরও টাকা চাইবে। কিন্তু যতটা সহজে পার পেয়ে গেছে ভেবেছিল পিয়া দেখা গেল তার থেকে একটু বেশিই খসাতে হয়েছে ওকে। লঞ্চের ওপর থেকে একটা দামি ওয়াকম্যান হাতে তুলে দেখাল গার্ড, এর মধ্যে এক ফাঁকে পিয়ার ব্যাগ থেকে ওটা ও হাতিয়ে নিয়েছে। চুরির আনন্দে কোমর বেঁকিয়ে আর দু'হাতে অশ্লীল ভঙ্গি করে নাচতে লাগল ডেকের ওপর।

কিন্তু এসব কিছুই আর গায়ে লাগছে না পিয়ার এখনওদের দুজনের হাত থেকে যে

অবশেষে মুক্তি পাওয়া গেছে তাতেই ও খুশি। ভটভট শব্দটা আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ও চোখ বন্ধ করে রইল।

ট্রাস্ট

লুসিবাড়ি দ্বীপটা এমনিতে ছোট হলেও বেশ কয়েক হাজার লোক বাস করে এখানে। অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেই সেই ১৯২০ সালে আসা আদি বাসিন্দাদের পৌত্র-প্রপৌত্র। কিন্তু তা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে ঢেউয়ের মতো এসেছে মানুষ। একদল এসেছে ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর, আবার অনেকে এসেছে ১৯৭১-এ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়। এমনকী তার পরেও এ দ্বীপে লোক এসে বসত করেছে। তারা এসেছে আশেপাশের দ্বীপ থেকে বাস্তুহারা হয়ে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য সরকার অনেক সময় জোর করে এ অঞ্চলের কিছু দ্বীপ খালি করে দিয়েছে; এই শেষ শ্রেণীর বাসিন্দারা সেই সরকারি ব্যবস্থার শিকার। এই সবকিছু মিলিয়ে লুসিবাড়ির জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে। ফলে এক টুকরো জমিও এখন আর খালি পড়ে নেই এখানে। ঘন সবুজ ফসলখেতের কথা মুড়ি দিয়ে পড়ে রয়েছে গোটা দ্বীপটা, তার মাঝে মাঝে ছোট ছোট কিছু মাটির ঘর, আর খেতের এদিক থেকে ওদিক কাটাকুটি খেলার দাগের মতো চলে গেছে কয়েকটা পায়ে হাঁটা পথ। কয়েকটা চওড়া রাস্তা আবার ইট-বাঁধানো, দু'ধারে সারি দিয়ে লাগানো ঝাউগাছের ছায়ায় ঢাকা। তবে এ হল ওপর ওপর দেখা। এ দেখায় বাংলাদেশের আর পাঁচটা গায়ের সাথে লুসিবাড়ির কোনও তফাত মিলবে না। এমনিতে বোঝাই যাবে না এই শান্ত চেহারার গ্রামটার জীবনপ্রণালী নির্ভর করছে একটি মাত্র ভৌগোলিক উপাদানের ওপর। সে হল এখানকার বাঁধ। পুরো গ্রামটাকে বেড় দিয়ে থাকা প্রাকারের মতো সে বাঁধ রোজ দু'বেলা লুসিবাড়িকে বাঁচায় বানভাসি থেকে।

বাদাবন ট্রাস্টের কম্পাউন্ডটা মূল লুসিবাড়ি গ্রাম থেকে কিলোমিটার খানেক দূরে, শাঁখের মতো দ্বীপটার গোল দিকে। এখানেই একটা ছোট বাড়িতে নীলিমা থাকে। অতিথি অভ্যাগত কেউ এলে তাদেরও সেই বাড়িতেই থাকতে দেওয়া হয়।

কানাই আর নীলিমা যখন এসে পৌঁছল তখন সন্ধে গড়িয়ে গেছে। ওরা বোট থেকে নেমেছিল দ্বীপের অন্য দিকটায়, চড়ার ওপরে। সেটা সুসিবাড়ি গ্রামের কাছে। সেখান থেকে যখন রওয়ানা হয়েছে তখনই সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। ঘাটের কাছ থেকে তারপর একটা রিকশাভ্যান ভাড়া করতে হয়েছে ট্রাস্টে আসার জন্য। এই রিকশাভ্যান জিনিসটা আগের বার এখানে দেখেনি কানাই। এখন এখানে এটার খুব চল হয়েছে। মালপত্র, গোরু-ছাগল, মানুষ সবকিছুই নিয়ে যাওয়া যায় ভ্যানে করে। পেছনের পাটাতনটায় ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে প্যাসেঞ্জাররা, আর মাঝে মাঝে খানাখন্দে পড়ে ভ্যান লাফিয়ে উঠলে এ ওকে ধরে টাল সামলায়।

"এটাতে আমাদের সবাইকে ধরবে তো?" ভ্যানটার দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল কানাই।

"কেন ধরবে না? উঠে পড়, আমরা ধরে থাকব তোকে, ভয়ের কিছু নেই," নীলিমা অভয় দিল।

যাত্রা শুরু হল। কানাইয়ের সুটকেসটা চাপানো হয়েছে একটা সবজির ঝুড়ির ওপর, তার একপাশে আবার কয়েকটা হাঁস মুরগি, তারস্বরে চেঁচাচ্ছে সেগুলো। খানিক চলার পর একটা ইট-ফেলা রাস্তার ওপর এসে পড়ল ভ্যানটা। ভাল করে বসানো হয়নি ইটগুলো, মাঝে মাঝেই দু'-একটা উঠে গেছে, গর্ত গর্ত হয়ে আছে সে জায়গাগুলো। ভ্যানের চাকা একেকবার সে গর্তের মধ্যে পড়ছে, আর ছিটে-গুলির মতো শূন্যে ছিটকে যাচ্ছে লোকগুলো। কানাই তো একবার পড়েই যাচ্ছিল, কোনও রকমে ওর জামা-টামা ধরে সামলাল অন্য যাত্রীরা।

"আমাদের গেস্ট হাউসটায় তুই থাকতে পারবি তো রে কানাই?" নীলিমার গলায় চিন্তার সুর। "খুব সাধারণ ব্যবস্থা কিন্তু। কোনও স্পেশাল কিছু আশা করিস না। তোর জন্যে একটা ঘর সাফসুতরো করে রাখা হয়েছে। রাতের খাবারও রাখা থাকবে টিফিন ক্যারিয়ারে। আমাদের একজন ট্রেনি নার্সকে বলা আছে, ও-ই তোর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করবে। তোর কিছু দরকার হলে ওকেই বলতে পারিস। মেয়েটার নাম ময়না। ও নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে

ওখানে আমাদের জন্যে।”

নামটা কানে যেতেই ভ্যানের চালক ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, “মাসিমা কি ময়না মণ্ডলের কথা বলছেন?”

“হ্যাঁ।”

“ওকে তো আপনি এখন গেস্ট হাউসে পাবেন না মাসিমা। আপনি শোনেননি কী হয়েছে?”

“কী হয়েছে?”

“ওর বর ফকির তো আবার কোথায় চলে গেছে। এবার আবার ছেলেটাকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে। ময়না বেচারি এখন চারদিকে খুঁজে খুঁজে মরছে।”

“সত্যি? তুই ঠিক জানিস?”

“হ্যাঁ মাসিমা,” অন্য কয়েকজন যাত্রীও মাথা নেড়ে সমর্থন করল ভ্যানওয়ালাকে।

জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল নীলিমা। “বেচারি ময়না। লোকটা একেবারে ওকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেল।”

মন দিয়ে সব শুনছিল কানাই। নীলিমার মুখে চিন্তার ছায়া দেখে জিজ্ঞেস করল, “তোমার তো খুব মুশকিল হয়ে যাবে তা হলে, না?”

“না রে। আমরা কিছু একটা ব্যবস্থা ঠিক করে নেব। আমি ভাবছি ময়নার কথা। এই বরটার জ্বালায় তো পাগল হয়ে যাবে মেয়েটা।”

“লোকটা, মানে, ওর বরটা কে?”

“ওকে তুই চিনবি না—” বলতে বলতে মাঝপথে থমকে গেল নীলিমা। কানাইয়ের হাতটা খামচে ধরল। “দাঁড়া, দাঁড়া, আমারই খেয়াল ছিল না। তুই তো ওকে চিনবিই। মানে

ওকে ঠিক না, ওর মাকে তুই চিনিস।”

“ওর মাকে?”

“হ্যাঁ। কুসুম বলে একটা মেয়ের কথা তোর মনে আছে?”

“কেন মনে থাকবে না?” কানাই বলল। “খুব মনে আছে। আগের বার যখন এসেছিলাম। তখন ও-ই তো এখানে আমার একমাত্র বন্ধু ছিল।”

“হ্যাঁ।” ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল নীলিমা। “আমারও মনে পড়ছে, তোরা একসঙ্গে খেলাধুলা করতিস। তো এই ছেলেটা, ফকির, ও হল সেই কুসুমের ছেলে। ওর সঙ্গে আমাদের ময়নার বিয়ে হয়েছে।”

“এই ফকিরকেই কি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?”

“হ্যাঁ, ওকেই পাওয়া যাচ্ছে না।”

“আর কুসুমের কী খবর? ও কোথায় আছে এখন?”

লম্বা একটা শ্বাস ছাড়ল নীলিমা। “কুসুমও কোথায় একটা পালিয়ে গিয়েছিল; বোধহয় তুই ফিরে যাওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই। তার পর বহু বছর কোনও খোঁজখবর নেই, শেষে একদিন ফিরে এল আবার। ওর কথা ভাবলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়।”

“কেন? কী হয়েছিল ওর?”

চোখ বন্ধ করল নীলিমা। যেন মনের থেকে আড়াল করে রাখতে চাইছে কুসুমের স্মৃতিটাকে। “ওকে মেরে ফেলেছিল।”

“মেরে ফেলেছিল? কারা? কেন?”

“সেসব তোকে পরে বলব,” নিচু গলায় বলল নীলিমা। “এখন নয়।”

“আর ওর ছেলে?” কানাই নাছোড়বান্দা। “কত বড় ও তখন? কুসুম মারা যাওয়ার সময়?”

“ও তো তখন একেবারে বাচ্চা। বছর পাঁচেক বয়স। ওদের এক আত্মীয়, হরেন, ওকে নিয়ে গিয়ে মানুষ করল।”

হঠাৎ চোখের সামনে একটা বিশাল বাড়ি কানাইয়ের মনোযোগ কেড়ে নিল। “ওখানে

ওটা কী মাসি?"

"ওটা হাসপাতাল," বলল নীলিমা। "আগের বার দেখিসনি তুই?"

"না। এটা তৈরি হওয়ার পর তো আর আসিনি আমি।"

হাসপাতালের গেটের কাছে অনেকগুলো লাইট লাগানো, প্রত্যেকটার চারদিকে মনে হচ্ছে একেকটা আলোর পুঞ্জ জমে আছে। জীবন্ত মনে হচ্ছে সেগুলোকে ঘুরছে, নড়াচড়া করছে। ভ্যানটা গেট পেরিয়ে ঢোকার সময় কানাই দেখল সেই জ্যোতিপুঞ্জগুলি আসলে খুদে খুদে কতগুলি পোকার ঝক। মেঘের মতো জমে আছে আলোর কাছে।

প্রত্যেকটা বালবের নীচে কিছু স্কুলের ছেলেমেয়েও বসে আছে। কোলের ওপর বইখাতা নিয়ে ওই আলোয় পড়াশোনা করছে তারা।

"এগুলো ইলেকট্রিক আলো?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল কানাই। ৫৪

"হ্যাঁ রে।"

"কিন্তু আমি যে শুনেছিলাম লুসিবাড়িতে ইলেকট্রিসিটি আসেনি এখনও?"

"বিজলি বাতির ব্যবস্থা শুধু আমাদের এই কম্পাউন্ডটুকুর মধ্যে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা থাকে আলো, সূর্য ডোবার পর থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত," নীলিমা বলল।

এই বিদ্যুৎ আসলে আসে একটা জেনারেটর থেকে। একজন পৃষ্ঠপোষক যন্ত্রটা ট্রাস্টকে দান করেছিলেন। প্রতিদিন সন্ধেবেলা কয়েক ঘণ্টার জন্য চালানো হয় জেনারেটরটা। হাসপাতালের কর্মীদের সেটা সবচেয়ে ব্যস্ততার সময়। তাড়াতাড়ি কাজকর্ম সেরে তারা রাতের নিস্তব্ধতার জন্য প্রস্তুত হয়। আশেপাশের স্কুলপড়ুয়া ছেলেমেয়েরাও ওই আলোর টানে সন্ধের সময় হাসপাতালের সামনে চলে আসে। বাড়িতে পড়ার চেয়ে এখানে এই ইলেকট্রিকের আলোয় পড়ার অনেক সুবিধা। তা ছাড়া কেরোসিন মোমবাতির খরচটাও বাঁচে।

"আমাদের এখন ওইখানে যেতে হবে," সামনের একটা বাড়ির দিকে দেখিয়ে বলল নীলিমা। দোতলা গেস্ট হাউসটা হাসপাতালের কাছেই, মাঝে শুধু একটা পুকুর আর একসারি নারকেল গাছ। চুনকাম করা ছোট্ট স্কুলের মতো দেখতে ঝকঝকে বাড়িটায় বেশ একটা মন ভাল করে দেওয়া ভাব রয়েছে। অতিথিদের থাকার জায়গা দোতলায়। একতলায় নীলিমার সংসার। নির্মলের সঙ্গে এখানেই থেকেছে ও, সত্তরের দশকের শেষ দিক পর্যন্ত। এ বাড়িরই ছাদের ওপর ছিল নির্মলের পড়ার ঘর। ওর সমস্ত কাগজপত্র এখনও ওখানেই রাখা আছে।

ভ্যান থেকে নেমে কানাইয়ের হাতে একটা চাবি দিল নীলিমা। "এই নে, এটা তোর মেসোর ছাদের ঘরের চাবি। ঘরে ঢুকেই ডেস্কের ওপর দেখতে পাবি ওই খামটা রাখা রয়েছে। আমিই তোকে নিয়ে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু ভীষণ ক্লান্ত লাগছে রে।"

"কিছু ভেবো না মাসি, আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব। সকালে দেখা হবে তা হলে তোমার সঙ্গে।"

সুটকেসটা নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছিল কানাই, এমন সময় নীলিমা আবার ডাকল পেছন থেকে। "জেনারেটর কিন্তু ন'টায় বন্ধ হয়ে যায়, খেয়াল রাখিস। অন্ধকারের মধ্যে মুশকিলে পড়বি না হলে।"

ফকির

লঞ্চের শব্দটা দূরে মিলিয়ে যেতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল পিয়া। বিপদ কেটে যাওয়ার পর এতক্ষণে ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে এল পেশিগুলো, মারাত্মক ধকলটা যেন শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে টের পাওয়া গেল। হঠাৎ হাত-পাগুলি কঁপতে শুরু করল, থুতনিটা বার বার ঠকঠক করে এসে ধাক্কা খেতে লাগল হাঁটুর ওপরে। মুহূর্তের মধ্যে এমন একটা কাঁপুনি এল সারা শরীরে যে গোটা ডিঙিটা দুলতে লাগল, ছোট ছোট ঢেউ ছড়িয়ে গেল নদীর জলে।

কার যেন একটা ছোঁয়া লাগল কাঁধের কাছে। পাশ ফিরে তাকিয়ে পিয়া দেখল বাচ্চা ছেলেটা, ওর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। পেছন থেকে পিয়ার গলা জড়িয়ে ধরল বাচ্চাটা, নিজের গায়ের ওম দিয়ে ওর শরীরে তাপ দিতে লাগল। স্বস্তিতে, আরামে চোখ বন্ধ হয়ে এল পিয়ার। দাঁতের খটখট বাজনা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আর চোখ খুলল না ও।

চোখ মেলেই দেখল ওর সামনে উবু হয়ে বসে আছে জেলেটা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে ওর মুখ, চোখে চিন্তার ছাপ। পিয়ার শরীরের কাঁপুনি থেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে লোকটার চেহারাতেও আস্তে আস্তে স্বস্তি ফিরে এল। একটা হাসির আভাসও দেখা গেল ঠোঁটের কোনায়। বুকের ওপর একটা আঙুল রেখে ও বলল, "ফকির"। ওর নাম। পিয়াও নিজের দিকে দেখিয়ে বলল, "পিয়া"। মাথা নাড়ল ফকির। বুঝতে পেরেছে। এবার বাচ্চাটার দিকে ইশারা করে বলল, "টুটুল"। তারপর আঙুল দিয়ে একবার বাচ্চাটার দিকে আর একবার নিজের দিকে দেখাতে লাগল। পিয়া বুঝতে পারল ওরা বাপ আর ছেলে।

"টুটুল।"

বাচ্চাটার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল পিয়া। যা মনে হচ্ছিল ওর বয়স আসলে তার থেকেও কম। খুব বেশি হলে বছর পাঁচেক হবে। এই নভেম্বরের ঠান্ডায় শুধু টিঙটিঙে পাতলা একটা সোয়েটার পরে রয়েছে ছেলেটা। আর একটা বেটপ রং-জ্বলা হাফপ্যান্ট। নিশ্চয়ই কারও পুরনো স্কুলের পোশাক হবে। বাচ্চাটার হাতে ওটা কী? তুলে দেখাল–পিয়ার ডিসপ্লে কার্ডটা। কোথা থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে কে জানে। ওটা যে আবার ফিরে পাওয়া যাবে ভাবেইনি পিয়া। একটা ট্রের মতো করে ধরে ওটা পিয়ার সামনে নিয়ে এল ছেলেটা। তারপরে ওর আঙুলগুলো ধরে আলতো একটা চাপ দিল, যেন বলতে চাইছে "ভয় পেয়োনা, আমি তো আছি।"

কিন্তু বাচ্চাটার আশ্বাসে উলটো প্রতিক্রিয়া হল পিয়ার ওপর। আচমকা ওর নিজেকে খুব অসহায় মনে হল। একেবারেই নতুন এই অনুভূতি পিয়ার। এর আগে বহুবার ও একা একা জলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে, অনেক সময়ই একেবারে অচেনা লোকেদের সাথেও ঘুরেছে, কিন্তু আজকে ওই ফরেস্ট গার্ড আর মেজদার ব্যবহারে আত্মবিশ্বাস একটু চিড় খেয়ে গেছে পিয়ার। এখনও ওর মনে হচ্ছে ও যেন আস্তে আস্তে একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে থেকে জেগে উঠছে, যেন এই মাত্র কয়েকটা হিংস্র পশুর হাত থেকে কোনও রকমে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে। সত্যিই, এই ডিঙিতে বাচ্চাটা আছে বলে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করল পিয়া।

তা না হলে আগেকার মতো সম্পূর্ণ অচেনা একটা লোকের ওপর কিছুতেই হয়তো আর ভরসা রাখতে পারত না। এক হিসাবে দেখতে গেলে তো বাচ্চাটা সত্যিই ওর রক্ষাকর্তা এখন। হঠাৎ কী রকম একটা মমতা-মাখা কৃতজ্ঞতায় বুকটা ভরে গেল পিয়ার। ওর স্বভাবের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না ব্যাপারটা, কিন্তু এখন এই টলমলে নৌকোর ওপর পিয়ার আবেগ আর বাঁধ মানল না–দু'হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটাকে ও বুকে টেনে নিল।

আদর শেষে হাত আলগা করতে গিয়ে পিয়া লক্ষ করল ছেলেটা একদৃষ্টে ওর হাতের দিকে তাকিয়ে আছে। নজর পড়তে দেখল মানিব্যাগটা এখনও দু আঙুলের ফাঁকে ধরা। হঠাৎ নিজেকে একটু অপরাধী মনে হল পিয়ার, মনে পড়ল জেলেটার সঙ্গে এখনও টাকাপয়সার ব্যাপারে কোনও কথাই বলা হয়নি। মানিব্যাগ থেকে একতাড়া টাকা নিয়ে পাতলা একটা গুছি আলাদা করে বের করল ও। টাকাটা গুনতে গুনতেই মনে হল ওরা বাপ-

ব্যাটা দু'জনে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মুখ তুলে দেখল ওদের নজর যেন আঠার মতো আটকে গেছে ওর হাতের সঙ্গে, স্তব্ধ বিস্ময়ে ওরা লক্ষ করছে ওর আঙুলের প্রতিটি নড়াচড়া যেন কোনও মায়াবিনীর হাতের জাদু। লোভ কিন্তু নয়, এমন একটা মুগ্ধতা ছিল ওদের দৃষ্টিতে যে পিয়া বুঝতে পারল জীবনে এই প্রথম ওরা এত টাকা একসঙ্গে দেখছে। এতগুলো কড়কড়ে নোট এত কাছ থেকে দেখার ভাগ্য ওদের আগে কখনও হয়নি। কিন্তু ওর জন্যেই যে ওগুলো গুনছে পিয়া সেটা মনে হল ফকিরের কল্পনায়ও আসেনি। গোনা শেষ করে টাকাটা এগিয়ে দিতেই অপরাধীর মতো কুঁকড়ে গেল ফকির, যেন পিয়া কোনও নিষিদ্ধ জিনিস ওর হাতে তুলে দিতে চাইছে।

মাত্র তো কয়েকটা টাকা, দু'কাপ কফি আর স্যান্ডউইচের জন্যেও পিয়া অনেক সময় এর থেকে বেশি খরচ করেছে। আর রিসার্চ গ্রান্ট হিসেবে যে পয়সা পাওয়া যায় তাতে বেহিসেবি হওয়ার সুযোগও বিশেষ মেলে না। এই সামান্য ক'টা টাকা ওদের প্রাপ্য বলেই ওর মনে হয়েছিল। লোকটার পরনে যদি কোনও জামা থাকত পিয়া ওর পকেটেই খুঁজে দিতে পারত টাকাগুলো, কিন্তু কোমরে জড়ানো ওই ভেজা টুকরো কাপড়টা ছাড়া আর কিছুই নেই ওর গায়ে। অবশ্য একটা মাদুলি বাঁধা আছে এক হাতে। উপায়ান্তর না দেখে ওই মাদুলির সুতোটার মধ্যেই পিয়া টাকা ক'টা মুড়িয়ে খুঁজে দিল। লোকটার সারা গায়ে ঘামাচির মতো কাটা দিয়ে উঠল। সে ওর হাতের ছোঁয়ায়, নাকি এই নভেম্বরের সন্ধ্যার হাওয়ায়, সেটা বুঝতে পারল না পিয়া।

মাদুলির বাঁধন থেকে টাকাটা বার করে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল ফকির। এতগুলো টাকা নিজের হাতে ধরে আছে সেটা যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না ওর। মুখের সামনে থেকে একটু দূরে রেখে নোটগুলো নিরীক্ষণ করতে লাগল ও। অবশেষে লঞ্চটা যেদিকে গেছে সেদিকে ইশারা করে একটা মাত্র নোট আলাদা করে নিল। পিয়া বুঝতে পারল ও আসলে বলতে চাইছে যে লঞ্চের লোকগুলো তো এই ক'টা টাকাই নিয়ে গেছে, তাই এর থেকে বেশি ও নেবে না। আলাদা করে রাখা নোটটা ছেলের হাতে দিতেই সে দৌড়ে চলে গেল ছইয়ের মধ্যে ওটাকে লুকিয়ে রাখতে।

বাকি টাকাগুলো পিয়াকে ফেরত দিয়ে দিল ফকির। প্রতিবাদের চেষ্টা করতেই দিগন্তের দিকে হাত তুলে হড়বড় করে একটানা অনেক কথা বলে গেল। তার মধ্যে শুধু লুসিবাড়ি' শব্দটা পিয়ার কানে চেনা ঠেকল। মোটের ওপর বোঝা গেল লুসিবাড়ি পৌঁছানো পর্যন্ত এই দেনাপাওনার ব্যাপারটা স্থগিত রাখতে চায় ও। আপাতত সেই ব্যবস্থাতেই সম্মত হল পিয়া।

চিঠি

গেস্ট হাউসটা দোতলায়। পুরো দোতলাটা জুড়েই। সরু একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। সব মিলিয়ে চারটে ঘর, হুবহু এক ভাবে সাজানো—দুটো সিঙ্গল খাট, একটা ডেস্ক আর-একটা চেয়ার। ঘরগুলোর সামনে দিয়ে টানা একটা জায়গা। তার খানিকটা বারান্দা, খানিকটা ডাইনিং রুম, আর একদিকে রান্না-বান্নার ব্যবস্থা। বারান্দার শেষপ্রান্তে একটা বাথরুম, শাওয়ার লাগানো। গোটা বাড়িটায় এটুকুই যা বিলাসিতার ছোঁয়া। বাথরুমটা দেখে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল কানাই। পুকুরে গিয়ে স্নান করতে হবে ভেবে ও একটু ভয়ে ভয়েই ছিল এতক্ষণ।

ডাইনিং টেবিলের ওপর ঝকঝকে স্টেনলেস স্টিলের একটা টিফিন ক্যারিয়ার। ওর রাতের খাবার, কানাই আন্দাজ করল। নিজের সংসারের সব দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও ময়না খাবারটা রেখে যেতে ভোলেনি। ঘুরে ফিরে দেখে একটা ঘরে ওর সুটকেসটা রাখল কানাই। ওরই জন্যে মনে হয় গুছিয়ে গাছিয়ে রাখা হয়েছে ঘরটা। তারপর ধীরে সুস্থে সিঁড়ির দিকে এগোল।

ছাদের ওপর উঠে এসে চোখ জুড়িয়ে গেল কানাইয়ের। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সারা আকাশ লালে লাল। ভাটা পড়ে গেছে অনেকক্ষণ, দ্বীপগুলো জলের অনেক ওপরে মাথা তুলে জেগে রয়েছে। নীচে নদীর জলেও যেন লাল আবির ছড়িয়ে রয়েছে। ছাদটায় এক চক্কর মেরে কানাই দেখল এদিকে ওদিকে সব মিলিয়ে অন্তত গোটা ছয়েক দ্বীপ দেখা যাচ্ছে কাছাকাছি। আর আটটা নদী’। লুসিবাড়ির দক্ষিণে আর কোনও দ্বীপেই জনবসতি নেই। খেত-জমি বাড়ি-ঘরেরও তাই কোনও চিহ্ন নেই। গভীর ম্যানগ্রোভের জঙ্গলে ঢাকা দ্বীপগুলো।

ছাদের একধারে একটা লম্বাটে টিনের চালাঘর। দরজায় তালা আঁটা। এটাই তা হলে মেশোর পড়াশোনার ঘর ছিল। নীলিমার দেওয়া চাবিটা দিয়ে তালাটা খুলল কানাই। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। মুখোমুখি উলটোদিকের দেওয়াল ভর্তি তাক, কাগজ আর বইপত্রে ঠাসা। একটাই মাত্র জানালা ঘরটার পশ্চিম দিকে। সেটা খুলে দিল কানাই। এখান থেকে রায়মঙ্গলের মোহনাটা দেখা যায়। জানালার ঠিক নীচে ডেস্ক। তার ওপর একটা দোয়াত, কয়েকটা কালির কলম, একটা পুরনো ধাঁচের অর্ধগোলাকার ব্লটার সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা। মনে হচ্ছে যেন কাছেই কোথাও গেছে নির্মল, একটু পরেই ফিরে এসে কাজে বসবে। ব্লটারটার নীচে বেশ বড়সড় একটা বন্ধ খাম, কানাইয়ের নাম লেখা। খামটা কয়েকপ্রস্থ প্লাস্টিকে মোড়া। সেগুলোকে আবার গঁদের আঠা দিয়ে জোড়া হয়েছে। তার ওপর বোধহয় কোনও নোটবই থেকে ছেঁড়া টুকরো একটা কাগজে কুড়ি বছর আগের নির্মলের হাতে লেখা কানাইয়ের নাম ঠিকানা। দু’আঙুলে চাপ দিয়ে বুঝতে পারল না কানাই ভেতরে কী আছে। কী করে প্যাকেটটা খোলা যাবে সেটাও কিছু বোঝা গেল না। প্লাস্টিকের পরতগুলো একেবারে গায়ে গায়ে সেঁটে গেছে মনে হচ্ছে। চারদিকে তাকিয়ে জানালার তাকের ওপর আধখানা দাড়ি কামানোর ব্লেড দেখতে পেল কানাই। সেটা নিয়ে এসে সাবধানে খামটার একদিকে কাটতে শুরু করল। বেশ কয়েক পরত কেটে ফেলার পর প্যাকেটটার ভেতরের বস্তুটা নজরে এল। একটা বাঁধানো খাতা। পাখির বাসার মধ্যে ডিমের মতো সযত্নে রাখা। একটু আশ্চর্য হল কানাই। ও ভেবেছিল হয়তো এক গোছা খোলা পাতা থাকবে, কবিতা বা প্রবন্ধ লেখা। একটা গোটা বাঁধানো খাতা ঠিক আশা করেনি। কয়েকটা পাতা উলটে পালটে দেখল। ঘন করে বাংলায় লেখা। জায়গা বাঁচানোর জন্য এত ছোট ছোট করে লেখা হয়েছে যে প্রায় গায়ে গায়ে লেগে গেছে লাইনগুলো। হাতের লেখাও ট্যারাবাকা, দেখেই মনে হয় খুব তাড়াহুড়ো করে লেখা হয়েছে। কাটাকুটিতে ভর্তি সমস্ত খাতাটা, একেকটা লাইন মার্জিনের বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। এতগুলি প্লাস্টিকের মোড়কের মধ্যে রাখা সত্ত্বেও ছোপ ছোপ ড্যাম্প ধরে গেছে মাঝে মাঝে। কয়েক জায়গায় তো লেখা এমন ঝাপসা হয়ে গেছে

যে প্রায় পড়াই যায় না।

লেখাটার প্রথম কয়েকটা শব্দ খুবই অস্পষ্ট। খাতাটা প্রায় নাকের কাছে নিয়ে এসে সেগুলো পাঠোদ্ধার করতে হল। প্রথম পাতার একেবারে ওপরে বাঁদিকে তারিখ আর সময় ইংরাজিতে লেখা : May 15, 1979, 5.30 a.m. তার ঠিক নীচে কানাইয়ের নাম। বিশেষ কোনও সম্ভাষণ দিয়ে শুরু না হলেও, পড়তে শুরু করলেই বোঝা যায় এটা আসলে কানাইয়ের জন্যই লেখা লম্বা একটা চিঠি।

প্রথম কয়েকটা লাইন পড়তেই সে ব্যাপারে নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে গেল কানাই : "এ লেখাটা আমি এমন একটা জায়গায় বসে লিখছি যে জায়গার নাম তুমি হয়তো শোনেইনি। ভাটির দেশের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তের এই দ্বীপের নাম মরিচঝাঁপি.."

খাতা থেকে মুখ তুলে নামটা নিয়ে মনের মধ্যে কয়েকবার নাড়াচাড়া করল কানাই। অভ্যাসের বশেই প্রায় শব্দটার একটা মানেও চলে এল মনে : 'লঙ্কার দ্বীপ।

আবার খাতার দিকে মন দিল ও :

"ঘড়ির কাটা যেন আর ঘুরতেই চাইছে না। অজানা এক ভয়ংকরের আশঙ্কায় কাটছে প্রতিটা মুহূর্ত। মনে হচ্ছে যেন খানিক বাদেই এসে আছড়ে পড়বে প্রচণ্ড সাইক্লোন, আমরা সবাই যেন তার অপেক্ষায় গুটিসুটি মেরে ঘরের ভেতরে বসে আছি। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। একেকটা সেকেন্ড মনে হচ্ছে একেকটা যুগ। বাতাসও যেন গম্ভীর, স্থির হয়ে আছে। সময় যেন নিথর হয়ে গেছে ভয়ের ধাক্কায়।

অন্য কোনও পরিস্থিতিতে হলে হয়তো এরকম ক্ষেত্রে আমি কিছু একটা পড়ার চেষ্টা করতাম। কিন্তু এখন এই খাতা, ডটপেন আর রিলকের দুইনো এলিজির ইংরাজি আর বাংলা অনুবাদগুলো ছাড়া আর কিছুই নেই আমার সঙ্গে। এমনিতেও অবশ্য খানিকক্ষণ আগে পর্যন্ত কিছুই পড়া সম্ভব ছিল না। কারণ এইমাত্র ভোরের আলো ফুটছে, আর আমি বসে আছি একটা ঘঁচের বেড়ার ঘরে, যেখানে একটা মোমবাতি পর্যন্ত নেই। ছাঁচের বেড়ার ফাঁক দিয়ে সামনে গারল নদী দেখা যাচ্ছে। সবে মাত্র সূর্য উঠতে শুরু করেছে, আর তার সঙ্গে যেন পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নদীর জল। জোয়ার আসছে। আশেপাশের দ্বীপগুলো তলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। খানিক পরেই মেরু সমুদ্রের আইসবার্গের মতো ওগুলোর বেশিরভাগটাই চলে যাবে জলের নীচে। শুধু সবচেয়ে উঁচু গাছের চুড়াগুলো জেগে থাকবে নদীর ওপর। এখনই দ্বীপের ধারের চর আর জালের মতো ঠেসমূলগুলোর ওপর দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে—শেকড়-বাকরগুলি জলের নীচে কেমন একটা ঝাপসা ভূতুড়ে চেহারা নিয়েছে মনে হচ্ছে যেন ওগুলো কোনও সামুদ্রিক আগাছা, থিরথির করে কাঁপছে স্রোতের টানে। একটু দূরে একঝাক বক উড়ে যাচ্ছে জলের ঠিক ওপর দিয়ে। জোয়ার আসছে, তাই ডুবন্ত দ্বীপগুলোর থেকে দূরে কোনও নিশ্চিন্ত আস্তানার খোঁজে যাচ্ছে ওরা। ভোর হচ্ছে, ভাটির দেশের মিষ্টি সুন্দর ভোর।

যে ঘরটায় আমি এখন বসে আছি সেটা আসলে আমার ঘর নয়। আমি এখানে অতিথি। এ ঘরের মালকিনকে তুমি চেন—কুসুম। প্রায় বছরখানেক হল ও ছেলেকে নিয়ে এখানে আছে। আচ্ছা, এই এক বছর রোজই তো ঘুম ভেঙে উঠে ওরা এই রকম ভোর দেখেছে—কুসুম আর ফকির। কেমন লেগেছে ওদের? ওদের প্রতিদিনের জীবন-যাপনের যন্ত্রণায় কতটুকু শান্তির প্রলেপ দিতে পেরেছে এই ভোর? কে বলতে পারে? এখন, এই অন্তহীন অপেক্ষার সময়, আমার শুধু কবির কথাগুলোই মনে পড়ছে:

'সৌন্দর্য আর-কিছু নয়, শুধু সেই আতঙ্কের আরম্ভ, যা অতি কষ্টে আমাদের পক্ষে নয় এখনো অসহনীয়। আরাধ্য সে আমাদের, যেহেতু সে শান্ত উপেক্ষায় তার সাধ্য সংহার হানে না।'

কাল সারারাত ধরে আমি নিজেকে প্রশ্ন করেছি, কাকে ভয় পাচ্ছি আমি? কীসের ভয়? আজ, এই সূর্যোদয়ের সময় আমি সে প্রশ্নের উত্তর পেলাম। আমি ভয় পাচ্ছি কারণ আমি জানি এই ঝড় কেটে গেলে তার আগের কথা কেউ আর মনে রাখবে না। এই ভাটির দেশের

পলি কত তাড়াতাড়ি অতীতকে ঢেকে দেয় তা আমার চেয়ে ভাল তো আর কেউ জানে না।

যে অনাগত ভয়ংকরের অপেক্ষায় আমরা এখানে প্রহর গুনছি, তাকে বাধা দেওয়ার মতো শক্তি আমার নেই। কিন্তু এক সময় তো আমি সাহিত্যচর্চা করেছি। যা এখানে ঘটছে, ঘটতে চলেছে, তার কিছুটা তো আমি লিখে রেখে যেতে পারি। একটু তো অন্তত দাগ রেখে যেতে পারি মহাকালের স্মৃতির পাতায়। এই ভাবনা আর এই ভয়ই আমাকে দিয়ে আজ এক অসাধ্য সাধন করিয়ে নিল–তিরিশ বছর পর কলম ধরিয়ে ছাড়ল আমাকে।

জানি না কতটা সময় আমার হাতে আছে। হয়তো শুধু আজকের দিনটাই। তার মধ্যেই আমি চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব লিখে রেখে যেতে যদি কোনওদিন তোমার হাতে গিয়ে পৌঁছয় এ লেখা। তুমি হয়তো ভাববে, এত লোক থাকতে তোমার জন্যই কেন লিখছি। কারণ হিসাবে এটুকুই আমি বলতে পারি যে এ গল্প আসলে আমার গল্প নয়। যাকে নিয়ে এই লেখা, লুসিবাড়িতে থাকার দিনগুলিতে সেই ছিল তোমার একমাত্র সঙ্গী। সে হল কুসুম। আমার জন্য না হলেও, কুসুমের কথা মনে করে অন্তত লেখাটা পড়ো।”

ডিঙিতে

ফকিরের নৌকোটা লম্বায় প্রায় মিটার পাঁচেক হলেও খুব একটা চওড়া নয়। এমনকী ঠিক মাঝখানটাতেও দু'জনের বেশি লোকের পাশাপাশি বসার জায়গা নেই। ডিঙিটাকে পিয়ার মনে হল ঠিক যেন একটা বস্তিবাড়ির ভাসমান সংস্করণ—ছেঁচা বাঁশ, টুকরো-টাকরা কাঠ আর ভেঁড়াখোঁড়া পলিথিন দিয়ে কোনও রকমে জোড়াতাড়া দেওয়া। নৌকোর বাইরের দিকের তক্তাগুলোতেও কোনওকালে পালিশ পড়েছে বলে মনে হয় না, ফঁক-ফোকরগুলো আলকাতরা দিয়ে বোজানো; যাতে জল চুঁইয়ে না ঢুকতে পারে। ডিঙির ওপরে কতগুলো পুরনো চায়ের পেটির প্লাইউড পাতা, কয়েকটাতে চা কোম্পানির নামটা এখনও পড়া যায়। পেরেক-টেরেকেরও কোনও বালাই নেই, তক্তাগুলি স্রেফ একটা তাকের মতো কাঠের ওপর পর পর রাখা। ইচ্ছে করলেই এদিক সেদিক নাড়াচাড়া করা যায়। নীচের গোল মতো অংশটায় জিনিসপত্র রাখার জায়গা। ডিঙির সামনের দিকে কোনাচে জায়গাটায় কিছু বুনো ঘাস আর জংলা গাছের ডালপালা জড়ো করা, কয়েকটা কাঁকড়া সেগুলোর মধ্যে নড়াচড়া করছে। এখানেই রাখা থাকে ফকিরের সারাদিনের শিকার। ডালপালা আর ঘাসগুলো দিয়ে জায়গাটাকে স্যাঁতস্যাঁতে রাখা হয়েছে। ওগুলো না থাকলে কাঁকড়াগুলো বোধহয় নিজেদের মধ্যে ছেঁড়াছিঁড়ি শুরু করে দিত।

নৌকোর ছইটাও তৈরি করা হয়েছে হেঁচা বাঁশ, কঞ্চি আর বাখারি দিয়ে। ছোট্ট ছইটা, কোনওরকমে দুটো লোক তার মধ্যে রোদ-বৃষ্টি থেকে মাথা আড়াল করতে পারে। জল আটকানোর জন্য ভেতরে আবার একটা ধূসর ছিট ছিট প্লাস্টিক দেওয়া। সেটার ওপরের লেখাগুলো চেনা লাগল পিয়ার—ওটা আসলে একটা ছেঁড়া মেলব্যাগ। ও নিজেই কতবার এরকম ব্যাগ ব্যবহার করেছে আমেরিকা থেকে চিঠিপত্র পাঠানোর জন্য। ডিঙির একেবারে পেছনের দিকে, বাঁকানো ল্যাজের মতো অংশটা আর ছইয়ের মাঝে ছোট একটা প্ল্যাটফর্ম মতো করা। পোড়া দাগ ধরা একটা তক্তা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে সেটা। ছইয়ের ভেতরে তক্তার নীচে আরও একটা খোপ। সেটাই এই নৌকোর ভাড়ার। জায়গাটা কাঠের দেওয়াল দিয়ে আলাদা করা। নীল একটা পলিথিন যেমন তেমন ভাবে পাতা আছে জল আটকানোর জন্য। ভেতরটায় সুন্দর করে গোছানো আছে কিছু শুকনো জামাকাপড়, রান্নার বাসনপত্র, সামান্য কিছু খাবার-দাবার আর খাওয়ার জল। খুপরিটার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা ভজ করা কাপড় বের করে আনল ফকির। ভাঁজ খুলতে দেখা গেল সেটা একটা শস্তার ছাপা শাড়ি।

এর পর যা ঘটতে লাগল তাতে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল পিয়া। প্রথমে টুটুলকে নৌকোর সামনের দিকে পাঠিয়ে দিল ফকির। তারপর পিয়ার ব্যাগগুলো ঠেসেটুসে ঢোকাল ছইয়ের মধ্যে। এবার নিজে বেরিয়ে এসে পিয়াকে ভেতরে যেতে ইশারা করল। পিয়া কোনওরকমে গুঁড়িসুড়ি মেরে ঢুকে যাওয়ার পর ছইয়ের সামনের দিকে পর্দার মতো শাড়িটাকে টাঙিয়ে দিল ফকির।

ব্যাপারটা মাথায় ঢুকতে বেশ খানিকক্ষণ লাগল পিয়ার। আসলে ওর জন্য একটা ঘেরা জায়গা বানিয়ে দিয়েছে ফকির, একটা আড়াল করে দিয়েছে, যাতে ও নিশ্চিন্তে ভেজা জামাকাপড় পালটে নিতে পারে। এতক্ষণে একটু অস্বস্তি হল পিয়ার। ওর নিজের সংকোচ হওয়ার আগেই ফকিরই চিন্তা করেছে কী করে ও আড়াল রেখে জামাকাপড় পালটাবে। একটু হাসিও এল ঠোঁটের কোনায়, কারণ ছাত্র অবস্থায় তো ওকে অনেক বছরই ছেলেদের সঙ্গে এক ডর্মিটরিতে থাকতে হয়েছে, এমনকী এক বাথরুম শেয়ার করতে হয়েছে। কাজের প্রয়োজনেও পুরুষদের সঙ্গে এক বাড়িতে কাটাতে হয়েছে অনেক সময়। তা সত্ত্বেও ফকিরের এই আচরণ পিয়ার মনকে কোথাও একটা ছুঁয়ে গেল। ফকির যে ওকে শুধু জামাকাপড় পালটানোর জন্যে একটা জায়গা করে দিয়েছে তা তো নয়, সাথে সাথে একটা সহজ সামাজিকতায় ওকে গ্রহণ করেছে, কথা না বলতে পারলেও বুঝিয়ে দিয়েছে পিয়া কেবল নামহীন ভাষাহীন কোনও বিদেশি নয়, সুন্দরবনের এই জেলের কাছে ও আপন

লোক। কিন্তু ফকিরের মতো একজন মানুষ, যে হয়তো এর আগে কোনও বিদেশির এত কাছাকাছি আসেইনি, তার পক্ষে এটা সম্ভব হল কী করে?

জামাকাপড় বদলানো হয়ে যাওয়ার পর শাড়িটাকে হাত দিয়ে একবার ছুঁয়ে দেখল পিয়া। বহুদিন ধোপ খেয়ে খেয়ে পাতলা আর নরম হয়ে এসেছে কাপড়টা। ঠিক এইরকম শাড়ি পরত পিয়ার মা, ওদের আমেরিকার বাড়িতে। এই রকম নরম, কোঁচকানো, ব্যবহারে ব্যবহারে পাতলা হয়ে আসা সেই শাড়ির ছোঁয়া এখনও ওর স্মৃতিতে লেগে আছে। মাঝে মাঝে খুব রাগও হত মায়ের ওপর। মনে হত সব সময় এই রকম রং-জ্বলা পুরনো একটা কাপড় পরে থাকলে ওর বন্ধুরা কী ভাববে? ওরা হয়তো মনে করবে পিয়ার মা জামাকাপড় পরে না, একটা বিছানার চাদর গায়ে জড়িয়ে থাকে।

কিন্তু এই শাড়িটা কার? ওর বউয়ের? বাচ্চাটার মা-র? দু'জনে কি একই লোক? প্রশ্নগুলো মনে আসছিল বটে, কিন্তু উত্তর জানার কোনও উপায় নেই বলে যে খুব একটা আফশোস হচ্ছিল পিয়ার, তাও ঠিক নয়। একদিক থেকে বাঁচোয়া; একটা মানুষের জীবনের খুঁটিনাটি জানার সাথে সাথে কিছু দায়িত্বও তো চলে আসে। তার থেকে অন্তত অব্যাহতি পাওয়া গেল।

ছইয়ের ভেতর থেকে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে এল পিয়া। নৌকোর নোঙর তোলা হয়ে গেছে, দাঁড় হাতে তুলে নিয়েছে ফকির। ওরও স্নান সারা হয়ে গেছে। চুল-টুল আঁচড়ে একেবারে ফিট বাবুটি হয়ে গেছে এর মধ্যে। মাঝখানে সিঁথি কাটা, চুলগুলি পেতে আছে মাথার ওপর। মুখে গলায় নুনের গুঁড়োগুলো না থাকায় খুব ছেলেমানুষ মনে হচ্ছিল ফকিরকে, এক্কেবারে একটা কলেজ-পালানো দুষ্টু ছেলের মতো লাগছিল। স্নান করে জামাকাপড়ও পালটে নিয়েছে ও। একটা ঘিয়ে রঙের টি শার্ট গায়ে দিয়েছে, পরনে একটা কাঁচা লুঙ্গি। দূরবিন দিয়ে পিয়া ওকে যে লুঙ্গিটা পরে থাকতে দেখেছিল সেটা আপাতত মেলা আছে ছইয়ের ওপর।

সূর্য এর মধ্যে পাটে বসেছে। দিগন্ত থেকে যেন একটা রঙের ধূমকেতু ছিটকে উঠে ডুব দিয়েছে ঠিক মোহনার মাঝখানে। একটু পরেই রাত নামবে, রাত কাটানোর মতো একটা কোনও জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে হবে তার মধ্যে। দিনের আলোতেই এই নদী-খাঁড়ির ভুলভুলাইয়ায় পথ খুঁজে পাওয়া কঠিন, রাতের অন্ধকারে এইটুকু ডিঙি নিয়ে তো দিশাহারা হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। তবে ফকির নিশ্চয়ই কোনও একটা নিরাপদ জায়গার কথা মনে মনে ভেবে রেখেছে। এখন যত তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে পৌঁছনো যায় ততই মঙ্গল।

নৌকো চলতে শুরু করার পর উঠে দাঁড়াল পিয়া, দূরবিন চোখে তুলে নিয়ে কাজ শুরু করল ফের। জরুরি সব যন্ত্রপাতি সঙ্গেই আছে, কোমরের বেল্টের সাথে লাগানো। দূরবিনে চোখ রাখতেই মনে হল যেন স্নিগ্ধ বৃষ্টি এসে ধুয়ে দিল চারপাশের দৃশ্যপট, চেনা কাজের ছন্দে মনের অস্থিরতা কমে এল ধীরে ধীরে। দূরবিন চোখে ঘড়ির কাটার মতো নদীর দিকে নজর রাখছিল পিয়া, আস্তে আস্তে ঘাড় ঘোরাচ্ছিল—ডানদিক থেকে বাঁদিক, বাঁদিক থেকে ডানদিক, যেন কোনও বাতিঘরের সিগনাল, আলো দেখিয়ে যাচ্ছে যন্ত্রের মতো। নৌকোর দুলুনিতে কোনও অসুবিধাই হচ্ছিল না ওর। এত বছরের চর্চায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে ওর শরীর, অভ্যাসগত প্রতিবর্তে জলের দোলার সাথে সাথে এখন সংকুচিত প্রসারিত হয় হাঁটুর পেশি। ভারসাম্য রাখার জন্য আর আলাদা করে চেষ্টা করতে হয় না।

ওর কাজের এই ব্যাপারটাই পিয়ার সবচেয়ে পছন্দের : সারাক্ষণ ভেসে ভেসে বেড়ানো, মুখে জোলো বাতাসের ঝাঁপটা, সতর্ক চোখ নদীর দিকে, আর হাতের কাছে সব জরুরি জিনিসপত্র যা যা দরকার। পিয়ার কোমরে সবসময় বাঁধা থাকে পর্বতারোহীদের বেল্ট, ক্লিপবোর্ড থেকে শুরু করে ছোটখাটো যন্ত্রপাতি সব হুকের সঙ্গে ঝোলানো। সবচেয়ে দরকারি যে যন্ত্রটা ও কখনও কাছছাড়া করে না সেটা হল ছোট্ট একটা হাতে-ধরা মনিটর। গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমে যে-কোনও জায়গায় নিজের নির্ভুল অবস্থান জানা যায় এটা দিয়ে। পিয়া যখন চোখে দূরবিন এঁটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুশুক খুঁজতে থাকে, তখন নিখুঁতভাবে এই যন্ত্র রেকর্ড করে যায় ওর পথ, প্রতিটি সেকেন্ডের, প্রতিটি মিটারের হিসেব

রেখে চলে। এমনকী খোলা সমুদ্রেও এটার সাহায্যে অভ্রান্ত ভাবে দিক নির্ণয় করা যায়। হয়তো কোনও একদিন কোনও এক সময় এক জায়গায় একটা শুশুকের পাখনার একটু আভাস দেখা গিয়েছিল, প্রয়োজন হলে ঠিক সেই বিন্দুতে আবার ফিরে আসা যায় যদি এই যন্ত্র হাতে থাকে।

এই জিপিএস মনিটর ছাড়াও পিয়ার সঙ্গে আছে একটা রেঞ্জফাইন্ডার আর একটা ডেস্থ সাউন্ডার। প্রথম যন্ত্রটা দিয়ে কোনও বস্তুর দূরত্ব মাপা যায়, আর দ্বিতীয়টা কাজে লাগে জলের গভীরতা মাপতে। এই সব ক'টা যন্ত্রই পিয়ার কাজের জন্য খুব জরুরি, কিন্তু সবচেয়ে দরকারি হল ওর গলায় ঝোলানো ওই দূরবিন। ওটা কিনতে গিয়ে প্রায় ফতুর হয়ে গিয়েছিল পিয়া, কিন্তু তাতে ওর কোনও দুঃখ নেই। কারণ দূরবিন ছাড়া এ ধরনের রিসার্চ একেবারেই কানা। বহু বছরের ব্যবহারে যন্ত্রটার বাইরের ঔজ্জ্বল্য কমেছে, লেন্সের ঢাকনাগুলো রোদে আর নুনের গুঁড়োর আঁচড়ে আঁচড়ে ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে এসেছে, কিন্তু জলনিরোধক আবরণ যেটা আছে সেটা খুবই কাজের। এই ছয় বছর ধরে একটানা ব্যবহার করার পরেও তাই একেবারে ঠিকঠাক কাজ করে যাচ্ছে পিয়ার এই বিশ্বস্ত দূরবিন। শক্তিশালী লেন্সগুলো এখনও বহুদূরের জিনিসকে যেন নাকের কাছে নিয়ে চলে আসে। ডানদিকের আইপিসটার সঙ্গে আবার একটা কম্পাস লাগানো আছে। ফলে দূরবিনটা চোখ থেকে না নামিয়েই দৃষ্টিপথ ঠিক রাখতে পারে পিয়া, জলের দিকে নজর রাখতে পারে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে নিখুঁত অর্ধবৃত্ত। ১৮০ ডিগ্রি। বেশিও নয়, কমও নয়। এটা যখন কিনেছিল তখন ও সদ্য ক্যালিফোর্নিয়ার স্ক্রিপস ইন্সটিটিউশন অব ওশ্যেনোগ্রাফিতে ভর্তি হয়েছে গ্র্যাজুয়েশন করতে। খুব জোর হলে বছর খানেক হয়েছে। সে ভাবে বলতে গেলে সে সময় এরকম একটা দূরবিনের দরকারই ছিল না ওর। তবে পিয়ার মনে কোনও দ্বিধা ছিল না। পড়াশোনা শেষ হলে কী করবে সেটা তখন থেকেই মনে মনে ও স্থির করে নিয়েছিল। দুরবিন কেনার কথা মনে হতে তাই বাজারের সেরাটাই কেনার ইচ্ছে হয়েছিল ওর। বেশ কিছুদিন ধরে বহু ক্যাটালগ ঘেঁটেঘুঁটে অবশেষে মানি অর্ডার করেছিল কোম্পানিতে।

প্যাকেটটা যখন এসে পৌঁছল সেটার ওজন দেখে বেশ একটু ঘাবড়েই গিয়েছিল পিয়া। সে সময়ে ও যেই ঘরটায় থাকত সেটা ছিল ইউনিভার্সিটির রাস্তার একেবারে পাশে। বইখাতা হাতে ছাত্রছাত্রীরা সব সময় সেখান দিয়ে যাতায়াত করছে। দূরবিনটা নীচের দিকে তাক করে ও ছেলেমেয়েগুলোর মুখ, ওদের হাতের বইপত্র দেখার চেষ্টা করছিল। অত উঁচু থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল প্রতিটা লোককে। এমনকী বইয়ের মলাটের লেখা, খবরের কাগজের হেডলাইনগুলো পর্যন্ত পরিষ্কার পড়া যাচ্ছিল। কিন্তু দূরবিনটা ঘুরিয়ে অন্যদিকে দেখতে গিয়ে বোঝা গেল যতটা সহজ মনে হয়েছিল আসলে ততটা সহজ নয় ব্যাপারটা। এ যন্ত্র হাতে একশো আশি ডিগ্রি পর্যন্ত ঘুরে দেখতে গেলে শুধু ঘাড় ঘোরালে চলবে না, একেবারে গোড়ালি থেকে শুরু করে কোমর কাধ মাথা সুদ্ধ পুরো শরীরটাই ঘোরাতে হবে। কয়েক মিনিটেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল পিয়া। হাতে ব্যথা ধরে গিয়েছিল। এই ভারী দূরবিন নিয়ে দিনে দশ বারো ঘণ্টা কী করে কাজ করে লোকে? তা হলে কি ওকে দিয়ে এ ধরনের কাজ হবে না? একটু হতাশ হয়ে পড়েছিল পিয়া।

এমনিতে বরাবরই বন্ধুবান্ধবদের তুলনায় ও দেখতে একটু ছোটখাটো। একেবারে ছেলেবেলায়, এমনকী কিশোর বয়সেও, ওর সমবয়সিদের সামনে ওকে লিলিপুটের মতো লাগত। তবে সেটা এক রকম অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল পিয়ার। কিন্তু যেদিন প্রথম ও লা জোলাতে ওর সিটোলজির ক্লাসে গেল সেদিন সহপাঠীদের সামনে ওর নিজেকে একেবারে একরত্তি একটা পুঁচকে মেয়ে মনে হচ্ছিল। "এ তো দেখা যাচ্ছে তিমির দলে পুঁটিমাছের প্রবেশ," একজন অধ্যাপক ঠাট্টা করে বলেছিলেন। হবে না-ই বা কেন? অন্য যারা ওর ক্লাসে ছিল তারা প্রায় সকলেই পোড়-খাওয়া খেলোয়াড় গোছের ছেলেমেয়ে-ইয়া মোটা মোটা হাড়, পেশিগুলো যেন পাথর কুঁদে বের করা। বিশেষ করে মেয়েগুলো বোধহয় জন্ম থেকেই ক্যালিফোর্নিয়া কি হাওয়াই কি নিউজিল্যান্ডের সমুদ্রের ধারে ভলিবল খেলে, ডাইভিং করে,

ডুবসাঁতার কেটে, নৌকো চালিয়ে বড় হয়েছে। তাদের শরীরের গড়নই তো অন্য রকম। রোদে পুড়ে পুড়ে গায়ের চামড়া প্রায় তামাটে সোনালি, তার ওপর হাতের কুচি কুচি লোমগুলো যেন চিকচিকে বালির দানা। পিয়া নিজে কোনওদিন খেলাধুলোর ধার দিয়েই যায়নি। তাতে করে অন্যদের থেকে আরও নিজেকে আলাদা মনে হত ওর। শুধু এই ছোটখাটো চেহারার জন্যই সারা কলেজে পরিচিত হয়ে গিয়েছিল ও, সবাই চিনে গিয়েছিল এই "পুঁচকে ইস্ট ইন্ডিয়ান" মেয়েটাকে।

তবে কোস্টারিকা উপকূলের কাছে জীবনে প্রথমবার সার্ভের কাজ করতে গিয়েই নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ মিটে গিয়েছিল পিয়ার। শুরুর ক'টা দিন কিছুই দেখা গেল না সেবার, শুধু এ দিগন্ত থেকে ও দিগন্ত নিষ্ফলা নজর রেখেই সময় কেটে গেল। দূরবিনের ভারে পিয়াকে হাসফাস করতে দেখে মনে হয় মায়া হচ্ছিল সহপাঠীদের, রুটিন ভেঙে ডেকে বসানো বড় বাইনোকুলারটা বেশিক্ষণ ধরে,ওরা ওকে দেখতে দিচ্ছিল। যাই হোক, এ ভাবে পর পর তিন দিন কেটে যাওয়ার পর চতুর্থ দিনে দেখা মিলল এক দঙ্গল ডলফিনের। শুরুতে মনে হয়েছিল ছোট একটা দল, খুব বেশি হলে সব মিলিয়ে গোটা কুড়ি হয়তো হবে। কিন্তু ক্রমেই বাড়তে থাকল সংখ্যাটা–কুড়ি থেকে একশো, দুশো করে বাড়তে বাড়তে প্রায় হাজার সাতেকে গিয়ে দাঁড়াল। শেষপর্যন্ত এত অজস্র ডলফিন দেখা যেতে লাগল চতুর্দিকে যে গুণতে গুণতে খেই হারিয়ে ফেলল ওরা। মনে হচ্ছিল গোটা সমুদ্রটা যেন ভরে গেছে ডলফিনে, যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই একেবারে দিগন্ত পর্যন্ত থিকথিক করছে অগুন্তি ডলফিন, ঢেউয়ের চেয়েও সংখ্যায় বেশি, জলের ওপর চার দিকে শুধু অজস্র ছুঁচোলো ঠোঁট আর চকচকে তেকোনা পাখনা। ঠিক সেই সময়ে পিয়া দেখল কীভাবে হঠাৎ হালকা হয়ে গেল ওর দূরবিনটা। মানে, রাতারাতি যে ও মহা শক্তিশালী গামা পালোয়ান হয়ে গেল তা নয় (যদিও ততদিনে দড়ির মতো পাকানো পাকানো পেশি গজিয়ে গেছে ওর হাতে), কিন্তু শুধু ওই একজোড়া কাঁচ সমুদ্রটাকে আর ডিগবাজি-খাওয়া ডলফিনগুলোকে এত কাছে এনে দিয়েছিল, যে ভারী ওজনের সমস্যাটা একেবারে বেরিয়েই গেল মাথা থেকে।

নির্মল আর নীলিমার কথা

নির্মল আর নীলিমা বোস প্রথমবার লুসিবাড়িতে আসে একটা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। সেটা ১৯৫০ সাল, তখন একবছরও হয়নি ওদের বিয়ে হয়েছে।

নির্মলের আদি বাড়ি ঢাকায়। কলকাতায় ও এসেছিল পড়াশোনা করতে। তারপর স্বাধীনতা, দাঙ্গা, দেশভাগ—পরিবারের সঙ্গে সব যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। নির্মল নিজেও কলকাতাতেই থেকে যেতে চেয়েছিল। তখন ও উঠতি লেখক, একটু নাম-টামও হয়েছে বামপন্থী বুদ্ধিজীবী হিসেবে। সেই সময়েই একটা চাকরি জুটে গেল আশুতোষ কলেজে। ইংরেজি পড়ানোর চাকরি। নীলিমা ছিল সেই কলেজের ছাত্রী।

পরিবারগত ভাবে দেখতে গেলে নির্মল আর নীলিমার মধ্যে কোনও মিলই ছিল না। নীলিমা ছিল বনেদি পরিবারের মেয়ে, ওর বাপ-কাকাদের লোকে এক ডাকে চিনত। ওর ঠাকুর্দা ছিলেন কংগ্রেসের প্রথম সদস্যদের একজন। আর বাবা, অর্থাৎ কানাইয়ের দাদু, ছিলেন হাইকোর্টের ডাকসাইটে ব্যারিস্টার। নীলিমার যখন তেরো-চোদ্দো বছর বয়স, তখন একবার ওর প্রচণ্ড হাঁপানি হয়। তার প্রকোপ চলেছিল বেশ কিছুদিন। ফলে কয়েক বছর পর স্কুলের গণ্ডি পেরোতেই ওকে ভর্তি করে দেওয়া হল ওদের বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়ির কাছে আশুতোষ কলেজে। বাড়ির একটা প্যাকার্ড গাড়ি রোজ সকালে ওকে কলেজ পৌঁছে দিত, আবার বিকেলে ফেরত নিয়ে আসত।

একদিন ছুটির পর একটা ছুতো করে বাড়ির ড্রাইভারকে ফেরত পাঠিয়ে দিল নীলিমা, আর বইখাতা বগলে নিয়ে কলেজের ইংরেজির অধ্যাপকের পেছন পেছন একটা বাসে গিয়ে উঠে পড়ল। অধ্যাপকের চোখের আদর্শবাদের দীপ্তি তখন আগুনের দিকে পতঙ্গের মতো টেনেছিল নীলিমাকে। ওর ক্লাসের অনেক মেয়েই তখন নির্মলের আগুনঝরা বক্তৃতা আর আবেগময় আবৃত্তিতে মুগ্ধ, এমনকী তাদের কেউ কেউ নির্মলের প্রেমে পাগলও ছিল, কিন্তু নীলিমার মানসিক শক্তি বা উদ্ভাবনী ক্ষমতা তাদের ছিল না। বাসে উঠে সেদিন ও ঠিক নির্মলের পাশের সিটটায় গিয়ে বসল; আর এক মাসের মধ্যেই বাড়িতে জানিয়ে দিল যে বিয়ের পাত্র ওর ঠিক করা হয়ে গেছে। বাড়ির লোকেদের স্বাভাবিক ভাবেই প্রচণ্ড আপত্তি ছিল এই বিয়েতে, কিন্তু তাতে নীলিমার জেদ বাড়ল বই কমল না। ১৯৪৯ সালে একদিন সাদামাটা এক অনুষ্ঠান করে বিয়ে হয়ে গেল ওদের। হোম-যজ্ঞ-মন্ত্রপাঠের বদলে পড়া হয়েছিল ব্লেক, মায়কোভস্কি আর জীবনানন্দের কবিতা। সে বিয়েতে পৌরোহিত্য করেছিল নির্মলের এক পার্টি কমরেড।

বিয়ের পর মাস খানেকও হয়নি, হঠাৎ একদিন সকালে ওদের মুদিয়ালির ছোট্ট ফ্ল্যাটে পুলিশ হানা দিল। আগের বছর কলকাতায় সোশ্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনালের এক কনফারেন্সে অংশ নিয়েছিল নির্মল—সেই সূত্রে। (গল্পের ঠিক এই জায়গায় এসে নির্মল একটু থেমে যেত, তারপর একটু ঝোঁক দিয়ে শুরু করত পরের বাক্যটা। ওর মতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে কলকাতার এই কনফারেন্স ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এমনকী দশ-বিশ বছর পরেও এশিয়ার সমস্ত গণ অভ্যুত্থানের সঙ্গে পশ্চিমি গোয়েন্দা দফতরগুলি এই কনফারেন্সের যোগসূত্র খুঁজে বের করত—সে ভিয়েতনামই হোক, কি মালয়েশিয়ার আন্দোলন, অথবা বার্মার রেড ফ্ল্যাগ অভ্যুত্থান। ওদের মতে এই সবকিছুর মূলেই ছিল ১৯৪৮-এর কলকাতা কনফারেন্সের 'সশস্ত্র সংগ্রাম নীতি'। নির্মল বলত এমনিতে যে এসব কথা সবাইকে জানতেই হবে তার কোনও মানে নেই, কিন্তু এই ভাটির দেশে এ ধরনের খবরের বিশেষ মূল্য আছে। বাইরের পৃথিবীর বড় বড় ঘটনার খোঁজ এখানে সহজে এসে পৌঁছয় না, সেই জন্যেই আরও বেশি করে সেগুলি এখানকার মানুষকে মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। কারণ ইতিহাসের প্লাবনের ঢেউ এক সময় না এক সময় পৃথিবীর দুর্গমতম অঞ্চলেও গিয়ে ধাক্কা দেয়।)

আটচল্লিশের কনফারেন্সে অবশ্য নির্মলের ভূমিকা ছিল খুবই সামান্য, সে ক'দিন ওকে বার্মিজ ডেলিগেশনের গাইড হিসেবে কাজ করতে হয়েছিল। কিন্তু বার্মায় কমিউনিস্ট

আন্দোলন শুরু হওয়ার পর সেই সূত্র ধরেই পুলিশ এল ওর বাড়িতে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ওরা নিয়ে গেল ওকে। এখনও ওই ডেলিগেশনের কারও সাথে ওর যোগাযোগ আছে কিনা, অথবা ওদের সম্পর্কে নতুন কিছু খবর যদি ও দিতে পারে, এই সব তথ্য ওর কাছে জানতে চেয়েছিল পুলিশ।

সবসুদ্ধ মাত্র দু-এক দিনই লক-আপে থাকতে হয়েছিল নির্মলকে। কিন্তু ওর পক্ষে সে অভিজ্ঞতার ফল হল মারাত্মক। সে সময় নীলিমার পরিবারের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই, নিজের বাড়ির থেকেও একেবারে বিচ্ছিন্ন, ফলে নিজের মধ্যে কেমন গুটিয়ে গেল নির্মল। কলেজে যেত না, দিনের পর দিন বিছানা থেকে উঠতে চাইত না। ব্যাপারটা বাড়াবাড়ির দিকে যাচ্ছে দেখে লজ্জার মাথা খেয়ে অবশেষে বাপের বাড়ির শরণাপন্ন হল নীলিমা। নির্মলের সঙ্গে বিয়েটা পরিবারের লোকেরা কখনওই ক্ষমার চোখে দেখেনি, কিন্তু এই বিপদের দিনে ওরাই ওর পাশে এসে দাঁড়াল। নীলিমার বাবার কথায় কয়েক জন ডাক্তার এসে নির্মলকে দেখে হাওয়া বদলের পরামর্শ দিলেন। নির্মলের পার্টির লোকেদেরও মনে ধরল কথাটা। আসলে ওরাও বুঝে গিয়েছিল এই রকম দুর্বল মানসিকতার লোক পার্টির বিশেষ কাজে আসবে না। নীলিমাও খুশি হল—শহর থেকে দূরে গেলে নির্মলও সেরে উঠবে, ওর নিজের হাঁপানিরও হয়তো কিছুটা উপশম হবে। কিন্তু কোথায় যাওয়া হবে সেটা ঠিক করাই হল সমস্যা। এবারেও মুশকিল আসান করলেন নীলিমার বাবা। সে সময় হ্যামিলটন এস্টেটের কিছু কাজকর্ম উনি দেখাশোনা করতেন। সেই সূত্রেই জানতে পারলেন এস্টেটের ম্যানেজার একজন শিক্ষকের খোঁজ করছেন লুসিবাড়ির স্কুলটা চালানোর জন্য।

১৯৩৯-এ স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন মারা যাওয়ার পর এস্টেটের মালিকানা বর্তায় তার ভাইপো জেমস হ্যামিলটনের ওপর। কিন্তু জেমস থাকতেন স্কটল্যান্ডের অ্যারান দ্বীপে। কাকার সম্পত্তি পাওয়ার আগে কখনও ভারতে আসার কথা তার চিন্তাতেও আসেনি। স্যার ড্যানিয়েলের মৃত্যুর পর কয়েকদিনের জন্য উনি গোসাবায় এসেছিলেন বটে, কিন্তু এস্টেটের কাজেকর্মে কখনও মাথা গলাননি। সেসব দেখাশোনা করত ম্যানেজার আর কর্মচারীরা। ফলে নীলিমার বাবা একবার বলে দিলেই যে নির্মলের চাকরিটা হয়ে যাবে সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু বেঁকে বসল নির্মল নিজে। এতদিন বামপন্থী রাজনীতি করার পর শেষে একজন পুঁজিপতির এস্টেটে গিয়ে কাজ করতে হবে? সে কী করে সম্ভব? অনেক সাধ্যসাধনার পর নীলিমা একবার গিয়ে জায়গাটা দেখে আসতে রাজি করাল ওকে। অবশেষে একদিন ওরা দু'জন গোসাবায় গিয়ে পৌঁছল। ঘটনাচক্রে সেদিন ছিল হ্যামিলটনের জন্মদিন। অবাক হয়ে ওরা দেখল ঠিক একটা পুজোর মতো করে জয়ন্তী উদ্যাপন করা হচ্ছে। এস্টেটের বিভিন্ন জায়গায় স্যার ড্যানিয়েলের মূর্তিগুলোকে মালা চন্দন দিয়ে সাজানো হয়েছে, ধূপ-ধুনো জ্বলছে সামনে, মূর্তির সামনে গিয়ে লোকে গড় হয়ে প্রণাম করছে। বোঝাই যাচ্ছিল স্থানীয় মানুষের কাছে এই স্কট সাহেব একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি, প্রায় ভগবানের মতো ভক্তি করে হ্যামিলটনকে এখানকার লোকেরা। বাসিন্দাদের কাছে এস্টেটের আদর্শবাদী প্রতিষ্ঠাতার গল্প শুনে অবশেষে মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হল নির্মল আর নীলিমা। মনে মনে একটু লজ্জাও হল ওদের।

কোথাকার কোন বিদেশি পুঁজিপতি এই জল-জঙ্গলের দেশে এসে গরিব মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য কত কিছু করেছেন, আর সেখানে কলকাতা শহরের বাইরে মানুষ কীভাবে থাকে সে ব্যাপারে ওদের কোনও ধারণাই নেই। এতদিন ধরে যা বড় বড় প্রগতিশীল কথা বলে এসেছে সেগুলি হঠাৎ কেমন শূন্যগর্ভ মনে হল নির্মলের।

দু-একদিনের মধ্যেই মন স্থির করে ফেলল ওরা। আর লুসিবাড়িতে পা দেওয়ার পর ঠিক করে ফেলল এই দ্বীপেই এসে কাটাবে কয়েক বছর। সেবার কলকাতায় ফিরে গিয়ে নিজেদের সামান্য জিনিসপত্র যা ছিল গুছিয়ে নিল নির্মল আর নীলিমা, তারপর বর্ষা কেটে যাওয়ার পর একদিন চাটিবাটি গুটিয়ে এসে উঠল লুসিবাড়িতে।

প্রথম কয়েক মাস ওরা যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। সব কিছুই এখানে একেবারে নতুন, সব জায়গার থেকে আলাদা। এমনিতে গ্রামগঞ্জের ব্যাপারে যেটুকু ধারণা ওদের ছিল সেসব সাধারণ সমতলের গ্রাম। সেসব জায়গার সঙ্গে এতটুকুও মিল নেই এই ভাটির দেশের। অদ্ভুত এখানকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনপ্রণালী ওদের মতো শহুরে লোকেদের বোধবুদ্ধির বাইরে। কতটুকুই বা দূর এখান থেকে কলকাতা শহর? মেরেকেটে সাতানব্বই কিলোমিটার। কিন্তু এদের সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই জানে না কলকাতার মানুষ। কত কথাই তো বলা হয় গ্রামভারতের স্মরণাতীত কালের ঐতিহ্য নিয়ে, কিন্তু চেনা জগতের থেকে একেবারে অন্যরকম এই পৃথিবীর কথা ক'টা লোক জানে? ক'জন চোখে দেখেছে এরকম একটা জায়গা যেখানে জাতপাত নেই, উঁচুনিচুর ভেদ নেই? আবার অন্যদিকে, কোথায় গেল সেই সমবায় ঋণ ভিত্তিক গণতান্ত্রিক দেশ? এখানকার সেই আলাদা মুদ্রা আর ব্যাঙ্কেরই বা কী হল? ভাটির দেশের কাদায় সোনা ফলানোর যে স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল সে সোনা কোথায়?

দারিদ্র্য এত চরম এই ভাটির দেশে যে পঞ্চাশের মন্বন্তরের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল নির্মল আর নীলিমার। তফাত শুধু একটা খিদে, মৃত্যু আর বিপর্যয় লুসিবাড়ির মানুষের রোজকার জীবনযাপনের অঙ্গ। দশকের পর দশক ধরে মানুষ বাস করছে এই দ্বীপে, কিন্তু বহু চেষ্টায়ও এখানকার জমির লোনাভাব পুরোপুরি দূর করা যায়নি। চাষবাস তাই বিশেষ হয় না, যেটুকু ফসল ওঠে তাও খুবই নিকৃষ্ট মানের। দ্বীপের বেশিরভাগ মানুষই একবেলা খেয়ে থাকে। এত বছর ধরে এত পরিশ্রমে যে বাঁধ বাঁধা হয়েছে, তার ওপরেই বা কতটুকু ভরসা করা যায়? ঝড়ে বন্যায় প্রায়ই ফাটল ধরে এখানে সেখানে। আর বাঁধ ভেঙে একবার যদি লোনা জল ঢুকে পড়ে গ্রামের মধ্যে, বেশ কয়েক বছরের মতো চাষবাসের দফারফা। শুরুতে যারা এসে বসত শুরু করেছিল লুসিবাড়িতে তাদের বেশিরভাগই ছিল চাষিবাসি মানুষ। বিনেপয়সার চাষের জমি দিয়ে এখানে এনে বসানো হয়েছিল তাদের। এদিকে অনাবাদি জমিতে ফসল ভাল হয় না। অথচ পেটের জ্বালাও বড় বালাই। তাদের কেউ তাই শুরু করল মাছ ধরতে, আবার কেউ বা গেল জঙ্গলের দিকে, যদি কিছু শিকার পাওয়া যায় সেই আশায়। ফল হল মারাত্মক। বহু লোক জলে ডুবে মরল, অনেককে কুমিরে কামটে টেনে নিয়ে গেল। এই বাদাবন থেকে যা পাওয়া যায় তাতে রোজকার পেটের খিদে মেটে না। তবুও হাজার হাজার মানুষ জঙ্গলে যেতে শুরু করল, সামান্য একটু মধু, মোম, জ্বালানি কাঠ বা কেওড়া গাছের টোকো ফলের আশায়। ফলে প্রতিদিনই একটা না একটা লোক মরত হয়—বাঘের বা কুমিরের মুখে, কিংবা সাপের ছোবলে।

আর স্কুলটারও যা ছিরি দেখল ওরা সে আর বলবার নয়। থাকার মধ্যে আছে চারটে দেওয়াল আর মাথার ওপরে একটা ছাদ। এস্টেটের তো ভাঁড়ে মা ভবানী। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, উন্নয়ন, সবকিছুর জন্য পয়সার বরাদ্দ আছে ঠিকই, কিন্তু সে পয়সা যে কোথায় যায় তা কেউ জানে না। লোকে বলে ফান্ডের সব টাকাই যায় আসলে ম্যানেজারবাবুর পকেটে, আর সে নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করলেই পোষা গুণ্ডা লেলিয়ে তার মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা আছে। পুরো জায়গাটাই যেন দ্বীপান্তর পাওয়া লোকেদের কলোনি। পরিবেশটাও দমবন্ধ, প্রায় জেলখানার মতো।

নির্মল আর নীলিমা হ্যামিলটনের স্বপ্নরাজ্যের খোঁজে লুসিবাড়িতে আসেনি বটে, কিন্তু এখানে এসে দারিদ্র্যের এরকম নির্মম চেহারা দেখতে হবে সেটাও ওদের কল্পনাতে ছিল না। সব দেখেশুনে একটাই প্রশ্ন মনে এল ওদের : "কী করা যায় এই মানুষগুলোর জন্য?"

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নির্মল লেনিনের "কী করতে হবে" বইটা বারবার পড়তে লাগল, কিন্তু সন্তোষজনক কোনও পথ খুঁজে পেল না। তুলনায় নীলিমার বাস্তবুদ্ধি অনেক বেশি। পুকুরে বা কুয়োতে স্নান করতে কি কাপড় কাঁচতে গিয়ে গ্রামের মহিলাদের সঙ্গে দেখা হলে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করল ও। তাদের সুখদুঃখের খবরও জেনে নিতে লাগল।

লুসিবাড়িতে আসার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করল নীলিমা।

দ্বীপের মহিলাদের বেশিরভাগেরই বেশভূষা বিধবাদের মতো—সাদা শাড়ি, সাদা সিঁথি, হাতে একগাছা রুলিও নেই। মাঝে মাঝে তো এমন হয় যে একজনও সধবা মহিলা খুঁজে পাওয়া যায় না পুকুরঘাটে কি কুয়োতলায়। খোঁজখবর করে নীলিমা জানতে পারল ভাটির দেশের এ এক অদ্ভুত নিয়ম। এখানকার মেয়েরা ছোটবেলা থেকেই জেনে আসে শাখা সিঁদুরের জোর ওদের নেই। বিয়ে যদি হয়ও, কয়েক বছরের মধ্যেই স্বামীহারা হতেই হবে। কেউ ঠেকাতে পারবে না। পঁচিশ, কি খুব বেশি হলে তিরিশ বছর, তার বেশি বয়স পর্যন্ত স্বামী-সোহাগ লেখা নেই ওদের কপালে। এ ধারণা ওদের একেবারে মর্মে মর্মে গেঁথে গেছে। সেই জন্যই ঘরের লোক মাছ ধরতে কি জঙ্গল করতে গেলে এখানকার মেয়েরা রঙিন শাড়ি ছেড়ে সাদা কাপড় পরে, সিঁদুর ধুয়ে ফেলে মাথা থেকে। যেন আগে থেকে দুঃখভোগ করে নিতে চায় স্বেচ্ছায়—যদি তাতে একটু দেরিতে আসে সে দুঃখের দিন। নাকি অনিবার্য ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে নিতেই এই নিয়ম বানিয়ে নিয়েছে এরা?

পুরো ব্যবস্থাটার প্রচণ্ড তীব্রতা নীলিমাকে যেন একটা ঝাঁকি দিয়ে গেল। ওর চেনা। জগতের মহিলারা—ওর মা কি দিদি তো মরে গেলেও এভাবে তাদের সধবার বেশ ত্যাগ করতে পারবে না। নিজেই কি পারবে নীলিমা? এত প্রগতিশীলতার শিক্ষা সত্ত্বেও তো ওর কাছে এখনও সজ্ঞানে শাঁখা সিঁদুর ফেলে দেওয়া আর স্বামীর বুকে শেল বিঁধিয়ে দেওয়া একই ব্যাপার। কিন্তু এই মেয়েদের জন্য বৈধব্যের পরীক্ষা বৃথা যায় কমই। ভাটির দেশের নদী-খাড়ির বাঁকে বাঁকে মরণ ওত পেতে থাকে। পেটের ভাতের জন্য জলে-জঙ্গলে যাওয়া ছাড়া যাদের গতি নেই বেশি দিন শাঁখা-সিঁদুরের বিলাসিতা ভোগ করা তাদের ঘরের বউ মেয়েদের কপালে নেই।

হিন্দু সমাজের প্রান্তবাসী ভাটির দেশের এই গ্রামে অবশ্য সামাজিক অনুশাসনের চোখরাঙানি নেই। বিধবারা যদি চায় আরেকবার বিয়ে করতেই পারে। কিন্তু সমর্থ পুরুষ মানুষেরই যেখানে আকাল সেখানে সে বাধা থাকাই বা কী, না থাকাই বা কী। বরঞ্চ নীলিমা দেখল সমতলের গ্রাম-শহরের তুলনায় এখানেই বিধবাদের আরও বেশি পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়, বছরের পর বছর সহ্য করে যেতে হয় পীড়ন আর লাঞ্ছনা।

কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এই মেয়েদের যন্ত্রণার জীবনকে? কোন শব্দ দিয়ে বর্ণনা করবে এদের নীলিমা? এরা তো একটা অন্য শ্রেণী। কিন্তু নির্মলকে কে বোঝাবে। তার মতে শুধুমাত্র এই মেয়েদের কী করে একটা শ্রেণীতে ফেলা যায়? শ্রমিকরা হল একটা শ্রেণী, কিন্তু শ্রমিকের বিধবাদের একটা শ্রেণী বলে উল্লেখ করার কোনও মানেই হয় না, এরকম কোনও শ্রেণী কখনও হতে পারে না।

কিন্তু এরা যদি একটা আলাদা শ্রেণী না হয়, তা হলে এরা কী?

শব্দ আর তত্ত্বের ভাড়ার যখন খালি হয়ে এল তখন অবশেষে বোধোদয় হল নীলিমার। কী আসে যায় নামে? শ্রেণী হোক বা না হোক, এই মেয়েদের কষ্টের জীবন পালটাতেই হবে। সে যে করেই হোক। স্কুলের কাছেই থাকত বছর পঁচিশ বয়সের এক বিধবা মহিলা, তাকে গিয়ে নীলিমা একদিন জিজ্ঞেস করল সে গোসাবা থেকে কিছু সাবান, দেশলাই ও আরও দু-একটা টুকিটাকি জিনিস কিনে আনতে পারবে কি না। লুসিবাড়িতে ওই সব জিনিসের যা দাম, তাতে সেগুলো বিক্রির পর ওর যাতায়াত ভাড়া বাদ দিয়েও হাতে বেশ কিছুটা পয়সা থেকে যাবে। তার অর্ধেক ও নিজের জন্য রাখতে পারে। নীলিমার এই ভাবনার বীজ থেকেই ধীরে ধীরে পাতা মেলল লুসিবাড়ির মহিলা সংগঠন। আর সেদিনের সেই চারাগাছ অবশেষে মহীরুহের আকার নিল বাদাবন ট্রাস্টের জন্মের পর।

নির্মল আর নীলিমার লুসিবাড়িতে আসার কয়েক বছরের মধ্যেই জমিদারি উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিল সরকার। আইন হল কোনও একজন ব্যক্তি বা সংগঠনের মালিকানায় খুব বেশি জমি থাকতে পারবে না। টুকরো টুকরো হয়ে গেল হ্যামিলটন এস্টেটের সম্পত্তি। যেটুকু যা বাকি ছিল মামলা-মোকদ্দমায় তারও শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াল। অন্যদিকে নীলিমার মহিলা সংগঠন তখন দিনে দিনে বাড়ছে। রোজ নতুন নতুন মেয়েরা আসছে নাম লেখাতে, কাজও

বেড়ে চলেছে পাল্লা দিয়ে চিকিৎসা, চাষ-আবাদ, ছোটখাটো আইনি সমস্যা—সব ব্যাপারে মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে সংগঠন। আস্তে আস্তে এত বিশাল আকার নিল নীলিমাদের এই আন্দোলন যে সেটা রেজিষ্ট্রি করানোর প্রশ্ন এল তখন। সাথে সাথে খাতায়-কলমে যাত্রা শুরু হল বাদাবন ট্রাস্টের।

নীলিমার এই কাজ কিন্তু কখনওই নির্মলের পুরোপুরি সহযোগিতা পায়নি। সমাজসেবার গন্ধলাগা এই সব কাজে কোনওদিনই ও বিশেষ উৎসাহ পায়নি। ট্রাস্টের নামটা অবশ্য ওরই দেওয়া। কিন্তু ওই পর্যন্তই।

আসলে 'বাদাবন' শব্দটা ছিল নির্মলের খুব পছন্দের। ও বলত ইংরেজি 'বেদুইন'-এর মতো বাদাবনও এসেছে আরবি 'বাদিয়া' শব্দ থেকে, যার অর্থ মরুভূমি। "কিন্তু ইংরেজরা তো আরবি শব্দটাকেই শুধু একটু পালটে নিয়েছে। আর বাঙালিরা আরবি বাদা'র সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে সংস্কৃত 'বন'," নীলিমাকে প্রায়ই বলত নির্মল। "বাদাবন শব্দটা নিজেই যেন দুটো বিরাট ভাষার মোহনায় গড়ে ওঠা একটা দ্বীপের মতো যেন গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্রের মাঝে জেগে ওঠা আরেকটা ভাটির দেশ। তোমার ট্রাস্টের জন্য এর থেকে ভাল নাম আর কিছু হতে পারে না।"

ট্রাস্ট তৈরি হওয়ার পর প্রথমেই দ্বীপের মাঝামাঝি একটা জায়গায় বেশ খানিকটা জমি কিনল নীলিমারা। পরে, সত্তরের দশকের শেষদিকে, সেই জমির ওপরেই আস্তে আস্তে গড়ে উঠল ওদের নিজস্ব হাসপাতাল, ওয়ার্কশপ, অফিসঘর আর গেস্ট হাউস। কিন্তু সেসব তো বছর দশেক পরের কথা। কানাই প্রথম যখন লুসিবাড়িতে আসে—সেই ১৯৭০ সালে—এসবের কোনও চিহ্নই ছিল না তখন। মহিলা সমিতির মিটিং-ও তখন নির্মলদের 'বাংলো'র উঠোনেই হত। আর সেখানেই কুসুমের সঙ্গে প্রথম দেখা হল কানাইয়ের।

নোঙর

সন্ধ্যার পড়ন্ত আলোয় বড় একটা খাঁড়ির মুখে এসে পৌঁছল ফকিরের ডিঙি। আবছা আঁধারে কয়েক কিলোমিটার দূরের ডাঙা প্রায় দেখাই যায় না। খাঁড়ির মাঝ বরাবর তাকিয়ে পিয়ার নজরে এল কিছু একটা নোঙর করা রয়েছে। মনে হল যেন বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা কিছু জলের ওপর ভাসছে। দূরবিন চোখে লাগিয়ে পিয়া দেখল জিনিসটা আর কিছুই না, গোটা ছয়েক মাছ-ধরা নৌকো জড়ো হয়ে রয়েছে এক জায়গায়। নৌকোগুলো আকারে আয়তনে অবিকল ওদের ডিঙিটার মতো একটার সঙ্গে আরেকটা পাশাপাশি দড়ি দিয়ে বাঁধা। এদিকে ওদিকে আরও কতগুলো দড়িদড়া নেমে গেছে জলের ভেতর, বোধ হয় স্রোতের মুখে নৌকোগুলোকে এক জায়গায় ভাসিয়ে রাখার জন্য। প্রায় এক কিলোমিটার দূর থেকেও দুরবিন দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেল পিয়া নৌকোর ওপর চলে ফিরে বেড়াচ্ছে লোকজন। কয়েকজন একা একা বসে বিড়ি ফুকছে, অন্যরা কেউ চা খাচ্ছে, অনেকে আবার গোল হয়ে বসে তাস পেটাচ্ছে। দু-এক জনকে দেখা গেল কাপড় কাঁচছে, বাসন মাজছে, বা স্টিলের বালতি করে জল তুলছে নদী থেকে। ঠিক মাঝখানের একটা নৌকো থেকে ধোঁয়া উঠছে পাকিয়ে পাকিয়ে। ওটাতেই নিশ্চয়ই রান্না-বান্নার ব্যবস্থা। দৃশ্যটা খুব পরিচিত পিয়ার, কিন্তু পুরো ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত। মেকং কি ইরাবড়িতেও ও দেখেছে ঠিক এইভাবেই সন্ধে নামে নদীর ধারের গ্রামগুলোতে। অন্ধকার নেমে আসার সাথে সাথে সেখানেও এইরকম মন্থর ধোঁয়ার কুন্ডলী পাক খেতে খেতে হারিয়ে যায় আবছা আলোয়, গাঁয়ের লোকজন পা চালিয়ে এগোতে থাকে নদীর দিকে, সারাদিনের ধুলোময়লা ধুয়ে রাতের বিশ্রামের জন্য তৈরি হয়। সময় একদিকে যেমন দ্রুত কাটতে থাকে, অন্যদিকে আবার মনে হয় কালের গতি যেন থমকে থেমে গেছে হঠাৎ। কিন্তু ঠিক সেইরকম গ্রামই এখানে ডাঙা ছেড়ে নেমে এসেছে মাঝনদীতে। কেন?

ডিঙিগুলো চোখে পড়তেই ফুর্তিতে চেঁচিয়ে উঠল টুটুল। তারপর কী সব বকবক করতে লাগল বাপের সঙ্গে। নিশ্চয়ই ওরা চিনতে পেরেছে নৌকোগুলোকে। হয়তো ওদেরই বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনরা আছে ওখানে। এত বছর ধরে নদীতে নদীতে জেলেদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে একটা জিনিস বুঝেছে পিয়া—নিজেদের এলাকার মধ্যে এই সব জেলে বা মাঝিরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে চেনে, জানে। মোটামুটি নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় ফকিররা ওই নৌকোর দঙ্গলের লোকজনদের ভালই চেনে, আর একবার ওখানে গিয়ে পৌঁছতে পারলে আদরযত্নেরও অভাব হবে না। আজকে রাতের বিশ্রামটা ওখানেই হবে বোঝা যাচ্ছে। স্নান টান সেরে বন্ধুবান্ধবদের কাছে সারাদিনের অভিজ্ঞতা গল্প করবে ফকির, হয়তো বলবে "দেখো কাকে নিয়ে এসেছি আমাদের সঙ্গে।" হয়তো শুরু থেকেই এখানে এসে রাত কাটানোর পরিকল্পনা ছিল ফকিরের। সেইজন্যই হয়তো নৌকোটা ও এই জায়গায় নিয়ে এসেছে। কে জানে!

বাঁকের মুখে ডিঙিটা ঘুরতেই আরও নিশ্চিত হয়ে গেল পিয়া। এর পরের কয়েকটা ঘণ্টা কীভাবে কাটবে ভাবতে লাগল। এইরকম অভিজ্ঞতা তো আর ওর কাছে নতুন কিছু নয়। সার্ভের কাজে বছরের পর বছর নদীতে নদীতে কাটিয়েছে ও, এই রকম জেলেদের সঙ্গে। কতবার এরকম অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় গিয়ে রাতের জন্য নোঙর ফেলেছে ওদের নৌকো। এখন পর পর কী ঘটবে চোখ বুজে বলে দিতে পারে পিয়া। ওকে দেখে প্রথমে কীরকম বিস্মিত হয়ে যাবে মানুষগুলো, তারপর শুরু হবে প্রশ্নের বন্যা—সবকটার জবাব দিতে হবে ফকিরকে, তারপর অভ্যর্থনার পালা। সে অভ্যর্থনার ভাষা না বুঝলেও জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে প্রত্যুত্তর দিতে হবে পিয়াকে। পুরো ব্যাপারটা ভেবেই গায়ে জ্বর এল পিয়ার। এমন নয় যে ওদের কাছ থেকে ওর কোনও বিপদের আশঙ্কা আছে—বরং এই জেলেদের মধ্যেই ও সবচেয়ে নিরাপদ, সেটা ও জানে কিন্তু ওই ভিড়ের মধ্যে এখন কিছুতেই যেতে ইচ্ছে করছে না ওর। তার চেয়ে ফকিরের এই ডিঙিতেই ওর নিজস্ব নিস্তব্ধতার দ্বীপটুকুর মধ্যে গা এলিয়ে চুপচাপ ভাসতে ভাসতে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া অনেক আরামের হবে। ওর

খুব ইচ্ছে করছিল ফকিরকে বলে এখানে না থেমে এগিয়ে যেতে, পাড়ের কাছে কোনও নিরাপদ জায়গা দেখে রাতের জন্য নৌকো বাঁধতে।

কিন্তু সে কথা তো আর ফকিরকে বলা যায় না, ভাষার ব্যবধান না থাকলেও পিয়া ওরকম বলতে পারত না। তাই ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেল পিয়া যখন ও দেখল যে ফকিরের নৌকো ওর যেদিকে ইচ্ছে সেদিকেই যাচ্ছে। একটু পরেই আরও পরিষ্কার বোঝা গেল ডিঙি ঘুরিয়ে নিয়েছে ফকির ওই নৌকোর ঝুঁকের দিক থেকে, পাড়ির ছায়ায় ছায়ায় বেয়ে নিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। বাইরে নিজের মনের ভাব একটুও বুঝতে দিল না পিয়া, দূরবিন হাতে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে নজর রেখে চলল জলের দিকে, কিন্তু ওর বুকের ভেতরটা যেন লাফিয়ে উঠল বাচ্চা ছেলে অযাচিত ল্যাবেঞ্চুস হাতে পেলে যেরকম খুশি হয়ে ওঠে, ঠিক সেইরকম আনন্দ হল পিয়ার।

দিনের আলো মিলিয়ে যেতে একটা খালে নৌকো ঢুকিয়ে নোঙর ফেলল ফকির। স্রোতের টানে টানে মাটি সরে গিয়ে খালটা এখানে সুরক্ষিত একটা খাঁড়ির চেহারা নিয়েছে। বোঝাই যাচ্ছিল আজ রাতে এর থেকে বেশি দূরে আর যাওয়া সম্ভব ছিল না ওদের পক্ষে, কিন্তু ফকিরের হাবভাব দেখে মনে হল ঠিক এই জায়গায় নৌকো বাঁধতে ও চায়নি। ও যেন মনে মনে অন্য কোনও জায়গার কথা ভেবে রেখেছিল। আর সেখানে পৌঁছতে পারেনি বলে যেন নিজের ওপরেই খানিকটা রেগে গেছে।

এবার বিশ্রামের সময়। সারাদিনে বিচিত্র অভিজ্ঞতার পর যেন একটা শ্লথ শ্রান্তির ছায়া নেমে এসেছে ডিঙির ওপর। কোমরের কষি থেকে দেশলাই বের করে কালচিটে একটা লক্ষ জ্বালাল ফকির। সেই আগুনে বিড়ি ধরিয়ে পাটায় বসে টানতে লাগল ফুকফুক করে। টানতে টানতে যখন ছোট্ট হয়ে এল বিড়িটা তখন সেটা নিভিয়ে উঠে পড়ল ও। ইশারায় পিয়াকে দেখিয়ে দিল নৌকোর পেছনের দিকে ছোট্ট চৌকোনো ঘেরা জায়গাটা—কী করে সামনে একটা পর্দা টেনে সেটাকে বাথরুমের মতো ব্যবহার করা যায়। পুরো ব্যাপারটা পিয়াকে পরিষ্কার করে বোঝানোর জন্যই যেন নদী থেকে এক বালতি লোনা জল তুলে সেই জলে টুটুলকে স্নান করাতে লাগল সাবান ঘষে ঘষে। একটা ক্যানেস্তারায় খানিকটা মিষ্টি জলও রাখা আছে দেখা গেল, মাঝে মাঝে তার থেকে একটু একটু করে নিয়ে সাবানের ফেনা ধুয়ে দিতে লাগল টুটুলের গা থেকে।

সূর্য ডোবার পর নদীর জোলো হাওয়ায় বেশ টের পাওয়া যাচ্ছিল শীতের কামড়। স্নানের পর ভিজে চুপ্পড় বাচ্চাটা ঠকঠক করে কাঁপছিল ঠান্ডায়। কোথা থেকে একটা চেক কাটা কাপড় বের করে ভাল করে ওর গা মুছিয়ে জামাকাপড় পরিয়ে দিল ফকির। লাল রঙের এই গা মোছার কাপড় আরও কয়েকটা রাখা ছিল নৌকোয়। পিয়ার আবছা মনে হল এরকম কাপড়ের টুকরো আগেও যেন ও দেখেছে, কিন্তু কোথায় দেখেছে সেটা কিছুতেই মনে পড়ল না।

এবার টুটুলের পালা তার বাবাকে স্নান করাবার। গায়ের সমস্ত জামাকাপড় খুলে শুধু একটা ল্যাঙোট পরে পাটাতনের ওপর বসল ফকির, আর নদী থেকে ঠান্ডা জল তুলে টুটুল ঢালতে লাগল ওর মাথায়। বাপকে স্নান করানোর ফুর্তিতে ওর খিলখিল হাসি আর চিৎকারে বেশ মজা লাগছিল পিয়ার। এত রোগা ফকির যে ওর খালি গায়ে পাঁজরের সবক'টা হাড় গোনা যায়। টিনের কৌটোর ওপর থেকে লেবেলটা ছিঁড়ে নিলে তার ঢেউখেলানো গা-টা যেমন দেখায় ফকিরের হাড় বের-করা শরীরটা দেখে ঠিক সেইরকম মনে হচ্ছিল। ওর সারা গা বেয়ে সরু আঁকাবাঁকা রেখার মতো গড়িয়ে পড়ছে জল, পাঁজরের হাড়ে ধাক্কা খেতে খেতে নেমে আসছে ছোটো ছোটো ঝরনার মতো।

বাপ-বেটার স্নান শেষ হল। এবার পিয়ার পালা। নদী থেকে এক বালতি জল তুলে রাখল ফকির, একটা শাড়ি টেনে দিল সামনে পর্দার মতো। কিন্তু এইটুকু ডিঙির ওপর নড়াচড়া করাই এক সমস্যা। দু'জনকে পাশ কাটিয়ে হেঁটে যাওয়া তো অসম্ভব। ছইয়ের নীচে প্রায় বুকে হেঁটে কনুইয়ে ভর দিয়ে ওদের একদিক থেকে আরেক দিকে যেতে হচ্ছিল। ফকিরকে

এক হাত দিয়ে লুঙ্গিটা চেপে ধরে থাকতে হচ্ছিল, যাতে খুলে না পড়ে। পাশ দিয়ে যাবার সময় পিয়া আর ও মুখোমুখি হয়ে গেল। চোখে চোখ পড়তে দু'জনেই হেসে ফেলল।

ডিঙির পেছন দিকে এসে পিয়া দেখল আবছা অন্ধকারে পারার মতো চিকচিক করছে জল। আকাশ ভরা ফুটফুটে জোছনায় সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাগুলো শুধু চোখে পড়ছে। নৌকোর লম্ফটা ছাড়া জলে ডাঙায় কোথাও কোনও বাতি দেখা যাচ্ছে না। কোথাও কোনও শব্দও নেই নদীর ছলাৎ ছলাৎ ছাড়া। পাড় এখান থেকে এত দূরে যে এমনকী জঙ্গলের ঝিঁঝির ডাকও কানে আসছে না। চারদিকে জনমানবের চিহ্ন নেই। এর আগে একমাত্র মাঝসমুদ্রে ছাড়া আর কোথাও এরকম পরিস্থিতিতে থেকেছে বলে মনে পড়ল না পিয়ার। তবুও লম্ফর হলদে আলোয় ওর ছোট্ট বাথরুমের ভেতর তাকিয়ে ও দেখল পরিষ্কার স্নান টানের জন্য সব ব্যবস্থাই মজুত রেখেছে ফকির। সত্যি বলতে কী, এই মাঝনদীতে এইরকম ব্যবস্থা আশাই করেনি পিয়া। সদ্যতোলা নদীর লোনা জলের বালতির পাশেই একটা ক্যানেস্তারায় খানিকটা টলটলে মিঠে জল রাখা আছে, একটা তাকের ওপর এক টুকরো সাবান, আর তার পাশে একেবারে অপ্রত্যাশিত একটা জিনিস ছোট্ট একটা প্লাস্টিকের প্যাকেটে খানিকটা শ্যাম্পু। ক্যানিং-এ কয়েকটা চায়ের দোকানে এরকম শ্যাম্পুর প্যাকেটের লম্বা ফিতে ঝুলতে দেখেছে পিয়া। তবুও, জিনিসটা হাতে নিয়ে ওর মনে হল এইরকম একটা জায়গায় এটা একেবারে বেখাপ্পা। ও হয়তো টান মেরে ছুঁড়ে ফেলেই দিত ওটা, কিন্তু মনে হল ফকিরদের কাছে প্যাকেটটা নিশ্চয়ই বহু মূল্যবান (কে জানে ক'টা কঁকড়ার বিনিময়ে কিনতে হয়েছে ওটা), আর শুধু ওর সম্মানেই মনে হয় এটা আজকে বের করা হয়েছে। এটা ফেলে দিলে ওদের ভালবাসার আন্তরিকতাকে অসম্মান করা হবে। এই শ্যাম্পু মাথায় দেওয়ার বিন্দুমাত্র বাসনা না থাকা সত্ত্বেও পিয়া তাই একটুখানি হাতে নিয়ে চুলে মাখল। জল ঢেলে ফেনা ধুয়ে নিল তারপর যদি জলে ভেসে যাওয়া বুদ্বুদগুলো চোখে পড়ে ফকিরের।

দু'এক মগ জল গায়ে ঢালতেই কাঁপুনি ধরল পিয়ার। এতক্ষণে মনে হল গা মোছার জন্য কোনও তোয়ালে-টোয়ালে তো সঙ্গে নেই! শীত কাটানোর জন্য পাটাতনের ওপর উবু হয়ে বসে নিজের হাঁটুদুটোকে জড়িয়ে ধরল ও। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখতে পেল গা মোছার ব্যবস্থাও করে রেখেছে ফকির। ওই লাল চেক-কাটা কাপড়ের একটা টুকরো বাখারিতে ঝোলানো রয়েছে ওর জন্য। টুকরোটা খটখটে শুকনো। তার মানে বেশ কিছুক্ষণ ধরেই নিশ্চয়ই ওটা রাখা আছে ওখানে। জিনিসটা হাতে নিয়েই ওর কীরকম যেন মনে হল এটা পরেই জলে ঝাঁপ দিয়েছিল ফকির ওকে তোলার জন্য। এই কাপড়গুলো অনেক কাজে লাগে, পিয়া জানে। নাকের কাছে এনে ওর মনে হল রোদে-শুকোনো খরখরে কাপড়টায় নদীর কাদামাটির ধাতব ঘ্রাণ ভেদ করে আবছা একটু ঘামের গন্ধও যেন পাওয়া যাচ্ছে।

হঠাৎ পিয়ার মনে পড়ে গেল এরকম কাপড় ও আগে কোথায় দেখেছে। যখন ও ছোটো ছিল, আমেরিকায় ওদের এগারোতলার ফ্ল্যাটে এই জিনিস দেখেছে ও। ওর বাবার ওয়ার্ডরোবের হাতলে জড়ানো। পরে আস্তে আস্তে ও বড় হয়েছে, কাপড়টা কিন্তু রয়েই গেছে ওখানে—ধূলিমলিন, শতছিন্ন। মাঝে মাঝেই ওটা খুলে ফেলে দেওয়ার ইচ্ছে হত পিয়ার, কিন্তু বাবা কিছুতেই ফেলতে দিত না। এমনিতে সেন্টিমেন্ট-ফেন্টিমেন্টের বিশেষ বালাই ছিল না বাবার, দেশের ব্যাপারে তো নয়ই। অন্যদের মতো দেশের স্মৃতি আঁকড়ে থাকা পছন্দ করত না বাবা। বলত, "আমি বর্তমানের মাটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে ভালবাসি", সাদা বাংলায় ওই বর্তমানের মাটির অর্থ চাকরির উন্নতির সিঁড়ি। সেটা পিয়া পরে বুঝেছে। কিন্তু ওই কাপড়ের টুকরোটা ফেলে দেওয়ার কথা তুললেই বাবা প্রায় আর্তনাদ করে উঠত। বলত এত বছর ধরে ওটা আছে ওখানে যে নখ বা চুলের মতো ওটা প্রায় শরীরের অংশ হয়ে গেছে বাবার। "ওটার সঙ্গে আমার ভাগ্য জড়ানো রয়েছে", ওটা ফেলে দেওয়ার কথা ভাবাই যায় না। কী যেন নাম কাপড়ের টুকরোটার? কী যেন বলত বাবা? শব্দটা জানত একসময় পিয়া। কিন্তু বহুদিনের অব্যবহারে সেটা স্মৃতি থেকে মুছে গেছে।

কুসুম

গেস্ট হাউসটার ছাদে দাঁড়ালে একটানা অনেকটা অবধি চোখে পড়ে। বেশ খানিকটা দূরে হ্যামিলটন হাই স্কুল, তারও পরে নির্মলদের আগেকার বাড়ির জায়গাটা পর্যন্ত এখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল কানাই। সে বাড়িটার জায়গায় এখন একটা হস্টেল উঠেছে স্কুলের ছাত্রদের জন্য, কিন্তু কানাইয়ের মনে নির্মলের সেই বাংলোর ছবি এখনও স্পষ্ট। নামে 'বাংলো' হলেও আকারে প্রকারে বাড়িটা আসলে ছিল স্রেফ একটা গুমটি। পুরোটা কাঠের তৈরি, ইট কি সিমেন্টের বালাই নেই। মাটি থেকে একটু ওপরে হাত-খানেক উঁচু কয়েকটা খুঁটির ওপর যেন কোনওরকমে দাঁড় করানো ছিল সেই বাড়ি। মেঝেটাও ছিল এবড়ো খেবড়ো মতো। শীতে বর্ষায় আবার তার ঢাল বদল হত। কানাইয়ের মনে আছে বর্ষাকালে কেমন স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যেত মেঝেটা, একটু দেবে যেত নীচের দিকে। শীতকালে হাওয়া শুকনো হয়ে এলে আবার টানটান যেমনকে তেমন।

সাকুল্যে দুখানা মাত্র ঘর ছিল সেই 'বাংলোয়। একটা শোয়ার ঘর, আরেকটাকে বলা যেতে পারে স্টাডি মতন, নির্মল আর নীলিমা দুজনেই সেখানে তাদের লেখাপড়ার কাজকর্ম করত। ওই ঘরেই একটা খাট পাতা হয়েছিল কানাইয়ের জন্য। সব সময় মোটা সুতির মশারি ফেলা থাকত তার ওপর। নির্মলদের বড় খাটটাতেও থাকত। যত না মশার জন্য, তার চেয়েও অন্যান্য প্রাণীর জন্য মশারিটা বেশি জরুরি ছিল সে সময়। রাতে তো বটেই, এমনকী দিনের বেলাতেও মশারি খাটানো না থাকলে সাপ-খোপ কি কাঁকড়াবিছে বালিশের তলায় বা বিছানার চাদরের নীচে ঢুকে বসে থাকত। পুকুরের পাড়ে একটা কুঁড়েতে নাকি একদিন তক্তপোশের ওপর একটা মরা মাছ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছিল। সে বাড়ির বউ এসে গল্পটা বলেছিল। একটা আস্ত কইমাছ কে জানে কখন কানে হেঁটে এসে উঠেছে, তারপর বিছানার ওপরেই মরে পড়ে রয়েছে।

রাত্তিরে মশারি গোঁজার আগে সব কোনা-খামচাগুলো একবার ভাল করে দেখে নিতে হত। এইসব রোজকার সাধারণ কাজের মধ্যেও মাঝেমধ্যেই ছোটবড় নানা উত্তেজনার খোরাক থাকত ভাটির দেশে। লুসিবাড়িতে আসার কিছুদিন পর একবার তো মশারি খাটাতে গিয়ে আরেকটু হলেই বিপদে পড়েছিল নীলিমা। রাত্রিবেলা, ঘরে একটা মাত্র মোমবাতি। সেটা আবার রাখা আছে ঘরের অন্য প্রান্তে, জানালার তাকের ওপর। নীলিমা একেই বেঁটেখাটো, তার ওপর চোখেও বেশ পাওয়ার, কম আলোতে ভাল দেখে না। খাটের চারকোনায় চারটে বাঁশের খুঁটি আটকানো, সেগুলির থেকেই মশারিটা ঝোলানো হত। খুঁটি অবধি ভাল করে হাত যায় না, পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কোনওরকমে, আন্দাজে আন্দাজে মশারির দড়িগুলি বাঁধছিল নীলিমা। আচমকা একটা দড়ি যেন জ্যান্ত হয়ে ছিটকে এল। সঙ্গে ফোঁস করে একটা আওয়াজ। নীলিমা তো পড়ি কি মরি করে কোনওরকমে মারল এক লাফ। হাতটা টেনে নেওয়ার আগেই চটাস করে লেজের একটা ঝাঁপটা লাগল তালুর মধ্যে। তারপর একেবেঁকে দরজার তলা দিয়ে সাপটা যখন বেরিয়ে যাচ্ছে ও দেখল সেটা একটা বেশ বড়সড় চিতিবোড়া। যথেষ্ট বিষাক্ত সাপ। সাধারণত মাঝারি গাছের ডালপালার মধ্যে এদের বাস। মশারি খাটানোর বাঁশটাকেও তাই নিজের জায়গা মনে করে বেশ গুছিয়ে বসেছিলেন বাবাজি।

রাত্তিরে খাটে শুলেই কানাইয়ের মনে হত গোটা ছাদটা যেন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। চালার মধ্যে থেকে থেকেই অদ্ভুত সব আওয়াজ পাওয়া যেত—কখনও হয়তো কিছু একটা খচমচ করে দৌড়ে গেল, অথবা ফোঁস করে উঠল কোথাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়তো একটা প্রবল কিচমিচ। মাঝে মধ্যেই ঠপ করে চালা থেকে নীচে পড়ত প্রাণীগুলো। পড়েই অবশ্য লাফিয়ে উঠে বেরিয়ে যেত দরজার তলা দিয়ে, কিন্তু মাঝে মধ্যে সকালে ঘুম থেকে উঠে কানাই দেখত একটা মরা সাপ কি কয়েকটা পাখির ডিম পড়ে আছে মেঝের ওপর, আর পিঁপড়েরা ভোজ লাগিয়ে দিয়েছে। কখনও কখনও এক‌েকটা আবার সোজা মশারির ওপর এসে পড়ত। পড়েই এমন নড়াচড়া শুরু করত যে মশারি টাঙানোর খুঁটিগুলো পর্যন্ত দুলতে

থাকত। এইরকম ক্ষেত্রে একটাই উপায় ছিল। বালিশটা নিয়ে চোখ বুজে এক ঝাঁপটা মারতে হত মশারির চালে। সাপ, ইঁদুর, বিছে যাই হোক না কেন, ওই এক ঝাঁপটাতেই পগার পার হয়ে যেত তারা। কয়েকটা অবশ্য শূন্যে ছিটকে উঠে আবার মশারির ওপর এসে পড়ত। সেরকম হলে ফের বালিশ হাতে রণাঙ্গনে নামতে হত কানাইকে।

বাংলোর পেছন দিকে একটা খোলা উঠোন মতো জায়গা ছিল, সেখানেই লুসিবাড়ি মহিলা সমিতির মিটিং-টিটিং হত। ১৯৭০ সালে কানাইকে যখন নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল এখানে, তখনও মহিলা সমিতি এত বিরাট হয়নি, টিমটিম করে চলছিল কোনওরকমে। সপ্তাহে কয়েকবার করে সমিতির সদস্যারা জড়ো হত নীলিমার বাড়ির উঠোনে। সেলাই-ফোঁড়াই, কাপড় বোনা, সুতো রং করা—এইসব নানান রোজগারমূলক কাজকর্ম নিয়ে আলাপ আলোচনা হত। সাধারণ গল্পগুজবও হত নানা রকম। আর ঘরের কথা উঠলেই অনেক সব জমানো ক্ষোভ-দুঃখের কথাও চলে আসত অনিবার্য ভাবেই।

শুরুর দিকে গাঁয়ের মেয়েদের এইসব ঘরোয়া পাঁচালি শুনতে অসহ্য লাগত কানাইয়ের। সমিতির মিটিং শুরু হলেই ও তাই বেরিয়ে পড়ত বাড়ি থেকে। ঘুরে বেড়াত এদিক ওদিক। কিন্তু তার একটা সমস্যাও ছিল। লুসিবাড়িতে কানাইয়ের সমবয়সি কোনও বন্ধু ছিল না। আর সেরকম কোনও যাওয়ার জায়গাও ছিল না। ওর বয়সের ছেলেপুলে যারা ছিল তারা হয় একেবারে সরল-সোজা, চুপচাপ অথবা অকারণে মারকুটে ধরনের। আর কানাইও মনে মনে জানত যে কয়েক সপ্তাহ পরেই ও এই নির্বাসন থেকে মুক্তি পাবে, ওদের সঙ্গে মেশার জন্য তাই বিশেষ কোনও ইচ্ছেও হয়নি। বারদুয়েক আড়াল-আবডাল থেকে ছোঁড়া ঢিল খাওয়ার পর অবশেষে ওর মনে হল বাড়ির বাইরে থেকে ভেতরেই বেশি নিরাপদ। ফলে দুপুরগুলো ওর কাটতে লাগল মাসির বাংলোর স্টাডিতে শুয়ে-বসে। উঠোনে মিটিং-এর কথাবার্তা হট্টগোলও গা সওয়া হয়ে এল আস্তে আস্তে।

এইরকম একটা মিটিঙেই প্রথম কুসুমকে দেখল কানাই। সামনের একটা দাঁত একটু ভাঙা, ছোটো করে কাটা চুল—একটু যেন আলাদা দ্বীপের অন্যসব মেয়েদের থেকে। আগের বছর টাইফয়েড হওয়ার পর ওকে নেড়া করে দেওয়া হয়েছিল। কোনওরকমে বেঁচে উঠেছিল মেয়েটা। তখনও বেশ দুবলা, সবাই আগলে আগলে রাখত ওকে। সমিতির মিটিংগুলোর সময় ও সেখানে থাকলে কেউ তাই কিছু বলত না। একই কারণে বোধ হয় সেই পনেরো-ষোলো বছর বয়সেও ফ্রক পরে ঘোরাঘুরিতেও ওর বারণ ছিল না। ওর বয়সি গাঁয়ের অন্যান্য মেয়েদের তো শাড়িই পরতে হত। ওই বয়সেও ফ্রক পরার পেছনে অবশ্য অন্য একটা কারণও থাকতে পারে। জামাগুলি তো তখনও যথেষ্ট ব্যবহারযোগ্য। শাড়ি ধরার আগে আরও যতটুকু পরে নেওয়া যায় নিঙড়ে নেওয়া যায় সবটুকু উপযোগিতা। গোটা গোটা ফ্রকগুলি কি প্রাণে ধরে ফেলে দেওয়া যায়?

একদিন সমিতির মিটিং-এ গাঁয়ের এক বউ সবিস্তারে তার দুঃখের কথা শোনাচ্ছিল। কিছুদিন আগের এক রাতের ঘটনা, বলছিল বউটি। তার সোয়ামি গিয়েছিল মাছ ধরতে, ঘরে শুধু সে আর বাচ্চারা। সবাই গভীর ঘুমে। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, একখানা লম্ফ শুধু টিমটিম করে জ্বলছে। এমন সময় গলা পর্যন্ত মাল টেনে টলতে টলতে ঘরে এসে ঢুকল তার শ্বশুর। হাতে এক বিশাল রামদা। বাচ্চাগুলির সামনেই দাটা গলার কাছে চেপে ধরে ছেলের বউয়ের কাপড়ে টান দিল সে। বউ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতেই লোকটা দায়ের এক কোপ মারল তার হাতে। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা প্রায় দু'-আধখান হয়ে গেল। শেষমেশ জ্বলন্ত লম্ফটা বুড়োর গায়ে ছুঁড়ে মেরে সে যাত্রা রক্ষা পেল মেয়েটি। এদিকে বুড়োর লুঙ্গিতে তো গেল আগুন ধরে। বেশ খানিকটা পুড়েও গেল। তাতেই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা খেপে গেল। ঘাড় ধরে বউকে বাড়ির বাইরে বের করে দিল। বেচারির স্বামীর ঘর করা শেষ হল স্রেফ নিজের আর ছেলেমেয়েদের ইজ্জত বাঁচাতে চেয়েছিল বলে।

গল্পের এই জায়গায় এসে গলা চড়তে লাগল বউটির। যেন ঘটনাটা প্রমাণ করার জন্যই প্রায় চিৎকার করে সে বলতে লাগল, "এই যে, এইখানে কোপ মেরেছিল আমাকে, এইখানে,

এইখানে।"

কানাই আর থাকতে না পেরে দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখতে গেল। যে বউটি গল্প বলছিল তাকে দেখা যাচ্ছিল না। বাকি সকলে তার দিকেই তাকিয়ে ছিল বলে কানাইকে কেউ নজর করল না। শুধু একজন ছাড়া কুসুম। বাকিদের থেকে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে ছিল সে। চোখে চোখ পড়ল দু'জনের। মুহূর্তের জন্য মনে হল ওরা যেন সৃষ্টির আদিমতম সময়ে কোনও প্রান্তরের দুদিক থেকে পরস্পরের দিকে চেয়ে রয়েছে, একে অন্যকে মেপে নিতে চাইছে, বুঝে নিতে চাইছে কতটা ভয়ংকরের সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে অন্য প্রান্তে। মনে হচ্ছিল দু'জনের মধ্যেকার এই দূরত্বটুকুর মধ্যেই হয়তো গোপন রয়েছে আজকের এই আবেগের সূত্র—এই বীভৎস হিংসার বীজ। এই পারস্পরিক সমীক্ষার ফলাফল কিন্তু সাধারণ ভয় বা বিতৃষ্ণা ছিল না, দু'জনের দৃষ্টিতেই ছিল একে অপরের সম্পর্কে এক সজাগ কৌতূহল।

কানাইয়ের যদূর মনে পড়ে, কুসুমই ওর সঙ্গে প্রথম এসে কথা বলেছিল। সেই দিন নয়, অন্য আরেক দিন। সকাল বেলায়। বাংলোর মেঝেতে বসে দেয়ালে হেলান দিয়ে একটা বই পড়ছিল কানাই। পরনে স্রেফ একটা খাকি হাফপ্যান্ট। বইটা রাখা ছিল ওর কোলের ওপর। হঠাৎ মনে হল দরজার বাইরে থেকে কে যেন ওকে উঁকি মেরে দেখছে। বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলে ও দেখল হাঁটা চুল আর ছেঁড়া ফ্রক-পরা ধীর গম্ভীর একটা চেহারা দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার সামনে। খানিকটা ঝগড়াটে গলায় চোখমুখ কুঁচকে ওকে জিগ্যেস করল, "কী করছিস তুই এখানে বসে?"

"বই পড়ছি।"

"আমি দেখেছি—সেদিন তুই সব শুনছিলি।"

"কী হয়েছে তাতে?" কাঁধ ঝাঁকাল কানাই।

"আমি বলে দেব।"

"বলগে যা।" কিন্তু বাইরে সাহস দেখালেও ভেতরে ভেতরে ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল কানাইয়ের। যদি সত্যি সত্যি বলে দেয়। প্রসঙ্গটা অন্য দিকে ঘোরাতে তাড়াতাড়ি একপাশে সরে কুসুমের বসার জন্য জায়গা করে দিল ও। কানাইয়ের পাশেই এসে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল মেয়েটা। একেবারে গা ঘেঁষে। হাঁটুর ওপর চিবুক। খুব কাছ থেকে ওর দিকে তাকিয়ে দেখার সাহস হল না কানাইয়ের, কিন্তু টের পাচ্ছিল মেয়েটার শরীরে ঠেকে আছে ওর শরীর ওর কনুইয়ের সঙ্গে, পায়ের সঙ্গে, হাঁটুর সঙ্গে ঘষা খাচ্ছে কুসুমের কনুই, পা, হাঁটু। ওর বাঁদিকের বুকের ওপর একটা ছোট্ট তিল নজরে এল কানাইয়ের। খুবই ছোট্ট একটা তিল, কিন্তু কিছুতেই ও আর সেটার থেকে চোখ সরাতে পারছিল না।

"দেখি, তোর বইটা দেখা তো আমাকে", বলল কুসুম।

বইটা ছিল একটা ইংরিজি রহস্য গল্প। কানাই তাই পাত্তাই দিল না ওর অনুরোধকে। "এটা দেখে তুই কী করবি? কিছুই বুঝবি না।"

"কেন বুঝব না?"

"তুই ইংরেজি পড়তে পারিস?" জিগ্যেস করল কানাই। "না।"

"তালে দেখতে চাইছিস কেন?"

জবাব না দিয়ে কয়েকমুহূর্ত প্যাটপ্যাট করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল মেয়েটা। তারপর ডানহাতটা ওর নাকের সামনে এনে আস্তে আস্তে মুঠোটা খুলে জিগ্যেস করল, "এটা কী জানিস?"

একটা ঘাসফড়িং। তাচ্ছিল্যের ভাব করে কানাই বলল, "না জানার কী আছে। এ তো সব জায়গায় পাওয়া যায়।"

"তা'লে দেখ", বলেই খপ করে ফড়িংটা নিজের মুখের ভেতরে পুরে দিল কুসুম।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হাতের বইটা নামিয়ে হাঁ করে মেয়েটার দিকে চেয়ে রইল কানাই। "তুই খেয়ে ফেললি ওটাকে?"

হঠাৎ হাঁ করল কুসুম। সঙ্গে সঙ্গে ঘাসফড়িংটা একলাফে বেরিয়ে সোজা কানাইয়ের

মুখের ওপর এসে পড়ল। চমকে চেঁচিয়ে উঠে পেছন দিকে উলটে পড়ে গেল কানাই, আর খিলখিল করে হাসতে লাগল মেয়েটা।

"কী বোকা রে! ওটা তো এমনি একটা পোকা। ভিতু কোথাকার।"

কথা

স্নানের পর জামাকাপড় পালটে ছইয়ের তলা দিয়ে গুঁড়ি মেরে নৌকোর সামনের দিকটায় গেল পিয়া। সেই চেক-চেক কাপড়ের টুকরোটা তখনও ঝুলছে হাতে। কিছুতেই মনে আসছে না কাপড়টার নাম। ফকিরকে একবার জিগ্যেস করল, কিন্তু ওর ইশারার প্রশ্ন ফকির বুঝতেই পারল না। একটু অবাক হয়ে হাঁ করে চেয়ে রইল ওর মুখের দিকে। অবশ্য বুঝবে যে, সে আশাও পিয়া বিশেষ করেনি; কারণ এতক্ষণের মধ্যে একবারও ফকির ওকে বাংলা শেখাবার কোনও চেষ্টাই করেনি। একটু আশ্চর্যই হয়েছে তাতে পিয়া। এইরকম ক্ষেত্রে সাধারণত ও দেখেছে লোকে আশেপাশের এটা-সেটার দিকে দেখিয়ে তাদের ভাষায় সেগুলির নাম বলে বলে দিতে থাকে, চেষ্টা করে যাতে ভিনদেশি মানুষটা কিছুটা অন্তত বুঝতে পারে তারা কী বলতে চাইছে। কিন্তু ফকির দেখা গেল ব্যতিক্রম। পিয়া যে ওই চেক কাটা কাপড়টার বাংলা নামটা জানতে চাইতে পারে সেটা তাই ওর মাথাতেই এল না।

কিন্তু পিয়াও হাল ছাড়ার পাত্রী নয়। নানারকম ইশারা অঙ্গভঙ্গি করেই যেতে লাগল যতক্ষণ না ফকির বুঝতে পারে ও কী বলতে চাইছে। বেশ খানিকক্ষণের চেষ্টার পর অবশেষে সফল হল পিয়া। “গামছা”, ফকির সংক্ষেপে বলল। আরে, তাই তো! গামছা, গামছা—শব্দটা তো পিয়া জানে! কিছুতেই মনে পড়ছিল না এতক্ষণ।

আচ্ছা, কেমন করে একেকটা শব্দ এভাবে হারিয়ে যায়? স্মৃতির মধ্যে লুকিয়ে থাকে—ভাঙা আলমারির এক কোনায় পড়ে থাকা পুরনো খেলনার মতো? তারপর কোনওদিন কেউ জঞ্জাল সাফ করতে গিয়ে হঠাৎ সেটা ফিরে পায়, বের করে আনে মাকড়শার জাল আর ধুলোর মধ্যে থেকে।

ছোটবেলার কথা মনে পড়ে পিয়ার। বাংলা ভাষা সে সময় যেন ক্রোধের বন্যার মতো আছড়ে আছড়ে পড়ত ওর দরজায়। ঝড়ের মতো, ঢেউয়ের মতো প্রবল সেই তোড়ের থেকে বাঁচার জন্য গুঁড়ি মেরে ও গিয়ে ঢুকত কাপড়ের আলমারির পেছনে, দু'কান চেপে ধরে দূরে ঠেলে রাখতে চাইত শব্দগুলোকে। কিন্তু আলমারির পলকা দরজা বাবা-মার গলার আওয়াজ আটকাতে পারত না। বাংলা ছিল পিয়ার মা আর বাবার ঝগড়া করার ভাষা। সে ঝগড়ার শব্দ দরজার তলা দিয়ে ফাঁকফোকর গলে পৌঁছে যেত পিয়ার কাছে, মুহূর্তে মুহূর্তে বাড়তে থাকত বন্যার জলের মতো, একেক সময় মনে হত শব্দের সেই জলোচ্ছ্বাস যেন ডুবিয়ে মারতে চাইছে ওকে। যেখানেই লুকোক, কী করে যেন সেই ঝগড়ার আওয়াজ ঠিক খুঁজে খুঁজে বের করত পিয়াকে। সে সময় বাবা আর মা তাদের সমস্ত জমা রাগ উগরে দিত বাংলা ভাষায়। সেই থেকেই ভাষাটার সঙ্গে কোথায় যেন একটা বিষণ্ণতার সুর লেগে রয়েছে। আলমারির কোনায় গুঁড়ি মেরে শুয়ে থাকতে থাকতে সে সময় পিয়া ওই শব্দগুলোকে মাথা থেকে ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেলতে চাইত; এমন সব শব্দের কথা ভাবত যেগুলি হবে ইস্পাতের মতো ভারী, ডাক্তারের দস্তানার মতো পরিষ্কার, ঝকঝকে, জীবাণুমুক্ত। সেই সব শব্দের স্বপ্ন দেখত অভিধানে যাদের ঠিকানা মেলে, যাদের সঙ্গে কোনও অসুখের অনুষঙ্গ জড়িয়ে নেই।

পিয়ার সেই ছোটবেলার শোয়ার ঘরের একটা জানালা দিয়ে এক চিলতে সমুদ্র নজরে আসত। ওদের অ্যাপার্টমেন্টটা ছিল ছোট্ট দুটো বেডরুম, একটা লিভিংরুম আর একটা রান্নাঘর। সেই অ্যাপার্টমেন্টের একটা বেডরুমের জানালা দিয়ে এরকম সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাওয়া রীতিমতো ভাগ্যের ব্যাপার ছিল।

সেই সবচেয়ে ভাল ঘরটাই ছিল পিয়ার নিজের ঘর। দু'বছরের পিয়াকে ঘিরেই তখন ওর মা-বাবার সাজানো সংসার। ওর কাছে তখন সেই বাড়িটা ছিল একটা মন্দিরের মতো, আর ওর নিজের ঘরটা তার গর্ভগৃহ। মা আর বাবা থাকত অন্য ঘরটাতে। সেটা এত ছোট যে খাটের পায়ের দিকটা বেয়ে ওদের বিছানায় উঠতে হত। সেই ছোট্ট বদ্ধ ঘরটাই ছিল ওদের দু'জনের সমস্ত রাগ-অভিমান প্রকাশের একমাত্র জায়গা। তার মধ্যেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা

কাটাত ওরা, এটা-সেটা নিয়ে খিটিমিটি করত, আর মাঝে মধ্যে চিৎকার করে ঝগড়া করত।

বড় ঘরটাকে প্রায় বছর পাঁচেক নিজের দখলে রেখেছিল পিয়া। তারপর হঠাৎ একদিন মা এসে ওকে সেখান থেকে উৎখাত করল। বাবার সঙ্গে এক ঘরে আর থাকতে পারছিল না মা। দরজা বন্ধ করে তাই বাকি পরিবারের থেকে নিজেকে আলাদা রেখে শান্তিতে থাকতে চাইছিল। কিছুদিন পরেই ধরা পড়ল মায়ের ক্যান্সার হয়েছে। সার্ভাইকাল ক্যান্সার। কিন্তু মাঝের বেশ খানিকটা সময় মা ওকে বিছানায় বসতে দিত মনে আছে। একমাত্র পিয়াই তখন যেতে পারত মা-র কাছে, দেখা করতে পারত, ছুঁতে পারত মাকে। আর কাউকেই সে সময় সহ্য করতে পারত না মা। বাবাকে তো নয়ই। পিয়ার মনে আছে ও স্কুল থেকে বাড়ি ফিরলেই মা ওকে আদর করে ডেকে নিত : "আয় পিয়া, আয়, এখানে এসে বোস।" অদ্ভুত ব্যাপার, সেই শব্দগুলো কেমন শুনতে ছিল সেটা পিয়ার আর কিছুতেই মনে পড়ে না (ইংরেজিতে বলত কি মা, নাকি বাংলাতে?) কিন্তু শব্দগুলির মানে, মায়ের গলার আওয়াজ, কথা বলার সুরটা স্পষ্ট মনে আছে এখনও। ও আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখত মা গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে বিছানার ওপর, পুরনো একটা শাড়ি পরে। সারা সকালটা তখন বাথরুমে কাটাত মা, ধুয়ে ধুয়ে কাল্পনিক ময়লা সব সাফ করতে চেষ্টা করত। অতক্ষণ ভিজে থাকার জন্য তাই কেমন যেন ভাজ ভাজ হয়ে থাকত হাতের চামড়া।

সেই সময়েই একদিন জানালা দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পিয়া জানতে পারল মায়ের ছেলেবেলার অনেকটা সময় কেটেছে এইভাবে জলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। মায়ের বাবা ছিলেন আসামের এক চা বাগানের ম্যানেজার। সেই বাগানের ধার ঘেঁষে বয়ে যেত এক বিশাল নদ। তার নাম ব্রহ্মপুত্র। আমেরিকার খুপরি ফ্ল্যাটবাড়ির ঘরে শুয়ে সমুদ্র দেখতে দেখতে মা পিয়াকে তার ছোটবেলার সুখের সময়ের গল্প বলত। রোদটলা সেই চা বাগানে ওরা কেমন দৌড়োদৌড়ি করে খেলে বেড়াত, মাঝে মাঝে লম্বা নৌকোসফরে যেত ব্রহ্মপুত্রে, সেই সব কথা বলত।

পরে, পিয়া যখন গ্রাজুয়েট স্কুলে ভর্তি হল, সে সময়ে ওকে অনেকেই জিজ্ঞেস করত মিষ্টি জলের শুশুকের বিষয়ে ওর আগ্রহের পেছনে কোনও পারিবারিক কারণ আছে কি না। প্রসঙ্গটা উঠলেই গা জ্বলে যেত পিয়ার। ও কী পড়াশোনা করবে, কী গবেষণা করবে সেটা মা বাবা ঠিক করে দিয়েছে—সে ইঙ্গিতটার জন্যে রাগ হত ওর। তা ছাড়া ব্যাপারটা আদৌ সে রকম কিছু ছিল না। ছোটবেলা থেকে ইতিহাসের কথা, পরিবারের কথা, ভাষার কথা, নানা রকম দায়িত্বের কথা পিয়া অনেক শুনেছে, কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কথা মা-বাবা কখনও ভাবেইনি।

যেমন, কলকাতার কথা বহু শুনেছে পিয়া মা-বাবার কাছে, কিন্তু কেউ ওকে কখনও বলেনি যে আমেরিকার এই পিউগেট সাউন্ড সমুদ্রের খুনে তিমির সমগোত্রীয় ওর্কায়েলা ব্রেভিরোস্ট্রিস সেখানেই প্রথম দেখা গিয়েছিল।

খানিক বাদেই রাতের খাওয়া-দাওয়ার তোড়জোড় শুরু করল ফকির। তক্তার নীচ থেকে দুটো বেশ বড়সড় জ্যান্ত কাঁকড়া বের করে নিয়ে এল। সেগুলোকে কালচিটে একটা পাত্র দিয়ে ঢেকে রেখে রান্নার অন্যসব সরঞ্জাম আনতে গেল। ছইয়ের ভেতর থেকে নিয়ে এল বড় একটা ছুরি, সঙ্গে আরও কিছু বাসনপত্র, আর একটা চোঙামতন মাটির জিনিস। সেটাকেও প্রথমে একটা বাসনই ভেবেছিল পিয়া। তার পরে দেখল জিনিসটার গায়ে একদিকে গোলমতো একটা গর্ত করা আছে। শেষে যখন তার মধ্যে টুকরো টুকরো জ্বালুনি কাঠ গুঁজে দিল ফকির, তখন পিয়া বুঝল ওটা আসলে একটা স্টোভ, মাটির তৈরি। স্টোভটাকে নৌকোর পেছনের দিকে তুলে নিয়ে গেল ফকির। ছইয়ের থেকে বেশ খানিকটা দূরে রেখে তাতে আগুন দিল, তারপর হাওয়া দিয়ে দিয়ে গনগনে আঁচ তুলল। এবার খানিকটা চাল ভাল করে ধুয়ে জলটা একটা তোবড়ানো টিনের পাত্রের মধ্যে ঢালল। তারপর চালটাতে আবার খানিকটা জল দিয়ে আগুনে বসাল সেটাকে। খানিক পরে হাঁড়িতে যখন টগবগ শব্দ উঠল, তখন কঁকড়াগুলোকে নিয়ে বসল ফকির। টুকরো টুকরো করে কেটে,

দাঁড়াগুলো ছুরি দিয়ে ভেঙে ভেঙে নিল। ভাত হয়ে যাওয়ার পর হাঁড়ি নামিয়ে আরেকটা কালচে রঙের অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র বসাল সেখানে। তারপর একটা তোবড়ানো টিনের কৌটো থেকে পাঁচ-সাতটা ছোট ছোট কাগজের পুঁটলি বের করল। পুঁটলিগুলো খুলে খুলে পর পর গোল করে সাজিয়ে রাখল স্টোভটার সামনে। দাউ দাউ আগুনের আভায় পিয়া দেখল বিভিন্ন রঙের সব মশলা রাখা আছে মোড়কগুলির মধ্যে কোনওটা লাল, কোনওটা হলুদ, কোনওটা তামাটে। আগুনে বসানো পাত্রটার মধ্যে খানিকটা তেল ঢালল ফকির, তারপর মশলার মোড়কগুলির ওপরে ওর হাত যেন উড়ে বেড়াতে লাগল পাখির মতো। একের পর এক মশলা ছিটিয়ে দিতে থাকল ফুটন্ত তেলে হলুদ, লঙ্কা, ধনে, জিরে।

রান্নার গন্ধটা ঝাঁঝালো লাগছিল পিয়ার নাকে। অনেকদিন এরকম খাবার খায়নি ও। ফিল্ডে থাকলে তো এমনিতে প্যাকেট, ক্যান বা বোতলের জিনিস ছাড়া কিছু মুখেই দেয় না। বছর তিনেক আগে ফিলিপাইন্সের মালাম্পায়া সাউন্ডে কাজ করার সময় একবার অসাবধান হয়েছিল ও। ফল হয়েছিল মারাত্মক। প্রায় বেহুশ অবস্থায় হেলিকপ্টারে করে ওকে তুলে নিয়ে যেতে হয়েছিল ম্যানিলায়, চিকিৎসার জন্য। তারপর থেকে সার্ভেতে গেলেই সব সময় নিজের সঙ্গে খাদ্য-পানীয়ের একটা জোগান রাখে পিয়া। যথেষ্ট পরিমাণে মিনারেল ওয়াটার, আর হালকা কিছু খাবার। প্রধানত হাই-প্রোটিন নিউট্রিশন বার। কখনও কখনও গুঁড়ো দুধ বা ওভালটিন জাতীয় পাউডারও রাখে। দুধ খাওয়ার একান্ত দরকার পড়লে সেটা গুলে নেয়। তা না হলে দিনে গোটা দুয়েক প্রোটিন বারেই ওর চলে যায়। তার একটা বাড়তি সুবিধাও আছে। এতে করে অজানা-অচেনা জায়গায় জঘন্য সব বাথরুম ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় কম।

আগুনের সামনে বসে ফকিরের রান্না করা দেখতে দেখতে বেশ বুঝতে পারছিল পিয়া যে রান্না শেষ হলেই ওকে খেতে বলবে ফকির। কিন্তু এই খাবার তো পিয়া খাবে না। তবু, রান্নার ঝাঁঝালো গন্ধে গা গুলিয়ে উঠলেও, মশলার মোড়কের ওপর দিয়ে উড়ে বেড়ানো ফকিরের আঙুলগুলির দিক থেকে চোখ সরাতে পারছিল না পিয়া। মনে হচ্ছিল ও যেন আবার সেই ছোট্ট পিয়া হয়ে গেছে, পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে ডিঙি মেরে দেখছে স্টোভের পাশে রান্নার তাকের ওপর পর পর সাজানো সব স্টেনলৈস স্টিলের বাসন, যেন ও দেখছে ওর মায়ের আঙুল, মশলার রং আর আগুনের আভার মধ্যে ছুটে বেড়াচ্ছে এদিক থেকে ওদিক। ছেলেবেলার এই ছবিটা হারিয়েই গিয়েছিল পিয়ার মন থেকে। আর সে ছবি যে সুন্দরবনের নদীতে এই নৌকোর ওপর এভাবে ফিরে আসবে সে কথা ও কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি।

এই ঝাঁঝালো গন্ধগুলোই এক সময় কত চেনা ছিল পিয়ার। এগুলিই ছিল ওর বাড়ির গন্ধ। সব সময় এই গন্ধই ও পেত মায়ের গায়ে; স্কুল থেকে ফেরার পথে, ফ্ল্যাটের লিফটে উঠতে উঠতে—সারাক্ষণ এ গন্ধগুলো নাকে লেগে থাকত পিয়ার। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেই দৌড়ে আসত গন্ধগুলো পোষা প্রাণীর মতো। ফ্ল্যাটের বদ্ধ গরম হাওয়ায় যেন পুষ্টি পেত ওরা। পিয়া কল্পনা করত রান্নাঘরটা যেন ওদের খাঁচা, ওখানেই ওরা খায়-দায়, ঘুমোয়। তাই খেলার মাঠে লোকের আলগোছ মন্তব্য বা বন্ধুদের খোঁচা-মারা রসিকতায় পিয়া যখন বুঝতে পারত যে অদৃশ্য পোষা প্রাণীর মতো গন্ধগুলি সব সময় ওর পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ায়, তখন রীতিমতো চমকে যেত ও। এক সময় পিয়ার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। লড়াই শুরু করল ও—এই গন্ধগুলির বিরুদ্ধে, ওর মায়ের বিরুদ্ধে। দীর্ঘ, শান্ত, নাছোড়বান্দা লড়াই। রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে সেখানেই ও ওদের আটকে রাখতে চেষ্টা করত।

কিন্তু এখানে এই নৌকোর ওপরে চারপাশের পরিবেশ যেন শান্ত করে রেখেছে ওই পোষা গন্ধের ভূতগুলোকে। ফকিরের আঙুলগুলোর চলনে প্রায় সম্মোহিত হয়ে গেছে। পিয়া। কেবল একেকটা হাওয়ার দমকে যখন লঙ্কার তীব্র ঝাঁঝ সরাসরি ওর নাকে এসে ঝাঁপটা মারছে, তখনই শুধু মুহূর্তের জন্য কেটে যাচ্ছে সে সম্মোহনের ঘোর। হঠাৎ করে তখন যেন জেগে উঠছে ভূতগুলো, তীক্ষ্ণ নখে চিরে দিচ্ছে ওর গলা আর চোখ—যেন ও কোনওও শত্রুপক্ষের লোক, হঠাৎ সীমান্ত পেরিয়ে চলে এসেছে এখানে। আস্তে আস্তে

নৌকোর সামনের দিকটায় সরে গেল পিয়া। একটু পরে ফকির যখন এগিয়ে এসে ভাতের থালা বাড়িয়ে দিল, তখন জলের বোতল আর প্রোটিন বারগুলোর দিকে দেখিয়ে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হেসে মাথা নাড়ল ও। হাবেভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল, ফকির কিছু যেন মনে না করে।

কিন্তু ফকির যেন জানতই যে ওই খাবার ও খাবে না। একটু অবাক হল পিয়া। ও ভেবেছিল প্রতিবাদ করবে ফকির, আশ্চর্য হবে, কতটা আহত হয়েছে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করবে, কিন্তু সেসব কিছুই করল না ও। একবার মাথা নাড়ল শুধু, আর খানিকক্ষণ চেয়ে রইল পিয়ার দিকে, যেন যাচাই করার দৃষ্টিতে। মনে হল নিজের মনে একটা লিস্টিতে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে ও, বোঝার চেষ্টা করছে কী কী কারণে ওর আনা খাবার ফিরিয়ে দিতে পারে পিয়া। পিয়ার আশঙ্কা হল ফকির হয়তো ভাবছে জাত-পাত বা ওই রকম কোনও রহস্যময় কারণে ও খাচ্ছে না ওই খাবার। তাই নিজের পেটে হাত রেখে খানিকটা শরীর খারাপের অভিনয় করে দেখাল ও কাজ হল তাতে। হেসে ফেলল ফকির। তারপর থালাটা দিয়ে দিল ছেলের হাতে। সেটা হাতে নিয়ে লোভীর মতো সাপটে সুপটে ভাত ক'টা খেয়ে নিল টুটুল।

খাওয়া-দাওয়া হলে বাসনপত্র আর স্টোভটা নিয়ে ফের তক্তার নীচে রেখে দিল ফকির। কয়েকটা মাদুর আর চাদর বের করে আনল সেখান থেকে। এর মধ্যেই ঝিমোতে শুরু করেছিল টুটুল। ছইয়ের নীচে একটা মাদুর পেতে নিয়ে মাথা অবধি চাদর মুড়ি দিয়ে খানিকক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল ও। তার পাশেই আরেকটা মাদুর পেতে দিয়ে সেটার দিকে ইশারা করল ফকির। রাতের জন্য ওখানেই ও পিয়ার শোয়ার ব্যবস্থা করছে। কিন্তু পিয়ার নিজেরই একটা মাদুর রয়েছে সঙ্গে। নীল রঙের পাতলা ফোম একটা, পিঠব্যাগের ফ্রেমের সঙ্গে বাঁধা। ইলাস্টিকের দড়িটা খুলে নৌকোর ওপর সেটা পেতে নিল পিয়া। মাথার দিকটা রাখল নৌকোর মুখের সরু জায়গাটার কাছাকাছি।

পিয়াকে ওইখানে রাতের জন্য শোয়ার বন্দোবস্ত করতে দেখে অস্থির হয়ে উঠল ফকির। বারবার মাথা নেড়ে দূরের জঙ্গলের দিকে ইশারা করতে লাগল হাত দিয়ে। ফকিরের ইঙ্গিতটা মনে হল ইচ্ছাকৃতভাবে খানিকটা অস্পষ্ট। পিয়া অনুমান করল কোনও জংলি জানোয়ারের ভয় পাচ্ছে ও। কোনও হিংস্র জন্তুর ভয়। এতক্ষণে একটু একটু বুঝতে পারছিল ও কেন এরকম একটা অদ্ভুত জায়গায় এনে নৌকোটাকে রেখেছে ফকির। মাঝরাতে যাতে বাঘ এসে হানা দিতে না পারে সেই জন্য মনে হয়। স্থলচর মাংসাশী প্রাণীদের নিয়ে পিয়া কখনও বিশেষ চর্চা করেনি বটে, কিন্তু যত খিদেই পাক শিকারের জন্য পাড় থেকে এতটা দূরে কোনও জন্তু সাঁতরে আসতে পারে বলে মনে হল না ওর। আর চলেই যদি আসে, তা হলে ছইয়ের নীচেই শোও কি বাইরেই শোও, খুব একটা তফাত কি হবে? এ নৌকোর যা ছিরি, একটা বাঘ উঠে এলে তার ভারে সবসুদ্ধই উলটে যাবে মনে হয়।

সব কিছু মিলিয়ে ব্যাপারটা এমন অদ্ভুত অবাস্তব ঠেকল, যে হেসে ফেলল পিয়া। ফকিরকেও মজার ভাগ দেওয়ার জন্য ও হাতের আঙুলগুলো বাঁকিয়ে বাঘের মতো হিংস্র মুখভঙ্গি করে এগিয়ে গেল ওর দিকে। কিন্তু ফকির দু হাত দিয়ে ওর কবজি চেপে ধরল; আর প্রচণ্ড মাথা নাড়াতে লাগল। মনে হল কোনওভাবে ওই প্রসঙ্গটা তুলতেই ও বারণ করছে। তখনকার মতো ব্যাপারটাকে আর না ঘাঁটানোই স্থির করল পিয়া। হাত দিয়ে নিজের মাদুরটাকে টানটান করে নিয়ে শুয়ে পড়ল তার ওপর। মনে হল এটাই ফকিরকে বোঝানোর সবচেয়ে সহজ উপায় যে, কোনও জলচর শ্বাপদের ভয়ে ওই ছইয়ের নীচে গাদাগাদি করে রাত কাটানো ওর পক্ষে সম্ভব নয়। ও আর প্রতিবাদ করল না দেখে স্বস্তি পেল পিয়া। ছইয়ের ভেতর থেকে একটা শাড়ি নিয়ে সেটাকে ভাজ করে বালিশ বানিয়ে এনে দিল ফকির। সঙ্গে একটা তেলচিটে ময়লা চাদর।

তারপর নৌকোর মাঝের দিকে গিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে একটা বিড়ি ধরাল ফকির। একটু পরেই আধো তন্দ্রায় পিয়ার কানে একটা গানের সুর ভেসে এল। ফকির গুনগুন করছে। কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে পড়ল পিয়া। বলল, "সিং"। একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ওর

দিকে খানিক চেয়ে রইল ফকির। এবার পিয়া দু হাত ওপরের দিকে তুলে ইশারা করে বলল, "লাউডার। সিং লাউডার"।

বুঝল ফকির। মাথাটা পেছনে হেলিয়ে গাইল দু' কলি। সুরটা শুনে অবাক হয়ে গেল পিয়া। একেবারে অন্যরকম। এর আগে যেসব ভারতীয় গান ও শুনেছে–ওর বাবার প্রিয় হিন্দি ফিল্মের গান, আর মায়ের গলায় দুয়েকটা বাংলা গান–সেগুলোর সঙ্গে এই সুরটার কোনও মিলই নেই। ফকিরের গলা যে খুব ভাল তা বলা চলে না, একটু কর্কশই; খাদে বা চড়ায় সুর ধরে রাখতে পারছিল না ঠিক, কিন্তু সুরটার মধ্যে কেমন যেন একটা বিষণ্ণতার ছোঁয়া লেগে রয়েছে। পিয়াকে ভেতরে ভেতরে নাড়া দিয়ে গেল সেটা।

এতক্ষণ পিয়ার মনে হচ্ছিল ফকিরের ওই পেশল চেহারার মধ্যে একটা সরল নিষ্পাপ ভাব রয়েছে, যেটা মনকে টানে। কিন্তু এখন এই গান শোনার পর পিয়ার মনে হল ও নিজেই কি একটু বেশি সরল তা হলে? ওর জানতে ইচ্ছে করছিল গানটা কী নিয়ে, গানের কথাগুলোর কী মানে; কিন্তু এই সুরের বেদনা আজ এখানে মনের কোন তার কীভাবে ছুঁয়ে গেল, এক নদী শব্দ খরচ করেও যে তা ঠিকমতো বোঝানো যাবে না সেটাও বেশ বুঝতে পারছিল পিয়া।

বনবিবির মহিমা

কুসুমের বাড়ি ছিল কাছেই একটা দ্বীপে। সাতজেলিয়ায়। ওর বাবা মারা গিয়েছিল জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে। ঘটনাটা ঘটেছিল বনবিভাগের নিষিদ্ধ এলাকায়, আর ওর বাবার কোনও পারমিটও ছিল না। তাই কোনও ক্ষতিপূরণ পায়নি কুসুমের মা। সংসার প্রায় চলে না, রোজগারেরও কোনও সংস্থান নেই, এইরকম সময় একদিন গ্রামের জোতদার দিলীপ চৌধুরি এসে বলল তার সঙ্গে শহরে গেলে একটা কাজ জোগাড় হতে পারে। হাতে যেন চাঁদ পেল কুসুমের মা।

গাঁয়ের আরও অনেক মেয়েকেই কাজ জুটিয়ে দিয়েছে দিলীপ, তাই এ প্রস্তাবে আপত্তির আর কী থাকতে পারে? কুসুমকে আত্মীয়দের কাছে রেখে একদিন সকালে দিলীপের সঙ্গে চলে গেল সে, কলকাতার ট্রেন ধরতে। দিলীপ ফিরে এল একা। কুসুমকে বলল তার মা খুব ভাল একটা বাড়িতে কাজ পেয়েছে, কদিন পরে ওকেও নিয়ে যাবে। খুব বেশিদিন লাগল না; মাসখানেক পরেই দিলীপ এসে বলল মা বলে পাঠিয়েছে ওকে কলকাতায় তার কাছে নিয়ে যেতে।

এই সময় হরেন নস্কর জানতে পারল ব্যাপারটা। হরেন কুসুমের বাবার সঙ্গে কাজ করত। ওর মা-র সঙ্গেও শ্বশুরবাড়ির সূত্রে তার দূর সম্পর্কের একটা আত্মীয়তা ছিল। সে এসে বলল ভুলেও যেন কুসুম দিলীপের ফাঁদে পা না দেয়। ও লোক ভাল নয়। মেয়ে পাচার করাই হল ওর ব্যবসা। কুসুমের মাকে কী কাজ জুটিয়ে দিয়েছে সে খবর কি ও রাখে? নিশ্চয়ই সোনাগাছির কোনও বেশ্যাবাড়িতে পচছে বেচারি। আর কুসুমের দিকে তো আরও বেশি করে নজর যাবেই দিলীপের। কমবয়সি মেয়েদের বেচতে পারলে অনেক বেশি পয়সা আসে। দিলীপের হাতে পড়লে ও হয় কলকাতার কোনও বেশ্যাপট্টিতে, নয়তো বোম্বের কোনও খারাপ জায়গায় গিয়ে ঠেকবে। হরেনই তারপর কুসুমকে লুসিবাড়িতে নিয়ে এসে মহিলা সমিতির হাতে তুলে দিল। ঠিক হল স্থায়ী একটা কিছু ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত সমিতির সদস্যারাই ওর দেখাশোনা করবে।

মাসকয়েক যেতে না যেতেই লুসিবাড়ি দ্বীপটাকে নিজের হাতের তেলের মতো চিনে গেল কুসুম। আর কানাই আসার পর ও-ই হল তার মুরুব্বি। কুসুমই কানাইকে গাঁয়ের সব খবরাখবর দিত—কে কীরকম লোক, কে কার ছেলে বা মেয়ে, গাঁয়ে কোথায় মোরগ লড়াই হচ্ছে, কোথায় কী পুজো হচ্ছে, কার বাচ্চা হল, কে মারা গেল—সব। আর কানাই ওকে বলত শহরের গল্প, ওর স্কুলের কথা, বন্ধুদের কথা। কুসুমের গল্পগুলোর তুলনায় নিজের গল্পগুলো সাদামাটা, ম্যাড়ম্যাড়ে মনে হত কানাইয়ের। কুসুম কিন্তু খুব মন দিয়ে শুনত। মাঝে মাঝে এটা ওটা প্রশ্ন করত।

“আচ্ছা, আমি যদি তোর সঙ্গে শহরে চলে যাই কেমন হয়?” একদিন জিজ্ঞেস করল : কুসুম। “তুই কোথায় থাকিস দেখব বেশ।”

কানাই চুপ করে গেল। এরকম একটা প্রশ্ন যে কুসুম করতে পারে সেটা ভাবতেই পারেনি ও। মেয়েটা কিচ্ছু বোঝে না নাকি? ওকে কলকাতার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুললে কী হবে কল্পনা করতেই সিঁটিয়ে গেল কানাই। মনে মনে পরিষ্কার শুনতে পেল মায়ের গলার ঝাঝালো সুর। আর পাড়ার লোকেরাই বা কী বলবে? “নতুন ঝি নিয়ে এলেন নাকি দিদি? বাসন মাজা কাপড় কাঁচার লোক তো ছিলই একটা আপনাদের। আরও একটা?”

“কলকাতায় তোর ভাল লাগবে না,” খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল কানাই। “ওখানে গিয়ে মানাতে পারবি না তুই।”

কুসুমের কাছ থেকেই শুনেছিল কানাই একটা যাত্রার দল আসছে লুসিবাড়িতে, বনবিবির পালা করবে। বনবিবির গল্পের কথা দুয়েকবার শুনেছে কানাই এখানে এসে, কিন্তু পুরো গল্পটা ঠিকমতো ওর জানা ছিল না। কুসুমকে জিজ্ঞেস করতে ও প্রায় আঁতকে উঠল, “সে কী রে? তুই বনবিবির গল্প জানিস না?”

“না।”

“ভয় পেলে তালে কাকে ডাকিস তুই?”

প্রশ্নের মানেটা ঠিক ধরতে না পেরে অন্য কথা পেড়েছিল কানাই। কিন্তু কথাটা ঘুরতেই থাকল ও মাথার মধ্যে। একটু বাদে নির্মলকে গিয়ে ও ধরল বনবিবির গল্প বলার জন্য।

নির্মল পাত্তাই দিল না। “ছাড়ো তো। এসব এখানকার লোকেদের বানানো উদ্ভট গল্প। এগুলি নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। যত্তসব গাঁজাখুরি কল্পনা।”

“গল্পটা বলোই না আমাকে।”

“হরেনকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো,” বলেছিল নির্মল। “দেখবে ও বলবে, বনবিবি এই পুরো জঙ্গলটার দেবী। বাঘ, কুমির, আরও সব জন্তু জানোয়ার সবাই এখানে বনবিবির কথা শুনে চলে, এই সব। এখানকার অনেক বাড়ির সামনে ছোট ছোট মন্দিরের মতো দেখনি? ওগুলির মধ্যে বনবিবির মূর্তি আছে। তোমার মনে হতে পারে যে এরকম একটা জায়গায় বাস্তব সমস্যাগুলো নিয়ে মাথা ঘামানোটাই গ্রামের লোকের পক্ষে বেশি স্বাভাবিক, কিন্তু এরা সব এই দেবী, পির আর যত সব আজগুবি অলৌকিক জিনিসেই বিশ্বাস করে।”

“কিন্তু গল্পটা আমাকে বলো না,” কানাই নাছোড়বান্দা। “কী নিয়ে গল্পটা? কী ঘটনার কথা আছে ওটাতে?”

“যেমন থাকে সব এরকম গল্পে,” অধৈর্য হয়ে হাত ওলটাল নির্মল। “দেবদেবী, পির ফকির, জন্তু জানোয়ার, দত্যি দানো—এই সব। অনেক লম্বা গল্প। তার চেয়ে এক কাজ করো। যাত্রাটা দেখে নাও, তাহলেই জেনে যাবে গল্পটা।”

যাত্রার মঞ্চ বানানো হয়েছিল লুসিবাড়ির বড়ো ময়দানে, হ্যামিলটনের কুঠি আর স্কুলের মাঝামাঝি জায়গায়। সাদামাটা একটা মঞ্চ, একদিনও লাগেনি তৈরি করতে। চারিদিকে বাঁশের ভারা মতে বেঁধে খানিকটা ওপরে কয়েকটা তক্তা পেতে দেওয়া হল। ওইটাই মঞ্চের মেঝে। পালা চলার সময় পেছনদিকের একটা বাঁশ থেকে একটা রংচং করা কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়া হল। দর্শকদের জন্য সেইটাই হল দৃশ্যপট, আর অভিনেতাদের জন্য পর্দা। তার আড়ালে তারা বিড়ি টানে, খাওয়া-দাওয়া করে, পোশাক বদল করে। আলোকসম্পাতের জন্য ঝুলিয়ে দেওয়া হল কয়েকটা হ্যাঁজাক বাতি, আর সংগীতের জন্য একটা ব্যাটারিতে চালানো ক্যাসেট রেকর্ডার আর লাউডস্পিকার।

লুসিবাড়িতে রাত নামে তাড়াতাড়ি। মোমবাতি কি লম্ফর দাম তো কম নয়; খরচ বাঁচানোর জন্য তাই হিসেব করে আলো জ্বালানো হয়। সূর্যের আলো থাকতে থাকতেই রাতের খাওয়া সেরে নেয় সবাই, আর রাতের অন্ধকার নেমে এলে নিঝুম হয়ে যায় সারা গাঁ। সে নিস্তব্ধতা ভাঙে কদাচিৎ দূর থেকে জলের ওপর দিয়ে ভেসে আসা জানোয়ারের ডাকে। ফলে, রাতে কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজন হলে লুসিবাড়িতে সেটা একটা বিশেষ ঘটনা। কয়েকদিন আগে থেকেই ছেলেবুড়ো সকলে মেতে ওঠে। আসল অনুষ্ঠানের চেয়ে প্রস্তুতিপর্বের উৎসাহটাও কম নয়। যাত্রা যখন শুরু হল, রাতের পর রাত জেগে বনবিবির পালা দেখল গাঁয়ের সমস্ত লোক। কুসুম আর কানাইও।

যাত্রার শুরুতেই একটা চমক অপেক্ষা করে ছিল কানাইয়ের জন্য। এরকম দেবদেবীর কাহিনি আগে যা শুনেছে ও, সেগুলো শুরু হয় স্বর্গে কিংবা গঙ্গার তীরে। কিন্তু এই বাঘের দেবীর গল্পের আরম্ভটা এক্কেবারে অন্যরকম। প্রথম দৃশ্য শুরু হল আরবদেশের এক শহরে। পেছনের সিনে মসজিদ আর মিনারের ছবি আঁকা।

দৃশ্যটা মদিনার। মুসলমানদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। সেই শহরে বাস করত এক ধর্মপ্রাণ মুসলমান, ইব্রাহিম। সন্তানহীন ইব্রাহিম সুফি ফকিরদের মতো পবিত্র জীবন যাপন করত। শেষে দেবদূত গ্যাব্রিয়েলের কৃপায় দুটি যমজ সন্তান হল তার, বনবিবি আর শা জঙ্গলি। এই দুই ছেলেমেয়ে যখন বড় হল, তখন একদিন দেবদূত এসে বলল তাদের ভাইবোনকে আল্লা একটা কাজের ভার দিয়েছেন। এই আরবদেশ থেকে তাদের যেতে হবে আঠারো ভাটির দেশে। গিয়ে সেই জায়গাটাকে মনুষ্যবাসের উপযুক্ত করে তুলতে হবে। এই দায়িত্ব পেয়ে

তো বনবিবি আর শা জঙ্গলি রওনা হল বাংলাদেশের বাদাবন অঞ্চলের উদ্দেশ্যে। পরনে তাদের সাধারণ সুফি ভিক্ষুকের পোশাক।

আঠারো ভাটির দেশে তখন দানবরাজ দক্ষিণরায়ের রাজত্ব। ভয়ংকর তার ক্ষমতা। সেখানকার সমস্ত প্রাণী, ভূত, পিশাচ—সকলে তার কথায় ওঠে বসে। আর মানুষ হল দক্ষিণরায়ের দু' চক্ষের বিষ। কিন্তু মানুষের মাংসের প্রতি তার অসীম লোভ।

একদিন দক্ষিণরায় শুনল জঙ্গলের মধ্যে কে যেন আজান দিচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারল বনবিবি আর শা জঙ্গলি এসেছে তার রাজত্বে। ভয়ানক রেগে গিয়ে তো দক্ষিণরায় তার সমস্ত সৈন্য সামন্ত জড়ো করল। এই দু'জনকে তাড়াতেই হবে এলাকা থেকে। ভীষণ এক যুদ্ধ হল তারপর। যুদ্ধে গোহারা হেরে গেল দক্ষিণরায়। কিন্তু বনবিবির দয়ার শরীর। যুদ্ধে জিতেও দানবরাজকে মারলেন না তিনি। বরং বললেন, এই ভাটির দেশের অর্ধেকটার ওপর রাজত্ব করতে পারে দক্ষিণরায়। সেখানে জঙ্গলের মধ্যে সে তার ভূত পিশাচদের নিয়ে থাকতে পারে। বাকি অর্ধেকটা নিয়ে নিলেন বনবিবি। সেখানে বন কেটে বসত হল। শান্তি এল আঠারো ভাটির দেশে। দেশটাকে জঙ্গল আর বসত, এই দু'ভাগে ভাগ করে বনবিবি সেখানে শৃঙ্খলা নিয়ে এলেন। সুখেই কাটছিল সময়, কিন্তু মানুষের লোভই একদিন শান্তি ভাঙল আবার।

ধনা নামে একটা লোক ভাটির দেশের একপ্রান্তে বাস করত। সে একদিন ঠিক করল জঙ্গলে যাবে, ভাগ্যান্বেষণে। কিন্তু সপ্তডিঙা সাজিয়ে ধনা যখন রওনা হতে যাবে তখন দেখা গেল একজন মাল্লা কম পড়ছে। হাতের কাছেই ছিল দুখে বলে একটা ছেলে। নামেও যেমন দুখে, সারাটা জীবন সেরকম দুঃখেই কেটেছে তার। ছোট্টবেলাতেই বাবাকে হারিয়েছিল দুখে। এখন সে থাকে তার অসুস্থ বুড়ি মা-র সঙ্গে। কোনওরকমে কায়ক্লেশে তাদের সংসার চলে। দুখেকে যেতে দেওয়ার একটুও ইচ্ছে ছিল না তার মায়ের। কিন্তু অবশেষে বিদায় নেওয়ার সময় এল। মা তখন তাকে একটা পরামর্শ দিল। বলল যখনই বিপদে পড়বে, দুখে যেন বনবিবিকে স্মরণ করে। বনবিবি আর্তের সহায়, গরিবের মুশকিল আসান। তিনি নিশ্চয়ই তাকে রক্ষা করবেন।

ধনার নৌবহর তো যাত্রা শুরু করল। ভাটির দেশের এ নদী সে নদী এ খাল সে খাল দিয়ে অবশেষে গিয়ে পৌঁছল কেঁদোখালির চরে। এখন, কেঁদোখালির চর ছিল দক্ষিণরায়ের রাজত্বের মধ্যে। কিন্তু মাল্লারা সেটা জানত না। তারা তো গিয়ে নৌকো ভেড়াল সেখানে। দক্ষিণরায় কিন্তু আগে থেকেই খোঁজ পেয়ে গিয়েছিল। ধনা আর তার দলবলের জন্য কিছু চমকেরও ব্যবস্থা করে রেখেছিল সে। চরে নেমেই তারা দেখল গাছে গাছে বড় বড় সব লোভনীয় মধু-টসটসে মৌচাক। কিন্তু যেই সেগুলির দিকে এগিয়ে যায়, মৌচাক আর দেখা যায় না। সেটা তখন একটু দূরের কোনও গাছে ঝুলছে। সারাদিনে একটা মৌচাকও জোগাড় করতে পারল না ধনা। নাকানিচোবানি খেয়ে গেল একেবারে। তারপর সেই রাতে স্বপ্নের মধ্যে ধনাকে দেখা দিয়ে দক্ষিণরায় দু'পক্ষের স্বার্থরক্ষার জন্য একটা প্রস্তাব দিল। ধনা তার নৌকোয় যে ছেলেটাকে এনেছে সেই ছেলেটাকে চাইল দক্ষিণরায়। বহুদিন হল মানুষের মাংস জোটেনি। দুখেকে খাওয়ার জন্য তাই নোলা সক সক করছে তার। তার বদলে সে ধনাকে নৌকো বোঝাই করে ধনসম্পদ দেবে।

লোভে পড়ে এ প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল ধনা। যেই না রাজি হওয়া, সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের সব ভূত দানো পিশাচ, এমনকী মৌমাছিরা পর্যন্ত মধু আর মোম' নিয়ে এসে ধনার নৌকো ভরে দিল। সবগুলো নৌকো টইটম্বুর হয়ে গেল মোমে আর মধুতে। এবার ধনার কথা রাখার পালা। দুখেকে ডেকে সে বলল জঙ্গল থেকে কিছু কাঠ নিয়ে আসতে। কী আর করে দুখে, নৌকো থেকে নেমে জঙ্গলে ঢুকল। খানিক পরে কাঠ নিয়ে যখন ফিরে এল তখন দেখল যা ভয় পেয়েছিল তাই হয়েছে। একটা নৌকোরও কোনও চিহ্ন নেই। সে একা দাঁড়িয়ে আছে চরে—সামনে তার বিশাল নদী আর পেছনে জঙ্গল। এই সময়ে হঠাৎ দূরে একটা হলুদ কালো ঝলক চোখে পড়ল দুখের। দেখে এক বিরাট বাঘ। নদীর অন্য পারে ঝোঁপের আড়ালে

আড়ালে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। বাঘটা আর কেউ নয়, দক্ষিণরায় স্বয়ং। পৃথিবী ঝাঁপিয়ে প্রচণ্ড এক গর্জন ছেড়ে সেটা লাফ দিল দুখের দিকে। বাঘের ওই বিশাল ভয়ানক

চেহারা দেখে তো তার প্রাণপাখি উড়ে যাওয়ার দশা। ভয়ে জ্ঞান হারাতে হারাতে মায়ের উপদেশের কথা মনে পড়ল দুখের। মনপ্রাণ দিয়ে সে ডাকতে লাগল, "ও বনবিবি, ও দয়াবতী, আমাকে রক্ষা করো, আমার সহায় হও।"

তখন বহুদূরে ছিলেন বনবিবি। কিন্তু ভক্তের ডাক শুনে এক লহমায় নদী পেরিয়ে পৌঁছে গেলেন তার কাছে। দুখেকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে তার শুশ্রূষা করতে লাগলেন তিনি। আর তার ভাই শা জঙ্গলি প্রচণ্ড প্রহার করে তাড়িয়ে দিলেন দক্ষিণরায়কে। দুখেকে তার বাড়ি নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে সেবা শুশ্রূষা করে তাকে সুস্থ করে তুললেন বনবিবি। তারপর দুখের যখন ঘরে ফেরার সময় হল, প্রচুর মধু আর মোম তার সাথে দিয়ে তাকে মায়ের কাছে পৌঁছে দিলেন তিনি। দুনিয়াকে বনবিবি বুঝিয়ে দিলেন, এই হল জঙ্গলের আইন। লোভী বড়লোকেরা শাস্তি পাবে, আর সৎ গরিব মানুষেরা পাবে তার আশীর্বাদ।

কানাই ভেবেছিল বুঝি ওর একঘেয়ে লাগবে এই গেঁয়ো যাত্রা। কলকাতায় তো ওরা নাটক দেখতে যায় অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে আর সিনেমা দেখতে যায় গ্লোবে। কিন্তু যাত্রা দেখতে দেখতে কাহিনিটার মধ্যে ও ডুবে গেল। দানোটা যখন দুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে, সত্যিই প্রচণ্ড ভয়ে তখন কাটা হয়ে গিয়েছিল কানাই। যদিও বাঘের চেহারাটা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য হয়নি, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল সেটা ডোরাকাটা কাপড় জড়ানো আর মুখোশ পরা একটা লোক। আবার বনবিবি যখন দুখের পাশে এসে দাঁড়ালেন, তখনও কানাই কেঁদে ফেলেছিল আনন্দ আর কৃতজ্ঞতায়। সত্যিকারের কান্না। আসরের সক্কলেরই তখন চোখে জল। অবশ্য মঞ্চে বনবিবির আবির্ভাবটা যে খুব অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে হয়েছিল তা নয়। এমনকী দুখে যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে আর বাঘ তাকে খেয়ে নিতে যাচ্ছে, তখনও বনবিবি মঞ্চের একপাশে ঝুঁকে পড়ে মুখ থেকে পানের ছিবড়ে ফেলতে ব্যস্ত। শেষে দর্শকরাই তাড়া দিয়ে দিয়ে পাঠাল তাকে দুখের কাছে। কিন্তু এসব কিছুই কাহিনির সাবলীল গতিকে রোধ করতে পারেনি। অভিনয় শেষ হওয়ার আগেই কানাই বুঝতে পেরেছিল এ পালা তাকে আবার দেখতে হবে।

যাত্রা যেদিন শেষ হল লুসিবাড়িতে, সেদিন সে এক দেখার মতো দৃশ্য। আশেপাশের সব দ্বীপ থেকে লোক একেবারে ভেঙে পড়েছিল। প্রচণ্ড ঠেলাঠেলি। ময়দানে তিল ধারণের জায়গা নেই। গুঁতোগুঁতির মধ্যে কানাই আর ভেতরের দিকটায় ঢুকতে পারেনি। একধারে কোনার দিকে বসে দেখছিল। এতবার দেখার পর প্রথম দিকটায় একটু একঘেয়েমি এসে গিয়েছিল কানাইয়ের; বসে বসেই ও ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভেঙে দেখল ও কুসুমের পাশে বসে আছে। "কী হচ্ছে রে?" ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল কানাই। "কোন জায়গাটা হচ্ছে এখন?" কোনও সাড়া নেই। যাত্রায় একেবারে ডুবে গেছে কুসুম, কানাই যে পাশে বসে আছে সে তার খেয়ালই নেই। কী এত মুগ্ধ হয়ে দেখছে কুসুম বোঝার জন্য মঞ্চের দিকে তাকিয়ে কানাই দেখে যা ভেবেছিল তার চেয়ে একটু বেশিই ঘুমিয়েছে ও। কাহিনি অনেকদূর গড়িয়ে গেছে। ধনা আর তার দলবল কেঁদোখালির চরে পৌঁছে গেছে। এর পরেই দক্ষিণরায়ের সঙ্গে সেই চুক্তিটা হবে।

"কুসুম?" ফিসফিস করে আবার ডাকল কানাই। মুহূর্তের জন্য মুখ ফেরাল কুসুম।

হ্যাজাকের অস্পষ্ট আলোয় কানাই দেখল নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে আছে ও, আর দু'গাল বেয়ে গড়াচ্ছে চোখের জল। এই যাত্রা দেখতে দেখতে কান্না আসতেই পারে, তাই খুব একটা আশ্চর্য হল না কানাই। কিন্তু তারপর কুসুম যখন হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করল, তখন ওর মনে হল শুধু যাত্রা দেখে তো এরকম ভাবে কাঁদবে না। নিশ্চয়ই অন্য কোনও কারণ আছে। মুহূর্তের আবেগে, কুসুমকে সান্ত্বনা দিতে একটা হাত বাড়িয়ে দিল কানাই, ওর হাত ধরার জন্য। কিন্তু যেখানে থাকবে ভেবেছিল কুসুমের হাত সেখানে ছিল না। বদলে ওর ফ্রকের ভঁজে জড়িয়ে গেল কানাইয়ের আঙুল। ফ্রকের জট

থেকে হাত ছাড়ানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল কানাই, কিন্তু বাইরে বেরিয়ে আসার বদলে কুসুমের শরীরের একটা নরম আর অপ্রত্যাশিত রকম গরম জায়গায় ঠেকে গেল ওর আঙুল। সে স্পর্শের অভিঘাতে চমকে উঠল ওরা দুজনেই, ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো।

চাপা একটা চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল কুসুম। তারপর কোনওরকমে হোঁচট খেতে খেতে বেরিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। কানাইয়ের ইচ্ছে করছিল ছুটে যায় ওর পেছন পেছন, কিন্তু স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশেই মনে হল ঠিক হবে না সেটা করা। লোকে দেখলে খারাপ ভাবতে পারে। মিনিট দুয়েক তাই অপেক্ষা করল কানাই। তারপর ধীরে ধীরে উঠে অন্য আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে এল ভিড় ছেড়ে। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে অনেকটা ঘুরে এসে কানাই ধরল কুসুমকে। ও তখন হ্যামিলটনের কুঠির দিকে যাচ্ছে। "কুসুম—একটু দাঁড়া। দাঁড়া একটু।"

দূরের হ্যাজাক থেকে যেটুকু আলো চুঁইয়ে আসছিল তাতে দেখা যাচ্ছিল কোনও রকমে হাতড়াতে হাতড়াতে হাঁটছে কুসুম, মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে নাক দিয়ে গড়িয়ে পড়া জল মুছে নিচ্ছে জামার কাঁধে। "কুসুম," চাপা গলায় আবার ডাকল কানাই। "দাঁড়া একটু বলছি।" কাছে এসে ওর কনুই ধরে ফেলল কানাই। "ভুল করে হয়ে গেছে, আমি ইচ্ছে করে করিনি।"

থেমে গেল কুসুম। কানাইও দাঁড়িয়ে গেল শক্ত হয়ে। ভাবল এক্ষুনি কুসুম খিঁচিয়ে উঠবে, গালাগাল আর বকুনির তোড়ে ধুইয়ে দেবে ওকে। কিন্তু কিছুই বলল না কুসুম। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কানাইয়ের মনে হল কুসুমের মন খারাপের পেছনে ওর ভূমিকা নিতান্তই সামান্য। মনে হল শুধু একটা ছেলের ভুল করে ছুঁয়ে দেওয়া নয়, ওই কান্নার উৎস রয়েছে আরও গভীরে কোথাও।

কুঠির গেটের প্রায় সামনে চলে এসেছে ওরা এখন। এক লাফে গেটটা ডিঙিয়ে গেল কানাই। কুসুমকে ডাকল তারপর, "আয় না, চলে আয়।" এক মুহূর্ত দোনামনা করে কুসুমও ঢুকল ভেতরে। ওর হাত ধরে পুকুরপাড়ের শ্যাওলা ধরা ইটের ওপর দিয়ে দৌড়ে কুঠিতে ওঠার সিঁড়ির সামনে এসে পৌঁছল কানাই। কুসুমকে নিয়ে তুলল ঢাকা বারান্দাটায়। তারপর পুরনো কাঠের দেওয়ালটায় পিঠ দিয়ে মেঝের ওপর বসে পড়ল ওরা। ময়দানটা পরিষ্কার চোখে পড়ছে এখান থেকে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে স্টেজের ওপর দুখে শুয়ে আছে, আকুল হয়ে ডাকছে বনবিবিকে।

কুসুমই কথা বলল প্রথম। "আমিও ডেকেছিলাম। কিন্তু আসেনি।"

"কে?"

"বনবিবি। যেদিন বাবা মরে গেল। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, আমার চোখের সামনে একেবারে। আমি কত বার ডাকলাম বনবিবিকে..."

আর পাঁচটা দিনের মতোই ছিল সেই দিনটা। আর ঘটনাটা ঘটেছিল ভর দুপুরে—সূর্য তখন মাঝ আকাশে। বাড়িতে টাকা ছিল, খাবারও ছিল। কারণ ঠিক তার আগের দিন মাছ ধরা সেরে ফিরেছে কুসুমের বাবা। বেশ ক'দিনের জন্যে বেরিয়েছিল মাছ ধরতে। অনেক মাছ পেয়েওছিল। ক্ষতি বলতে একটাই হয়েছিল সেবার, গামছাটা বাবা হারিয়ে এসেছিল। ভাল করে খেতে চেয়েছিল বাবা। মা বসে রাঁধছিল, ভাত ডাল তরকারি। কিন্তু মাছ রাঁধতে গিয়ে দেখে জ্বালানি কাঠ শেষ হয়ে গেছে। শুনেই তো বাবা খেপে আগুন। কতদিন খাওয়া জোটেনি ঠিক মতো, সেদিন তো ভাল করে খাবেই। কিছুতেই ছাড়বে না। দুমদাম করে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। বলল এক্ষুনি ফিরবে কাঠ নিয়ে।

ওদের কুঁড়েটা ছিল বাঁধের গায়ে, সরু একটা খাঁড়ির পাড়ে। নৌকো বেয়ে অন্য পারের জঙ্গলটায় যেতে খুব বেশি হলে দশ থেকে পনেরো মিনিট লাগত। রিজার্ভ ফরেস্ট ছিল ওটা, কিন্তু জ্বালানি কাঠের দরকার হলে ওখান থেকেই নিয়ে আসত ওদের গাঁয়ের লোক। কুসুমও বেরোল বাবার পেছন পেছন; বাবা নৌকো নিয়ে ওপারে গেল, আর ও বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। উলটোদিক থেকে প্রচণ্ড হাওয়া দিচ্ছিল সেদিন, তাই এমনিতে যা লাগে তার চেয়ে বেশি সময় লাগছিল বাবার ওপারে পৌঁছতে। তারপর বাবা যখন নৌকোটাকে ঠেলে পাড়ে তুলছে, তখনই কুসুম দেখতে পেল জানোয়ারটাকে—গোটাটা দেখা

যাচ্ছিল না, কিন্তু ঝোঁপের ফাঁকে হলুদ কালো ডোরা যেটুকু নজরে আসছিল সেটুকুই বোঝার পক্ষে যথেষ্ট।

"মানে, তুই দেখতে পেলি—" কিন্তু কানাই বাঘশব্দটা উচ্চারণ করার আগেই কুসুম ওর মুখটা চেপে ধরল হাত দিয়ে। "বলিস না, বলিস না একদম। নাম বললেই এসে হাজির হবে।"

পাড়ের ঝোঁপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছিল জন্তুটা। ওর এগোনো দেখেই বুঝতে পেরে গিয়েছিল কুসুম যে নদী পেরোনোর সময় ও নৌকোটাকে দেখতে পেয়েছে। কুসুমের প্রথম চিৎকারটাতেই ওর মা আর আশেপাশের পড়শিরা ছুটে বেরিয়ে এসেছিল বাঁধের ওপর। কিন্তু যাকে ডাকছিল চেঁচিয়ে সে-ই শুনতে পেল না। তখন উলটোদিকে বইছিল হাওয়া, তাই কুসুমের গলার আওয়াজ পৌঁছল না বাবার কানে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে জনা বিশেক লোক জড়ো হয়ে গেল বাঁধের ওপরে। কুসুমের সঙ্গে ওরাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল জানোয়ারটা এগোচ্ছে বাবার দিকে। গাঁয়ে পুরুষ যারা ছিল সবাই দৌড়ল নৌকো আনতে। মেয়েরা হাতের কাছে থালা ঘটি বাটি যা পেল সব নিয়ে বাজাতে লাগল আর চিৎকার করতে লাগল যত জোরে পারে। কিন্তু কোনও লাভ হল না। হাওয়া তখন ওদের দিকে বইছিল, ওপারে তাই কিছুই শুনতে পেল না বাবা। জানোয়ারটাও ছিল তার শিকারের তুলনায় হাওয়ার উলটোদিকে এপার থেকে দেখা যাচ্ছিল চকচক করছে ওর গাটা। ও জানে হাওয়ায় ওর গায়ের দুর্গন্ধ পাওয়া যায়, তাই সেরকম ভাবেই চলাফেরা করে ও। এই উলটো হাওয়ার মুখে ওপারের অতগুলো লোক কিছুই করতে পারবে না সেটা যেন ও জানত। এত ওর সাহস, শেষটায় তো বেরিয়েই পড়ল ঝোঁপের আড়াল ছেড়ে। শিকার ধরার জন্য দৌড়তে শুরু করল পাড় ধরে; আড়াল-টাড়ালের আর পরোয়াই করল না। সবাই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল এপার থেকে। আশ্চর্য সেই ভয়ংকর দৃশ্য। এরকম আগে বোধহয় কেউ দেখেওনি কখনও। কারণ ভাটির দেশের এই বড় বেড়ালের চলাফেরা এক্কেবারে ভুতের মতো। তার পায়ের ছাপ দেখা যায়, গর্জন শোনা যায়, গায়ের গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু তাকে দেখা যায় না সহজে। এতই কম চোখে পড়ে জন্তুটা, যে বলা হয় যারা তাকে দেখে তারা কেউ আর ঘরে ফেরে না। সেদিনের ওই দৃশ্য দেখতে দেখতে তো কয়েক জন মেয়ে অজ্ঞানই হয়ে গেল বাঁধের ওপর।

কিন্তু কুসুম অজ্ঞান হয়নি। ও হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছিল। ফিসফিস করে বলছিল, "ও বনবিবি, দয়াবতী গো, আমার বাবাকে বাঁচিয়ে দাও।" চোখ বুজে ছিল কুসুম, তাই দেখতে পায়নি শেষটা। কিন্তু কান তো খোলা ছিল। হাওয়া ওদের দিকে ছিল বলে প্রতিটা আওয়াজ স্পষ্ট ভেসে আসছিল জলের ওপর দিয়ে। প্রথম কানে এল গর্জনটা, যাতে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল বাবা। "বাঁচাও" বলে একবার চেঁচিয়ে উঠল। তারপর জানোয়ারটার থাবার ঝাঁপটে ঘাড়টা মটকে গেল বাবার। হাড় ভাঙার শব্দটা স্পষ্ট শোনা গেল। শেষে ঝোঁপঝাড়ের সড়সড় আওয়াজ এল কানে। শিকার নিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে গেল শয়তানটা।

এই সারাটা সময় বনবিবির নাম জপ করে গিয়েছিল কুসুম। একবারও থামেনি।

হরেন এসে তুলেছিল ওকে ধুলো থেকে। "বনবিবি শুনতে পেয়েছেন তোর কথা। অনেক সময় তার কাছের মানুষদের এভাবেই ডেকে নেন উনি। তোর বাবার মতো বাউলেরাই তাই সবসময় আগে যায়," বলেছিল হরেন।

ঘটনাটা বলতে বলতে শরীর ছেড়ে দিয়েছিল কুসুমের। কোনও রকমে কানাইয়ের কাঁধে ভর দিয়ে বসেছিল ও। কানাই টের পাচ্ছিল ওর গায়ে এসে লাগছে কুসুমের চুল। গল্পটা শুনতে শুনতে কী যেন একটা দলা পাকিয়ে উঠছিল ওর গলার কাছে। ইচ্ছে করছিল দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কুসুমকে, ইচ্ছে করছিল ওর শোক ভুলিয়ে দেয়, মুছিয়ে দেয় ওর চোখের জল। নিজের শরীর দিয়ে দেওয়ালের মতো আড়াল করে রাখে ওকে গোটা পৃথিবীর কাছ থেকে। এরকম তীব্র শারীরিক অনুভূতি এর আগে কখনও হয়নি কানাইয়ের। কাউকে আগলে রাখা, আড়াল করার এই প্রচণ্ড ইচ্ছা, সহানুভূতির এরকম সুতীব্র শারীরিক প্রকাশ কানাই এর আগে কোনওদিন এভাবে অনুভব করেনি। নিজের ঠোঁট দিয়ে কুসুমের চোখ

মুছিয়ে দিল ও। এত কোমল উষ্ণ সেই অনুভূতি, যে থামতে পারল না কানাই। এক হাতে জড়িয়ে ধরে কুসুমকে বুকে টেনে নিল ও, নিজের মাথা চেপে ধরল ওর মাথায়।

হঠাৎ একটা আওয়াজ শোনা গেল। কেউ যেন দৌড়ে আসছে। মচমচ করে উঠল হ্যামিলটন বাংলোর সেগুনকাঠের সিঁড়ি। "কুসুম, কুসুম"—হরেনের গলা। চাপা হিসহিস স্বরে ও ডাকছে কুসুমকে।

"আমি এখানে," বলে দাঁড়িয়ে উঠল কুসুম।

ওদের সামনে এসে হাঁপাতে লাগল হরেন। "কুসুম, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের। আমি দিলীপকে দেখলাম, কয়েকটা লোককে নিয়ে এসেছে। তোকে খুঁজছে। এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়। লুসিবাড়ি থেকে পালাতে হবে তোকে।"

কানাইয়ের পাশে এসে হাঁটু গেড়ে বসল হরেন। ওর ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল রেখে বলল, "একটা কথা শুনে রাখো ছোটবাবু। যদি কেউ জানতে পারে কুসুম কোথায় গেছে আর কার সঙ্গে গেছে, তা হলে তুমিও কিন্তু খুব বিপদে পড়বে বলে রাখলাম। বুঝেছ?"

জবাবের অপেক্ষা না করে কুসুমের হাত ধরে বেরিয়ে গেল হরেন। দৌড়ে।

সেই শেষ দেখা কুসুমের সঙ্গে। পরদিন নির্মল বলল কানাইয়ের বনবাস শেষ, ওকে ফেরত দিয়ে আসা হবে কলকাতায়।

স্পন্দন

পূর্ণিমা আসতে এখনও ক'দিন বাকি। চাঁদের তিন ভাগ মাত্র দেখা যাচ্ছে। তাও এত উজ্জ্বল জ্যোৎস্না এসে পড়েছে জলের ওপর, মনে হচ্ছে নদীর ভেতর থেকে যেন আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। একটু ঠান্ডা ঠান্ডা পড়েছে রাতের দিকটায়, কিন্তু হাওয়া চলছে না। পাড় থেকেও কোনও শব্দ ভেসে আসছে না। নিঝুম নিস্তরঙ্গ চারদিক। অস্বচ্ছন্দ তন্দ্রায় একবার পাশ ফিরল পিয়া। ঠিক করে নিল ভাজ-করা শাড়ির বালিশটা। দেখে নৌকোর গলুই-এর কাঠটার ওপর মাথা রেখে শুয়ে আছে ও। হঠাৎ একটা নড়াচড়ার আওয়াজে ঘুম ছুটে গেল পিয়ার। কীসে যেন খচমচ করছে, নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে নৌকোর গা, ডিঙি বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। যেন নৌকোর পেটের ভেতর থেকে কাঠ ভেদ করে কানে আসছে আওয়াজটা। কয়েকমিনিট লাগল পিয়ার বুঝতে, ব্যাপারটা কী। কিছুই না, ফকিরের ডিঙির জীবন্ত পণ্যভাণ্ডার। তক্তার নীচে কঁকড়াগুলি নড়াচড়া করছে, তারই শব্দে ঘুম ভেঙেছে পিয়ার। কঁকড়ার খোলার খটর খটর, দাঁড়াগুলোর কট কট আওয়াজ, ডালপালার খসখস স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল পিয়া। মনে হচ্ছিল ও যেন একটা দৈত্য, মাটিতে কান পেতে শুনছে কোনও পাতালপুরীর প্রাণস্পন্দন।

নৌকোটা দুলে উঠল হঠাৎ, মনে হল কারও নড়াচড়ায়। পায়ের দিকে তাকিয়ে পিয়া দেখল ডিঙির মাঝের জায়গাটায় ফকির বসে আছে। একটা চাদর দিয়ে তাঁবুর মতো করে ঘাড় পর্যন্ত মোড়া। পিয়া ভেবেছিল ও বোধহয় ঘুমোচ্ছে ছইয়ের নীচে। কিন্তু ফকিরের বসার ভঙ্গিটায় এমন একটা পাথুরে নিশ্চলতা রয়েছে, বোঝাই যাচ্ছিল বেশ খানিকক্ষণ ওই ভাবে বসে আছে ও। পিয়া যে ওর দিকে তাকিয়ে আছে সেটা যেন টের পেল ফকির। ঘুরে তাকাল ওর দিকে। পিয়া জেগে গেছে দেখে হাসল। হাসিটার মধ্যে একই সঙ্গে একটা কৈফিয়ত আর আত্মবিদ্রুপের ভাব। ওখানে বসে বসে ওকে আর টুটুলকে পাহারা দিচ্ছে ফকির, ভেবে ভাল লাগল পিয়ার। মনে পড়ল জলের তলায় প্রথম যখন ফকিরের হাতের ছোঁয়া পেয়েছিল, কী প্রচণ্ড চেষ্টা করেছিল পিয়া সেটাকে সরিয়ে দিতে—যতক্ষণ না ও বুঝেছিল যেটা ওকে ধরার চেষ্টা করছে সেটা কোনও হিংস্র প্রাণী নয়, একটা মানুষ, যার ওপর ও ভরসা করতে পারে, যে ওর কোনও ক্ষতি করবে না। বিশ্বাসই হচ্ছিল না পিয়ার যে কয়েক ঘণ্টা হয়েছে মাত্র ও উলটে পড়েছিল জলে ওই লঞ্চটা থেকে। ঘটনাটা মনে পড়তেই সারা শরীর কেঁপে উঠল পিয়ার। চোখ বুজতেই মনে হল আবার যেন জল চেপে ধরেছে ওকে চারদিক থেকে, ও যেন সেই অদ্ভুত উজ্জ্বল অতলে তলিয়ে যাচ্ছে ফের, যেখানে সূর্যের আলোর কোনও দিকদিশা নেই, যেখানে বোঝা যায় না কোনদিকে গেলে ওপরে ওঠা যাবে আর কোনদিকে গেলে ডুবে যাবে নিতল গভীরে।

পিয়ার মনে হল নৌকোটা যেন নড়ছে ওর শরীরের নীচে। বুঝতে পারছিল কাঁপুনি হচ্ছে ওর। একের পর এক লম্বা লম্বা শ্বাস নিয়ে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করছে, এমন সময় কাঁধের কাছে একটা ঠান্ডা, দৃঢ় হাতের স্পর্শ পেল পিয়া। অদ্ভুত ভাবে, এই ছোঁয়াটাও ওকে সেই পড়ে যাওয়ার কথা মনে করিয়ে দিল। ফকির এসেছে—বুঝতে পারল ও। চোখ মেলে দেখল উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে ফকির চেয়ে আছে ওর মুখের দিকে। একটু হাসার চেষ্টা করল পিয়া, কিন্তু খিচুনির মতো কাঁপছে সারা শরীর, তাই মুখবিকৃতির মতো দেখাল হাসিটা। ও বুঝতে পারল ফকিরের উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে যাচ্ছে, তাই ওর হাতের ওপর একটা হাত রাখল। হাতটা ধরে নিয়ে ওর পাশে শুয়ে পড়ল ফকির, লম্বা হয়ে। ওর শরীরের লোনা, রোদে-পোড়া গন্ধ এখন পিয়ার নাকে; দু'জনের মধ্যে ব্যবধান বলতে একটা চাদর, সেটা ভেদ করে ফকিরের পাঁজরগুলি অনুভব করতে পারছিল পিয়া। ফকিরের গায়ের ওমে ধীরে ধীরে গরম হয়ে উঠল চাদরটা, শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে থিরথিরে কাঁপুনির ভাবটা থিতিয়ে এল আস্তে আস্তে। কাঁপুনি থামতে একটু অপ্রতিভ হয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল পিয়া। ফকিরও ছিটকে উঠে পড়ল। পিয়া বুঝতে পারছিল একই রকম অপ্রস্তুত বোধ করছে ও-ও। কী করে বোঝানো

যায় ফকিরকে যে সব ঠিক আছে, কিছু মনে করেনি পিয়া, ভুল বোঝেনি ওকে? ভেবে পেল না পিয়া। সশব্দে গলা পরিষ্কার করল একবার, তারপর শুধু বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ"। ঠিক সেই সময়েই, যেন এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে ওদের উদ্ধার করার জন্য ঘুমের মধ্যে কেঁদে উঠল টুটুল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে ছইয়ের ভেতর ঢুকে গেল ফকির, ছেলেকে শান্ত করতে।

পুঁটুলি পাকানো শাড়িটার ওপর আবার মাথা নামাল পিয়া। মনে হল কাপড়টার ভাজে ভজে ওটার মালিকের গন্ধ পাচ্ছে ও। যেন হঠাৎ সে সশরীরে উপস্থিত হয়েছে এই নৌকোর ওপর। ভেবে ভাল লাগল পিয়ার, ফকিরকে যা বলতে চেয়েছিল একই কথা বলতে পারবে তাকেও—অনৈতিক কিছু করেনি ওরা, কিছু ঘটেইনি আদতে।

কীই বা ঘটতে পারত? ফকিরের বিষয়ে খুব একটা কিছু জানে না পিয়া, কিন্তু এটুকু তো বোঝা গেছে যে ও বিবাহিত এবং ওর একটা বাচ্চা আছে। আর নিজের সম্পর্কেও এটা অন্তত বলতে পারে পিয়া যে এরকম ব্যক্তিগত কোনও জটিলতায় জড়ানোর কথা ও স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। ও একটা কাজের দায়িত্ব নিয়ে এসেছে, এ জায়গাটা প্রকৃতপক্ষে ওর কর্মক্ষেত্র। আর ব্যক্তিগত সম্পর্কের থেকে দূরে থাকলেই একটা জায়গা কর্মক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে। দুয়ের মধ্যে যে ভেদরেখা সেটার পবিত্রতায় বিশ্বাস করে পিয়া; নিজের কাজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না করে সে রেখা ও কিছুতেই পেরোতে পারবে না।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল পিয়ার নৌকো ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে। চোখ খুলে দেখে রাতের ঠান্ডা বাতাস আর নদীর গরম জলের ধাক্কায় ধাক্কায় জমে ওঠা কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে আছে চারদিক। নিজের পাটুকু পর্যন্ত কোনওরকমে দেখতে পাচ্ছিল পিয়া; গায়ের চাদরটা চুপচুপে ভিজে গেছে হিমে। পুব আকাশে একটা আবছা আভা দেখে শুধু বোঝা যাচ্ছিল যে সূর্য উঠেছে। এই আলোতেও কী করে নৌকো চালাচ্ছে ফকির ভেবে একটু আশ্চর্য হল পিয়া। বোঝাই যাচ্ছে এই জলের রাস্তা ওর মুখস্থ প্রায়, তাই এই ঝুম কুয়াশাতেও নদী-খাঁড়ির কিনারা বুঝে বুঝে ডিঙি চালিয়ে নিয়ে যেতে কোনও অসুবিধাই হচ্ছে না।

উঠে পড়ার কোনও তাড়া ছিল না, তাই আবার আরামে চোখ বুজল পিয়া। একটু পরে হঠাৎ থেমে গেল নৌকোটা। পিয়ার ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখল কুয়াশা এখনও বেশ ঘন, চারপাশের জল জঙ্গল কিছুই নজরে আসছে না। ডিঙির পেছনের দিক থেকে নোঙর নামানোর শব্দ কানে এল এবার। পিয়া একটু অবাক হল। এরকম একটা জায়গায় এনে কেন নোঙর ফেলছে ফকির? কুয়াশার জন্যই হবে নিশ্চয়ই। হয়তো বড় নদীতে কি মোহনায় এসে পড়েছে, ভাল করে না দেখে আর দিক ঠিক করা যাচ্ছে না।

আবার ঘুমিয়ে পড়তে যাচ্ছিল পিয়া, হঠাৎ একটা আওয়াজ পেয়ে চমকে উঠে বসল সোজা হয়ে। ভাল করে শোনার জন্য হাত রাখল কানের পেছনে। আবার সেই আওয়াজ! ছলাৎ করে জলের শব্দ একটু, তারপর একটা চাপা নাক ঝাড়া দেওয়া শব্দ। যেন খুব মোটা রুমালের মধ্যে কেউ নাক পরিষ্কার করছে।

"আশ্চর্য!" ছিটকে উঠে হাঁটু গেড়ে বসল পিয়া, কুয়াশায় কান পেতে শুনতে লাগল মনোযোগ দিয়ে। মিনিট কয়েক ভাল করে শুনে বোঝা গেল বেশ কয়েকটা ডলফিন ঘোরাঘুরি করছে নৌকোর চারপাশে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানা দিক থেকে আসছিল শব্দগুলো, জায়গা বদলাচ্ছিল মুহূর্তে মুহূর্তে। কয়েকটা আওয়াজ খুব ক্ষীণ, মনে হয় যেন কিছুটা দূর থেকে আসছে; কয়েকটা আবার বেশ স্পষ্ট, ধারে কাছেই। দিনের পর দিন কাটিয়েছে পিয়া এই চাপা ঘোঁতঘোঁত আওয়াজ শুনে, ও জানে একমাত্র ইরাবড়ি ডলফিন, মানে ওর্কায়েলা ব্রেভিরোষ্ট্রিস ই পারে এরকম আওয়াজ করতে। অর্থাৎ একটা ওর্কায়েলার ঝক এই পথ দিয়ে যেতে যেতে নৌকোটাকে দেখে একটু থেমেছে এখানে। আর এমনই পিয়ার কপাল যে ঘটনাটা এমন একটা সময় ঘটছে যখন ও নিজের হাতের তেলো পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। আগের আগের অভিজ্ঞতা থেকে পিয়া জানে যে মিনিট কয়েক পরেই অস্থির হয়ে উঠবে ডলফিনগুলো। হয়তো ওর যন্ত্রপাতি বের করতে করতেই ওরা চলে যাবে দূরে।

"ফকির!" ও-ও শুনেছে কিনা আওয়াজগুলো সেটা বোঝার জন্য চাপা গলায় ডাকল

পিয়া। একটু দুলে উঠল নৌকোটা। বুঝল ফকির এগিয়ে আসছে। তাও চমকে গেল পিয়া ওকে দেখে : কাঁধের কাছে ঘেঁড়া ছেঁড়া কুয়াশায় মনে হল ওর মাথাটা যেন ভাসছে শূন্যে, একটা মেঘের ওপর।

"লিসন," শব্দগুলোর দিকে ইশারা করে কানের পেছনে একটা হাত রেখে বলল পিয়া। মাথা নাড়ল ফকির, কিন্তু অবাক হল না; যেন এই ডলফিনের ঝাঁকের সঙ্গে দেখা হওয়াটা অপ্রত্যাশিত কিছু নয়, ও যেন আগে থেকেই জানত যে ওগুলি থাকবে এখানে। তা হলে ও কি রাত থেকে এদিকেই আসছিল, পিয়াকে ডলফিন দেখাবে বলে?

আরও গুলিয়ে গেল পিয়ার মাথাটা। ফকির করে জানবে যে ঠিক এই সময়ে এই এক ঝাক ওর্কায়েলা আসবে এখানে? হতে পারে নদীর এ জায়গাটায় ডলফিনের ঝাক মাঝে মাঝে আসে, কিন্তু তাও, আজকে এই সময়টাতেই যে ওরা এখানে থাকবে সেটা ও জানবে কী করে? আর যাই হোক, এরকম ভ্রাম্যমাণ শুশুকের ঝুঁকের চলাফেরার ঠিক ঠিকানা আগে থেকে অনুমান করা তো অসম্ভব ব্যাপার, সেটা তো অস্বীকার করা যায় না। যাক গে, এখন এসব প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আপাতত এই কুয়াশার মধ্যেই যতটা পারা যায় তথ্য সংগ্রহ করে নিতে হবে।

হাতে সময় বেশি নেই যদিও, কিন্তু ব্যাগ থেকে কাজের যন্ত্রপাতি বের করার সময় পিয়া খুব ধীর এবং গোছানো। একগোছা ডেটাশিট বের করে ক্লিপবোর্ডে আটকাতে যাবে, ঠিক সেই সময় মাত্র মিটার খানেক দূরে ভেসে উঠল একটা ডলফিন। এত কাছে যে ওটার নিশ্বাসের সঙ্গে ফোয়ারার মতো বিন্দু বিন্দু জল এসে লাগল পিয়ার গায়ে। পিঠের পাখনা আর ভোঁতা নাকটা একবারের জন্য দেখা গেল। সন্দেহের আর কোনও জায়গা নেই, এগুলো ওর্কায়েলা-ই।

কোনওই ভুল নেই। যদিও শুরু থেকেই মোটামুটি নিশ্চিত ছিল পিয়া সে ব্যাপারে, তাও এবার চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হয়ে গেল। নৌকোর এত কাছে ভেসে উঠেছিল শুশুকটা, যে জিপিএস মনিটরটা হাত বাড়িয়ে ধরে রেখেই রিডিং নিয়ে নিল পিয়া। ডেটাশিটে সংখ্যাগুলো লেখার সময় যেন একটা যুদ্ধজয়ের আনন্দ হচ্ছিল ওর—এক্ষুনি, এই মুহূর্তেও যদি চলে যায় ডলফিনগুলো, এই ছোট্ট কাগজের টুকরোটায় তো ধরা থেকে গেল এই তথ্যপ্রমাণ।

এর মধ্যে পাতলা হয়ে এসেছে কুয়াশা। ভাটাও শেষ হতে চলল প্রায়; কয়েকশো মিটার দূরেই ডাঙা দেখা যাচ্ছে। পিয়া লক্ষ করল ফকির নৌকোটা যেখানে এনে দাঁড় করিয়েছে, সেটা একটা বাঁকের মুখ। পাড়টা এখানে এসে একটা ভাঁজ করা হাতের মতো বেঁকে গেছে। ফলে কনুইয়ের বাঁকটায় একটা নিস্তরঙ্গ এলাকা তৈরি হয়েছে নদীর মধ্যে। আর ঠিক এই স্থির গভীর জায়গাটার মধ্যেই এসে নোঙর ফেলেছে ফকির। খানিকটা বুমেরাং-এর মতো দেখতে এই দহটা লম্বায় প্রায় এক কিলোমিটার। এই জায়গাটুকুতেই, যেন অদৃশ্য একটা পুকুরের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে ওই ডলফিনগুলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোরের কুয়াশা আর রাতের ঠান্ডা সুদূর স্মৃতির মতো কোথায় মিলিয়ে গেল। উঁচু বাঁধ আর ঘন জঙ্গলের বাধা পেরিয়ে কোনও হাওয়াও আসতে পারছে না নদী পর্যন্ত। স্থির জলের বুকে নদীর মধ্যে যেন আর একখানা সূর্য জ্বলছে। ওপরের মেঘহীন আকাশ থেকে আগুনের হলকা নামছে, জলের বুক থেকেও ঠিকরে উঠে আসছে তাপ। পারা চড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঁসফাস করতে করতে মাটির নীচের জীবনপ্রবাহ উঠে আসছে পাড়ের কাদায়। পালে পালে কঁকড়া চলে বেড়াচ্ছে সেখানে, ঝাঁপিয়ে পড়ছে নদীর রেখে যাওয়া পাতা আর অন্যান্য রসালো আবর্জনার ওপর।

দুপুর পর্যন্ত ডেটা যা জোগাড় হল তাতে ঝকটায় কটা ডলফিন আছে মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই আন্দাজ করা চলে। পিয়া হিসাব করে দেখল সব মিলিয়ে সাতটা। তার মধ্যে একটা জোড়া মনে হচ্ছে একসাথে সাঁতরাচ্ছে আর মোটামুটি একই সঙ্গে ভেসে উঠছে। জোড়াটার একটা ডলফিন দলের অন্যগুলোর চেয়ে মাপে একটু ছোট। ওটা নিশ্চয়ই একটা ছানা; একেবারে কচি বাচ্চাও হতে পারে। হয়তো এখনও মাকে ছেড়ে নিজে নিজে আলাদা

সাঁতরানোর বয়স হয়নি। পিয়া দেখল ছানাটা বার বার পাক খেতে খেতে উঠে আসছে জলের তলা থেকে, ছোট্ট মাথাটা ভেসে উঠছে জলের ওপর—মানে এখনও ঠিকমতো শ্বাস নিতেও শেখেনি ওটা। যতবার ওই কচি মাথাটা ভেসে উঠছিল, আনন্দে নেচে উঠছিল পিয়ার মনটা : তার মানে ওর্কায়েলারা এখনও বংশবৃদ্ধি করছে এখানে।

সাঁতার কেটেই যাচ্ছে শুশুকগুলো, বাঁকের মুখটা ছেড়ে অন্যদিকে যাচ্ছেই না প্রায়। নদীর ওই ছোট্ট গভীর অংশটার মধ্যে পাক খেয়ে যেতেই যেন ভাল লাগছে ওদের। নৌকোটার জন্য যে ওরা এখানে ঘুরঘুর করছে তাও নয়; যেটুকু আগ্রহ নৌকোটার প্রতি ওদের ছিল সে কখন ফুরিয়ে গেছে।

তা হলে কীসের জন্য ঘুরছে ডলফিনগুলো এখানে? এ জায়গাটায় ওরা এসেছেই বা কেন, আর কীসের জন্যই বা অপেক্ষা করছে? খুবই গোলমেলে সমস্যা। পিয়ার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে খুব কৌতুলহজনক কিছু একটা ঘটছে এখানে; এমন কিছু, যা থেকে ইরাবড়ি ডলফিন এবং তাদের স্বভাব সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নতুন তথ্য জানা যেতে পারে। ওকে শুধু মাথা খাঁটিয়ে বের করতে হবে রহস্যটা কী।

মরিচঝাঁপি

সবে ভোর হয়েছে। জানালায় পর্দা নেই, তাই নরম রোদে ধুয়ে যাচ্ছে ঘরটা। সাতসকালেই ঘুম ভেঙে গেল কানাইয়ের। মুখহাত ধুয়ে জামাকাপড় পালটে একটু বাদে নীচে নেমে এল ও। টোকা দিল নীলিমার দরজায়।

"কে?" কেমন যেন কাঁপা কাঁপা শোনাল মাসির গলাটা।

"আমি—কানাই।"

"আয়। ভোলাই আছে দরজা।" ঘরে ঢুকে কানাই দেখল পিঠের কাছে কয়েকটা বালিশ জড়ো করে তাতে ঠেস দিয়ে বসে আছে নীলিমা। পায়ের ওপর বড় একটা লেপ ফেলা রয়েছে অগোছালো ভাবে। চোখদুটো কুঁচকে রয়েছে, যেন দেখতে পাচ্ছে না ভাল করে। বিছানার পাশের টেবিলে এক কাপ চা আর একটা প্লেটে মারি বিস্কুট চার-পাঁচটা। ঘরে জামাকাপড় বা নীলিমার নিজের ব্যবহার্য জিনিসপত্র বলতে কিছুই নেই; শুধু বই আর ফাইলপত্র ঠাসা বিছানায়, মেঝেতে, এমনকী মশারির পুঁটলির ওপরে পর্যন্ত। খুবই সাদামাটা কেজো চেহারার ঘর, আসবাব বলতে প্রধানত কয়েকটা বইয়ের আলমারি আর ফাইল ক্যাবিনেট। নীলিমার বড় খাটটা না থাকলে এটাকে ট্রাস্টের আর-একটা অফিসঘর বলে ভুল হতে পারত।

"তোমাকে কিন্তু অসুস্থ দেখাচ্ছে মাসি, কানাই বলল। "ডাক্তারকে খবর দিয়েছ?" হাতের রুমালটায় একবার নাক ঝাড়ল নীলিমা। "ওই সর্দি লেগেছে একটু। সেটা বলে দিতে আবার ডাক্তার কেন লাগবে?"

"যাই বল মাসি, তোমার কাল ক্যানিং-এ যাওয়াটা ঠিক হয়নি," বলল কানাই। "ধকলটা একটু বেশি হয়ে গেছে। শরীরের দিকে আরেকটু নজর দিতে হবে তোমাকে।"

হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর মতো ভঙ্গি করে কথাটা উড়িয়ে দিল নীলিমা। "ছাড় তো আমার কথা। তোর কথা বল। আয়, এখানে এসে বোস। ভাল ঘুম হয়েছিল তো রাত্তিরে?"

"তোফা।"

"আর প্যাকেটটা?" নীলিমার গলায় আগ্রহ ঝরে পড়ছে। "ওটা পেয়েছিস তো?"

"হ্যাঁ। যেখানে বলেছিলে সেখানেই রাখা ছিল।"

"বল না রে কী আছে ওটায়? গল্প না কবিতা?"

মাসির গলায় প্রত্যাশার সুরটুকু কানাইয়ের কান এড়াল না। ও বুঝতে পারছিল নীলিমার বিশ্বাস এমন কিছু আছে ওই প্যাকেটটায় যাতে মৃত্যুর পরেও তার স্বামীর সাহিত্যিক খ্যাতি নতুন করে ছড়িয়ে পড়বে। মাসিকে নিরাশ করতে খারাপ লাগছিল কানাইয়ের। যতটা সম্ভব নরমভাবে ও বলল, "আসলে আমি যা ভেবেছিলাম সেরকম কিছু নেই ওটায়। আমার মনে হয়েছিল হয়তো গল্প কি কবিতা বা প্রবন্ধ-টবন্ধ থাকবে, কিন্তু যেটা আছে সেটা একটা ডায়ারি বা জার্নাল মতো। সাধারণ একটা খাতায় লেখা, স্কুলের বাচ্চারা যেমন খাতা ব্যবহার করে সেরকম।"

"ও, তাই?" ম্লান হয়ে এল নীলিমার চোখ। একটা আশাভঙ্গের দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক থেকে। "কোন সময়কার লেখা রে? তারিখ-টারিখ কিছু আছে?"

"হ্যাঁ। ১৯৭৯-তে লেখা," কানাই বলল।

"১৯৭৯?" এক মুহূর্ত চুপ করে কী ভাবল নীলিমা। "কিন্তু সে বছরই তো ও মারা গেল। জুলাই মাসে। তুই ঠিক দেখেছিস? ওই বছরেই লেখা ওটা?"

"হ্যাঁ," বলল কানাই। "কেন আশ্চর্য হচ্ছ তুমি?"

"বলছি," নীলিমা বলল। "কারণ সে বছরটায় একেবারে লেখালিখির ধার দিয়েই যায়নি নির্মল। তার আগের বছরই ও রিটায়ার করল লুসিবাড়ি স্কুলের হেডমাস্টার হিসেবে। তার পর থেকেই ওর সময়টা ভাল যাচ্ছিল না। আমরা লুসিবাড়ি চলে আসার পর থেকেই, মানে প্রায় তিরিশ বছর ধরে ওই স্কুলটাই ছিল ওর প্রাণ। রিটায়ার করার পর থেকেই কেমন একটা যেন

হয়ে গেল ও। আগেও ওর একটা মানসিক সমস্যা ছিল, সে তো জানিসই, তাই সব সময় খুব চিন্তায় থাকতাম আমি। দিনের পর দিন কোথায় উধাও হয়ে যেত, ফেরার পর আর মনেও করতে পারত না কোথায় গিয়েছিল। খুবই অস্থিরতার মধ্যে কেটেছিল সে বছরটা ওর। লেখার মতো অবস্থাতেই ছিল না।”

“হয়তো খানিকটা সময়ের জন্য সুস্থিতি ফিরে এসেছিল কখনও একটা,” বলল কানাই। “আমার এক ঝলক দেখে যা মনে হল, গোটা খাতাটা একদিনে, বা খুব বেশি হলে দু'দিনে লেখা।”

“তারিখটা লিখেছে কি?” খুঁটিয়ে কানাইকে নজর করতে করতে জিজ্ঞেস করল নীলিমা।

“লিখেছে,” কানাই বলল। “মেসো ওটা লিখতে শুরু করেছিল ১৯৭৯ সালের ১৫ মে সকালবেলা। মরিচঝাঁপি বলে একটা জায়গায়।”

“মরিচঝাঁপি!” শব্দটা বলতে গিয়ে হঠাৎ একটা শ্বাস টানল নীলিমা।

“হ্যাঁ, কানাই বলল। “সেখানে কী হয়েছিল বলো তো আমায়।”

নীলিমা বলতে শুরু করল। মরিচঝাঁপি এই ভাটির দেশেরই একটা দ্বীপ। লুসিবাড়ি থেকে নৌকোয় কয়েক ঘণ্টার পথ। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের আওতায় ছিল দ্বীপটা, কিন্তু এ ধরনের অন্য দ্বীপগুলোর মতো দুর্গম ছিল না। ১৯৭৮ সালে একটা সময় হঠাৎ বহু মানুষ এসে হাজির হল মরিচঝাঁপিতে। যে দ্বীপে মানুষের কোনও বসতি ছিল না, প্রায় রাতারাতি হাজার হাজার লোক এসে থাকতে শুরু করল সেখানে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তারা বাদাবন সাফ করে, বাঁধ তৈরি করে, শত শত কুঁড়ে বানিয়ে ফেলল। এত তাড়াতাড়ি পুরো ব্যাপারটা ঘটল, শুরুতে তো কেউ জানতেই পারেনি এ লোকগুলো কারা, কোথা থেকে এসে উদয় হল এখানে। আস্তে আস্তে জানা গেল ওরা হল বাংলাদেশি রিফিউজি। অনেকে সেই পার্টিশনের সময় এসেছিল, অনেকে আবার পরে বিভিন্ন সময় বর্ডার পেরিয়ে এসে ঢুকেছে। একেবারে হতদরিদ্র সব মানুষ, বাংলাদেশে মুসলমানদের আর উঁচু জাতের হিন্দুদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে চলে এসেছে এপারে।

“বেশিরভাগই ছিল আমরা এখন যাদের দলিত বলি সেরকম,” নীলিমা বলল। “তখন বলা হত হরিজন।”

মরিচঝাঁপিতে আসার সময় কিন্তু এরা বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসেনি; তখন ওরা পালাচ্ছিল মধ্য ভারতের একটা সরকারি পুনর্বাসন শিবির থেকে। এই শিবির ছিল মধ্যপ্রদেশের দণ্ডকারণ্যে, গভীর জঙ্গলের মধ্যে। পশ্চিমবাংলা থেকে বেশ কয়েকশো কিলোমিটার দূরে। পার্টিশনের পর পরই তখনকার ওই পূর্ব পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের অনেককে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেখানে।

“সরকার তো ওগুলোকে বলত ‘পুনর্বাসন’ শিবির, কিন্তু লোকে বলত কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প, জেলখানা,” বলল নীলিমা। “ওই উদ্বাস্তুদের সব সময় পাহারা দিয়ে রাখত নিরাপত্তারক্ষীরা, ক্যাম্প ছেড়ে কোথাও যাওয়ার জো ছিল না। কেউ পালালে ঠিক খুঁজে বের করে ফিরিয়ে আনা হত তাকে।”

ক্যাম্পগুলো যেখানে বানানো হয়েছিল সেখানকার মাটি ছিল পাথুরে, বাংলাদেশের মাটির সঙ্গে তার কোনও মিল ছিল না। উদ্বাস্তুরা ওখানকার ভাষা বলতে পারত না, আর স্থানীয় লোকেরাও মনে করত ওদের ওখানে থাকার কোনও অধিকার নেই, উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। মাঝে মাঝেই তারা তির ধনুক আর মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উদ্বাস্তুদের ওপর হামলা চালাত। অনেক বছর ধৈর্য ধরে ওই ক্যাম্পে ছিল মানুষগুলো। অবশেষে ১৯৭৮-এ কিছু লোক জোট বেঁধে পালাল ওখান থেকে। ট্রেনে করে, পায়ে হেঁটে ওরা পুবদিকে চলতে শুরু করল। ভাবল সুন্দরবনে গিয়ে বসত করবে। মরিচঝাঁপিতে আসবে বলেই ঠিক করে রেখেছিল ওরা।

তার কিছুদিন আগেই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছে পশ্চিমবঙ্গে; রিফিউজিরা ভেবেছিল এই সরকার তাদের বিশেষ কিছু বলবে না। কিন্তু এইখানেই হিসেবে গণ্ডগোল

হয়ে গিয়েছিল ওদের। সরকার বলল মরিচঝাঁপিকে সংরক্ষিত এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়েছে, সেখান থেকে উঠে যেতেই হবে উদ্বাস্তুদের। প্রায় বছর খানেক ধরে বার বার রিফিউজিদের সংঘর্ষ হল সরকারি লোকেদের সঙ্গে।

"আর শেষ ঝামেলাটা হয়েছিল," বলল নীলিমা, "আমার যদূর মনে পড়ছে, ওই ১৯৭৯-র মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে।"

"মানে তুমি বলছ ওই গণ্ডগোলটা যখন হয়েছিল মেসো তখন ওখানে ছিল?" এক মুহূর্ত থেমে গেল কানাই। আরেকটা সম্ভাবনার কথা মনে হল ওর। "নাকি পুরোটাই কল্পনা?"

"জানি না রে কানাই," অন্যমনস্ক ভাবে নিজের হাতের দিকে চেয়ে বলল নীলিমা। "সত্যি জানি না। সে বছরটায় যেন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিল নির্মল। আমার সঙ্গে কথা বলত না, কথা লুকিয়ে রাখত। এমন ব্যবহার করত যেন আমি ওর শত্রুপক্ষের লোক।" কানাই দেখতে পাচ্ছিল আরেকটু হলেই কেঁদে ফেলবে নীলিমা। মাসির জন্য খুব খারাপ লাগছিল ওর। "খুব কষ্টে কেটেছে সে সময়টা তোমার?"

"খুব কষ্টে রে," নীলিমা বলল। "মরিচঝাঁপি নিয়ে যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল মানুষটা। আমার ভাল লাগত না। বুঝতে পারছিলাম একটা ঝামেলা হতে যাচ্ছে ওখানে; নির্মলকে তার থেকে দূরে রাখতে চাইছিলাম আমি।"

কানাই মাথা চুলকাল একবার। "একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না। এই ব্যাপারটা নিয়ে এত কেন ভাবছিল মেসো?"

একটু সময় নিয়ে জবাবটা দিল নীলিমা। "একটা জিনিস ভুলে যাস না কানাই, কম বয়সে বিপ্লবের কথা ভাবতে ভালবাসত নির্মল। পার্টি বা পুরনো কমরেডদের থেকে সরে এলেও এরকম লোকেরা জীবনে সেসব কথা ভুলতে পারে না। বুকের মধ্যে থেকে গোপন ঈশ্বরের মতো সে চিন্তা ওদের চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়, ওদের প্রাণশক্তির কাজ করে। যন্ত্রণার মধ্যে, বিপদের মধ্যে ওরা আনন্দ পায়। মেয়েদের কাছে সন্তানের জন্ম দেওয়ার অনুভূতি যে রকম, ভাড়াটে যোদ্ধাদের কাছে যুদ্ধ যে রকম, বিপ্লবের চিন্তায়, আপদ বিপদের মধ্যে সেই রকম অনুভূতি হয় ওদের।"

"কিন্তু মরিচঝাঁপিতে যারা এসেছিল তারা তো আর বিপ্লব করছিল না।"

"না," বলল নীলিমা। "একেবারেই না। ওদের উদ্দেশ্য ছিল একেবারে সোজাসাপটা। ওরা শুধু মাথা গোঁজার জন্য একটু জমি চেয়েছিল। কিন্তু তার জন্য সরকারের সঙ্গে লড়তে প্রস্তুত ছিল ওরা। একদম শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ের জন্য ওরা তৈরি ছিল। তাই যথেষ্ট। তার মধ্যেই বিপ্লবের কাছাকাছি পৌঁছনোর একটা রাস্তার ছায়া দেখতে পেয়েছিল নির্মল। ওদের লড়াইয়ে তাই অংশ নিতে চেয়েছিল ও। খানিকটা হয়তো নিজের বয়সটাকে ভুলে থাকার ইচ্ছেও কাজ করছিল এর পেছনে।"

মেসোর চেহারাটা কানাইয়ের চোখে ভাসছিল। ওই ধুতি-পাঞ্জাবি পরা শান্ত নম্র মানুষটাকে ঠিক বিপ্লবী বলে কিছুতেই ভাবতে পারছিল না ও। "তুমি কখনও বোঝাতে চেষ্টা করেছিলে মেসোকে?"

"করিনি আবার?" নীলিমা বলল। "কিন্তু শুনলে তো! আমাকে বলত, "তুমিও ওই সরকারি লোকেদের মতো হয়ে গেছ, ওদের মতো করে ভাবছ। এই যে সমাজসেবা করে যাচ্ছ এত বছর ধরে, সেজন্যেই তোমার দৃষ্টিভঙ্গি এরকম পালটে গেছে। সেইজন্যেই এরকম সব চিন্তা আসছে তোমার মাথায়। আসল ব্যাপারগুলোই আর চোখে পড়ছে না তোমার।" সারা জীবন ধরে একটু একটু করে গড়ে তোলা ওর কাজকে কেমন এককথায় উড়িয়ে দিয়েছিল নির্মল সে কথা মনে করে একবার চোখ বন্ধ করল নীলিমা। গড়িয়ে পড়া চোখের জল মুছে নিতে মাথাটা ঘুরিয়ে নিল ও। "আমরা দু'জন যেন দুটো ভূতের মতো বাস করছিলাম একটা বাড়িতে। শেষের দিকটায় আমাকে যেন শুধু কষ্ট দিতেই ভাল লাগত ওর। আচ্ছা ভাব, অন্য কী কারণ থাকতে পারে তা ছাড়া এই খাতাটা আমাকে না দিয়ে তোকে দিয়ে যেতে চাওয়ার?"

"কী বলব বুঝতে পারছি না।" কানাই ভেবেছিল খাতাটা ওকে দিয়ে যাওয়ার কারণ হল

ওর সঙ্গেই শুধু বাইরের বধির জগৎটার একটা যোগসূত্র আছে বলে মনে করেছিল মেসো। এক মুহূর্তের জন্যেও ওর মনে হয়নি যে নীলিমার মনে ব্যথা দিতে চেয়েছিল নির্মল। ব্যাপারটা ভেবেই একটু শিউরে উঠল কানাই। বরাবরই মেসোকে একটু খ্যাপাটে মানুষ বলে জানে ও, কিন্তু তার মধ্যে কোনও নিষ্ঠুরতা আছে বলে কখনওই মনে হয়নি। আর নীলিমার প্রতি নিষ্ঠুর হবে নির্মল সে তো ও স্বপ্নেও ভাবেনি কখনও। আর সকলের মতো কানাইও এতদিন জানত যে বেশ ভালই ছিল ওদের দুজনের জীবন; ঠিক রাজযোটক যাকে বলে তা না হলেও, সুখী দম্পতিই ছিল ওরা। এখন ও বুঝতে পারল নির্মল লুসিবাড়ি ছেড়ে বেরোত না বলেই এই ধারণাটা ওদের কোনওদিন বদলায়নি।

কী কষ্টের মধ্যে মাসিকে এতগুলো বছর কাটাতে হয়েছে ভেবে কী যেন একটা দলা

পাকিয়ে উঠছিল কানাইয়ের গলার ভেতরে। "শোনো," দাঁড়িয়ে উঠল কানাই, "আমি এক্ষুনি তোমাকে খাতাটা এনে দিচ্ছি। তুমি রেখে দাও, ফেলে দাও–যা ইচ্ছে করো। ওটা আমার কোনও দরকার নেই।"

"না, কানাই!" নীলিমা যেন চেঁচিয়ে উঠল। "বোস, বোস।" হাতটা ধরে টেনে ওকে। চেয়ারে বসাল নীলিমা। "কানাই, আমার কথাটা একবার শোন। আমি সব সময় নির্মলের প্রতি আমার কর্তব্য করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। ওর শেষ ইচ্ছের যাতে অসম্মান না হয় সেটা দেখাটাও খুব বড় ব্যাপার আমার কাছে। আমি জানি না কেন নির্মল ওটা তোকে দিয়ে যেতে চেয়েছিল, ওটায় কী আছে তাও জানি না আমি, কিন্তু ওর ইচ্ছাটা আমাকে রাখতেই হবে।"

চেয়ার থেকে উঠে বিছানায় মাসির পাশে গিয়ে বসল কানাই। ওর একটু অস্বস্তি হচ্ছিল কুসুমের প্রসঙ্গটা তুলতে, কিন্তু আর কোনও উপায় দেখল না ও। "আচ্ছা," খুব আস্তে বলল কানাই, "তোমার কি মনে হয় কুসুমের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ আছে ব্যাপারটার?"

নামটা শুনেই যেন একটু কুঁকড়ে গেল নীলিমা। "হ্যাঁ কানাই, এরকম একটা গুজব সে সময় শোনা গিয়েছিল। সেটা অস্বীকার করব না।"

"কিন্তু মরিচঝাঁপিতে কী করতে গিয়েছিল কুসুম?"

"কী করে কী ঘটেছিল সে আমি জানি না, কিন্তু সে সময় কুসুম ছিল মরিচঝাঁপিতে।"

"যে সময়টায় ও ওখানে ছিল তার মধ্যে কুসুমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তোমার?" কানাই জিজ্ঞেস করল।

ঘাড় নাড়ল নীলিমা। "হ্যাঁ, একবার মাত্র। দেখা করতে এসেছিল ও আমার সঙ্গে। এই ঘরেই।"

একদিন সকালবেলা–১৯৭৮ সালে–এসেছিল ও। নীলিমা তখন নিজের টেবিলে বসে কাজ করছে। একজন নার্স এসে বলল কে যেন দেখা করতে এসেছে, বলছে নাকি নীলিমাকে চেনে। কী নাম জিজ্ঞেস করতে বলতে পারল না নার্সটি। "ঠিক আছে," বলল নীলিমা, "নিয়ে এসো এখানে।" খানিক পরে দরজা খুলে ভেতরে এল একটি কমবয়সি মহিলা, সঙ্গে একটা বছর চার-পাঁচেকের বাচ্চা ছেলে। মহিলার বয়স মনে হল খুব বেশি হলে বছর কুড়ি-বাইশ হবে। কিন্তু সাদা শাড়ি পরা, শাঁখা-সিঁদুর কিছু নেই। অন্য কোথাও হলে দেখেই বোঝা যেত বিধবা, কিন্তু লুসিবাড়িতে সেটা বলা কঠিন।

চেনা চেনা লাগছিল নীলিমার। মুখটা ততটা নয়, কিন্তু চোখদুটো আর তাকানোর ভঙ্গিটা খুব পরিচিত মনে হল। কিন্তু নামটা ও কিছুতেই মনে করতে পারল না। মেয়েটি এসে প্রণাম করল পা ছুঁয়ে। নীলিমা বলল, "তুমি কে বলো তো মা?"

মেয়েটি বলল, "আমাকে চিনতে পারছেন না মাসিমা? আমি কুসুম।"

"কুসুম!" প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওকে বকতে শুরু করল নীলিমা। "কোথায় ছিলি বল তো এতদিন? কোনও খোঁজ নেই, খবর নেই। কত খুঁজেছি জানিস তোকে আমরা?"

হেসে ফেলল কুসুম। "কত কী হয়ে গেছে মাসিমা এর মধ্যে। একটা-দুটো চিঠিতে অত কিছু ধরতই না।"

ও উঠে দাঁড়াতে নীলিমা দেখল পুরোদস্তুর শক্ত সমর্থ ঝকঝকে চোখের মহিলা হয়ে

উঠেছে কুসুম। "এই ছেলেটা কে রে, কুসুম?"

"আমার ছেলে," জবাব দিল কুসুম। "ওর নাম ফকির—ফকিরচাঁদ মণ্ডল।"

"আর ওর বাবা?"

"ওর বাবা মারা গেছে মাসিমা। আমিই এখন ওর সব।"

নীলিমা দেখে খুশি হল এই অকালবৈধব্য কুসুমের মুখের হাসিটা কেড়ে নিতে পারেনি। "বল এবার, এখানে কেন এসেছিস?"

তখন কুসুম বলল যে ও মরিচঝাঁপিতে থাকে। ও এসেছে নীলিমাকে বলতে যদি ওখানকার জন্য লুসিবাড়ি থেকে ডাক্তার, ওষুধ কিছু পাঠানো যায়।

সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হয়ে গেল নীলিমা। বলল মেডিকেল টিম পাঠাতে পারলে খুবই খুশি হত ও, কিন্তু সেটা অসম্ভব। সরকার পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে মরিচঝাঁপির জবরদখলিদের উচ্ছেদ করা হবেই। কাজেই ওদের কোনওরকম সাহায্য করতে গেলেই এখন সরকারের কোপে পড়তে হবে। এই হাসপাতাল আর মহিলা সমিতির কথা তো ভাবতে হবে নীলিমাকে। সরকারকে বাদ দিয়ে ও চালাতে পারবে না। বেশি লোকের যাতে মঙ্গল হয় সেভাবেই চলতে হবে নীলিমাকে।

আধঘণ্টা খানেক পর চলে গেল কুসুম। আর কখনও ওকে দেখেনি নীলিমা।

"তার পর তা হলে কী ঘটল?" জিজ্ঞেস করল কানাই। "কুসুম কোথায় গেল?"

"কোথাও যায়নি রে কানাই, ও তো খুন হয়ে গেল তারপর।"

"খুন?" কানাই জিজ্ঞেস করল। "সে কী? কী করে?"

"ওই ম্যাসাকারের সময়ই মারা গিয়েছিল ও। মরিচঝাঁপি গণহত্যা।"

দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকল নীলিমা। "ভীষণ ক্লান্ত লাগছে রে। খানিকটা বিশ্রাম নিলে মনে হয় ভাল লাগবে।"

হঠাৎ আলো

দুপুরের দিকে জল যখন বাড়তে শুরু করল, পিয়া লক্ষ করল আগের মতো অত ঘন ঘন আর দেখা যাচ্ছে না ডলফিনগুলোকে। ডেটাশিটটা এক ঝলক দেখে নিঃসন্দেহ হল ও জোয়ার আসার সাথে সাথে মনে হচ্ছে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে ওরা।

সকালের দিকটায় পিয়া কাজ করছিল ঝড়ের গতিতে। ওর ধারণা ছিল এটা একটা ভেসে বেড়ানো শুশুকের দল, আপাতত এখানে আছে, কিন্তু যে-কোনও সময়ে চলে যাবে নজরের বাইরে। কিন্তু এতক্ষণ ধরে প্রাণীগুলোর হাবভাব লক্ষ করে বিশেষ কোনও গন্তব্য ওদের আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। বরঞ্চ বোধ হচ্ছে শুধু এই জায়গাটুকুতেই ঘোরাঘুরি করে ভাটার সময়টা কাটিয়ে দিতে চাইছিল ওরা। জল যেই বাড়তে শুরু করেছে, এখন আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে এখান থেকে। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না মাথামুণ্ডু, নিজের মনেই বলল পিয়া। এই ডলফিনদের সম্পর্কে ওর যেটুকু জানা আছে এদের ব্যবহার তো একেবারেই খাপ খাচ্ছে না তার সঙ্গে।

সাধারণত দুটো উপজাতিতে ভাগ করা যায় এই ওর্কায়েলা ডলফিনদের। একটা জাত ভালবাসে সমুদ্র উপকূল অঞ্চলের লোনা জল, আর অন্যটা নদীনালা বা মিষ্টি জলে থাকতে পছন্দ করে। দু'দলের মধ্যে শারীরিক গঠনগত কোনও তফাত নেই, তফাত শুধু বাসস্থান নির্বাচনে। এই দু'জাতের মধ্যে সমুদ্র উপকূলবর্তী ডলফিনদেরই দেখা যায় বেশি। দক্ষিণ এশিয়া এবং উত্তর অস্ট্রেলিয়া অঞ্চলে বেশ কয়েক হাজার এ ধরনের ডলফিন আছে বলে জানা গেছে। অন্য দিকে মিষ্টি জলের ওর্কায়েলারা সংখ্যায় অনেক কম—ক্রমশ আরও কমে আসছে। এশিয়ার কোনও কোনও অঞ্চলের নদীতে এদের আর কয়েকশো মাত্র অবশিষ্ট আছে। উপকূলীয় প্রজাতির ডলফিনরা সাধারণত বেশিক্ষণ এক জায়গায় থাকে না, সমুদ্রের তীর বরাবর ভেসে ভেসে বেড়ায়। কিন্তু মিঠে জলের প্রজাতির প্রাণীগুলি নিজেদের নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যেই থাকতে পছন্দ করে। খুব বৃষ্টির সময় নদীর জল বেড়ে গেলে মাঝে মাঝে শিকারের পেছন পেছন খানিকটা দূরে কোনও খাল বা নালা, এমনকী ধানক্ষেতের মধ্যে পর্যন্ত চলে আসতে দেখা গেছে এদের। কিন্তু শুখা মরশুমে জল কমে এলে ফের এরা ফিরে যায় সেই নিজেদের নির্দিষ্ট জায়গাতে। অনেক সময় ভূপ্রাকৃতিক কারণে বা নদীর স্রোতের হেরফেরে নদীর নীচে গভীর পুকুরের মতো খাতের সৃষ্টি হয়। সাধারণত ওই পুকুর'-গুলোতে থাকতে পছন্দ করে মিষ্টি জলের ডলফিনরা। কম্বোডিয়াতে কাজ করার সময় নম পেন থেকে লাওস সীমান্ত পর্যন্ত মেকং নদী বরাবর এরকম অনেকগুলি 'পুকুর'-এর সন্ধান পেয়েছিল পিয়া। তখন দেখেছিল বছরের পর বছর ধরে একই ডলফিন একই নির্দিষ্ট 'পুকুরে' বার বার ফিরে আসছে। কিন্তু প্রতি বছরই ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শত শত কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে ভাটির দিকে চলে যেত ওরা। একবার তো লাওস সীমান্ত অঞ্চলের একটা ডলফিন নম পেনের কাছাকাছি গিয়ে একটা মাছ-ধরা জালে জড়িয়ে মারা পড়ল।

সুন্দরবনে এসে পিয়া ভেবেছিল এখানে যদি কোনও ওর্কায়েলা দেখতে পায় সেটা নিশ্চয়ই উপকূলীয় প্রজাতির হবে। সেটাই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল, কারণ এখানকার নদী-খাড়িগুলির জল যথেষ্ট লোনা। কিন্তু আজকে যে অভিজ্ঞতা হল তার পর তো মনে হচ্ছে ভুল ভেবেছিল ও। এগুলো যদি উপকূলীয় প্রজাতির ডলফিনই হয় তা হলে নদীর মধ্যের এই পুকুরে এরকম দল বেঁধে ঘোরাঘুরি করছে কেন। ওদের স্বভাব তো এরকম নয়—শুধু মিষ্টি জলের ডলফিনরাই এরকম করে। কিন্তু সে ডলফিন তো এখানে এত লোনা জলে থাকার কথা নয়। আর তা ছাড়া নদীর ডলফিনরা এরকম হঠাৎ করে দুপুরবেলা তাদের 'পুকুর' ছেড়ে উধাও হয়ে যায় না। পুরো একটা ঋতু তারা সেখানে কাটায়। তা হলে কী ধরনের প্রাণী এগুলো? আর এদের এরকম অদ্ভুত ব্যবহারের মানেটাই বা কী?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা নতুন চিন্তা মাথায় এল পিয়ার। আচ্ছা, এরকম কি হতে পারে যে মেকং-এর ডলফিনরা যেটা বছরে একবার করে, এই সুন্দরবনের শুশুকেরা সেটাই করে প্রতিদিন দু'বার করে? হতেই পারে যে এই ভাটির দেশের পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার জন্য

এই নতুন উপায় বের করেছে এরা? মেকং ডলফিনদের বার্ষিক জীবনছন্দকে এখানকার প্রাত্যহিক জোয়ার-ভাটার চক্রের সঙ্গে মিলিয়ে এক এক দিনের হিসেবে সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছে এই শুশুকগুলো?

পিয়া বুঝতে পারছিল যদি কোনওভাবে বিষয়টা ও প্রমাণ করতে পারে, তা হলে একটা আশ্চর্য নিটোল নতুন তত্ত্ব খাড়া করা যাবে; স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বিশৃঙ্খল অভ্যাসের জগতে সেটা হবে এক বিরল সৌন্দর্যের প্রতীক। তবে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল এই লুপ্তপ্রায় প্রজাতির সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও সে তত্ত্বের বিশাল ভূমিকা থাকবে। এই বিশেষ দহগুলোকে এবং এই ডলফিনদের যাতায়াতের পথগুলোকে যদি চিহ্নিত করা যায় তা হলে সেই অঞ্চলগুলোর ওপর জোর দিয়ে পরবর্তী কালে সংরক্ষণের কাজ করা যাবে। অনেক বেশি কার্যকরী হবে সেই ব্যবস্থা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সামান্য দু-একটা সূত্র শুধু পাওয়া গেছে। তত্ত্ব দাঁড় করাতে গেলে আরও বহু প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে পিয়াকে। যেমন, কী ধরনের শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের ফলে এখানকার জোয়ার-ভাটার চক্রের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছে এই শুশুকরা? এদের দৈনিক জীবনছন্দটাই সেভাবে বদলে গেছে তাও ঠিক বলা যায় না, কারণ জোয়ার-ভাটার সময় এখানে প্রতিদিনই পালটে যায়। বর্ষার সময় যখন নদীতে মিষ্টি জলের পরিমাণ বেড়ে যায়, তখনই বা কী হয়? সে সময় তো জলে নুনের মাত্রা অন্য সময়ের মতো থাকে না। এই দৈনিক পরিযাণ চক্র কি তা হলে দীর্ঘতর কোনও ঋতুছন্দের মাত্রার ওপর নতুন খোদকারি?

অনেক দিন আগে পড়া একটা স্টাডির কথা মনে পড়ল পিয়ার। তাতে দেখা গিয়েছিল গোটা ইয়োরোপ মহাদেশে যত প্রজাতির মাছ আছে তার চেয়ে অনেক বেশি প্রজাতির মাছ দেখতে পাওয়া যায় এই সুন্দরবনে। সেখানে বলা হয়েছিল এত বিচিত্র জাতের জলজ প্রাণী এখানে পাওয়া যাওয়ার কারণ হল এখানকার জলের প্রকৃতির বিভিন্নতা। গাঙ্গেয় বদ্বীপের এই বিশেষ অঞ্চলটিতে নদী এবং সাগরের জল সর্বত্র সমান ভাবে এসে মেশে না। বরং বলা যায় সুন্দরবনের নদী-খাড়িতে এই দুই জলস্রোত পরস্পরের মধ্যে ঢুকে আসে—কোনও কোনও জায়গায় মিষ্টি জলের স্রোত নদী বা খাঁড়ির একেবারে নীচের মাটি বরাবর বয়ে চলে; ফলে হাজারো বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয় তোনাভাব এবং পলির মাত্রায়, তৈরি হয় শত শত বিভিন্ন জৈবক্ষেত্র। এই অণুজীবমণ্ডলগুলি তাদের নিজের নিজের গতিতে কতকটা বেলুনের মতো ভেসে বেড়ায় জলের মধ্যে। অবিরাম তারা জায়গা বদলায়, কখনও চলে যায় মাঝনদীতে, আবার ফিরে আসে তীরের কাছাকাছি। কোনও কোনও সময় সমুদ্রের মধ্যেও অনেকদূর পর্যন্ত এগুলো ভেসে চলে যায়, আবার কখনও নদী-খাঁড়ি বেয়ে উজান ঠেলে চলে আসে অনেক ভেতরে। এই প্রতিটি বেলুন হল একেকটি ভাসমান জীবগোলক, তাতে ঠাসা থাকে তার নিজস্ব প্রাণী ও উদ্ভিদজগৎ। আর জলের মধ্যে দিয়ে যখন এরা ভেসে চলে, পেছন পেছন সারে সারে চলতে থাকে শিকারি প্রাণীর দল। এই বিভিন্ন পরিবেশমণ্ডলের অস্তিত্বের জন্যই বিশালকায় কুমির থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মাছ পর্যন্ত বিভিন্ন মাপের জলজ প্রাণীদের নিয়ে বৈচিত্র্যময় এক বিশাল জীবজগতের সৃষ্টি হয়েছে এই সুন্দরবনে।

এখন এই নৌকোর ওপর বসে এই সমস্ত কিছুর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ আর সম্পর্কের কথা ভাবতে ভাবতে মনের মধ্যে একের পর এক এত সব সম্ভাবনার দরজা খুলে যেতে লাগল যে মাথা ধাঁধিয়ে গেল পিয়ার; চোখ বন্ধ করে ফেলল ও হাতের সামনে অজস্র সূত্র, কত কিছু করতে হবে এখন, বহু প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে; কাজ চালানোর মতো শিখে নিতে হবে অনেকগুলি বিষয়—হাইড্রলিক্স, সেডিমেন্টেশন জিওলজি, ওয়াটার কেমিস্ট্রি, ক্লাইমেটোলজি; একটা ঋতু-ভিত্তিক গণনা করতে হবে এখানকার ডলফিনদের, ওদের যাতায়াতের পথের ম্যাপ তৈরি করতে হবে, গ্রান্টের জন্য কাঠখড় পোড়াতে হবে, নানা রকম পারমিট আর পারমিশনের জন্য দরখাস্ত করতে হবে; কোনও কূল কিনারা নেই কাজের। ওকে সুন্দরবনে পাঠানো হয়েছে মাত্র দু'সপ্তাহ সময় দিয়ে, ছোট একটা সার্ভে করার জন্য। বাজেটও খুবই কম। কিন্তু যেসব প্রশ্ন এখন মাথায় ঘুরছে তার উত্তর খুঁজে বের

করা তো এক দু'সপ্তাহের কাজ নয়, বছরের পর বছর সময় দিতে হবে, কয়েক দশক লাগলেও আশ্চর্য হবে না পিয়া। নদীনালায় ঘুরে ঘুরে ফিল্ড রিসার্চই করতে হতে পারে পনেরো-কুড়ি বছর ধরে। এই প্রজেক্ট শেষ করতে গেলে সে সময়টা অন্তত দিতে হবে ওকে। এমনকী, বলা যায় না, হয়তো সারা জীবন ধরেও কাজ করে যেতে হতে পারে।

যে সমস্ত ফিল্ড বায়োলজিস্টরা স্মরণীয় কাজ করার মতো বিষয় খুঁজে পেয়েছেন যেমন কিনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে কাজ করেছেন জেন গুডল, কুইন্সল্যান্ডের জলাভূমিতে কাজ করেছেন হেলেন মার্শ–কত সময় তাদের ঈর্ষা করেছে পিয়া। কিন্তু খুব একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই বলে ওর নিজের কপালেও একদিন এরকম কিছু জুটে যেতে পারে বলে কখনও ভাবেনি। তা সত্ত্বেও এই সুযোগ এসে গেল হাতের সামনে। এবং এরকম অকল্পনীয়ভাবে–যখন মনে হচ্ছিল কিছুই ঠিকমতো হচ্ছে না, কেবলই একের পর এক বাধা আসছে কাজে। ছোটবেলায় যেসব আশ্চর্য আবিষ্কারের গল্প পড়ে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ জন্মেছিল, সেই গল্পগুলি মনে পড়ল পিয়ার। কেমন অদ্ভুত, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কিন্তু অনুপ্রেরণা এসেছিল সাধারণ সব দৈনন্দিন ঘটনা থেকে যেমন আর্কিমিডিস আর তার বাথটাব, নিউটন আর সেই আপেলগাছ। অবশ্য সেসব আবিষ্কারের সাথে ওর এই কাজকে কোনওভাবেই তুলনা করা যায় না, কোনওরকম কোনও মিলও নেই কিন্তু অন্তত ও এখন বুঝতে পারছে কীভাবে হয় ব্যাপারটা, কেমন করে একটা আশ্চর্য ভাবনার ঝলক হঠাৎ মাথায় এসে যায়, আর এক মুহূর্তে ঠিক হয়ে যায় এই কাজটাই তাকে করে যেতে হবে বাকি জীবন ধরে।

বড় বৈজ্ঞানিক হবে এরকম উচ্চাশা পিয়ার কোনওদিনই ছিল না। যদিও জলচর প্রাণীদের ও ভালবাসে এবং তাদের বিষয়ে জানার আগ্রহও আছে, কিন্তু মনে মনে পিয়া ভাল করেই জানে যে শুধু সেইজন্যই ও এ কাজ করতে এসেছে তা ঠিক নয়। বাকি অনেকের মতোই ওইসব প্রাণীদের প্রতি ভালবাসা ছাড়াও ফিল্ড বায়োলজিতে ওর আকর্ষণের আরেকটা কারণ এই কাজের ইন্টেলেকচুয়াল দিক–এখানে ও নিজের মতো করে কাজ করতে পারবে, রোজ কোনও নির্দিষ্ট অফিসে হাজিরা দিতে হবে না, চেনাজানা জগতের পরিধির বাইরে বাইরে কাজ করা যাবে, এবং পরস্পরের প্রতি দায়বদ্ধ অথচ আলগা সম্পর্কের একটা নিজস্ব সমাজও থাকবে। এখন এই বিশাল কাজ যদি ও হাতে নেয়, সেই ব্যাপারগুলি হয়তো খুব একটা কিছু পালটাবে না, কারণ আপাতত বেশিরভাগ সময়টাই কাটবে সেই দরখাস্ত লেখা, গ্রান্ট জোগাড়ের চেষ্টা আর ওই রকম সব গতানুগতিক কাজে। আর শেষ পর্যন্ত যাই হোক না কেন এই গবেষণার ফলে বিজ্ঞান জগতে যে মারাত্মক কিছু তোলপাড় হয়ে যাবে তা তো নয়। কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও, এভাবে নিজের ভবিষ্যৎ ঠিক করে নেওয়া বা আগামী বছরগুলিতে কী করবে সে চিন্তার দায় থেকে মুক্তি পাওয়ার মধ্যে যে কী তৃপ্তি তা কি পিয়া আগে কখনও ভাবতে পেরেছিল? আর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন কিছু না ঘটাতে পারলেও, এটা তো ঠিক যে শেষ পর্যন্ত সফল যদি হয় পিয়া–এমনকী আংশিক ভাবেও যদি হয় তা হলেও বর্ণনামূলক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক চমৎকার অবদান হিসেবে থেকে যাবে ওর কাজ। তাই যথেষ্ট; বেঁচে থাকার কৈফিয়ত হিসেবে অন্য কিছুর আর দরকার নেই পিয়ার। অন্তত এই পৃথিবীতে থাকার সময়টুকু ও বাজে খরচ করেছে সে অপবাদ তো কেউ দিতে পারবে না।

ময়না

কানাই নীলিমার দরজায় গিয়ে আবার যখন কড়া নাড়ল তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে বিছানা থেকে উঠে মাসি জামাকাপড় পালটে নিয়েছে দেখে ভাল লাগল ওর।

"আরে কানাই," নীলিমা ডাকল হাসিমুখে, "আয় আয়, ভেতরে আয়।"

সকালের মন খারাপের এতটুকুও চিহ্ন নেই আর মাসির মুখে। কানাই আন্দাজ করল নিশ্চয়ই এতক্ষণ অফিসে কাজকর্ম করে মুড ভাল হয়ে গেছে। মেসো মারা যাওয়ার ধাক্কা, এতগুলো বছরের একাকিত্ব তা হলে এভাবেই ভুলে থেকেছে মাসি—কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে।

"ময়নাকে খবর দিয়েছি, এক্ষুনি এসে যাবে ও," বলল নীলিমা, "তোকে নিয়ে একবার হাসপাতালটা ঘুরিয়ে দেখাতে বলেছি ওকে।"

"ময়না করেটা কী এখানে?" কানাই জিজ্ঞেস করল।

"ও এখানকার ট্রেনি," নীলিমা জবাব দিল। "অনেক বছর ধরে এই ট্রাস্টে কাজ করছে, সেই আমরা যখন 'বেয়ারফুট নার্স প্রোগ্রাম' চালু করেছিলাম তখন থেকে। ওই প্রোজেক্টটা নেওয়া হয়েছিল এখানকার সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছনোর জন্য, দূরদূরান্তের গ্রামের লোকেরাও যাতে কিছু অন্তত চিকিৎসার সুবিধা পায় সেই জন্য। কয়েকজন নার্সকে আমরা সাধারণ কিছু ট্রেনিং দিয়ে দিয়েছিলাম—সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি, নিউট্রিশন, কিছু প্রাথমিক চিকিৎসা, প্রসবের কাজ, আরও টুকিটাকি দু-একটা—যেমন কেউ জলে ডুবলে কী করতে হবে, এইসব। জলে ডোবার ঘটনা তো আকছার লেগেই আছে এখানে। তারপর ওই নার্সরা যার যার গ্রামে ফিরে গিয়ে নিজেরা ট্রেনিং ক্লাস চালায়।"

"কিন্তু তারপর তো ময়নার পদোন্নতি হয়েছে মনে হয়?"

"তা হয়েছে," নীলিমা বলল। "এখন ও আর বেয়ারফুট নার্স নয়। হাসপাতালে পুরোদস্তুর নার্স হওয়ার জন্য ট্রেনিং নিচ্ছে। বছর কয়েক আগেই দরখাস্ত করেছিল, আর ওর রেকর্ডও বেশ ভাল ছিল, তাই হাসপাতালে নিয়ে নেওয়া হল ওকে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল এতদিন ও কাজ করছে আমাদের সঙ্গে, কিন্তু ও যে কে সেটাই জানতাম না আমরা মানে ও যে আমাদের কুসুমের ছেলের বউ সেটাই জানা যায়নি। একদিন ঘটনাচক্রে আমি জানতে পারলাম ব্যাপারটা।"

"কী করে?"

"আমি একদিন বাজারে গেছি, বুঝলি তো," নীলিমা বলল, "হঠাৎ দেখি সেখানে ময়না, একটা ছোকরার সঙ্গে কথা বলছে; সঙ্গে একটা বাচ্চা। এখন, ফকিরকে এর আগে আমি যখন দেখেছি তখন তো ও বছর পাঁচেকের একটা বাচ্চা ছেলে। কাজেই বাজারে দেখে ওকে আমি চিনতে পারিনি। তো, আমি ময়নাকে জিজ্ঞেস করলাম, "এই ছোঁড়াটা তোর বর নাকি রে? ও বলে, 'হা মাসিমা, আমার বর। জিজ্ঞেস করেছি, নাম কী রে ওর?' বলে, ফকির মণ্ডল। এমনিতে নামটা খুবই কমন, কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পেরে গেছি। বললাম, এ কী রে? তুই কে বল তো? আমাদের কুসুমের ছেলে ফকির নাকি তুই?' তো সে বলে 'া।"

"যাক, তবু ভাল, কানাই বলল। "ফকির অন্তত নিরাপদে লুসিবাড়িতেই আছে।"

"ভাল হলে তো ভালই ছিল," বলল নীলিমা, "কিন্তু খুব একটা ভাল নেই রে ওরা।"

"তাই? কেন?"

নীলিমা বলল, "ময়না মেয়েটা বেশ বুদ্ধিমতী, উচ্চাশাও আছে। বাড়ির দিক থেকে কোনও উৎসাহ ছাড়াই নিজের চেষ্টায় খানিকটা লেখাপড়া শিখেছে। ওদের গ্রামে কোনও স্কুল ছিল না, বেশ কয়েক কিলোমিটার হেঁটে আরেকটা গ্রামে গিয়ে রোজ স্কুল করত। ফাইনাল পরীক্ষাতেও ভালই করেছিল। তারপর ঠিক করল কলেজে ভর্তি হবে—ক্যানিং কি অন্য কোথাও। নিজে নিজেই সব ব্যবস্থা করে ফেলেছিল, এমনকী শিডিউলড কাস্ট সার্টিফিকেটও জোগাড় করেছিল, কিন্তু বাড়ির লোকেরা কিছুতেই যেতে দেবে না। ওকে

আটকানোর জন্য বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলল। পাত্র ঠিক করল ফকিরকে। ছেলে হিসেবে ফকির এমনিতে সব দিক থেকেই ভাল, কিন্তু লেখাপড়া কিচ্ছু জানে না, নদী থেকে কাঁকড়া ধরে সংসার চালায়।

"তবে একটা ভাল ব্যাপার হল ময়না কিন্তু হাল ছাড়েনি," বলল নীলিমা। "নার্স হবে বলে এমনই মনস্থির করে ফেলেছে ও, যে ট্রেনিং-এর সময়টা লুসিবাড়িতে থাকলে সুবিধে হবে বলে ফকিরকে পর্যন্ত নিয়ে চলে এসেছে এখানে।"

"ফকির খুশি তাতে?"

"মনে তো হয় না," নীলিমা বলল। "মাঝে মাঝেই তো শুনি গণ্ডগোল হচ্ছে সেই জন্যই বোধহয় থেকে থেকেই ও নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। খুঁটিনাটি সব কিছু জানি না, মেয়েগুলো তো সব বলেও না আমায়। কিন্তু এটা জানি খুব ঝামেলার মধ্যে কাটছে ময়নার। আজকেই তো সকালে ভীষণ মনমরা দেখলাম ওকে।"

"তার মানে আজকে এসেছে ও কাজে?"

"হ্যাঁ, এসেছে তো," নীলিমা বলল। "যে-কোনও সময় এসে যাবে এখানে। আমিই ওকে পাঠিয়েছি একবার হাসপাতালে, কয়েকটা ওষুধ এনে দেওয়ার জন্যে।

"কিন্তু ফকির কি আজকেও বাড়ি ফেরেনি?"

"না," বলল নীলিমা, "আর চিন্তায় চিন্তায় বেচারি ময়নার মাথা খারাপ। সেজন্যেই ওকে বলেছি তোকে নিয়ে হাসপাতালটা দেখাতে, খানিকক্ষণ অন্তত যাতে অন্য কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকে।"

দরজায় খটখট করে আওয়াজ হল একটা। গলাটা একটু তুলে সাড়া দিল নীলিমা, "ময়না নাকি রে?"

"হ্যাঁ মাসিমা।"

"ভেতরে আয়।"

কানাই ফিরে দেখল মাথায় ঘোমটা দেওয়া অল্পবয়সি একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। খোলা দরজা দিয়ে বাইরের উজ্জ্বল আলো উপচে ঢুকে আসছে ঘরে, কিন্তু সেদিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে বলে ছায়া পড়েছে মেয়েটির মুখে, কানের দুলদুটো আর নথটা শুধু ঝিকমিক করছে; ওর ছায়া ছায়া ডিমাকৃতি মুখে নক্ষত্রপুঞ্জের তিনটে তারার মতো জ্বলজ্বল করছে সেগুলো।

"ময়না, এ হল কানাইবাবু," আলাপ করিয়ে দিল নীলিমা, "আমার বোনপো।" ঘরের ভেতর ঢুকে এল মেয়েটি। বলল, "নমস্কার।"

"নমস্কার।" এখন আলো পড়েছে ময়নার মুখে, কাছে থেকে দেখেই কানাই লক্ষ করল একটু ধেবড়ে গেছে ওর চোখের কাজল। গায়ের রং মসৃণ কালো, কুচকুচে কালো চুল তেলে

মা টানা ভুরু, 'পষ্ট চোয়াল; এক নজর দেখেই কানাই বলতে পারে সারা দুনিয়া ওর বিরুদ্ধে গেলেও নিজের জেদ রাখতে এ মেয়ে পিছপা হবে না। তবুও চোখের লালচে ভাব দেখে বোঝা গেল একটু আগেও কাঁদছিল ময়না।

"শোন কানাই," ইংরেজিতে বলল নীলিমা, যাতে ময়না বুঝতে না পারে, "একটু সাবধান। মেয়েটার মন মেজাজ কিন্তু মনে হয় ভাল নেই।"

"ঠিক আছে মাসি," বলল কানাই।

"রাইটি-ও, দেন" নীলিমা বলল, "আই সাপোজ ইউ হ্যাড বেটার বি গোয়িং।"

"রাইটি-ও!" মাসিকে ইংরেজি বলতে এর আগে বিশেষ শোনেনি কানাই; এরকম স্পষ্ট সুন্দর উচ্চারণ শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল ও। এত বছর এই ভাটির দেশে থেকে নীলিমার বাংলাটার থেকে শহুরে ছাপ মুছে এসেছে, প্রায় এখানকার লোকেদের ভাষার মতোই হয়ে গেছে সেটা। কিন্তু ইংরেজিটা বোধহয় বিশেষ ব্যবহার হয় না বলেই রজনের স্ফটিকের মধ্যে ফার্নের পাতার মতো অক্ষত রয়ে গেছে। সময়ের স্পর্শ তাতে পড়েনি, রোজকার ব্যবহারের

মলিনতা ছুঁতে পারেনি ব্রিটিশ আমলের স্কুলে শেখা সে ইংরেজিকে। কানাইয়ের মনে হল যেন হারিয়ে যাওয়া কোনও ভাষা শুনছে ও, ফুরিয়ে যাওয়া সেই ঔপনিবেশিক যুগের উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের মুখের ভাষা, যে ভাষা বলা হত সেকালের ইলোকিউশন স্কুল আর ডিবেটিং সোসাইটিতে শেখা স্পষ্ট দ্বিধাহীন উচ্চারণে।

হাসপাতালের রাস্তায় যেতে যেতে কানাই ময়নাকে জিজ্ঞেস করল, "মাসিমা কি আপনাকে বলেছেন যে আমি আপনার শাশুড়িকে চিনতাম?"

"না তো!" অবাক হয়ে কানাইয়ের দিকে তাকাল ময়না। "কিচ্ছু বলেননি তো মাসিমা। সত্যি চিনতেন?"

"হ্যাঁ," কানাই বলল। "চিনতাম। অনেককাল আগে যদিও। ওর বয়েস তখন খুব বেশি হলে পনেরো-টনেরো হবে, আর আমি আরও ছোট।"

"কেমন ছিলেন উনি?"

"আমার যেটা মনে আছে সেটা হল ওর তেজ," বলল কানাই। "ওইটুকু বয়েসেই খুব তেজি ছিল ও।"

মাথা নাড়ল ময়না। "লোকে বলে নাকি একটা ঝড়ের মতো ছিলেন উনি।"

"হ্যাঁ," বলল কানাই। "সেরকমও বলা যেতে পারে। অবশ্য আপনি তো বোধহয় দেখেননি ওকে, তাই না?"

"না," বলল ময়না। "উনি যখন মারা যান তখন তো আমি ছোট বাচ্চা। কিন্তু অনেক গল্প শুনেছি ওনার সম্পর্কে।"

"আপনার স্বামী কিছু বলেন না ওর কথা?"

কুসুমের কথা বলতে বলতে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল ময়নার, কিন্তু ফকিরের প্রসঙ্গ উঠতেই আবার যেন মেঘ জমল সেখানে। "না," ও বলল। "ও তো কখনও বলেই না ওনার কথা। আমার মনে হয় খুব একটা মনেও নেই ওর। উনি মারা যাওয়ার সময় তো ও খুবই ছোট ছিল–" কাধটা একটু ঝাঁকিয়ে কথাটা শেষ করে দিল ময়না। এ প্রসঙ্গটা আর না-টানাই ভাল মনে হল কানাইয়ের।

হাসপাতালের কাছাকাছি চলে এসেছিল ওরা। বাড়িটা কাছ থেকে দেখে নতুন করে বুঝতে পারল কানাই কী বিশাল কর্মযজ্ঞের পৌরোহিত্য করছে এখানে নীলিমা। এমনিতে যে বাড়িটা বিরাট বড় বা দেখতে খুব চমৎকার তা নয়–সাধারণ একটা দোতলা বাড়ি, চৌকো টাইপের জুতোর বাক্সর মতো দেখতে। ছাই-রঙা বাইরের দেওয়াল, আর সাদা বর্ডার টানা রয়েছে জানালা এবং লম্বা বারান্দার রেলিংগুলো বরাবর। সামনে একটা বাগান, তাতে বেশিরভাগই গাঁদাফুলের গাছ। কিন্তু সাধারণ হলেও, এই ভাটির দেশের কাদা আর ছাতলার মধ্যে ঝকঝকে তকতকে এই বাড়িটাকেই আকাশছোঁয়া বহুতলের মতো বলে মনে হচ্ছে। কানাইয়ের মনে হল শুধু এই বাড়িটা দেখেই অনেকটা ভরসা পাবে রোগীরা।

বাড়িটার বহিরঙ্গের সে প্রভাব ময়নার ওপরেও পড়েছে দেখা গেল। কানাইকে নিয়ে হাসপাতালে ঢুকতে ঢুকতেই একটা স্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ করা গেল ওর হাবেভাবে। প্রতিটি পদক্ষেপে মনে হল আরও ঋজু, আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে ওর চলাফেরার ভঙ্গি যেন বাড়িটার সংস্পর্শে আসতে-না-আসতেই সংসারভারগ্রস্ত এক স্ত্রী ও মায়ের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসছে চটপটে পেশাদার একটা নতুন মানুষ।

হাসপাতালের গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে একটা দরজার সামনে কানাইকে নিয়ে এল ময়না। "এটা আমাদের মেটারনিটি ওয়ার্ড," কথাটা বলার সময় গর্বে গলাটা যেন বুজে এল ওর।

এমনিতে হাসপাতাল-টাসপাতালের ব্যাপারে আদৌ কোনও আগ্রহ নেই কানাইয়ের। কিন্তু এই জায়গাটা ব্যতিক্রম: প্রতিটি ওয়ার্ড এত টিপটপ, দেখে অবাক না হয়ে পারল না ও। পুরো হাসপাতালটা তকতকে পরিষ্কার, আর যদিও মোটে চল্লিশটা বেড, কিন্তু হাসপাতালের আয়তনের তুলনায় ব্যবস্থাদির কোনও খামতি নেই। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সব

পৃষ্ঠপোষকদের পয়সায় কেনা, বলল ময়না। তাদের মধ্যে দেশের লোকও আছে কিছু, আবার বিদেশিও অনেকে আছে। প্যাথোলজি ল্যাব আছে, একটা এক্স-রে রুম আছে, এমনকী একটা ডায়ালিসিস মেশিন পর্যন্ত আছে। হাসপাতালের ওপরের তলায় দু'জন রেসিডেন্ট ডাক্তার থাকেন। তাদের মধ্যে একজন তো প্রায় দশ বছর আছেন এই লুসিবাড়িতে। অন্যজন ডাক্তারি পাশ করার পর ভেলোরের নামকরা হাসপাতালে প্রশিক্ষণ শেষ করে নতুন এসেছেন এখানে। ময়না বলল দু'জনকেই আশেপাশের সমস্ত দ্বীপের লোকজন খুব শ্রদ্ধা করে আর ভালবাসে। যে পেশেন্টই আসে হাসপাতালে, ডাক্তারবাবুদের জন্য হাতে করে কিছু না কিছু একটা নিয়ে আসে—কখনও একটা নারকেল, বা কিছু কেওড়া ফল, না হলে পাতায় মুড়ে একটা মাছ, কখনও বা দু-একটা মুরগি।

ময়না বলল এত নামডাক হয়ে গেছে এখন হাসপাতালটার যে দূরদূরান্ত থেকে রোগীরা এখানে দেখাতে আসে। এমনও অনেকে আসে এই লুসিবাড়ি হাসপাতালে যাদের পক্ষে ক্যানিং, এমন কী কলকাতা পর্যন্ত চলে যাওয়া এর তুলনায় সহজ হত। কারণ এখানকার সবাই জানে যে এ হাসপাতালে সামান্য খরচে যে যত্ন পাওয়া যায় সেরকম যত্ন অনেক জায়গায় অনেক পয়সা দিয়েও পাওয়া যায় না। আবার এত মানুষ এখানে যাতায়াত করে বলে এলাকার বেশ কিছু লোকের কিছু জীবিকার সংস্থান হয়েছে। গত কয়েক বছরে কতগুলো সাইকেল ভ্যানের স্ট্যান্ড হয়েছে। নতুন চায়ের দোকান আর গেস্ট হাউসগুলো তো রমরম করে চলছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এখন লুসিবাড়ির বেশিরভাগ লোকেরই জীবিকার উৎস এই হাসপাতাল।

দোতলায় উঠে ময়না দেখাল এ হাসপাতালে নির্মলের একমাত্র অবদান বিশাল একটা ওয়ার্ড, সাইক্লোন ঠেকানোর জন্য বিশেষভাবে বানানো। জানালাগুলিতে মোটা কাঠের পাল্লা দেওয়া, আর দরজাগুলো সব লোহার ফ্রেমে বাঁধানেনা। এমনিতে ট্রাস্টের কাজে কর্মে বিশেষ নাক গলাত না নির্মল, কিন্তু এই হাসপাতাল যখন তৈরি হয় তখন দেখতে এসেছিল যে সাইক্লোন ঠেকানোর ব্যবস্থা সব ঠিকমতো নেওয়া হয়েছে কিনা। সেরকম কিছু করা হয়নি শুনেই একেবারে আঁতকে উঠল—ভাটির দেশের বিধ্বংসী সব সাইক্লোনের ইতিহাস সবাই ভুলে গেছে নাকি? সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি লুসিবাড়িতে কখনও হবে না নাকি? নির্মলের নিবন্ধাতিশয্যেই শেষে তৈরি হল এই ওয়ার্ড।

দোতলার বারান্দা থেকে হাসপাতালের চারদিকের দোকানঘর আর ছোট ছোট কুঁড়েগুলো কানাইকে দেখাল ময়না। "ওদিকে দেখুন কানাইবাবু, দোকানগুলো দেখুন হাসপাতালের আশেপাশে। কত্তগুলো হয়েছে দেখেছেন?"

হাসপাতালটা নিয়ে ময়নার গর্ব দেখে বেশ ভাল লাগল কানাইয়ের, প্রায় অভিভূত হয়ে গেল ও। জিজ্ঞেস করল, "আপনি ফকিরকে কখনও নিয়ে এসেছেন এখানে?"

ছোট্ট করে একবার মাথা নাড়ল ময়না। "না।"

"কেন?"

মুখটা একটু বাঁকিয়ে বলল, "ও আসতে চায় না—বলে কেমন যেন লাগে ওর এখানে।"

"এখানে মানে—এই হাসপাতালে, না লুসিবাড়িতে?"

"দুটোই," বলল ময়না। "এখানে ওর ভাল লাগে না।"

"কেন বলুন তো?"

"গাঁয়ে যেমন ছিল তার থেকে সব আলাদারকম এখানে।"

"কী রকম আলাদা?"

কাঁধ ঝাঁকাল ময়না। "ওখানে ও সব সময় টুটুলকে নিয়ে থাকত—টুটুল আমাদের ছেলে," বলল ও। "ট্রাস্টের কাজের জন্যে আমাকে অনেকটা সময় বাইরে বাইরে থাকতে হত তো, আর ও সারাদিন টুটুলকে নিয়ে নদীতে নদীতে ঘুরত। কিন্তু এখানে আসার পর আমাকে সেটা বন্ধ করে দিতে হল।"

"তাই? কেন বন্ধ করতে হল?"

"কারণ টুটুলকে তো স্কুলে যেতে হবে, না কি?" একটু যেন ঝাঁঝ ময়নার গলায়। "ও-ও বাপের মতো কঁকড়া ধরে বেড়াবে সেটা আমি চাই না। ওতে কোনও ভবিষ্যৎ আছে নাকি?"

"কিন্তু ফকির তো তাই করে।"

"করে তো, কিন্তু কতদিন আর করবে বলুন?" বলল ময়না। "মাসিমা তো বলেন নতুন যেসব জাল-টাল লোকে ব্যবহার করছে তাতে পনেরো বছরের মধ্যে নদীতে মাছ আর কিছু থাকবে না।"

"কী নতুন জাল?"

"ওই যে সব নাইলন জাল চালু হয়েছে এখন। চিংড়ির মীন—মানে বাগদা চিংড়ির পোনা—ধরে ওতে করে। জালের ফুটোগুলো এত ছোট যে তাতে মীনের সঙ্গে অন্য সব মাছের ডিমও উঠে আসে। মাসিমা একবার চেষ্টা করেছিলেন নাইলন জাল বন্ধ করতে, কিন্তু কিচ্ছু করা গেল না।"

"কেন?"

"কেন আবার? চিংড়ির ব্যবসায় তো প্রচুর লাভ। আর সব নেতাদের ওরা পয়সা খাইয়ে রাখে। ওদের আর কী? নেতাদেরও কিছু যায় আসে না। মরবে তো আমাদের মতো লোকেরাই। আমাদেরই তাই ভাবতে হবে কী করা যায়। সেইজন্যেই তো আমি চাই টুটুলটা যাতে ভালভাবে লেখাপড়া শেখে। নইলে কী হবে ওর বলুন তো?" এক নিশ্বাসে এতগুলো কথা বলে গেল ময়না।

"আপনি যদি ভাল করে ফকিরকে বোঝান ও নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে," কানাই বলল।

"সে চেষ্টা কি করিনি ভেবেছেন?" গলার আওয়াজ চড়ে গেল ময়নার। "কতবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু কী বুঝবে ও বলুন? লেখাপড়া জানে না তো এসব জিনিস ওকে বোঝানো অসম্ভব।"

ওর কথা শুনতে শুনতে কানাইয়ের মনে হচ্ছিল এই পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও নিজের জগটুকু সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা আছে ময়নার। আর কী করে সেখানে চলতে হবে সেটাও ও ভাল করেই জানে। অবাক লাগছিল কানাইয়ের, শেষবার যখন ও এই ভাটির দেশে এসেছিল তারপর থেকে কত পালটে গেছে সবকিছু। বাইরের পরিবর্তনই শুধু নয়, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সবকিছুই অনেক বদলে গেছে। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই হাসপাতালটা তার সুযোগ সুবিধা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, সবকিছুই। এইসব পরিবর্তনের মধ্যে ময়নার মতো প্রতিভাময়ী একটা মেয়ের স্বপ্ন ওরকম একজন স্বামীর জন্য অপূর্ণ থেকে যাবে ভাবতেও খারাপ লাগল কানাইয়ের।

"দেখুন।"

একটা অপারেটিং থিয়েটারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। হঠাৎ ময়না গিয়ে দরজার কাঁচ লাগানো গোল ফুটোটার মধ্যে উঁকি দিয়ে ভেতরে দেখতে লাগল। দেখছে তো দেখছেই। কানাই ভাবল ভেতরে নিশ্চয়ই কোনও অপারেশন চলছে। কিন্তু অবশেষে ময়না সরে এসে ওকে যখন দেখতে দিল, কানাই দেখল ঘরটা খালি, শুধু যন্ত্রপাতিগুলো রয়েছে।

"কী দেখছিলেন এতক্ষণ?" ও জিজ্ঞেস করল ময়নাকে।

"এই নতুন যন্ত্রগুলো। আমার খুব ভাল লাগে ওগুলো দেখতে," একটু হেসে বলল ময়না। "আমার কোর্সটা শেষ হয়ে গেলে আমিও হয়তো একদিন কাজ করব ওখানে।"

"নিশ্চয়ই করবেন।"

ঠোঁটদুটো একটু কোঁচকাল ময়না। "ভগবান জানে।"

ওর গলা শুনে স্পষ্ট বুঝতে পারল কানাই, যে এই নার্স হওয়ার স্বপ্ন ওর কোনও সাধারণ শখের ব্যাপার নয়—এ স্বপ্নের উৎস যে আকাঙ্ক্ষায়, সম্পূর্ণতায় বা ঋদ্ধিতে মনের মধ্যে লালিত তার রূপ কোনও কবিতা বা উপন্যাসের তুলনায় কোনও অংশে কম নয়। নিজেকে আরও পরিশীলিত করে সামনের বিরাট পৃথিবীর দিকে হাত বাড়ানোর দুর্দম ইচ্ছার চেহারাটা আজ ফের ধরা দিল কানাইয়ের কাছে। ময়নার কথা শুনতে শুনতে ও যেন হারিয়ে যাওয়া

নিজের ছবি নতুন করে খুঁজে পেল।

দরজার গায়ের গোল কাঁচটার মধ্যে নিজের মুখের ছায়ার পাশে ময়নার মুখটা দেখতে পেল কানাই। কাঁচের গায়ে টোকা দিয়ে অন্ধকার অপারেটিং থিয়েটারটার দিকে দেখাল ময়না। "এই ঘরটাতেই আমার টুটুল হয়েছিল," ও বলল। "মাসিমাই আমার ভর্তির সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। জানেন, আমার আগে আমাদের বাড়ির কোনও মেয়ে বাচ্চা হওয়ার সময় হাসপাতালে ভর্তি হয়নি। টুটুল যখন হয়, তখন তিনজন নার্স ছিল এখানে। আমাকে দেওয়ার আগে ওরা সবাই একবার করে কোলে নিল ওকে। আমার শুধু মনে হচ্ছিল ওদের কী ভাগ্য; খুব ইচ্ছে করছিল তখন ওদের মতো হতে।"

স্পষ্ট পড়া যাচ্ছিল ময়নার মুখে আঁকা উচ্চাশার ছবি। সেদিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটা মমতায় ভরে গেল কানাইয়ের মন: আমাদের একান্ত নিজস্ব সব আকাঙ্ক্ষা–যেগুলো হয়তো সারাজীবন ধরে শুধু আড়াল করার চেষ্টা করে যাই আমরা–হঠাৎ তার ছায়া যদি ছেলেবেলার পুরনো কোনও ছবিতে চোখে পড়ে তা হলে যেমন মনে হয়, খানিকটা সেইরকম একটা কোমল অনুভূতিতে মনটা ছেয়ে গেল ওর।

"চিন্তা কোরো না ময়না," বলল কানাই। "খুব শিগগিরই এখানে কাজ করবে তুমি।" কথাটা বলেই খেয়াল হল জিজ্ঞেস না করেই ও 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছে ময়নাকে। ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত নয়, কিন্তু সেটা নিয়ে কিছু বলার দরকার আছে বলে মনে হল না কানাইয়ের। মনে হল এই তো ভাল। আলাদা করে বলার কী-ই বা প্রয়োজন?

কাঁকড়া

ঠিক দুপুর নাগাদ, জল বেশ খানিকটা বেড়ে ওঠার পর পরিষ্কারই বোঝা গেল আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে শুশুকগুলো। শেষের কয়েকবার মা আর ছানার জুড়িটাকেই শুধু দেখতে পেল পিয়া। জলের ওপর নানারকম সব কসরত দেখাল তারা। সেরকম আগে কখনও বিশেষ দেখেনি পিয়া। প্রথমে পরপর কয়েকবার এমনভাবে ভেসে উঠল যে দুটো ডলফিনেরই পুরো শরীর দেখতে পাওয়া গেল জলের ওপর। ছানাটা দেখা গেল মিটার খানেকের মতো লম্বা আর মা-টা তার দেড়গুণ মতো। একটু পরে ফের দেখা গেল বার দুয়েক। চমৎকার লাগছিল দেখতে। মা আর ছানা মুখ দিয়ে ফোয়ারার মতো জল ছুঁড়ে দিচ্ছে শূন্যে। এই 'থুতু ছেটানোর' অভ্যেসটা এ জাতীয় ডলফিনদের একটা বৈশিষ্ট্য—পিয়ার নিজের ধারণা এটা ওরা করে শিকারকে বিভ্রান্ত করার জন্য। এত সুন্দর লাগছিল দেখতে যে ডেটাশিট রেখে ক্যামেরা বের করল পিয়া। মিনিট কয়েক পরেই আশ্চর্য এক কাণ্ড করল ছানা ডলফিনটা একটা মাছকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে আবার লুফে নিল মুখে। শিকার নিয়ে খেলা করাটা এদের বংশের ধারা—এই ওর্কায়েলা-দের জ্ঞাতি খুনে তিমিরও এ স্বভাব আছে। কিন্তু এত বছর নদী-নালায় ঘুরে ঘুরে কাজ করলেও, সব মিলিয়ে মাত্র বার ছয়েক এরকম দৃশ্য চোখে পড়েছে পিয়ার। আর এই প্রথম তার একটা স্পষ্ট ছবি তুলতে পারল ও।

খানিক বাদেই এ দুটো ডলফিনও বেপাত্তা হয়ে গেল। এখন দেখতে হবে সন্ধেবেলা জল নামলে আবার এখানে ফিরে আসে কিনা আঁকটা।

পিয়া যখন নৌকোর আগায় বসে জলের দিকে নজর রাখছিল, ফকির আর টুটুল তখন ডিঙির পেছন দিকটায় বসে খুব ধৈর্য ধরে একগোছা মাছ ধরার সুতোর পরিচর্যা করছিল। সুতোগুলো দেখে প্রথমটায় একটু চিন্তিত হয়েছিল পিয়া, কারণ কিছু কিছু মাছ ধরার সরঞ্জামে ডলফিনদেরও অনেক সময় আটকে পড়তে দেখা গেছে। কিন্তু ভাল করে দেখে বুঝতে পারল ফকিরের সুতোগুলো এতই পলকা, ডলফিনের মতো অত বড় প্রাণীকে তাতে আটকাতে পারবে না। এই নিয়ে তাই আর কোনও উচ্চবাচ্য করেনি ও। এই সামান্য সুতোগুলোতে কিছুই আসে যায় না। মাছেরাও মনে হল একইরকম ভাবছে; সারা সকাল চেষ্টা করে বাপ ব্যাটা কেউই একটা চুনোপুঁটিও ধরে উঠতে পারল না। কিন্তু ওদের দুজনের তাতে দেখা গেল কোনও হেলদোল নেই মনে হল, যা করছে তাই নিয়েই বেশ আছে, অন্তত আপাতত।

কিন্তু ফকির আর টুটুল কখন ফিরতে চাইবে কে জানে। রাত্রে পিয়া আশা করেছিল সূর্য উঠলেই বোধহয় রওয়ানা হবে ওরা। কিন্তু এই ডলফিনগুলো এসেই সব পালটে দিল। এখন তো মনে হচ্ছে অন্তত কাল সকাল পর্যন্ত থাকতে হবে এখানে। সুন্দরবনের এই ডলফিনেরা এখানকার জোয়ার-ভাটার চক্রের সঙ্গে নিজেদের মতো করে খাপ খাইয়ে নিয়েছে কিনা তা বোঝার এটাই একমাত্র উপায় এখন দেখা যাচ্ছে আরও একটা ভাটা আর জোয়ার এখানে অপেক্ষা করে যাওয়া। অবশ্য এরকম হতেই পারে যে এ সমস্তই নিছক ওর কল্পনা, আর সে কল্পনা যদিও বা সত্যি হয় তা হলেও তার সমর্থনে উপযুক্ত তথ্য জোগাড় করে উঠতে বছরের পর বছর কেটে যাবে। এখনকার মতো অন্তত আরও একটু কিছু প্রমাণ চাই পিয়ার, সামান্য কিছু ইঙ্গিত, যাতে অন্তত বোঝা যায় যে ওর চিন্তাটা ঠিক দিকেই এগোচ্ছে। পরের সূর্যোদয়টা পর্যন্ত যদি কোনওভাবে থাকতে পারে এই জায়গাটায়, তা হলেই ওর চলবে।

সময় যত কাটতে লাগল ডলফিনদের ছেড়ে ফকির আর তার ছেলেকে নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে থাকল পিয়ার। আর কতক্ষণ ওরা ধৈর্য ধরে থাকতে চাইবে এখানে কে জানে? কী করলে আটকে রাখা যাবে ওদের? পিয়া লক্ষ করছে ওদের ওই মাটির স্টোভটা একবারও জ্বালানো হয়নি আজকে। বাপ ব্যাটা শুধু কয়েকটা শুকনো রুটি খেয়ে আছে সকাল থেকে। ভাল লক্ষণ নয়। তার মানে রসদ ফুরিয়ে আসছে ওদের। অন্য কোনও পরিস্থিতি হলে ও আরও কিছু টাকা অফার করতে পারত ফকিরকে; কিন্তু এক্ষেত্রে সে প্রসঙ্গ তোলা যায় না

কারণ সঙ্গে টুটুল আছে। বাবার কিছু বাড়তি পয়সা রোজগার হবে বলে ওইটুকু ছেলে খিদে সহ্য করে বসে থাকবে সেটা আশা করা যায় না। ': পিয়ার নিজেরই মিনারেল ওয়াটার কমে এসেছে, কিন্তু ও জানে যেটুকু আছে তা দিয়েই ও চালিয়ে নিতে পারবে। ওদের দুজনের জন্যেই ওর চিন্তা। শেষ পর্যন্ত থাকতে না-পেরে কোনওদিন ও যা করেনি তাই করল: ওর সাবধানে জমিয়ে রাখা নিউট্রিশন বারের প্যাকেট থেকে কয়েকটা বের করে দিতে চাইল ওদের। ফকির নিল না, কিন্তু টুটুল একটা নিয়ে বেশ তারিয়ে তারিয়েই খেল। একটু নিশ্চিন্ত হল পিয়া। সেরকম দরকার হলে আরও কয়েকটা বার দিয়ে দেবে ও তাতে যদি থেকে যায় ওরা তা হলেই পুষিয়ে যাবে ওর। কিন্তু তবুও মনটাকে শান্ত করতে পারছিল না পিয়া। ডেটাশিট ভরতে ভরতে বারবার আড়চোখে চাইছিল ওদের দুজনের দিকে। ওদের প্রতিটি ওঠাবসায় চমকে চমকে উঠছিল ও এই রে! এই বোধহয় ওরা ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করছে।

কিন্তু কেন কে জানে, সেরকম কিছুই হল না শেষ পর্যন্ত। রওয়ানা হওয়ার ব্যাপারে ওদের দু'জনের কারওরই কোনও আগ্রহ দেখা গেল না। দুপুরে সামান্য কিছু শুকনো রুটি মধু দিয়ে খেয়ে বাপ ব্যাটা গিয়ে ছইয়ের ভেতর ঢুকে শুয়ে পড়ল।

আশা-নিরাশার দোলায় পিয়ার টেনশন এদিকে বেড়েই চলেছে। ভাটা পড়া পর্যন্ত এই কয়েকটা ঘণ্টা চুপ করে এক জায়গায় বসে থাকতেই পারছে না ও। শেষে ঠিক করল এই সময়টা নদীর নীচের এই জায়গাটার ম্যাপ তৈরি করবে। সত্যিই ওই ওর্কায়েলা-দের জড়ো হওয়ার মতো কোনও দহ এখানটায় আছে নাকি দেখা যাবে। এ ধরনের ম্যাপ তৈরির কিছু অভিজ্ঞতা ওর আছে, এটুকু জানে যে খুব একটা কঠিনও নয় কাজটা, তবে বেশ ঝামেলার: ডেপ্‌থ সাউন্ডিং করে নদীর নীচ থেকে ফিরে আসা প্রতিধ্বনি মেপে মেপে গভীরতার মাপ কাগজে তুলতে হবে, তারপর সেগুলো জুড়ে জুড়ে নদীগর্ভের ঢালের একটা রেখাচিত্র বানাতে হবে। গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমের সুবিধা থাকায় অবশ্য প্রত্যেকবার শব্দ ক্ষেপণের জায়গার নিখুঁত অবস্থানটা ঠিক করে নেওয়া সহজ, ফলে নিয়মিত জ্যামিতিক বৃত্তচাপ বরাবর ঠিকমতো রিডিংগুলো নেওয়াও খুব একটা কঠিন হবে না।

কিন্তু সমস্যা হল ফকিরকে সেটা বোঝানো যাবে কী করে?

আস্তে আস্তে ছইয়ের সামনে গেল পিয়া, দেখল বেঘোরে ঘুমোচ্ছে ফকির আর তার ছেলে। দু'জনেই পাশ ফিরে শুয়ে আছে, বাবার শরীরের বাঁকের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে টুটুলের ছোট্ট চেহারাটা দেখা যাচ্ছে। ছেলেটা একটু নাদুস-নুদুস, বাপের প্রায় কঙ্কালসার কাঠখোট্টা ভাবের একেবারে উলটো। ফকিরের গায়ে তো খালি হাড়-পাঁজরা আর পাকানো পেশি কয়েকটা। পুরুষের গঠনতন্ত্রের শুধু সারটুকু দিয়ে যেন তৈরি ওর শরীরটা। আচ্ছা, ছেলেটা কি তা হলে বাবার থেকে ভাল খেতে পায়? এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও গল্প আছে, সেটা জানতে পারলে বেশ হত। ছেলেটার দেখাশোনা কে করে? কেউ কি নিজে না-খেয়ে রেখে দেয় খাবারটা, যাতে ঠিক মতো খেতে পায় টুটুল?

ঘুমের মধ্যে একসঙ্গে ওঠানামা করছিল দু'জনের বুক। ওদের শ্বাসের ছন্দটা দেখে মা ডলফিন আর ছানাটার কথা মনে পড়ে গেল। এত নিশ্চিন্তে ওদের ঘুমোতে দেখে নিজের মনটাও একটু শান্ত হল পিয়ার—ওর মনের ভেতরের উথাল পাথালের সঙ্গে ওদের এই শান্তির ঘুমের আকাশ পাতাল ফারাক। ফকিরকে জাগানোর জন্য হাতটা বাড়াতে একটু দ্বিধা হচ্ছিল পিয়ার: এই ভরদুপুরের কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে কি ও বিরক্ত হবে? তারপর যদি বাড়ি ফিরে যেতে চায় তক্ষুনি? পিয়া দেখল ফকিরের কপালের পাশ দিয়ে একটা ঘামের ফোঁটা গড়িয়ে নামছে চোখের কোণের দিকে। কিছু না-ভেবেই একটা আঙুল বাড়িয়ে ঘামটা মুছে দিল ও।

সঙ্গে সঙ্গে জেগে গেল ফকির। উঠে বসল ধড়মড় করে। পিয়ার আঙুলের ডগাটা ওর চামড়ার যে জায়গায় ছুঁয়েছিল সেখানটা ঘষতে লাগল হাত দিয়ে। অপ্রস্তুত হয়ে একটু পিছিয়ে গেল পিয়া। মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "আই অ্যাম সরি। আই ডিডন্ট মিন..." নির্লিপ্তভাবে মাথাটা একবার ঝাঁকাল ফকির, তারপর হাত মুঠো করে চোখ কচলাতে লাগল,

যেন বাকি ঘুমটুকু ঘষে ঘষে চোখ থেকে মুছে দিতে চাইছে।

"লুক!" পজিশনিং মনিটরটা ফকিরের মুখের সামনে ধরে স্ক্রিনের দিকে ইশারা করল পিয়া। "ওভার হিয়ার।" আশ্চর্য হয়ে দেখল ফকির বুঝতে পারছে ওর বক্তব্য। তারপর পিয়া যখন ওই বিন্দু আর রেখাগুলোর মানে বোঝাতে শুরু করল, মনিটরটার দিকে ঝুঁকে পড়ে মন দিয়ে দেখতে লাগল ফকির।

সবচেয়ে কঠিন সমস্যাটা হল মনিটরের পর্দায় যে ওদের এখনকার অবস্থানটা দেখা যাচ্ছে সেটা কী করে ওকে বোঝাবে পিয়া। বিভিন্ন কিছুর দিকে ইশারা করে বোঝানোর চেষ্টা করল—একবার স্ক্রিনের দিকে, একবার নিজের দিকে, একবার ফকিরের দিকে, একবার ছেলেটার দিকে, কিন্তু কোনও লাভ হল না। পিয়া দেখল ঘাবড়ে যাচ্ছে ফকির, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না কী করবে। মনে হল ইশারাগুলিতে ও ভেবেছে ওকে কাছে সরে আসতে বলছে পিয়া। পাগল পাগল লাগছিল পিয়ার। কী করে বোঝানো যায় একে! শেষে ঠিক করল অন্য কায়দা করে দেখবে একবার। একটা কাগজ নিয়ে এল পিয়া। ব্যাপারটাকে দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্রে নিয়ে এলে হয়তো বোঝানো একটু সহজ হবে। সরল একটা ছবি দিয়ে, বাচ্চারা যেমন কাঠি কাঠি হাত-পাওয়ালা মানুষ আঁকে সেরকম এঁকে ফকিরকে জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করবে ও। কিন্তু মুশকিল হল, ছবি আঁকাটা পিয়ার কখনওই ঠিক আসে না। অর্ধেকটা এঁকেও হঠাৎ থেমে গেল ও। নতুন একটা সমস্যার কথা মাথায় এল এবার। আগে যখনই এরকম মানুষের ছবি ও এঁকেছে, মহিলা বোঝানোর জন্যে সবসময় কাঠিটার মধ্যে একটা তিনকোণা স্কার্ট এঁকে দিয়েছে। কিন্তু এখানে তো তা করলে চলবে না—এখানে তো পুরুষের পরনে লুঙ্গি আর মহিলার পরনে প্যান্ট। কাগজটাকে দলা পাকিয়ে ফেলল পিয়া। ফেলেই দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওর হাত থেকে সেটা প্রায় ছিনিয়ে নিল ফকির, গুছিয়ে রেখে দিল জ্বালানি করবে বলে।

পরের ছবিটা ও শুরু করল জায়গাটার মোটামুটি একটা নকশা দিয়ে। নিজেদের অবস্থানটা দেখানোর আগে প্রথমে নদীর পাড়ের বাকটা এঁকে নিল। দেখা গেল ঠিকই আন্দাজ করেছিল ও, ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্র ছেড়ে দুই মাত্রায় আসতেই ফল পাওয়া গেল: ওর নকশাটার সঙ্গে মনিটরের পর্দার লাইনগুলো কীভাবে মিলে যাচ্ছে একবার দেখিয়ে দিতেই জলের মতো সোজা হয়ে গেল বাকিটা। পেনসিলের কয়েকটা আঁচড়েই তারপর ও ফকিরকে বুঝিয়ে দিল কীভাবে মোটামুটি ত্রিভুজাকার একটা বৃত্তচাপের মধ্যে পরপর সমান্তরাল পথে নৌকোটা বেয়ে নিয়ে যেতে হবে ওকে। চাপের শীর্ষবিন্দুটা প্রায় ছুঁয়ে থাকবে নদীর অন্য পাড়টাকে।

পিয়া ভেবেছিল বোধহয় গাঁইগুঁই করবে ফকির, এমনকী হয়তো নাও রাজি হতে পারে। কিন্তু আদৌ সেরকম কিছু ঘটল না। বরং মনে হল বেশ খুশিই হয়েছে ও, এমনকী উৎসাহের চোটে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে টুটুলকে পর্যন্ত ঘুম থেকে তুলে দিল। ওই সরলরেখা বরাবর পারাপারের ব্যাপারটাতেই মনে হল ওর বেশি উৎসাহ। কেন, সেটা একটু পরেই বুঝতে পারল পিয়া—যখন তক্তার নীচ থেকে একগোছা মাছ ধরার সুতো বের করে আনল ফকির। বোঝাই যাচ্ছে এই সুযোগে ও কিছু মাছ ধরে নিতে চায়।

কিন্তু মাছ ধরার সুতোটা দেখে একটু ধাঁধা লাগল পিয়ার। এশিয়ার বিভিন্ন নদীতে জেলেদের সঙ্গে ও কাজ করেছে, এরকম কিছু তো কোথাও আগে দেখেনি। একটু মোটা নাইলনের শক্ত সুতো, আর পুরো দৈর্ঘ্য বরাবর মিটার খানেক পরপর একটা করে ওজন বাঁধা ছোট ছোট টুকরো করা টালি কতগুলো। আরও অদ্ভুত যেটা, বঁড়শি-টরশির কোথাও কোনও বালাই নেই। তার বদলে ওজনগুলোর মাঝে মাঝে মাছের শুকনো হাড়কাটা কয়েকটা বাঁধা রয়েছে। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না কী করে কাজ করে জিনিসটা। দেখে তো মনে হচ্ছে যেন ওরা আশা করছে যে মাছেরা নিজের থেকেই এসে আটকে যাবে সুতোটার মধ্যে, আর ওরা শুধু সেটা গুটিয়ে তুলবে। কিন্তু সেরকম কি আদৌ সম্ভব? তা হলে কী ধরবে ওটা দিয়ে? কোনওরকম কোনও ব্যাখ্যাই খুঁজে পেল না পিয়া। তবে একটা ব্যাপার অন্তত পরিষ্কার, ওই

সুতোতে ডলফিনদের কোনও ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। তাই নৌকো যদি ঠিকঠাক পথে চলে তা হলে ওতে আপত্তি করারও কোনও কারণ দেখল না পিয়া।

আবার নৌকোর আগার দিকটায় ফিরে গেল ও, ম্যাপ বানানোর সব প্রস্তুতি করতে শুরু করল। মনিটরটা হাতে নিয়ে ফকিরকে ইশারা করে দেখাল ঠিক কোন জায়গাটা থেকে শুরু করতে হবে। তারপর, টুটুলও মাছ-ধরা সুতোর প্রথম ওজনটা জলে ফেলল, আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইকো সাউন্ডারটাও ডুবিয়ে দিয়ে বোতাম টিপল পিয়া।

প্রথম দফায় প্রায় কিলোমিটার খানেক যেতে হল ওদের। সবটা সুতোই এর মধ্যে জলে ফেলা হয়ে গেছে টুটুলের। পুরোটা যাওয়ার পর আবার যখন নৌকোর মুখ ফিরিয়ে উলটোদিকে চলতে শুরু করল ওরা, তখন পিয়া আবিষ্কার করল কী করে ওরা ওই সুতোটা দিয়ে। সুতোটা টেনে তোলার সময় দেখা গেল সাত-আটটা টোপ পরপরই একটা করে কাঁকড়া ঝুলছে। শক্ত করে পাঁড়া দিয়ে চেপে ধরে আছে সুতোয় বাঁধা মাছের কাঁটাগুলো। ফকির আর টুটুল একটা জাল দিয়ে কাঁকড়াগুলোকে ছাড়িয়ে আনল, তারপর পাতা দিয়ে ভর্তি একটা পাত্রের মধ্যে রেখে দিল সেগুলোকে। দেখতে দেখতে হাসি পেয়ে গেল পিয়ার। এর থেকেই তা হলে 'ক্র্যাবি' কথাটা এসেছে ইংরেজিতে? এত একগুঁয়ে প্রাণীগুলো, ধরা পড়বে তবু খাবার ছাড়বে না।

বার কয়েক যাতায়াতের পরই বোঝা গেল ঠিকই ভেবেছিল পিয়া, নদীর নীচে একটা ঢালু জায়গাতেই এসে জমা হয় ডলফিনগুলো। সাউন্ডিং করে দেখা গেল নদীর খাতটা এই জায়গায় এসে পাঁচ থেকে আট মিটার পর্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেছে; ফলে ভাটায় জল নেমে গেলেও ডলফিনরা এখানে এসে স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারে সেই সময়টা।

নদীর নীচের এই দহ শুধু যে ডলফিনদের জন্যই উপযুক্ত তা নয়—কঁকড়াদেরও মনে হয় খুবই বাড়বাড়ন্ত এখানে। প্রতিবার যাতায়াতের সময়ই রাশি রাশি কঁকড়া উঠে আসছে ফকিরের সুতোয়। শুরুতে পিয়া ভেবেছিল ওদের দুজনের কাজের বোধহয় ব্যাঘাত ঘটবে—ওর ডেথ সাউন্ডিং-এর ফলে ফকিরের মাছেরা পালিয়ে যাবে অথবা উলটোটা হবে। কিন্তু ও সবিস্ময়ে লক্ষ করল আদৌ সেরকম কিছু ঘটল না। সুতোটা জলে ফেলার জন্য প্রত্যেকবারই একেবারে ঠিক সময়ে নৌকো থামিয়েছে ফকির। ঠিক ওই সময়গুলোতেই পিয়ারও থামার দরকার ছিল সাউন্ডিং নেওয়ার জন্য। তা ছাড়া ফকিরের সুতোটা ঠিকমতো পথপ্রদর্শনের কাজেও সাহায্য করছিল—সুতো বরাবর একেবারে সোজা পথে চলছিল নৌকোটা। আর ফেরার সময়ও প্রতিবারই ঠিক যে জায়গাটা থেকে রওয়ানা হয়েছিল নিঃসন্দিগ্ধভাবে সেখানটাতেই এসে পৌঁছনো যাচ্ছিল আবার। অন্য সময় হলে প্রতিবারই পথ ঠিক রাখার জন্য ওর গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমটা ব্যবহার করতে হত পিয়াকে। কিন্তু এখানে ওই সুতোটা দিয়েই সে কাজ হয়ে যাচ্ছিল। শুধু প্রত্যেকবার পারাপারের সময় বৃত্তচাপ বরাবর আগেরবারের থেকে যাতে ঠিক পাঁচ মিটার দুরে যাত্রা শুরু হয় সেটা ঠিক করার জন্য মনিটরটা কাজে লাগাতে হচ্ছিল। এতে কিন্তু ফকিরেরও লাভ হচ্ছিল, কারণ কখনওই এক জায়গায় দু'বার পড়ছিল না ওর কাঁকড়া-ধরা সুতোটা।

খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে এতটুকুও বিরোধ হচ্ছিল না ওদের দুজনের কাজের। আশ্চর্যের এইজন্য যে একজন কাজ করছে ভূসমলয় কক্ষের কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে, আর অন্যজনের কাজের সরঞ্জাম হল কয়েকটা মাছের কাটা আর ভাঙা টালির টুকরো। কিন্তু দু'জন একেবারে দু'রকমের মানুষ, যারা পরস্পরের সঙ্গে একটা বাক্যও বিনিময় করতে পারে না, একজন কী ভাবছে অন্যজনের সেটা জানা বা বোঝার কোনও উপায়ই নেই, তারা যে একই সঙ্গে নির্বিবাদে নিজের নিজের কাজ করে যাচ্ছে, সেটা মনে হল আরও বিস্ময়কর—যেন প্রায় দৈবঘটিত। ব্যাপারটাতে শুধু যে পিয়াই আশ্চর্য হয়েছে তা নয়, একবার হঠাৎ করে ফকিরের চোখে চোখ পড়ায় ওর মুখের ভাবেও বোঝা গেল বেশ অদ্ভুত লাগছে ওর। দু'জনের উদ্দেশ্য এবং তৃপ্তির এরকম স্বচ্ছন্দ মিশ্রণ কী করে সম্ভব হল সেটা ও যেন বুঝে উঠতে পারছে না।

কঁকড়ার পাত্রটা ভর্তি হয়ে যাওয়ার পর সেটার মুখটা একটা অ্যালুমিনিয়ামের প্লেট দিয়ে ঢেকে কাঁকড়াগুলোকে নৌকোর খোলের মধ্যে ঢেলে দেওয়ার জন্য পিয়ার হাতে দিল ফকির। ঢাকনা ফাঁক করে পিয়া দেখল ভেতর থেকে গোটা পনেরো কঁকড়া কটমট করে ওর দিকে চেয়ে দাঁড়া শানাচ্ছে। ডিঙির খোলের মধ্যে পাত্রটা উলটে দিতে হুড়মুড় করে একটা লম্বা শেকলের মতো বেরিয়ে এল কাঁকড়াগুলো, প্রচণ্ড রেগে খটখট আওয়াজ করতে করতে ঢুকে গেল তক্তার নীচে। কাঁকড়াদের এই অভাবনীয় মুখরতায় হাসি পেয়ে গেল পিয়ার। ওর জন্ম হয়েছিল জুলাই মাসে। মাঝে মাঝেই ওর তাই মনে হয়েছে এত প্রাণী থাকতে প্রাচীনকালের লোকেরা কাঁকড়াকে কেন রাশিচক্রের মধ্যে ঢুকিয়েছিল। কিন্তু এখন এই কঁকড়াগুলোকে তড়বড় করে নৌকোর খোলের মধ্যে ঢুকে যেতে দেখতে দেখতে পিয়ার মনে হল প্রাণীগুলোর বিষয়ে আরও কিছু জানা থাকলে বেশ হত। মনে পড়ল একবার একটা ক্লাসে ওদের এক অধ্যাপক দেখিয়েছিলেন কিছু প্রজাতির কাঁকড়া কীভাবে তাদের বাসার কাদাটা সত্যি সত্যি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে কাদার প্রতিটা দানা ওরা সাফ করে ঘষে ঘষে। ওই কঁকড়াদের পায়ে এবং শরীরের ধার বরাবর সূক্ষ্ম লোমের আবরণ থাকে। সেই লোমগুলোই আণুবীক্ষণিক বুরুশ আর চামচের মতো কাজ করে। ওগুলো দিয়েই কাদার সূক্ষ্ম কণার গায়ে লেগে থাকা ক্ষুদে শ্যাওলা আর অন্যান্য সব খাদ্যবস্তু চেঁছে তোলে ওরা। একই সঙ্গে স্বাস্থ্যবিভাগ এবং পরিচ্ছন্নতা দপ্তরের কাজ করে এই কাঁকড়ারা–বাদাবনের পচা পাতা, জঞ্জাল সাফ করে ওরাই বাঁচিয়ে রাখে বনকে। ওরা না-থাকলে তো নিজেদের আবর্জনার চাপেই দমবন্ধ হয়ে মারা পড়ত জঙ্গলের সব গাছ। বাদাবনের জৈবতন্ত্রের একটা বিরাট অংশই যে এই কঁকড়ারা, সেটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে? ডালপাতা সমেত সমস্ত গাছের তুলনায়ও যে একটা বাদাবনে কাঁকড়াদের গুরুত্ব বেশি সেটা তো সত্যি? কেউ একজন তো বলেইছিলেন যে ম্যানগ্রোভের বদলে এই ধরনের নদীমুখের জঙ্গলগুলির নাম কঁকড়াদের নামেই হওয়া উচিত। কারণ বাঘ বা কুমির বা ডলফিন নয়, এই কঁকড়ারাই হল গোটা বাদাবনের জৈবতন্ত্রের মূল ধারক।

এতদিন পর্যন্ত এই সমস্ত বিষয়ে যখনই ভেবেছে পিয়া–এই জৈবতন্ত্র, মূল প্রজাতি এইসব–সবসময়েই নিজেকে তার বাইরে রেখে, অন্যান্য সমস্ত কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে ভেবেছে। সংক্ষেপে, প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ভেবেছে–কারণ কে বলেছে যে মনুষ্যসৃষ্ট সমস্ত কিছুকে বাদ দিয়ে যা বাকি থাকে তাই হল ‘প্রকৃতি’? কিন্তু আজকে যে ও এখানে এসেছে সে তো নিজের ইচ্ছায় আসেনি; এই কঁকড়াদের জন্যই এসেছে। কারণ এরাই হল ফকিরের জীবিকা, আর এরা–থাকলে ফকির জানতেও পারত না কোথায় কোন নদীর দহে এই ওর্কায়েলাশুশুকেরা আসে। হয়তো ঠিকই করেছিল সেই প্রাচীনকালের লোকেরা। হয়তো আসলে পিয়ার নিয়তির জোয়ার ভাটার দিক নির্দেশ করছে এই কাঁকড়ারাই। কে বলতে পারে!

ভ্রমণকাহিনি

গেস্ট হাউসে ফিরে কানাই দেখল টিফিন ক্যারিয়ারে করে দুপুরের খাবার রেখে গেছে। ময়না। সাদামাটা খাবার ভাত, মুসুরির ডাল, একটা চচ্চড়ি আলু, মাছের কাটা আর কী একটা শাক দিয়ে। শাকটা ঠিক চিনতে পারল না কানাই। আর ছিল কুচো মৌরলা মাছের পাতলা ঝোল। ঠান্ডা হয়ে গেলেও খাবারটা অমৃতের মতো লাগল কানাইয়ের। দিল্লিতে ওর যে রাঁধুনি আছে সে লক্ষ্ণৌর লোক। নানারকম মোগলাই খাবারই সে বেশি বানায়। ফলে বহুদিন এরকম সাধারণ বাঙালি খাবার কপালে জোটেনি কানাইয়ের। প্রতিটা খাবারের স্বাদ যেন ওর মাথার মধ্যে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এত খেয়ে ফেলল যে পেটটা আইঢাই করতে লাগল একেবারে।

খাওয়ার পর বাসনপত্র সরিয়ে রেখে ওপরে নির্মলের পড়ার ঘরে গেল কানাই। দরজাটা বন্ধ করে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল ডেস্কটার সামনে। তারপর নোটবইটা খুলল।

কানাই, সেই ১৯৭০-এ শেষ যারা কুসুমকে দেখেছিল লুসিবাড়িতে, তাদের মধ্যে তুমি ছিলে একজন। সে বছর বনবিবি জহুরানামা পালা চলার সময় হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যায় ও। যেন একটা ঝড় ওকে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছিল কোথাও, এতটুকু চিহ্নও রেখে যায়নি। কেউ জানত না কোথায় গেল কুসুম। সেই শেষ। তারপরে আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি ওর। সত্যি বলতে কী, ওর কী যে হল তা নিয়ে আমরা কেউ মাথাও ঘামাইনি। খুবই দুঃখের বিষয় হলেও সত্যি, এই ভাটির দেশের অনেক ছেলেমেয়েই এভাবে হারিয়ে যায় শহরের ভিড়ে। এরকম ঘটনা এত ঘটে যে খেই রাখা মুশকিল।

তারপর বহু বছর কেটে গেল, আমারও অবসরের সময় চলে এল। অস্বীকার করলে.মিথ্যে বলা হবে, আমার বুকটা একটু দুরুদুরু করছিল বইকী। প্রায় তিরিশ বছর হেডমাস্টারি করেছি। এই স্কুল, এই ছাত্ররা, তাদের পড়ানো–এসবই জীবনের অংশ হয়ে গিয়েছিল আমার। ক্লাসরুম আর রুটিনের নিয়মের বাইরে বেরিয়ে আমি বাঁচব কী নিয়ে? বহু বছর আগের সেই অসম্বন্ধ দিনগুলির কথা মনে পড়ে গেল আমার, যখন পৃথিবীটাকে এত নৈরাশ্যময় আর জটিল মনে হত যে সবসময় খালি শুয়ে থাকতেই ইচ্ছে করত। আবার যদি সেরকম হয়? সে সময় আমার মনের অবস্থাটা নিশ্চয়ই তুমি কল্পনা করতে পারছ।

ছকে-বাঁধা জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হল তার অর্থহীনতাটা বোঝা যায় বড় দেরিতে। কত বছর ধরে আমি নীলিমাকে বলেছি যে আমি ওপরে আমার স্টাডিতে বসে লেখার কাজ করছি। শুনে খুব খুশি হত নীলিমা। এই যে চারিদিকে ওর এত খ্যাতি, প্রতিপত্তি, আর আমার কিছুই নেই, সেটা ওর ভাল লাগত না। ওর বিশ্বাস ছিল আমি একজন লেখক, কবি। ও চাইত কবি হিসেবে, লেখক হিসেবে আমাকেও সবাই চিনুক, জানুক। কিন্তু সত্যি কথা হল লুসিবাড়িতে এতগুলো বছরে একটা শব্দও লিখিনি আমি। শুধু তাই নয়, আমার আরেকটা ভালবাসার জিনিস বই পড়া, সে অভ্যাসটাকেও বিসর্জন দিয়েছিলাম একেবারে। অবসরের সময় যত এগিয়ে আসতে লাগল, এই সবকিছুর জন্য ভীষণ অনুশোচনা হতে লাগল আমার। একদিন কলকাতায় গিয়ে আমার এক সময়কার প্রিয় দোকানগুলোতে বইপত্র ঘেঁটে অনেকটা সময় কাটালাম, দেখলাম বই কেনার সামর্থ্য আমার আর নেই। একটা মাত্র নতুন বই নিয়ে ফিরে এলাম লুসিবাড়িতে। বার্নিয়ের ভ্রমণকাহিনি। তুমিই কিনে দিয়েছিলে সেটা আমাকে।

আমার স্কুল থেকে বিদায়ের দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল, পরিষ্কার বোঝা গেল অন্য মাস্টারমশাইরা সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন আমার যাওয়ার জন্য। আমার মনে হয় না তার মধ্যে বিদ্বেষের ভাব খুব একটা ছিল। আসলে অনাগত ভবিষ্যতের গর্ভে কী লুকোনো আছে সেটা দেখার জন্যই ওরকম উদগ্রীব হয়েছিলেন ওঁরা। কেউ যদি কোনও জায়গায় একটানা তিরিশ বছর কাজ করে, সেখানকার দেওয়ালের গায়ে শ্যাওলার মতো হয়ে যায় সে। নতুন দিনের আলোয় কেমন করে তা শুকিয়ে ঝরে যায় সেটা সকলেই দেখতে চায়।

আমার অবসরের খবর যত ছড়াতে থাকল, বহু নিমন্ত্রণ পেতে থাকলাম আমি আশেপাশের অন্য সব দ্বীপের স্কুলগুলো থেকে, সেসব জায়গায় একবার ঘুরে আসার জন্য। আগে হলে হয়তো রাজি হতাম না, কিন্তু এখন কবির সেই সতর্কবাণী মনে পড়ল আমার—"থেমে যাওয়ার অর্থ অস্তিত্বহীনতা"। কাজেই খুশি হয়েই সে সব নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে লাগলাম। একদিন এরকমই এক নিমন্ত্রণ এল কুমিরমারি দ্বীপ থেকে। আমার পরিচিত একজন সেখানে থাকতেন। লুসিবাড়ি থেকে কুমিরমারির দূরত্ব খুব একটা কম নয়, বেশ কয়েকবার ফেরি পার হয়ে যেতে হয়। স্থির করলাম যাব।

যেদিন সকালে আমার যাওয়ার কথা, ঘটনাচক্রে নীলিমা সেদিন বাড়ি ছিল না, ট্রাস্টের কাজে কোথাও গিয়েছিল। আমিও খালি বাড়িতে মনের আনন্দে অনেকক্ষণ ধরে আমার ঝোলা গোছালাম। একটা বই ঢোকালাম, তারপর মনে হল আরও একটা নিই—এত দূরের পাড়ি, অনেক পড়ার জিনিস লাগবে। এই করতে করতে সময়ের হিসাব ভুলে গেলাম আমি—ক'টার সময় নৌকো আছে, জেটি পর্যন্ত হেঁটে যেতে কতক্ষণ লাগবে—সব গোলমাল করে ফেললাম। তারপর কী হল সে আর বিশদ বলার কিছু নেই। এইটুকু বললেই চলবে যে প্রথম নৌকোটা ধরতে পারলাম না আমি। অর্থাৎ পরের কোনও ঘাটেও আর ফেরি ধরতে পারব না।

হতাশ হয়ে বাঁধের ওপর বসেছিলাম, হঠাৎ দেখি একটা চেনা চেহারা—নৌকো নিয়ে যাচ্ছে সামনে দিয়ে। হরেন নস্করকে বহু বছর দেখিনি, কিন্তু ওই তাগড়াই চেহারা আর সরু চোখ দেখে সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারলাম ওকে। কিশোর বয়সি একটি ছেলে ছিল সঙ্গে, নিশ্চয়ই ওর বড় ছেলে।

তড়িঘড়ি বাঁধ বেয়ে নেমে গিয়ে ডাকলাম ওকে—"হরেন! হরেন! একটু দাঁড়াও!"

কাছাকাছি আসতে অবাক হয়ে হরেন বলল, "সার? আপনি এখানে? আমি তো ছেলেকে নিয়ে আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। ও আপনার স্কুলে ভর্তি হতে চায়।"

ছেলেটার কাঁধে হাত রাখলাম আমি। "অবশ্যই ওর ভর্তির ব্যবস্থা করে দেব। কিন্তু আমারও যে একটা উপকার করে দিতে হবে হরেন।"

"নিশ্চয়ই সার। কী করতে হবে বলুন।"

"হরেন, আমাকে এখন একবার কুমিরমারি যেতেই হবে। তুমি নিয়ে যাবে?"

"কেন নিয়ে যাব না সার? এটুকু করতে পারব না আপনার জন্য? উঠে আসুন, উঠে আসুন।" ছেলের পিঠে একটা চাপড় মেরে ওকে বলল একাই বাড়ি ফিরে যেতে। তারপর একবারও পেছনে না তাকিয়ে আমরা রওয়ানা হলাম কুমিরমারির উদ্দেশ্যে।

চলতে শুরু করেই আমার মনে হল বহু বছর পরে হরেনের নৌকোর মতো এরকম নৌকোয় চড়লাম। গত কয়েক বছরে যখনই লুসিবাড়ির বাইরে যাওয়ার দরকার হয়েছে—খুব একটা বেশি হয়নি অবশ্য—সাধারণত লঞ্চ বা ভটভটিতেই যাতায়াত করেছি। এখন এই নৌকোয় বসে চারপাশের চেনা দৃশ্যগুলোই কেমন অন্যরকম মনে হতে লাগল—যেন নতুন দৃষ্টিতে দেখছি আমি। ছাতা দিয়ে রোদ আড়াল করে বসে একটা বই বের করলাম—সেই বার্নিয়ের ভ্রমণকাহিনি—আর যেন কোনও জাদুমন্ত্রে বইয়ের যে পাতাগুলো খুলল ঠিক সেই জায়গাটাতেই সাহেব ভাটির দেশে তার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন।

হরেন বলল, "কী পড়ছেন সার? গল্পের বই? আমাকেও একটা গল্প বলুন না ওটা থেকে। অনেক দূরের পথ তো, শুনতে শুনতে যাওয়া যাবে বেশ।"

"ঠিক আছে, আমি বললাম, "শোনো তা হলে।

"এই বইটা লিখেছিলেন একজন খ্রিস্টান পাদরি। ফরাসি দেশ থেকে ১৬৬৫ সালে এসেছিলেন ভারত ভ্রমণ করতে। তখনও চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা আমাদের গ্রামগঞ্জের মানুষের বেশ মনে আছে। আর দিল্লির মসনদে তখন ছিলেন মুঘল বাদশা আওরঙ্গজেব। তো, আমাদের পাদরিসাহেব ছিলেন জেসুইট সম্প্রদায়ের মানুষ। নাম ছিল সোয়া বার্নিয়ে। সাহেবের সঙ্গে ছিল দু'জন পর্তুগিজ পথপ্রদর্শক আর বেশ কিছু চাকর-বাকর। সকলে মিলে

তো এসেছেন এই বাদাবনে। কিন্তু প্রথম দিনেই সাহেবরা খিদের জ্বালায় অস্থির। সঙ্গে খাবার ছিল, কিন্তু ডাঙায় নেমে রান্না করার সাহস আর হয় না। এখানকার বাঘের হিংস্রতার বহু গল্প তারা শুনে এসেছেন, সবাই। তাই খুব সাবধান। অবশেষে নদীর মাঝে একটা সুবিধাজনক চড়া পাওয়া গেল। সেখানে নেমে রান্না করা হল—দুটো মুরগি আর একটা মাছ। খাওয়া-দাওয়ার পরে তো আবার রওয়ানা হল নৌকো। একেবারে অন্ধকার নামা পর্যন্ত তারা চললেন। সন্ধের মুখে মুখে নিরাপদ একটা খাঁড়িতে ঢুকে দু'দিকের তীরের থেকে বেশ খানিকটা দূরে এসে নোঙর ফেলা হল। সাহেবদের মনে হল জন্তুজানোয়ারের আক্রমণের সম্ভাবনা অনেক কম হবে এই মাঝখাঁড়িতে। তবুও, বাড়তি সাবধানতা হিসেবে ঠিক হল পালা করে রাত জেগে পাহারা দেওয়া হবে। পাদরি সাহেব লিখেছেন কী ভাগ্যিস তাকেও রাত জাগতে হয়েছিল সেখানে, সেইজন্যেই অপূর্ব এক দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হল তার—চাঁদের আলোয় রামধনু।"

"ও!" হরেন বলে উঠল, "আমি জানি কোন জায়গায় হয়েছিল এটা। নিশ্চয়ই গেরাফিতলার কাছটায় হবে।"

"রাবিশ," আমি বললাম, "কী করে জানবে তুমি হরেন? তিনশো বছরেরও আগেকার ঘটনা, সেটা তুমি কী করে জানবে?"

"আমিও দেখেছি তো, "হরেন প্রতিবাদ করল, "ঠিক যেমন আপনি বলছেন—একটা বড় নদী দিয়ে গিয়ে একটা খাঁড়ি, সেরকম। শুধু সে জায়গাটায় দেখা যায় ওই চাঁদের রামধনু। পূর্ণিমার রাতে কুয়াশা থাকলে রামধনু হয় ওখানটায়। সে যাকগে, আপনি গল্পটা বলুন সার।"

"বাদাবনে আসার তৃতীয় দিনে বার্নিয়ে আর তার দলবল আবিষ্কার করলেন যে তাঁরা পথ হারিয়ে ফেলেছেন। একবার এ নদী দিয়ে যান, একবার সে খাঁড়িতে ঢোকেন—আর যত এরকম ঘুরতে থাকেন, আরও গুলিয়ে যায় পথ। ভয়ে সবার প্রাণ শুকিয়ে গেছে, ভাবছেন বুঝি এই গোলোকধাঁধা থেকে বেরোনোই যাবে না কোনওদিন, এখানেই বোধ হয় ঘুরে মরতে হবে। এইরকম সময়, আবার এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। নৌকো থেকে দেখা গেল দূরে একটা বালির চরের ওপর কিছু লোক কী যেন করছে। নৌকোর মুখ ঘোরানো হল সেদিকে। সাহেবরা ভেবেছিলেন নিশ্চয়ই স্থানীয় জেলে-টেলে হবে, ওদের কাছ থেকে বেরোনোর পথ জেনে নেওয়া যাবে। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখা গেল লোকগুলি পর্তুগিজ। নুন তৈরি করছে ওই বালির চরে।"

"ওহ!" লম্বা একটা শ্বাস ছেড়ে বলল হরেন। "ও জায়গাটা তো আমি চিনি। কেঁদোখালি যাওয়ার পথে পড়ে। ওদিকে একটা জায়গা আছে যেখানে এখনও গ্রামের কিছু লোক নুন তৈরি করে। আমার ছোটকাকা একবার এক রাত্তির ছিল ওই চরে। সারারাত কাদের সব গলা শুনেছে। অদ্ভুত ভাষায় কী সব কথা বলছে। নিশ্চয়ই

ওই ভূতগুলোই হবে। সে যাকগে সার, আপনি বলুন গল্পটা।"

"চারদিনের দিন, তখনও এই ভাটির দেশ থেকে বেরোতে পারেননি পাদরিসাহেব আর তার দলবল। সন্ধে হয়ে এসেছে, তখন আবার একটা খাঁড়ির মাঝে গিয়ে নোঙর ফেলা হল। সে রাত এক অসাধারণ রাত। প্রথমে তো হাওয়া বন্ধ হয়ে গেল; সারা জঙ্গলে একটা গাছের পাতা নড়ছে না। তারপর, নৌকোর চারপাশের বাতাস আস্তে আস্তে গরম হয়ে উঠতে লাগল। ক্রমে এত গরম হয়ে গেল যে পাদরি আর তার দলবলের প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসার মতো অবস্থা হল। তারপর হঠাৎ মনে হল নৌকোর চারপাশের জঙ্গলে যেন আগুন লেগেছে; গাছে গাছে থিকথিক করছে অজস্র জোনাকি। এমনভাবে উড়ছিল জোনাকিগুলো, মনে হচ্ছিল যেন গাছের ডাল আর শেকড়গুলোর ওপর দিয়ে আগুন নেচে বেড়াচ্ছে। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেল মাঝিরা। পাদরি লিখেছেন, "উহাদের মনে হইতেছিল ওইগুলি সব ভূতপ্রেত।"

"কিন্তু সার," অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে হরেন জিজ্ঞেস করল, "মনে হচ্ছিল কেন লিখেছে সার? ওগুলো তো ভূতই। তা ছাড়া আবার কী?"

"আমি জানি না, হরেন। পাদরি যা লিখেছেন সেটাই আমি বলছি।"

"ঠিক আছে সার, ঠিক আছে। বলুন, আপনি বলুন।"

"পরের রাতটা আরও সাংঘাতিক সম্পূর্ণরূপে ভয়াবহ এবং বিধ্বংসী', লিখেছেন সাহেব। কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ প্রচণ্ড এক ঝড় উঠল। ওদের নৌকোটাকে ঠেলে নিয়ে ঢোকাল এক খাঁড়ির মধ্যে। কোনওরকমে সেটাকে পাড়ের কাছে নিয়ে গিয়ে যত দড়িদড়া ছিল সব দিয়ে কষে বাঁধা হল একটা গাছের সঙ্গে। কিন্তু ভয়ানক সে ঝড়ের দাপট; হাওয়ার মুখে দড়ি বেশিক্ষণ টিকল না। খানিক পরেই টুকরো টুকরো হয়ে গেল সব বাঁধন, মনে হল ঝড়ের তোড়ে এক্ষুনি নৌকো খাঁড়ির নিরাপদ আশ্রয় থেকে ভেসে যাবে মোহনায়, উথাল পাথাল ঢেউয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে একেবারে। আর সমস্তক্ষণ অঝোরে বৃষ্টি, মনে হইতেছিল যেন কেউ বৃহৎ বারিভাণ্ড লইয়া নৌকার উপর জল নিক্ষেপ করিতেছে, আর মস্তকের সম্মুখে অনবরত এমন উজ্জ্বল বিদ্যুৎচমক আর কর্ণবিদারক বজ্রপাত হইতে লাগিল যে সে রাত্রে আমাদিগের প্রাণ বাঁচানোর আশা আর রহিল না।"

"এইরকম সময়ে 'এক আকস্মিক এবং স্বতস্ফূর্ত চেষ্টায়' পাদরিসাহেব আর তার দুই পর্তুগিজ পথপ্রদর্শক জঙ্গলের গাছের পাচালো শেকড়গুলি দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। তাদের হাতগুলোও যেন জীবন্ত শেকড়ের মতো হয়ে লেগে রইল গাছের সঙ্গে। প্রায় দুই ঘটিকা কাল, যতক্ষণ সে ঝঞ্ঝা তীব্র গতিতে বহিয়া চলিল', ততক্ষণ ওঁরা সেইভাবে রইলেন।"

"এই রে!" বলে উঠল হরেন। "নিশ্চয়ই সে গণ্ডীটা পেরিয়ে গিয়েছিল।"

"কোন গণ্ডী হরেন?"

"বললেন না সার, যে ওরা হারিয়ে গেছিল?"

"হ্যাঁ, বললাম তো।"

"আর দেখতে হবে না! তা হলে তাই হয়েছিল। নিশ্চয়ই ভুল করে গণ্ডীটা পেরিয়ে গিয়েছিল, আর একেবারে দক্ষিণরায়ের এলাকায় কোনও দ্বীপে গিয়ে পড়েছিল। ওরকম কোথাও কিছু নেই হঠাৎ ঝড় শুরু হয়ে গেল—ওরকম হলেই বুঝতে হবে ও দক্ষিণরায় আর তার দানোগুলোর কারসাজি।"

আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না আমি। বললাম, "হরেন, ঝড়ঝঞ্ঝা হল প্রাকৃতিক ব্যাপার, কারও ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর সেটা নির্ভর করে না।"

এত রূঢ়ভাবে কথাটা বলেছিলাম আমি যে হরেন আর প্রতিবাদ করল না, কিন্তু একমতও হল না আমার সঙ্গে। "ঠিক আছে সার," ও বলল, "আমার বিশ্বাস আমার কাছে, আপনার বিশ্বাস আপনার কাছে। তারপর গল্পটা কী হল বলুন।"

আমার মনে হল একমাত্র কবিই ওর মতো এইরকম মানুষদের চিনতে পেরেছিলেন—'পেশি আর সারল্যে ভরপুর।'

অনেকক্ষণ একটানা লেখা হয়ে গেল কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে বোধহয়। আমার ডটপেনের কালিও ফুরিয়ে এসেছে। এত বছর না লিখলে এরকমই হয় প্রতিটা মুহূর্ত যেন স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ হয়ে ফিরে আসে, ছোট ছোট ঘটনাকে মনে হয় যেন বিশ্বদর্শন।

আমাকে এখানে ফকিরের কাছে রেখে কুসুম আর হরেন বেরিয়েছে। ওরা দেখতে গেছে যে গুজবটা সত্যি কিনা মরিচঝাঁপিতে হামলা হতে পারে সেই গুজব; যদি সেটা সত্যি হয় তা হলে কখন হতে পারে সে হামলা?

আপশোস হচ্ছে। এতগুলো বছর কত সময় ছিল আমার হাতে, কিন্তু একটা শব্দও লিখিনি আমি। আর এখন আমার নিজেকে আরব্যোপন্যাসের সেই শাহজাদির মতো মনে হচ্ছে—ভ্রান্তস্থিতি, ভ্রান্তলিঙ্গ—ছুটন্ত কলম হাতে কোনওরকমে রাতটা পার করে দেওয়ার চেষ্টা করছি...

গর্জনতলা

শেষবার নদী পেরোনোর পর ফকিরের নৌকো এসে থামল অগভীর জলে, পাড় থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূরে। পিয়ার আন্দাজ একেবারে ঠিক প্রমাণিত হয়েছে, সন্দেহের কোনও অবকাশই নেই আর—সাউন্ডিং-এর ফলাফল অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে বাঁকের মুখে, নদীর

কনুইয়ের ঠিক ভেতরের দিকটায় কিলোমিটার খানেক জায়গা জুড়ে বেশ খানিকটা গম্ভীর হয়ে গেছে খাতটা। চারপাশ থেকে আস্তে আস্তে ঢালু হয়ে এসে কিডনি আকৃতির একটা বেসিন সৃষ্টি হয়েছে সেখানে। কোথাও কোথাও সেটা নদীর খাতের থেকে আট মিটারের মতো বেশি গম্ভীর হলেও, গড়ে সে গভীরতা মিটার পাঁচেকের বেশি নয়। সংক্ষেপে, শুখা মরশুমে জল কমে এলে মেকং নদীর নীচের যে 'পুকুর'গুলিতে ওর্কায়েলারা এসে জমা হয়, প্রায় সবদিক থেকেই সুন্দরবনের এই নদীখাতের দহের সঙ্গে তার ভীষণ মিল।

জল এখন অনেকটাই ওপর দিয়ে বইছে। হাত কয়েকের বেশি আর দেখা যাচ্ছে না। পাড়ের কাদা। বনের গাছগুলোও ঠিক চোখের সমান উচ্চতায়—নৌকোর থেকে উঁচুতেও নয়, নিচুতেও নয়। পাড়ের কাছে এ জায়গাটা এতই অগভীর যে এখানে আর সাউন্ডিং-এর কোনও মানেই হয় না। বেশ কয়েকঘণ্টা পর এতক্ষণে একটু গা ঢিলে দিল পিয়া। দূরবিনটা নামিয়ে চোখ রাখল পাড়ের সবুজের দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কাদার মধ্যে ইটের টুকরোর মতো কী যেন একটা নজরে এল। দূরবিন দিয়ে ভাল করে একবার দেখল পিয়া। হ্যাঁ, ঠিকই মনে হয়েছিল, ইটের টুকরোই বটে। একটা টুকরো শুধু নয়, পাড় জুড়ে রাশি রাশি পড়ে রয়েছে ওরকম ভাঙা ইট। ওপরের ঘন জঙ্গলের দিকে নজর করে দেখা গেল গায়ে গায়ে লেগে থাকা গাছগুলোর মধ্যে কয়েকটা গজিয়ে উঠেছে পুরনো মাটির দেওয়ালের ওপর, আর কয়েকটার শেকড়-বাকড়ের মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে থাক থাক ইট।

ফকিরকে ডাকল পিয়া, "লুক—দেয়ার।" পাড়ের দিকে একবার ফিরে দেখে মাথা নাড়ল ফকির। হাত দিয়ে সেদিকে দেখিয়ে বলল, "গর্জনতলা"। পিয়া আন্দাজ করল হয়তো কোনও একদিন এই নামে কোনও বসতি ছিল এখানে। "গর্জনতলা?" মাথা নেড়ে সায় দিল ফকির। নামটা জেনে খুশি হল পিয়া, চটপট টুকে নিল নোটবইয়ে। ঠিক করল এই পরিত্যক্ত গ্রামের নামেই ভাটার সময় ডলফিনদের জড়ো হওয়ার জায়গাটার নামকরণ করা হবে—'গর্জনতলা, দহ'।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠল টুটুল। অল্প দুলে উঠল নৌকোটা। নোটবই থেকে চোখ তুলে পিয়া দেখল খানিক দূরে পাড়ের একটা গাছের দিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে ও। আশপাশের অন্য গাছের তুলনায় সেটা বেশি লম্বা, এই বাদাবনের গাছের মতো নয় ঠিক, খানিকটা যেন বার্চের মতো দেখতে—পাতলা ডালপালা, হালকা রঙের বাকল, বনের অন্যসব গাছের ঘন সবুজের সামনে এর পাতাগুলোকে মনে হচ্ছিল প্রায় রুপোলি।

পিয়ার নদী পারাপারের কাজ হয়ে যাওয়ার পর হঠাই নৌকোর মুখ এদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল ফকির। একটু আশ্চর্য হয়েছিল পিয়া। এর আগে জঙ্গলের এতটা কাছে ও কখনও আসেনি, মনে হচ্ছিল যেন এই প্রথম এল বনের মুখোমুখি। আগে জঙ্গল যেটুকু দেখেছে সে হয় অর্ধেক জলে ডোবা, নয়তো দূরের উঁচু পাড় থেকে জলের ওপর ঝুঁকে থাকা কালো ছায়ার মতো। সামনাসামনি দেখে অবাক হয়ে গেল ও। চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়ে দেয় এই গাছগাছালির সারি। পর্দা বা দেওয়ালের মতো যে জঙ্গলটা চোখের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তা শুধু নয়, যেন ধন্দে ফেলে দিচ্ছে মানুষের দৃষ্টিকে, যেন খুব ভেবেচিন্তে বানানো প্রহেলিকা। আকার, ঢং, বর্ণ আর বিন্যাসের এত বৈচিত্র্য এখানে যে চোখের সামনে থাকা জিনিসও হঠাৎ করে নজরে আসে না, লুকিয়ে থাকে অসংখ্য রেখার জটের মধ্যে—বাচ্চাদের হেঁয়ালি ছবির মতো।

শেষ একবার জোরালো বৈঠা মেরে ফকির দাঁড় তুলে নিল। পাড়ের কাদায় আস্তে একবার ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল ডিঙিটা। ফকির উঠে দাঁড়িয়ে ম্যাজিকের মতো কবজির ছোট্ট একটা মোচড়ে পরনের লুঙ্গিটাকে ল্যাঙ্গোটের মতো বানিয়ে ফেলল। তারপর নৌকোর পাশের দিকে পা ঝুলিয়ে বসে ঝুপ করে নেমে পড়ল জলে, আর নৌকোটাকে আরও একটু ঠেলে দিল পাড়ের দিকে। ডিঙির একেবারে সামনে বসে পিয়া দেখল পাড়ের অনেকটা ওপরের দিকে বসে আছে ও, সামনের ঢাল জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে জটপাকানো ম্যানগ্রোভের দেওয়াল।

টুটুলকে কোলে তুলে নিয়ে হাত দিয়ে পিয়াকে ইশারায় ডাকল ফকির। পিয়া বুঝতে পারল নৌকো থেকে নেমে ওর পেছন পেছন যেতে বলছে। কিন্তু কোথায় যাচ্ছে ও? পিয়ার ইশারায় প্রশ্নের জবাবে শুধু হাত তুলে সামনের জঙ্গলের পেছনে দ্বীপের ভেতরের দিকটা দেখাল ফকির।

"ইন দেয়ার?"

আবার হাত নেড়ে ডাকল ওকে ফকির। ইশারা করল তাড়াতাড়ি যেতে। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল পিয়া; কাদা, পোকামাকড়, ঘন বন—এসব ওর একটুও পছন্দ নয়। কিন্তু এ সবগুলিই প্রচুর পরিমাণে রয়েছে পাড়ের ওপর। অন্য যে-কোনও অবস্থাতেই কিছুতেই এরকম জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে ঢুকত না পিয়া, কিন্তু ফকিরের সঙ্গে ও যেতে পারে। কেন যেন মনে হয় ওর সঙ্গে থাকলে বিপদের কোনও ভয় নেই।

"ওকে। আই অ্যাম কামিং," হাঁটু অব্দি প্যান্টটা গুটিয়ে নিয়ে নৌকোর পাশের দিক দিয়ে পা বাড়িয়ে দিল পিয়া। পায়ের তলা থেকে কাদা সরে গেল ওর ভারে। একটা ভেজা ভেজা খপাৎ শব্দ করে মাটির ভেতরে যেন টেনে নিল পা-টা। পিয়া একটুও প্রস্তুত ছিল না এর জন্যে, কারণ ফকির যখন নেমে দৌড়ে পাড়ে উঠে গেল তখন একবারও মনে হয়নি কাদা এত গভীর এখানে। সামান্য যেটুকু সামনে ঝোঁক দিয়ে নামতে হল নৌকো থেকে, এ কাদায় ব্যালান্স হারানোর জন্য সেটুকুই যথেষ্ট। কাদা যেন গোড়ালিটা কামড়ে ধরে টানছে পেছনের দিকে, শরীরটাকে সরিয়ে দিচ্ছে ভরকেন্দ্র থেকে। হঠাৎ পিয়া দেখল মুখ থুবড়ে উলটে পড়ে যাচ্ছে ও, হাতদুটো সামনে বাড়ানো—কাদা থেকে বাঁচার জন্য। কিন্তু ঠিক সময়ে ওর একেবারে সামনে এসে গেল ফকির। নিজের শরীর দিয়ে পিয়াকে ঠেকানোর জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল ওর মুখোমুখি। ধপাস করে ফকিরের কাঁধের ওপর এসে পড়ল পিয়া, ওর গায়ের সেই নোনা গন্ধ আবার এসে লাগল নাকে। হাতের সামনে কোনও থাম কি গাছ পেলে পড়ন্ত মানুষ যেমন তাকে জড়িয়ে ধরে নিজেকে সামলায়, ফকিরকে সেরকম দু হাতে জড়িয়ে ধরল পিয়া। একটা হাতে আঁকড়ে ধরল ফকিরের স্কন্ধার হাড়। অন্য হাতটা পিছলে গেল ওর খালি গায়ের চামড়ার ওপর দিয়ে, একেবারে পিঠের শেষটায় এসে থামল। মুহূর্তের জন্য সংকোচে অবশ হয়ে গেল পিয়া। ঠিক সেইসময়ে টুটুলের গলা শুনতে পেল ও। পিয়ার দুরবস্থা দেখে মজা পেয়ে হাসছে—শিশুসুলভ আনন্দে। আস্তে আস্তে আঙুল সরিয়ে নিয়ে ফকিরের গা ছেড়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল পিয়া। ওকে সোজা করে দাঁড় করাতে ফকির যখন কনুইয়ের তলা দিয়ে এক হাত গলিয়ে দিল, পিয়া দেখল ও-ও হাসছে। সে হাসিতে নিষ্ঠুরতা নেই। পিয়ার পড়ে যাওয়ার চেয়ে আচমকা গভীর কাদায় নামার পর ওর ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটাতেই যেন বেশি মজা পেয়েছে ফকির।

পিয়া নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পর ছোট্ট একটু মূকাভিনয় করে দেখিয়ে দিল ফকির, কেমন করে হাঁটতে হবে এই কাদার মধ্যে। প্রথমে একটা পা তুলে বুড়ো আঙুলটা কঁকড়ার পঁাড়ার মতো কুঁকড়ে ধরল, তারপর কাদার মধ্যে যেন পুঁতে দিল পা-টাকে। পিয়া নিজে চেষ্টা করল এবার, কয়েক পা এগোল ঠিক মতো, তারপর পিছলে গেল আবার। সৌভাগ্যবশত ফকির পাশেই ছিল। ওর হাতটা ধরে কোনওরকমে টাল সামলে নিল। কাদা পার হয়ে পাড় বরাবর টানা দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ঢুকে পড়া পর্যন্ত হাতটা ধরে রইল পিয়া।

ফকিরের সঙ্গে দেখা গেল একটা ধারালো দা আছে। পিয়াকে ছেড়ে এগিয়ে গেল ও, ডাইনে বাঁয়ে দা চালিয়ে ডালপাতা কেটে কেটে ঢুকতে লাগল ঘন বনের ভেতরে। সামান্য পরেই জঙ্গলের দেওয়াল ভেদ করে একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ল ওরা। বনের মধ্যে একচিলতে ফাঁকা ঘাসজমি, কয়েকটা বেঁটে খেজুরগাছ ছাড়া আর কোনও গাছ নেই সেখানে।

ফাঁকা জায়গাটার শেষে ছোট একটা গুমটি মতো ঘর—কয়েকটা খুঁটির ওপর দাঁড় করানো। একদৌড়ে টুটুল সেটার সামনে চলে গেল। কাছে গিয়ে পিয়া দেখল গুমটি নয়, পাতা দিয়ে তৈরি একটা ছোট মন্দিরের মতো—ওটা দেখে ওর মায়ের পুজোর টেবিলের

একটা সুদূর স্মৃতি ভেসে এল পিয়ার মনে। তফাত শুধু এ মন্দিরের মূর্তিগুলির সাথে পিয়ার চেনা হিন্দু ঠাকুর দেবতাদের কোনও মিল নেই। সবচেয়ে বড়টি স্ত্রী মূর্তি টানা টানা চোখ, শাড়ি পরা; তার পাশে আকারে একটু ছোট একটি পুরুষের মূর্তি। দু'জনের মাঝখানে নিচু হয়ে বসে আছে একটা বাঘ—গায়ের ডোরাকাটা দাগ দেখে বাঘ বলে আন্দাজ করা গেল সেটাকে।

পিয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল ফকির আর টুটুল মিলে একটু পুজো মতো করল সেখানে। প্রথমে কিছু ফুল পাতা নিয়ে এসে মূর্তিগুলির সামনে রাখল। তারপর মন্দিরের সামনে মাথা হেঁট করে জোড়হাতে দাঁড়িয়ে ফকির মন্ত্রের মতো কিছু একটা আওড়াতে লাগল। কয়েক মিনিট শোনার পর পিয়া ধরতে পারল মন্ত্রটার মধ্যে একটা লাইন ধুয়ার মতো ঘুরে ঘুরে আসছে। তার মধ্যে একটা শব্দ মনে হল 'আল্লা'। এতক্ষণফকিরের ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায়নি পিয়া, কিন্তু এখন মনে হল ও হয়তো মুসলমান। কিন্তু সেটা ভাবার পরেই খেয়াল হল মুসলমান হলে তো এরকম মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করবে না। ফকির যেটা করছে তার সাথে ওর মা যেরকম পুজো করত তার বেশ মিল রয়েছে। কিন্তু মন্ত্রের শব্দগুলো শুনে আবার অন্যরকম মনে হচ্ছে।

তবে যাই হোক না কেন তাতে কীই বা আসে যায়? এখানে দাঁড়িয়ে এরকম একটা অদ্ভুত পুজো দেখার সুযোগ পেয়েই ও খুশি।

মিনিট কয় পরে আবার ফিরতি পথ ধরল ওরা। জঙ্গল ভেদ করে নদীর কাছে পৌঁছে পিয়া দেখল সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিমে, এদিকে নদীর জলও নামতে শুরু করেছে। এবার খুব সাবধানে পা টিপে টিপে কাদার মধ্যে দিয়ে হেঁটে ডিঙিটার কাছে গিয়ে পৌঁছল পিয়া। নৌকোয় উঠতে যাবে, এমন সময় হাত নাড়ল ফকির। কিছু একটা দেখাতে চাইছে কাদার মধ্যে। মিটার বিশেক দূরে হাঁটু গেড়ে বসে আছে ও মাটির দিকে ইশারা করছে হাত দিয়ে। পিয়া একটু এগিয়ে গেল। দেখল কাদার মধ্যে একটা গর্তের মতো কিছু দেখাচ্ছে ফকির। কাঁকড়া বিজবিজ করছে সেটার মধ্যে। ভুরুদুটো একটু তুলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল পিয়া। ফকির একটা হাত তুলে দেখাল, যেন ওকে বলতে চাইছে গর্তটা কীসের একটা হাতের ছাপ। ব্যাপারটা ঠিক মাথায় ঢুকল না পিয়ার। ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগল ফকির ছাড়া আর কে হাত দিতে যাবে ওই কাদার মধ্যে? হঠাৎ খেয়াল হল হাত' নয়, ও বোধহয় 'পা' বোঝাতে চাইছে—মানে 'থাবা"। "টাইগার?" শব্দটা উচ্চারণ করতে যেতেই আঙুল তুলে বারণ করল ফকির। পিয়া আন্দাজ করল নিশ্চয়ই কোনও কুসংস্কার আছে—নাম উচ্চারণ করা বা ইঙ্গিতেও প্রসঙ্গটার উল্লেখ করা চলবে না।

ছাপটার দিকে আবার তাকাল পিয়া। দেখে কিন্তু ফকির যা বলছে সেরকম কিছু বুঝল না ও। দাগটা যেখানে আছে তাতেই ওর বেশি সন্দেহ হচ্ছিল—ওই জায়গায় আসতে গেলে তো জঙ্গল থেকে পুরো বেরিয়ে আসতে হবে জন্তুটাকে। তা হলে তো জল থেকে ওর চোখে পড়ত। আর একটা বাঘ যদি কাছাকাছি থাকে তা হলে ফকিরই বা এরকম নিশ্চিন্তে থাকে কী করে? কিছুই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

ঠিক তখনই একটা শ্বাস ফেলার মতো শব্দ শুনতে পেল পিয়া। সঙ্গে সঙ্গে বাঘ-টাঘের সমস্ত চিন্তা উবে গেল ওর মাথা থেকে। দূরবিন তুলে দেখল কুঁজের মতো দুটো জিনিস জল কেটে ভেসে যাচ্ছে। সেই মা ডলফিন, ছানাটার সঙ্গে সাঁতরাচ্ছে। জল নামার সাথে সাথে আবার ফিরে এসেছে ডলফিনগুলো। যেরকম আন্দাজ করেছিল পিয়া, তার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে ওদের গতিবিধির ধরন।

আলোড়ন

হঠাৎ দপদপ করতে করতে নিভে গেল টেবিলের ওপরের আলোটা। তখনও মেসোর ঘরে বসে একমনে লেখাটা পড়ছিল কানাই। একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে খানিকক্ষণ বসে রইল চুপ করে। বাইরে জেনারেটারের ধকধক শব্দটা কমতে কমতে মিলিয়ে গেল। একটা নিঝুম

ভাব মেঘের মতো ধীরে ধীরে ছড়িয়ে গেল গোটা দ্বীপটার ওপর। কানাই যেন শুনতে পাচ্ছিল তার এগিয়ে আসা, ভাবছিল নিস্তব্ধতার প্রসঙ্গে ইংরেজিতে কেন যে 'ফল' বা 'ডিসেন্ড' শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় কে জানে—শুনতে লাগে যেন ওপর থেকে নেমে আসা পর্দা কি ছুরি। জেনারেটার বন্ধ হওয়ার পর যে নৈঃশব্দ্য এখন অনুভব করছে কানাই, তার মধ্যে পড়ে যাওয়া কি থিতিয়ে পড়ার ভাব তো নেই। বরং কুয়াশা কি মেঘের সঙ্গেই তার মিল বেশি—যেন দূর থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল গুঁড়ি মেরে, কিছু শব্দকে ঢেকে দিল তার চাদরে, কিছু শব্দকে আবার স্পষ্ট করে তুলল—ঝিঁঝিপোকার ডাক, দূরের কোনও রেডিয়ো থেকে ভেসে আসা একটা গানের টুকরো, হঠাৎ একটা পাচার কর্কশ চিৎকার। প্রত্যেকটা শব্দই শোনা গেল সামান্য দু-এক মুহূর্তের জন্য, তারপরেই যেন আবার ঝাপসা হয়ে ঢাকা, পড়ে গেল কুয়াশায়। এরকমভাবেই হঠাৎ একটা অচেনা শব্দ কানে এল কানাইয়ের, খুব সামান্য সময়ের জন্য, তারপরেই মিলিয়ে গেল শব্দটা। প্রতিধ্বনির মতো বহু দূর থেকে জলের ওপর দিয়ে ভেসে আসা সে আওয়াজ হয়তো শোনাই যেত না জেনারেটার চালু থাকলে। তা সত্ত্বেও সে শব্দের মধ্যে নগ্ন দাপট, শক্তি এবং হিংস্রতার ভয়ংকর প্রকাশ বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হল না। ছোট্ট একটু আওয়াজ, কিন্তু তাতেই যেন মুহূর্তের জন্য নিথর হয়ে গেল সমস্ত দ্বীপ, অন্যসব শব্দ যেন থেমে গেল হঠাৎ। আর তারপরেই শুরু হয়ে গেল কানে তালা-ধরানো শোরগোল—সবচেয়ে বেশি শোনা যাচ্ছিল কুকুরগুলোর পাগলের মতো চিৎকার।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ছাদে বেরিয়ে এল কানাই। আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করল কখন ফের বদলে গেছে চারপাশের রূপ। যেন কোনও মহাকাব্য লেখকের কলমের আঁচড়ে। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। দিনের বেলা যে ছবি দেখেছিল, জ্যোৎস্নায় ধুয়ে গিয়ে এখন যেন তার রুপোলি নেগেটিভটুকু রয়ে গেছে চোখের সামনে। আবছা আঁধারে ঢাকা দ্বীপগুলোকেই এখন মনে হচ্ছে টলটলে দিঘি, আর গোটা নদীর বিস্তার জুড়ে যেন পড়ে রয়েছে বিশাল এক চকচকে ধাতুর পাত।

"কানাইবাবু?"

ঘুরে তাকিয়ে কানাই দেখল মাথায় ঘোমটা দেওয়া এক ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে দরজায়।

"ময়না?"

"হ্যাঁ।"

"শুনতে পেয়েছ?" বলতে-না-বলতেই আবার সেই আওয়াজ—একইরকম অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি, খানিকটা যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসা কোনও রেলগাড়ির শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে সারা দ্বীপ জুড়ে ফের শুরু হয়ে গেল কুকুরদের কোরাস, যেন শব্দটা আবার হবে বলে এতক্ষণ অপেক্ষা করে ছিল ওরা।

"এটা কি..." বলতে শুরু করেই কানাই দেখল কেমন যেন কুঁকড়ে গেল ময়না। থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "নামটা বলতে নেই, না?"

"না," ময়না বলল। "জোরে বলতে নেই এ নাম।"

"কোথা থেকে আসছে মনে হয় শব্দটা?"

"যে-কোনও জায়গা থেকে হতে পারে," বলল ময়না। "আমি ঘরে বসেছিলাম, বসে বসে অপেক্ষা করছি, তখন ওটা শুনতে পেলাম। স্থির হয়ে আর বসে থাকতে পারলাম না।"

"ফকির তা হলে এখনও ফেরেনি?"

"না।"

এবার কানাই বুঝল জন্তুটার গর্জনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে ময়নার উদ্বেগের। "চিন্তা কোরো না," ওকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য বলল কানাই। "নিশ্চয়ই সাবধানেই আছে ফকির। কী করতে হয় না হয় সে তো ও জানে।"

"ও?" রাগ যেন ঝরে পড়ছে ময়নার গলায়। "ওকে জানলে আর এ কথা বলতেন না আপনি। সব লোকে যা করে, ও ঠিক তার উলটোটা করবে। অন্য যারা মাছ ধরতে যায়,

আমার বাবা, আমার ভাইরা, প্রত্যেকে ডিঙিতে রাত কাটালে সবার নৌকো একসঙ্গে বেঁধে মাঝনদীতে গিয়ে থাকে, যাতে কিছু হলে সবাই মিলে সামাল দিতে পারে। কিন্তু ফকির তা করবে না। ও নিজের মতো কোথাও একটা গিয়ে থাকবে; চারদিকে হয়তো সেখানে একটা জনপ্রাণীও নেই।”

“কেন?”

“ও ওইরকমই, কানাইবাবু,” ময়না বলল। “নিজের বোঝ নিজে বোঝে না। একেবারে বাচ্চাদের মতো করে।”

চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে ময়নার মুখের সোনার বিন্দু তিনটে। আবার নক্ষত্রপুঞ্জের তিনটে তারার কথা মনে হল কানাইয়ের। যদিও যত্ন করে আঁচলটা টানা মাথার ওপর, কিন্তু ময়নার একদিকে একটু হেলানো মুখের অস্থির ভাবটুকু ওর মার্জিত শাড়ি পরার ঢংয়ের সঙ্গে ঠিক যাচ্ছে না, মনে হল কানাইয়ের।

“একটা কথা বলো তো ময়না,” খানিকটা যেন মজা করে ওকে খেপানোর সুরে বলল কানাই, “বিয়ের আগে তুমি চিনতে না ফকিরকে? মানে, ও কীরকম মানুষ সেটা জানতে না?”

“হ্যাঁ,” ময়না বলল। “আমি ওকে জানতাম, কানাইবাবু। ওর মা মারা যাওয়ার পর তো হরেন নস্করই ওকে মানুষ করেছে। ওদের গ্রাম আর আমাদের গ্রাম তো একেবারে পাশাপাশি।”

“আচ্ছা, তুমি তো বুদ্ধিমতী মেয়ে, ময়না,” কানাই বলল। “যদি জানতেই ও কীরকম লোক, তা হলে ওকে বিয়ে করলে কেন?”

মনে হল যেন নিজের মনেই একটু হাসল ময়না। “সে আপনি বুঝবেন না।”

ময়নার প্রত্যয়ী ভঙ্গিটা যেন বিছুটির মতো এসে লাগল কানাইয়ের গায়ে। “আমি বুঝব না?” কর্কশ শোনাল ওর গলার স্বর। “তুমি জান আমি ছয়-ছয়টা ভাষা জানি? সারা পৃথিবী ঘুরেছি আমি? আমি কেন বুঝব না?”

ঘোমটা খসে গেল ময়নার, মিষ্টি করে একটু হাসল ও কানাইয়ের দিকে তাকিয়ে। “আপনি ক’টা ভাষা জানেন তাতে কিছু আসে যায় না কানাইবাবু। আপনি তো মেয়েমানুষ নন, আর আপনি ওকে চেনেনও না। আপনি বুঝবেন না।”

হঠাৎ ফিরে চলে গেল ময়না। কানাই দাঁড়িয়ে রইল, একা।

শোনা

ডলফিনগুলোর ধীর নিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দে একটু ঝিমুনি মতো এসে গিয়েছিল পিয়ার। হঠাৎ যেন স্বপ্নের মধ্যে থেকে ভেসে আসা প্রচণ্ড একটা গুমগুম আওয়াজে চটকাটা ভেঙে গেল। চোখ খুলে উঠে বসতে বসতেই আবার চারদিক চুপচাপ। প্রতিধ্বনির রেশটুকুও নেই আর। ডিঙির গায়ে জলের ধাক্কায় মৃদু একটা ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুধু কানে আসছে। ফটফটে জ্যোৎস্নায় তারাগুলোকে দূরে ক্ষুদে ক্ষুদে আলোর বিন্দুর মতো মনে হচ্ছে।

নৌকোটা দুলতে শুরু করল হঠাৎ। তার মানে ফকিরও জেগে আছে। মাথাটা একটু তুলে পিয়া দেখল ডিঙির ঠিক মাঝখানটায় আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছে ফকির। উঠে পড়ে কাঁকড়ার মতো হামা দিয়ে গিয়ে ওর পাশে বসল পিয়া। "কীসের আওয়াজ ওটা?" ভুরুদুটো একটু তুলে মাথা ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল ইশারায়। একটু হাসল ফকির, কিন্তু সোজাসুজি কোনও জবাব দিল না। হাতটা তুলে অস্পষ্টভাবে পাড়ের দিকে ইশারা করল একবার। তারপর থুতনিটা হাঁটুর ওপর রেখে বিকেলে ওরা যে দ্বীপটায় গিয়েছিল সেটার দিকে চেয়ে রইল একদৃষ্টে। এতদূর থেকে জলের ওপর হালকা জরির নকশার মতো লাগছে এখন দ্বীপটাকে।

শুশুকগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে নৌকোটার চারপাশে। দু'জনে বসে চুপচাপ সেই শব্দ শুনল খানিকক্ষণ। একটু পরে পিয়া শুনতে পেল খুব আস্তে আস্তে গুনগুন করছে ফকির। একটু হেসে ও বলল, "সিং। লাউডার। সিং।" আরও বার দুই বলার পর নিচু গলায় গাইতে শুরু করল ফকির। আগের দিন যে গানটা গাইছিল তার থেকে এ সুরটা একেবারে অন্যরকম– মাঝে মাঝে প্রাণোচ্ছল, কয়েকটা কলি আবার ধীর, শান্ত। পিয়ার মনে হল যেন নিজের মনের ভাবের ছায়া দেখতে পাচ্ছে ওই সুরে। ফকিরের গান আর তার ফাঁকে ফাঁকে ডলফিনদের শ্বাসের শব্দ শুনতে শুনতে কেমন একটা তৃপ্তিতে ভরে উঠল ওর মনটা। এই মায়াময় পরিবেশে নৌকোর ওপর একজন বিশ্বাসী মানুষের পাশে বসে ওই শুশুকদের চলাফেরার শান্ত শব্দ শোনা–এর চেয়ে সুখ আর কী আছে?

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল ওরা দু'জন। পিয়ার মনে হল ফকির যদিও চেয়ে আছে সামনের তীরের দিকে, কিন্তু আসলে কিছুই দেখছে না ও। ঘুম এসে গেছে নাকি? যেমন অনেক সময় মানুষ আধো-ঘুমে থাকলেও দেখে মনে হয় জেগে আছে। নাকি নিজের ভাবনাতেই ডুবে আছে ও? হারিয়ে যাওয়া কোনও স্মৃতির ছেঁড়া সুতো জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করছে মনে মনে?

কী দেখবে ফকির ফিরে তাকালে? একটা কুঁড়েঘরের ছবি মনে এল পিয়ার ক্যানিং-এর আশেপাশে যেরকম দেখেছে–মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল, হেঁচা বাঁশের। দরজা। ফকিরের বাবাও হয়তো একজন জেলে পাকানো দড়ির মতো হাত পা, বহু বছরের রোদে জলে পোড়খাওয়া মুখ; ওর মা-র চেহারা শক্ত সমর্থ, কিন্তু ক্লান্তির ছাপ তাতে–দিনের পর দিন ঝুড়ি ঝুড়ি মাছ আর কঁকড়া বাজারে বয়ে নিয়ে যাওয়ার হাড়ভাঙা খাটুনি স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে চেহারায়। ছোট্ট ফকিরের খেলার সাথীর কোনও অভাব নেই, চারদিকে একগাদা বাচ্চা-কাচ্চা দৌড়ে বেড়াচ্ছে। সংসারে স্বাচ্ছল্য নেই, কিন্তু পরিবারের মধ্যে উষ্ণতার কোনও অভাব নেই। এরকম পরিবারের কথা বাবার মুখে শুনেছে পিয়া: অভাব আর দারিদ্রই সেখানে একসাথে বেঁধে রাখে সকলকে।

বিয়ের আগে কি কখনও ওর বউয়ের মুখ দেখেছে ফকির? ওর নিজের বাবা মা-র কথা শুনেছে পিয়া, তারা নাকি বিয়ের আগে দেখেছিল পরস্পরকে, এমনকী কথাও বলেছিল। অন্য সব আত্মীয়স্বজনদের সামনে অবশ্য। কিন্তু ওরা তো শহরের লোক, মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত। ফকিরদের গ্রামে নিশ্চয়ই বিয়ের আগে বর-কনেকে ওরকম দেখা করতে দেয় না। হয়তো বিয়ের যজ্ঞের সময়ই প্রথম ওরা দেখেছে দুজন দুজনকে। হয়তো তার পরেও চোখ তুলে

তাকায়নি ওর বউ, যতক্ষণ না রাতে ওদের কুঁড়ের মাটির দেয়াল দেওয়া ঘরে গিয়ে শুয়েছে পাশাপাশি। তখনই হয়তো প্রথম ভাল করে চেয়ে দেখেছে বরের দিকে, মনে মনে ধন্যবাদ দিয়েছে ভাগ্যকে, এরকম জোয়ান, টানা টানা চোখের সুন্দর বর জুটিয়ে দেওয়ার জন্য। হয়তো এরকম বরেরই স্বপ্ন দেখে এসেছে ও বরাবর, এর জন্যেই এতদিন প্রার্থনা করেছে ভগবানের কাছে।

উঠে পড়ল পিয়া, আবার গিয়ে শোবে। ডিঙির সামনের দিকে পেতে রাখা বিছানায় গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে মনোযোগ দিল ডলফিনগুলোর দিকে। ভরা জোয়ার এসে গেছে, কিন্তু এখনও দহটা ছেড়ে যায়নি ওরা। তার মানে রাতে ওরা শিকারে বেরোয় না। কাল তা হলে ভাটা শেষ হলে দেখতে হবে তখন ওরা কী করে।

শুয়ে শুয়ে কল্পনা করতে লাগল পিয়া আধোঘুমে দহটার মধ্যে পাক খেয়ে যাচ্ছে ডলফিনগুলো, জলের মধ্যে ভেসে আসা প্রতিধ্বনি শুনছে কান পেতে, ছবি আঁকছে–ত্রিমাত্রিক সব ছবি, যার অর্থ একমাত্র ওরাই উদ্ধার করতে পারে। খুব ভাল লাগে পিয়ার ওদের জগৎটার কথা ভাবতে: যেখানে ‘দেখা’ আর ‘শোনা’য় কোনও ফারাক নেই, যেখানে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগই অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র উপায়।

সে তুলনায় নিজের জগতে—এখানে–কত লক্ষ যোজন দূরত্ব ওর আর ফকিরের মধ্যে। ওই জ্যোৎস্নার নদীর দিকে চেয়ে কী ভাবছে ফকির? জঙ্গলের কথা? কঁকড়ার কথা? কোনওদিনই জানতে পারবে না পিয়া। শুধু যে ভাষার ব্যবধানের জন্য তা নয়, জানতে পারবে না কারণ মানুষদের জগৎটাই এরকম। একমাত্র মানুষই পৃথিবীতে আসে অন্যের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখার ক্ষমতা নিয়ে। ফকির আর ও, ওরা দু’জন দু’জনকে যতটা জানে, তাতে ওরা যদি দুটো গাছ কি পাথরও হত তফাত বিশেষ কিছু হত না। সেভাবে ভাবলে একদিক থেকে এটাই তো ভাল, এই কথা না বলতে পারাটা–অন্তত এটুকু তো বলা যাবে যে নিজেদের কাছে সৎ আছে ওরা। কারণ ডলফিনরা যেমন তাদের প্রতিধ্বনির আয়নাতেই পৃথিবীটাকে দেখে, তার সঙ্গে তুলনা করলে মানুষের ভাষা তো শুধু কিছু কৌশল, চোখের দিকে তাকিয়েই মনের কথা পড়ে নেওয়া সম্ভব–এই ভুল ধারণার বাহন মাত্র।

তীরে ভেড়া

অবশেষে কুমিরমারি। সেখানেই সেদিন মরিচঝাঁপির কথা প্রথম শুনলাম আমি। দুটো দ্বীপের দূরত্ব খুব একটা বেশি নয়। যে স্কুলটায় গিয়েছিলাম সেখানকার মাস্টারমশাইদের মধ্যেও অনেকেই দেখেছেন যখন রিফিউজিরা আসে। হাজারে হাজারে লোক নাকি এসেছে—বড় নৌকোয়, ছোট নৌকোয়—যে যা পেয়েছে। তাতে করেই গিয়ে উঠেছে মরিচঝাঁপিতে। মাস্টারমশাইদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেও নাকি কেউ কেউ ভিড়ে গেছে ওদের সঙ্গে, বিনে পয়সায় জমি পাওয়া যাবে সেই আশায়। সবাই আশ্চর্য হয়েছে উদ্বাস্তুদের বুকের পাটা দেখে। কেউ কেউ আবার বলেছে এই নিয়ে পরে গন্ডগোল বাঁধতে পারে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের জায়গা, সরকার কি আর এমনি ছেড়ে দেবে? তাড়িয়ে ছাড়বে ওদের ওই দ্বীপ থেকে।

আমি আর এই নিয়ে মাথা ঘামাইনি তখন। আমার কী যায় আসে?

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে হরেন আর আমি ধীরে সুস্থে রওয়ানা হলাম লুসিবাড়ির উদ্দেশে। নৌকো করে যাচ্ছি বাড়ির পথে, এমন সময় হঠাৎ ঝড় উঠল। দেখতে না দেখতে তুমুল হাওয়ার তোড় হুড়মুড় করে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের ওপর—অদ্ভুত রণমূর্তিতে ক্ষ্যাপা মোষের মত আক্রমণ করল আমাদের। এজন্যই এখানকার লোকে মনে করে যে অলৌকিক কিছু একটা আছে এই ঝড়গুলোর পেছনে। কয়েক মিনিট আগে পর্যন্ত যে নদী একেবারে শান্ত ছিল সেখানে এখন উথাল পাথাল ঢেউ, মোচার খোলার মতো নৌকোটাকে তুলে আছড়াচ্ছে। খানিক আগেও যে নৌকোকে নাড়াতে দম বেরিয়ে যাচ্ছিল হরেনের, সে এখন হু হু করে ছুটে চলেছে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

"এবার কি তা হলে শেষ, হরেন?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"না সার," ও বলল, "এর থেকেও কত বড় ঝড় পার করে দিয়েছি—"

"কবে?"

"সত্তর সালে। আগুনমুখা ঝড়ে পড়েছিলাম। সে যদি আপনি দেখতেন তা হলে তো এটাকে কোনও ঝড়ই মনে হত না আপনার। কিন্তু সে অনেক লম্বা গল্প সার। এখন আগে কোনওরকমে পাড়ে নিয়ে গিয়ে তুলি নৌকোটাকে।" ডান হাত তুলে একটা দ্বীপের দিকে দেখাল হরেন।

"মরিচঝাঁপি, সার। ঝড় থামা পর্যন্ত ওখানেই গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।"

আমি আর কী বলব? পেছন থেকে হাওয়ার চাপ থাকায় একটু পরেই গিয়ে পাড়ে ঠেকল নৌকো। সেটাকে ঠেলে ডাঙায় তুলতে হরেনের সঙ্গে হাত লাগালাম আমিও। তারপর ও বলল, "সার, কোথাও একটা গিয়ে উঠতে হবে আমাদের। কোনও চালা-টালার নীচে।"

"এখানে কোথায় গিয়ে উঠব হরেন?"

"ওইখানটায় সার। একটা ঘর দেখা যাচ্ছে।"

আর কথা না বাড়িয়ে ওর পেছন পেছন দৌড়োলাম। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছে, আমার চশমার কাঁচ বেয়ে ধারা নামছে জলের, কোনওরকমে শুধু হরেনের পিঠটার দিকে নজর রেখে দৌড়ে চলেছি সামনের দিকে।

একটা চালাঘরের সামনে গিয়ে পৌঁছলাম আমরা। দরমার বেড়া আর গোলপাতার ছাউনি দেওয়া ঘর। দরজার কাছে এসে হরেন একটা হাঁক ছাড়ল, "ঘরে কেউ আছ নাকি গো?

খুলে গেল দরজাটা। আমি গিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। চোখ পিটপিট করতে করতে চশমা খুলে কাঁচটা মুছছি, এমন সময় শুনতে পেলাম কে যেন বলছে, "সার? আপনি!"

নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম একজন অল্পবয়সি মহিলা হাঁটু গেড়ে বসে প্রণাম করছে আমাকে। আমি চিনি না ওকে, কিন্তু ও আমাকে চেনে। তাতে অবশ্য আমি বিশেষ আশ্চর্য হইনি। বহু বছর এক জায়গায় শিক্ষকতা করলে পথেঘাটে যার সঙ্গেই দেখা হয় এই একই ব্যাপার ঘটে। ছাত্রছাত্রীরা বড় হয়ে যায়, স্মৃতিশক্তি তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে পারে না। নতুন নতুন মুখগুলিকে তাদের পুরনো চেহারার সঙ্গে মেলাতে পারি না।

"সার, আমি কুসুম," মেয়েটি বলল।

এত দূরে এই মরিচঝাঁপিতে ঝড় বাদলের মধ্যে আশ্রয় খুঁজতে এসে শেষে কুসুমের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। "অসম্ভব!"

চশমাটা শুকিয়ে গেছে ততক্ষণে। নজর করে দেখলাম একটা বাচ্চা ছেলে উঁকি মারছে মেয়েটির পেছন থেকে। "ওটা আবার কে?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"ও আমার ছেলে, ফকির।"

একটু ঝুঁকে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে গেলাম, কিন্তু ছুট্টে পালাল ছেলেটা। মায়ের আঁচলের তলা থেকে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল।

"খুব লাজুক, সার," হেসে বলল কুসুম।

হঠাৎ আমার খেয়াল হল হরেন তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলাম আমাকে সম্মান দেখানোর জন্য ভেতরে ঢোকেনি ও। মনে মনে একটু খুশিও হলাম, আবার বিরক্তিও লাগল। খুশি হলাম, কারণ মানুষের শ্রদ্ধার মূল্য বুঝবে না দুনিয়ায় এরকম সাম্যবাদী কেউ কি আছে? কিন্তু রাগ হল এই কথা ভেবে যে, ও কি জানে না এইরকম হাত-জোড় করা ভাব আমি পছন্দ করি না?

দরজা দিয়ে মাথা বের করে দেখলাম ওই অঝোর বৃষ্টির মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ও। "কী ব্যাপার কী হরেন?" আমি বললাম। "ভেতরে এসো, ভেতরে এসো। এখন কি এইসব আদিখ্যেতার সময় নাকি?"

ভেতরে এল হরেন। খানিকক্ষণ কারও মুখে কোনও কথা নেই—বহুদিন পর চেনা মানুষদের সঙ্গে দেখা হলে অনেক সময় যেমন হয়। কুসুমই মুখ খুলল প্রথম, "তুমি?" হরেন তার স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে বিড়বিড় করে কী যে জবাব দিল কিছুই বোঝা গেল না। তারপর বাচ্চাটাকে ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে কুসুম বলল, "এই যে ফকির, আমার ছেলে।" ছেলেটার চুলে হাত বুলিয়ে হরেন বলল, "বেশ বেশ!"

"আর তোমার বাড়ির কী খবর?" জিজ্ঞেস করল কুসুম। "ছেলেপুলেরা নিশ্চয়ই সব বড় বড় হয়ে গেছে?"

"ছোটটার পাঁচ বছর হল, "হরেন বলল। "আর বড়টার এই চোদ্দো চলছে।" হাসল কুসুম। তারপর ঠাট্টার সুরে বলল: "বল কী গো? তা হলে তো প্রায় বিয়ের বয়স হয়ে গেল বলতে গেলে।"

"না," হঠাৎ একটু জোরেই বলে উঠল হরেন। "যে ক্ষতি আমার হয়েছিল ওর বেলায় সেটা হতে দেব না আমি।"

কথাটা লিখলাম একটা উদাহরণ হিসেবে, অনেক অস্বাভাবিক সময়েও মানুষ কেমন তুচ্ছ সব বিষয়ে কথা বলে সেটা বোঝানোর জন্য।

"কাণ্ডটা দেখো একবার," আমি বললাম। "এতদিন পরে খোঁজ পাওয়া গেল কুসুমের, আর আমরা কিনা হরেন আর তার ছেলেমেয়েদের নিয়েই কথা বলে যাচ্ছি তখন থেকে।"

একটা মাদুর পাতা ছিল মাটিতে, তার ওপরে বসে পড়লাম আমি। কুসুমকে জিজ্ঞেস করলাম কোথায় ছিল ও এতদিন, আর কী করেই বা এই মরিচঝাঁপিতে এসে পৌঁছল।

"কী বলব সার," বলল কুসুম। "সে অনেক বৃত্তান্ত।"

বাইরে থেকে বাতাসের গর্জন কানে আসছে, বৃষ্টিরও থামার কোনও লক্ষণ নেই। "এমনিতেও তো কিছুই করার নেই এখন," আমি বললাম। "তার থেকে তোর গল্পটাই বল, শুনি।"

হাসল কুসুম। "ঠিক আছে সার। আপনাকে আর না বলি কী করে? যা যা ঘটেছিল সবই বলছি।"

মনে আছে, সে কাহিনি বলতে গিয়ে গলার স্বর বদলে গেল কুসুমের, কথা বলার ঢঙে ছন্দ যোগ হল—স্পষ্ট তার লয় আর মাত্রা। নাকি সে আমারই স্মৃতির ছলনা? কে জানে। সে যাই হোক, ওর সেই কথাগুলি এখন বন্যার স্রোতের মতো নেমে আসছে আমার মনে। তার

সঙ্গে তাল রেখে পক্ষীরাজের মতো উড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে আমার কলমকে। মূর্তিমতী বাগদেবী সেদিনের সেই কুসুম; আমি তার লিপিকর মাত্র।

"মা কোথায়, খোঁজ কেউ পারে কি বলতে? আঁধারে হাতড়ে মরি, পথ জেনে নিতে অনেককে শুধোলাম। কেউ বলে শুনি, ধানবাদ নামে কোনও শহরেতে কোথা মাকে ওরা নিয়ে গেছে। সেখানে কী করে যেতে হবে জানি না তো। জিজ্ঞাসা করি, অচেনা বা চেনা লোক যাকে পাই পথে। এই গাড়ি সেই গাড়ি রেলগাড়ি ধরে, অবশেষে পৌঁছই ধানবাদে গিয়ে।

"স্টেশনে নামার পর অন্ধকার দেখি, কী করে এখানে আমি খুঁজে পাব মাকে? খনির শহরে সেই সেখানে বাতাসে ধোঁয়া ধুলো লোহাগন্ধ চারিদিকে ভাসে। লোকজন পথেঘাটে আদতে আলাদা, তেমন মানুষ আগে দেখিনি কখনও। লোহা দিয়ে গড়া যেন মুখের জবান। কথা বলে, শব্দ যেন বেজে বেজে ওঠে। চোখের চাহনি যেন জ্বলন্ত কয়লা, তাকালেই মনে হয় হ্যাঁকা লাগে গায়ে। একে সেখানে আমি ছেঁড়া ফ্রক পরা, ছোট মেয়ে, ভয়ে বুক দুরু দুরু করে।

"অদৃষ্ট কিন্তু ছিল সহায় আমার। অজানিতে ভগবান বাতলে দিল পথ। ঘুগনির ফেরিওয়ালা স্টেশনে সেখানে সওদা সাজিয়ে বসে খদ্দেরের আশে। কাছে গিয়ে তার সাথে কথা বলে আমি দেখি যে ভাটির দেশ তারও জন্মভূমি! নাম তার রাজেন, ছিল বাসন্তীতে বাড়ি। গরিব ঘরের ছেলে, খুবই ছেলেবেলা দেশ ছেড়ে চলে আসে পেটের ধান্দায়। একদিন কলকাতা শহরে হঠাৎই চলন্ত বাসের নীচে চাপা পড়ে সে যে এক পা খোয়াল তার। তারপর থেকে এটা ওটা ফেরি করে ট্রেনে ও স্টেশনে। ভাগ্যচক্র অবশেষে নিয়ে এল তাকে, ধানবাদ শহরে এই। এখানে কপালে জুটে গেল ঝুপড়ি এক, সেখানেই থাকে। রেললাইনের পাশে, বেশি দূরে নয়। যখন শুনল রাজেন বৃত্তান্ত আমার, বলল সাহায্য নিশ্চয় করবে আমাকে। কিন্তু ততদিন আমি থাকব কোনখানে? চলে এসো ঝুপড়িতে আমার সঙ্গেই থেকে যাবে, অসুবিধা কিছুই হবে না। তুমি তো একাই, আমি একলাই থাকি। দু'জনের জন্যে ঘরে যথেষ্ট জায়গা,বলল রাজেন। আমি ধীর পায়ে পায়ে ওর পিছু পিছু যাই রেললাইন ধরে। সেখানে গিয়ে তো ডরে বুক কেঁপে ওঠে। কে জানে কেমন ঠাঁই, নিরাপদ কিনা। সারারাত জেগে থাকি। ঝম ঝম করে ট্রেন যায়, সেই শব্দ শুনি শুয়ে শুয়ে।

"বহুদিন কেটে গেল রাজেনের ঘরে। লজ্জায় পড়িনি এক মুহূর্ত কখনও। মানুষ সে ভাল ছিল, দয়ার হৃদয়। এরকম কটা লোক খুঁজে পাওয়া যায়? ঠিক বটে, সেখানেও কানাঘুষো ছিল–"দেখ রে, ল্যাংড়া রাজু কাকে নিয়ে থাকে। সেসব কখনও আমি গায়েতে মাখিনি। বলুক যা মন চায়। কী বা যায় আসে?

"অবশেষে একদিন রাজেনই মায়ের খোঁজ নিয়ে এল। নাকি এক জায়গায় ট্রাক-ড্রাইভাররা সব আসে প্রতিদিন, খাঁটিয়ায় বিশ্রাম করে সেথা, আর ভাড়া করে মেয়েদের। সেখানেই নাকি মা আমার কাজ করে। রাজেনের সাথে একদিন গোপনেতে গিয়ে দেখা করি। মাকে তো দেখেই বুকে ঝাপাই তখনি। কিন্তু মুখে কথা নেই–বাক্যহারা আমি; এ কী দেখি, মা তো নয়, মায়ের কঙ্কাল: কুঁকড়ে গেছে শুকনো মুখ, রোগা জীর্ণ দেহ। সে চেহারা দেখে কষ্টে ভেঙে গেল বুক। ফিসফিসে গলা মার, অস্ফুটে বলল, "দেখিস না, কুসুম, চোখ বন্ধ করে ফেল। এ চেহারা মুছে ফেল মন থেকে তোর। আগেকার আমাকেই মনে রেখে দিস, সেই যবে তোর বাবা বেঁচে ছিল আর, কষ্ট ছিল, তবু ছিল ভরা সংসার। সবই সেই দিলীপের দোষ। সে রাক্ষস, মিথ্যেবাদী, বলেছিল খুঁজে দেবে কাজ ভাল কোনও জায়গায়। শেষে এইখানে নিয়ে এসে ঠেকিয়েছে। এর চেয়ে ভাল ছিল দেশে পড়ে থেকে শাকপাতা খেয়ে কোনও মতে বেঁচে থাকা, সে তবু মানের। দিলীপ দানব সেই আনল আমাকে, বেচে দিল অন্য সব পশুদের কাছে। তুই হেথা থাকিস না, ফিরে যা, ফিরে যা। কিন্তু মন তবু চায় একবার আরও দেখে নিই তোর মুখ জনমের মতো। যাওয়ার আগেতে শুধু আর একটি বার দেখা করে যাস এই অভাগীর সাথে।

“সে রাতের মতো আমি ফিরি ঝুপড়িতে। হপ্তা এক-দেড় পরে রাজেন আবার নিয়ে গেল আমাকে সে মায়ের ডেরায়। তখনই রাজেন দিল বিয়ের প্রস্তাব। বলে মাকে, অনুমতি দাও যদি তুমি, কুসুমকে বউ করে রেখে দিই কাছে। নতুন জীবন হবে ওর, আর আমি দুঃখ সুখ ভাগ করে নেব ওর সাথে।অবশেষে দেখি মা-র মুখে হাসি ফোটে: এর চেয়ে সুসংবাদ কী বা হতে পারে? কী ভাগ্য কুসুম! বনবিবির দয়ায় বর পাবি, ঘর পাবি এর চেয়ে সুখ কিছু যে কপালে আছে ভাবিনি কখনও।রাজেন বলল, ‘মা গো, তোমাকেও সাথে নিয়ে যাব চুরি করে। এখানে কিছুতে আমরা তোমাকে আর দেব না থাকিতে। এ তোমার জায়গা নয়। কিছুদিন আরও থাক যদি প্রাণে তুমি বাঁচবে না আর। মা-কে সাথে করে নিয়ে ফিরি সেইদিনই রাজেনের ঝুপড়িতে। সে যে কত সুখ! তার পর বিয়ে হল রাজেন ও আমার। মা দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দিল আমাদের। তখন কি জানতাম এ মা-র মুকতি? তিন মাসও তারপর কাটল না আর: আমাদের সুখী দেখে মা নিল বিদায়। সে মা-র নিয়তি ছিল—কী বা করা যাবে? আরও দু’বছর যদি বাঁচত পরাণে, দেখে যেত ফকিরকে ছেলেকে আমার।

“কত মাস কেটে গেল সেই ধানবাদে। মাঝে মাঝে দু’জনেই ভাবি ফিরে যাই, এ খনির দেশ ছেড়ে। এ তো নয় ঘর। এখানের সব কিছু বড় ভিনদেশি। লোহার ওপরে হুঁটি, মনে পড়ে খালি, ভাটির দেশের কাদা জন্ম থেকে জানা। এখানে রেলের লাইন চারিদিক বেড়ে, দেখি আর ভাবি সেই রায়মঙ্গল, কতদূরে চেনা সেই বানভাসা নদী। স্বপ্নে দেখি ঝড় আসে উথাল পাথাল, বাদাবন থরথর হাওয়ার বেগেতে। ছোট ছোট দ্বীপ কত নদী দিয়ে ঘেরা, সোনালি শেকলে যেন বাঁধা পড়ে থাকে। জোয়ারের কথা ভেবে দু’চোখে জোয়ার, মনে পড়ে মোহনার থইথই জলে ভেসে যায় নিচু দ্বীপ, মনে হয় যেন জলের নীচেতে কত মেঘ জমে আছে। রাত্রে দেশের কথা মনে করি আর গল্প করি, স্বপ্ন দেখি। সকালে আবার ফিরে আসি ফের সেই লোহা কয়লার জগতে। মনের দুখ মনে রাখি চেপে।

“এভাবেই চলে গেল চারটি বছর। তারপর সে জীবনও শেষ হয়ে গেল: চলতে শুরু করল ট্রেন, রাজেন তখনও পায়নি পয়সা তার যাত্রীদের থেকে। ইঞ্জিনের তেজ বাড়ে, রাজেনও দৌড়ায়। হঠাৎ মোচড় লাগে খোঁড়া পায়ে তার, হোঁচটে ছিটকে পড়ে চাকার নীচেতে। কী আর বলার আছে? সময়ের আগে চলে গেল। কখনও তো

ভাবিইনি আমি এভাবে হঠাৎ করে ছেড়ে চলে যাবে। সান্ত্বনা, ফকির আছে দান রাজেনের। তাকে বুকে নিয়ে ফের ভাবি চলে যাব চেনা দেশে, চেনা ঘরে ফিরব আবার। কিন্তু ভয় লাগে প্রাণে, বাচ্চা কোলে নিয়ে কার কাছে হাত পেতে দাঁড়াব সেখানে? যদি কিছু নাই জোটে কী করে সংসার চালাব? আবার যদি দিলীপের পায়ে গিয়ে পড়তে হয় তা’লে কী হবে আমার?

“মনে হয় বনবিবি দেখেছিল সবই, নিজের আসন থেকে। কারণ একদিন হঠাৎ খবর পাই বিরাট মিছিল যাবে এ শহর দিয়ে, পুবদেশ পানে। পরদিনই এল তারা, মানুষের ঢল নেমে এল ধানবাদে। রেললাইন ধরে দেখি ক্লান্ত মুখ সব ধুলোয় ধূসর পা টেনে টেনে চলে। কাঁধে ছানাপোনা, বোঁচকা কুঁচকি যত, সারা সংসার টেনে নিয়ে হেঁটে চলে ভূতের মতন। কোথায় চলল এরা? কোথা থেকে আসে? সবাই অচেনা মুখ, এ শহরে আগে এদের কাউকে আমি দেখিনি কখনও। দাঁড়িয়ে দেখছি আমি সেই জনস্রোত, হঠাৎ পড়ল চোখে বয়স্কা মহিলা আমার মায়ের মতো—পা হড়কিয়ে পড়ে। তাকে নিয়ে আসি। ওদের দলের আরও কেউ কেউ আসে মহিলার সাথে। জল আর খাবার দিই, দেখি কী ভীষণ ক্লান্ত সব। বিশ্রামের খুবই দরকার। রহো, ব্যয়ঠো, বলি আমি হিন্দি ভাষায়, বিশ্রাম নিতে বলি ওদের সেখানে। জবাব আসে বাংলায়, আমি তো অবাক। চেনা শব্দ, চেনা ভাষা—কানে মধু ঢালে। কে তোমরা? কোথা থেকে আসছ এভাবে? কোথায়ই বা যেতে চাও? শুধোলাম আমি। “তুমি আমাদের বোন। বলি শোনো তবে, দীর্ঘ কাহিনি সেই,’ বলে শুরু করে।

“আমরা বাংলারই লোক, খুলনা জেলার। ভাটি দেশে ঘর ছিল, জঙ্গলের কাছে। সে ঘর জ্বালিয়ে দিল যুদ্ধের সময়। আমরা পালিয়ে আসি, বর্ডার পেরিয়ে। এদেশে ঢুকতেই

পাকড়াও করল পুলিশ, বাস ভরে নিয়ে গেল উদ্বাস্তু শিবিরে। সে এক অচেনা ঠাই, এরকম আগে জীবনে দেখিনি। বড় ভয়ংকর লাগে। ধূ ধূ করে মাঠ; মাটি টকটকে লাল, রক্তে ধোয়া যেন। যারা সে দেশের লোক তাদের কাছেতে সেই একই লাল মাটি সোনার সমান, তারা তাই ভালবাসে। যেভাবে আমরা ভালবাসি কাদামাটি, বাদাবন, নোনা জল—ঠিক সেরকমই। কিন্তু আমাদের সেথা বসে না তো মন। চেষ্টা প্রাণপণ করি, তবু কীরকম মাথার ভেতরে সেই নদী ডাক দেয়, জোয়ারের টান লাগে শিরায় শিরায়। আমাদেরই বাপ কাকা বহুদিন আগে হ্যামিলটনের ডাকে সাড়া দিয়েছিল, নদীর টানের সাথে কী লড়াই লড়ে বাদাবন সাফ করে গড়েছিল গ্রাম। একই ভাবে এখনও তো গড়ে নিতে পারি নতুন বসতি আরও, ভাবি মনে মনে। ভাটির দেশেতে আরও কত খালি দ্বীপ এখনও তো পড়ে আছে—মানুষ থাকে না। আমাদেরই এক দল গিয়ে দেখে এল বড় খালি চর এক, মরিচঝাঁপিতে। তারপর বহু মাস প্রস্তুতি নিতে চলে গেল। অবশেষে বেচেবুচে সব রওয়ানা হলাম। কিন্তু সাথে সাথে দেখি, পেয়াদা পুলিশ সব লেগেছে পেছনে। ট্রেনে থিকথিক করে পুলিশের লোক, রাস্তা বন্ধ করে রাখে, আটকে দেবে বলে। তবু পিছু হটব না কিছুতে আমরা—হাঁটতে শুরু করে দিই রেললাইন ধরে।

“শুনি বসে বসে আর বুকে আশা জমে; এরা তো নিজেরই লোক, আত্মীয় আমার—একই ভাষা, রক্তে একই জোয়ারের টান, একই স্বপ্ন দেখি, মনে একই সুর বাজে। এরাও মাখতে চায় সেই কাদামাটি হাতে-পায়ে, দেখতে চায় জোয়ারের নদী। আমি কেন তবে আর দূরে সরে থাকি? কী লাভ এখানে থেকে, এই ধানবাদে? জং-ধরা শহরে এই মুখে রক্ত তুলে পরিশ্রম করে যাব আমরণ কাল? পুঁটুলি গুছিয়ে নিই, কাপড় কখানা গাঁঠরি বেঁধে তুলে দিই ফকিরের কাঁধে। রাজেনের স্মৃতি বুকে নেমে আসি পথে। অনেক দূরের পাড়ি সে মরিচঝাঁপি।

“এই হল কাহিনি, সার। এই আমার কথা। এভাবেই পৌঁছলাম এইখানে এসে।”

খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম আমরা, যে যার নিজের ভাবনা নিয়ে কুসুম আর ফকির, হরেন আর আমি। মনে মনে যেন দেখতে পাচ্ছিলাম ওরা হেঁটে আসছে, ওই হাজার হাজার মানুষ, শুধু ভাটির দেশের কাদায় আরেকবার পা রাখার জন্য। দেখতে পাচ্ছিলাম ওরা আসছে, দলে দলে ছেলেমেয়ে বাচ্চা বুড়ো সারাজীবনের সমস্ত সঞ্চয় পুঁটুলিতে করে মাথায় নিয়ে হেঁটে আসছে এই মরিচঝাঁপির দিকে। মনে হল এদের কথাই তো কবি বলতে চেয়েছিলেন, যখন লিখেছিলেন:

“পৃথিবীর প্রতিটি ধীর মন্থর ঘূর্ণন এখন কিছু উত্তরাধিকারহীন সন্তানের জনক,
যার কাছে ভূত কিছুর অর্থ নেই, আসন্নেরও মান নেই কোনও।”

ধাওয়া

সকালেও দেখা গেল বাড়ি যাওয়ার কোনও উদ্যোগ করছে না ফকির। পিয়াও তাড়া দেওয়ার প্রয়োজন মনে করল নাঃ যতক্ষণ এই ডলফিনগুলোর সঙ্গে কাটাতে পারে ততই ওর ভাল।

খানিকটা বেলায় জল ফের বাড়তে শুরু করা পর্যন্ত দহটার মধ্যেই রয়ে গেল প্রাণীগুলো। তারপর আবার আধঘণ্টা যেতে না যেতেই উধাও হয়ে গেল—ঠিক আগের দিনের মতো। তফাত শুধু জোয়ার আসার সময়ের।

তা হলে, এখন যেটা জানা বাকি রয়ে গেল তা হল এখান থেকে বেরিয়ে এরা যায় কোথায়। ফকির হয়তো জানলেও জানতে পারে। নানারকম ইশারা আর অঙ্গভঙ্গি করে অবশেষে ফকিরকে ওর প্রশ্নটা বোঝাতে পারল পিয়া: এই নৌকো করে কি ডলফিনগুলোর পেছন পেছন যাওয়া যাবে? সাগ্রহে মাথা নাড়ল ফকির, সঙ্গে সঙ্গে নোঙর তুলে ফেলল।

দহটা ছেড়ে যখন বেরোল ওরা, তখনও জোয়ারের জল ঢুকছে। ফলে স্রোতের টানে নৌকোর গতিও বাড়ল খানিকটা। গর্জনতলা পেছনে ফেলে একটা মোহনায় এসে পৌঁছল ওরা। নৌকোর গলুইয়ে দাঁড়িয়ে পিয়া লক্ষ করল থইথই জোয়ারে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে চারপাশের দ্বীপগুলো।

দূরবিনে চোখ রেখে সামনে অনেকটা দূরে একবার জলের ওপর এক জোড়া পাখনা দেখতে পেল পিয়া। কিন্তু মোহনা পেরিয়ে যেতে যেতেই সেগুলির আর কোনও চিহ্ন দেখা গেল না। তবে ফকিরকে দেখে মনে হল ও ঠিক জানে কোথায় যেতে হবে। নির্দ্বিধায় ডিঙির মুখ ঘুরিয়ে প্রথমে একটা বড় খাঁড়িতে পড়ল, সেখান থেকে আবার ঢুকল সরু একটা খালে। খানিক যাওয়ার পর হঠাৎ দাঁড় নামিয়ে ইশারা করল পাড়ের দিকে। দূরবিন সমেত মুখ ফিরিয়ে পিয়া দেখল তিনটে কুমির শুয়ে আছে কাদার ওপর। আগে চোখে পড়েনি কারণ এতক্ষণ ও শুধু জলের দিকেই মনোযোগ দিয়েছিল। ও আন্দাজ করল এদেরও হয়তো ফকির আগে এই জায়গায় দেখেছে। চোখের সামনেই শুয়ে ছিল তিনটে কুমির, কিন্তু কাদামাখা শরীরগুলো এমনভাবে চারপাশের সঙ্গে মিশেছিল যে প্রাণীগুলো কত বড় সেটাও ঠিক ভাল করে বোঝা যাচ্ছিল না। একটা কুমির আবার হাঁ করে ছিল। এত বড় রাক্ষুসে হাঁ, যে পিয়ার মনে হল দাঁড়ানো অবস্থায় গোটা একটা মানুষ তার মধ্যে ঢুকে যাবে—অন্তত ওর নিজের মাপের একটা লোক তো বটেই।

এই খালটা তুলনায় একটু সরু, ফলে এখন যদি ভাটার সময় হত, ওই কুমিরগুলোর খুব কাছ দিয়ে যেতে হত ওদের। কিন্তু জোয়ার থাকার ফলে অনেকটা দূরে আছে এখন প্রাণীগুলো পাড়ের বেশ খানিকটা ওপরের দিকে। নৌকোটা ওদের নজরে পড়েছে বলে মনে হল না, কিন্তু খানিক পরে দূরবিন ঘুরিয়ে দেখতে গিয়ে পিয়া লক্ষ করল মাত্র দুটো কুমির শুয়ে আছে এখন সেখানে। তিন নম্বরটা কখন পিছলে নেমে গেছে জলে। কাদার ওপর দিয়ে তার হেঁচড়ে নামার ফলে যে লম্বাটে গর্তটা তৈরি হয়েছে সেটা এর মধ্যেই ভরাট হয়ে যেতেও শুরু করেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আর কোনও চিহ্ন রইল না দাগটার; পাড়ের পলি ফের যেমন কে তেমন—আগের মতোই মসৃণ, চকচকে।

হঠাৎ টুটুল একটা চিৎকার করে হাত তুলে কী একটা দেখাল সামনের দিকে। চট করে দূরবিন ঘুরিয়ে পিয়া একটা ডলফিনের লেজ এক ঝলক দেখতে পেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে গেল সেটা জলের তলায়। কুমির দেখতে গিয়ে খামখা সময় নষ্ট করেছে বলে পিয়ার একটু রাগ হল নিজের ওপর। কিন্তু মিনিট খানেক পরেই আবার দেখা গেল একটা লেজ—জলের ওপরে একেবারে খাড়া যেন মাথার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডলফিনটা। তার পরেই আরও এক জোড়া লেজ দেখা গেল সেটার পাশে, একইরকম খাড়া হয়ে আছে জলের ওপরে। পিয়া চিনতে পারল, সেই মা আর ছানা ডলফিনটা—ওই দহের মধ্যে যাদের দেখেছিল। জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাজারো ছোট ছোট খাঁড়ির সৃষ্টি হয়েছে। চারপাশে,

আশেপাশের দ্বীপগুলোতে ডাঙার মধ্যে বেশ খানিকটা করে ঢুকে গেছে সেগুলো। সেরকমই একটা খাঁড়িতে ঢুকে খাবার খুঁজছে ডলফিনগুলো। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে খুবই কম গভীরতা খাড়িটার, এমনকী ফকিরের নৌকোও ঢুকবে না সেখানে।

তবে ডলফিনগুলো ওখানে কী করছে চোখ বুজে সেটা বলে দিতে পারে পিয়া: এক দল মাছকে তাড়া করে নিয়ে ঢুকেছে ওরা ওই অগভীর জলে, আর মাছগুলো ওদের হাত থেকে পালাবার ব্যর্থ চেষ্টায় গিয়ে লুকিয়েছে কাদার মধ্যে। তারপর খরগোশ যেমন করে ক্ষেতের থেকে গাজর তুলে খায়, অনেকটা সেই ভাবে জলের নীচে কাদা থেকে মাছ তুলে তুলে খাচ্ছে ডলফিনগুলো।

ওর এত দিনের অভিজ্ঞতায় একবারই মাত্র এই দৃশ্যের ব্যতিক্রম দেখেছে পিয়া। ইরাবডিড নদীতে। সেখানে তখন একটা সার্ভের কাজ চলছিল। তারই মধ্যে খানিকটা সময় বের করে নিয়ে মান্দালয়ের উত্তরের এক গ্রামে দুই জেলের কাছে গিয়েছিল ওরা। ওরই চেনা আরেকজন সিটোলজিস্ট বলে দিয়েছিল এই জেলেদের কথা। বলেছিল, ওদের সঙ্গে গেলে এমন এক অভিজ্ঞতা হবে পিয়ার, নিজের চোখে দেখেও যা বিশ্বাস করা কঠিন।

সেই দুই জেলের সঙ্গে আলাপ করে দেখা গেল তারা আসলে বাবা আর ছেলে। বাবা মাঝবয়সি, আর ছেলের বয়স বড়জোর চোদ্দো কি পনেরো। দুপুর এগারোটা নাগাদ তাদের মাছধরা ডিঙিতে চড়ে বসল পিয়া আর ওর দোভাষী। মাপে সে ডিঙিটা মোটামুটি এই ফকিরের নৌকোরই সমান, কিন্তু কোনও ছই ছিল না সেটাতে। সেই এগারোটার সময়ই এত গরম সেখানে যে নদীর জল পর্যন্ত মনে হচ্ছিল ঝিম ধরে আছে, বিশেষ কোনও নড়াচড়া নজরে আসছে না। পিয়া আশ্বস্ত হল দেখে যে খুব একটা দুরে ওদের যেতে হবে না। পাড় থেকে নদীর ভেতরে মিটার বিশেক যাওয়ার পরেই বয়স্ক লোকটি একটা লাঠি বের করে সেটা দিয়ে নৌকোর গায়ে বাড়ি মারতে লাগল। মিনিট কয়েকের মধ্যে একটা মসৃণ চকচকে পাখনা দেখা গেল জলের ওপরে। একটু পরে আরও কয়েকটা পাখনা ভেসে উঠল আশেপাশে। কমবয়সি জেলেটি তখন মাছ ধরার জালটা নিয়ে সেটার ধারে ধারে বাঁধা ধাতুর টুকরোগুলোতে ঝম ঝম করে আওয়াজ করতে শুরু করল। সেই শব্দ শুনে দল ছেড়ে বেরিয়ে এল দুটো ডলফিন। বাকিরা যে জায়গায় ছিল সেখানেই রয়ে গেল, আর এই জোড়াটা এগিয়ে এল নৌকোর খুব কাছে। ডিঙির মুখের কয়েক মিটার দূরে এসে হঠাৎ গোল হয়ে ঘুরতে শুরু করল ডলফিন দুটো, যেন একটা আরেকটার লেজ ধরার চেষ্টা করছে। দোভাষীর মাধ্যমে জেলেরা বোঝাল যে এক দল মাছকে ঘিরে ধরে নৌকোর দিকে নিয়ে আসছে ডলফিন দুটো।

বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে দেখতে লাগল জেলে দু'জন। একটু পরে কমবয়সি জেলেটি উঠে দাঁড়াল। মুখ দিয়ে গুবগুব একটা আওয়াজ করে মাথার ওপর দু'-এক পাক ঘুরিয়ে নিয়ে জালটা ছুঁড়ে দিল জলে। ডলফিন দুটো যেখানে বৃত্তাকারে পাক খাচ্ছিল, ঠিক তার কেন্দ্রে গিয়ে পড়ল জালটা। জাল ডুবতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে বুজকুড়ি উঠতে লাগল জলে। দু-একটা ছোট ছোট রুপোলি মাছ লাফিয়ে উঠল, আর ডলফিনগুলো আরও দ্রুত সাঁতরাতে লাগল, ক্রমশ ছোট করে আনতে লাগল পাক খাওয়ার বৃত্তটা। দলের বাকি ডলফিনগুলোও এবার যোগ দিল ওই দুটোর সঙ্গে, তিরবেগে ঘুরতে থাকল জালের চারদিকে, লেজের বাড়ি মারতে লাগল জলে ছড়িয়ে পড়া মাছগুলোকে জালের কাছাকাছি তাড়িয়ে আনার জন্য।

দুই জেলে এবার টেনে তুলল জালটা, সঙ্গে সঙ্গে খাবি খাওয়া কিলবিলে একটা রুপোলি পিণ্ড যেন ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল নৌকোর ওপর। মনে হচ্ছিল যেন একটা পিনাটা ফাটানো হয়েছে, আর প্রচুর ঝিলমিলে কাগজ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। ডলফিনগুলোও এর মধ্যে তাদের ভোজ শুরু করে দিয়েছে। জালটা যখন জলে ডুবছিল তার চাপে বহু মাছ গিয়ে গেঁথে গিয়েছিল নদীর নীচের নরম মাটিতে। সেই জলের তলার ফসল তুলে এখন খাচ্ছে ওরা। মহা উৎসাহে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেই মাছগুলির ওপর, মাথা নিচু করে লেজ শূন্যে

তুলে শিকার ধরছে; আর জলের ওপরে মনে হচ্ছে তাদের কিলবিলে লেজের একটা ছোট জঙ্গল তৈরি হয়েছে।

একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল পিয়া এই দৃশ্য দেখে। মানুষ এবং বন্যপ্রাণীদের পরস্পরনির্ভরশীলতার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কিছু আছে? ভেবে পেল না ও। কত যে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে এই জলজীবনে তার কোনও সীমা পরিসীমা নেই।

স্বপ্ন

বাইরে ঝড়ের গর্জন থামার কোনও লক্ষণ নেই। বোঝা গেল সে রাতে আর লুসিবাড়ি ফেরা সম্ভব নয়।

"সার," একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অবশেষে বলল হরেন, "মনে হচ্ছে কুসুমের ঘরের মেঝেতেই আজকের রাতটা কাটাতে হবে আমাদের।"

"যা ভাল বোঝ," বললাম আমি। "তুমি যা ঠিক করবে তাই হবে।"

খানিক পরে ভাত চাপাল কুসুম। ফকির ক'টা ট্যাংরা মাছ ধরে এনেছিল, তাই দিয়ে ঝোল রাঁধল। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে ঘরের একপাশে হরেন আর আমার জন্য মাদুর পেতে দিল, আর নিজে ফকিরকে নিয়ে শুল আরেক কোনায়। অনেক রাতে, ঝড় তখন থেমে গেছে, একবার দরজা খোলার আওয়াজ কানে এল। বুঝলাম হরেন বেরোল, নৌকোটা ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে আসতে। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়লাম, বিকারগ্রস্ত জ্বরো রোগীর মতো সে ঘুম, একটা ঘোরের মধ্যে যেন ছটফট করতে লাগলাম।

"সার"—কুসুমের গলা শুনতে পেলাম। অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না। "শরীর খারাপ লাগছে?"

"না তো। কিছু তো হয়নি। কেন রে?"

"না, আপনি ঘুমের মধ্যে চেঁচিয়ে উঠলেন একবার, তাই ভাবলাম।"

কুসুম আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে টের পেলাম। চোখে জল এল আমার। "ওসব বুড়ো মানুষের রাতের বেলার ভয়," অবশেষে বললাম আমি। "এখন ঠিক আছি রে। যা, ছেলের কাছে যা। ঘুমো গিয়ে।"

সকালবেলা উঠে দেখি আকাশে এক ছিটে মেঘ নেই কোথাও। এরকম একটা ঝড়ের পরে তাই হয় সাধারণত। ঝকঝকে রোদে ধুয়ে যাচ্ছে গোটা দ্বীপ আর নদী। কুসুমের ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি কাছাকাছি আরও কয়েকটা এরকম কুঁড়ে রয়েছে। হেঁটে হেঁটে খানিকটা দূর পর্যন্ত গেলাম, দেখলাম বনবাদাড় সাফ করা মাঠের ওপর আরও অনেক ঘর কয়েকটা কুঁড়ে, কিছু গুমটি, বস্তি মতো কয়েকটা। যেরকম হয় এ ধরনের ঘর এই ভাটির দেশে বাঁশ, দরমা আর মাটি দিয়ে তৈরি। কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করলাম: ঘরগুলো কিন্তু যেখানে সেখানে ইচ্ছে মতো বানানো হয়নি।

কী আশা করেছিলাম আমি? নোংরার মধ্যে এলোমেলো ভাবে কিছু মানুষ কোনওরকমে একসঙ্গে গাদাগাদি করে বাস করছে? 'রিফিউজি' শব্দটার অর্থ তো সেরকমই হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু যা দেখলাম তার সঙ্গে আমার কল্পনার কোনও মিলই নেই। রাস্তাঘাট এর মধ্যেই বানানো হয়ে গেছে; বাঁধ—দ্বীপজীবনের নিরাপত্তায় যার প্রধান ভূমিকা—তাও তৈরি হয়েছে; জমি ভাগ ভাগ করে বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়ে গেছে; বেড়ার ওপর শুকোচ্ছে মাছধরা জাল। মহিলা পুরুষ সবাই যার যার ঘরের সামনে বসে বসে জাল সারাই করছে অথবা টোপ গাঁথছে কঁকড়া ধরার সুতোয়।

কী শৃঙ্খলা! কী পরিশ্রম! তাও মাত্রই কয়েক সপ্তাহ হল এরা এখানে এসেছে। দৃশ্যগুলি মনে গেঁথে নিতে নিতে একটা অদ্ভুত, মাতাল-করা উত্তেজনা এল আমার মধ্যে: হঠাৎ আবিষ্কার করলাম নতুন একটা কিছু জন্ম নিচ্ছে আমার চোখের সামনে, যা আগে কেউ কখনও দেখেনি। মনে হল নিশ্চয়ই ঠিক একই অনুভূতি হয়েছিল হ্যামিলটনের লঞ্চের ডেকে দাঁড়িয়ে বাদাবন সাফ করা দেখতে দেখতে। কিন্তু এই মরিচঝাঁপিতে যা হচ্ছে তার সঙ্গে হ্যামিলটনের কাজের একটা মূলগত ফারাক আছে; এটা কোনও একজন মানুষের ভাবনা নয়। যারা এখানে বসত করতে এসেছে এ তাদেরই নিজেদের স্বপ্ন, সেই স্বপ্নকেই বাস্তব করে তুলছে তারা।

আমার চলা থেমে গেল। বৃষ্টিভেজা রাস্তার ওপর এক জায়গায় ছাতায় ভর দিয়ে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি, আমার কোঁচকানো ধুতি অল্প অল্প উড়তে লাগল সকালের

ফুরফুরে বাতাসে। মনে হল আমার ভেতরে যেন একটা পরিবর্তন আসছে। কী বিস্ময়কর, আমি—বই মুখে করে সারা জীবন কাটানো একজন ইস্কুল মাস্টার আমার জীবদ্দশায় এরকম একটা ঘটনা দেখে যাচ্ছি যা কোনও শিক্ষিত বা ক্ষমতাবান মানুষের কল্পনাপ্রসূত নয়, শিক্ষা আর ক্ষমতা যাদের নেই তাদেরই নিজস্ব স্বপ্নের বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করছি আমি!

মনে হল আমার শিরায় শিরায় যেন নতুন প্রাণ ফিরে আসছে। ছাতা ফেলে দিলাম হাত থেকে, বুক চিতিয়ে দাঁড়ালাম রোদ আর হাওয়ার মুখোমুখি। মনে হল যে শূন্যতাকে এত দিন দু'হাতে আঁকড়ে ছিলাম আমি, এক রাত্রে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি দূরে।

ভীষণ উত্তেজিত অবস্থায় আবার ফিরে গেলাম কুসুমের ঘরে। আমার চেহারা দেখে ঘাবড়ে গেল ও। বলল, "কী হয়েছে সার? আপনার জামা কাপড়ে কাদা লাগা, মুখটা লাল হয়ে গেছে... আপনার ছাতাটা কোথায় গেল?"

"সেসব কথা ছাড় এখন," অধৈর্য লাগছিল আমার, "আগে বল, কে আছে এ সবের দায়িত্বে? কোনও কমিটি তৈরি হয়েছে? নেতা-টেতা কেউ আছে?"

"সে তো আছেই। কেন বলুন তো?"

"তাদের সঙ্গে আমি দেখা করব।"

"কেন সার?"

"কারণ, এখানে যা হচ্ছে তাতে আমিও কিছু করতে চাই, সাহায্য করতে চাই যে রকম পারি।"

"সে আপনি চাইলে করবেন। আমি না বলার কে?"

কুসুম আমাকে জানাল যে গোটা দ্বীপটাকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেকটা ভাগের দায়িত্বে আছে কিছু লোক, তারাই সমস্ত ঠিক করছে কী করা হবে না হবে, জরুরি যা যা দরকার তারাই তার ব্যবস্থা করছে।

"তোদের ভাগটার মূল দায়িত্বে যে আছে তার কাছে নিয়ে চল আমাকে," বললাম আমি। কুসুম পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল আমাকে, খানিক দূরে একটা কুঁড়ের দরজায়।

নেতাটি দেখলাম বেশ বুদ্ধিমান, কর্মঠ লোক, আদৌ কোনও স্বপ্নের জগতের বাসিন্দা নয়। কেউ এসে খামখা সময় নষ্ট করলে তাকে পাত্তা দেওয়ার মানুষ সে নয়। স্বল্পবাক, কিন্তু হাবেভাবে এমন একটা আত্মবিশ্বাসের ছাপ, যেন ও জানে যে সাফল্য হাতের নাগালের মধ্যে প্রায়। খুবই ব্যস্ত ছিল সে, কিন্তু যখন শুনল আমি একটা স্কুলের হেডমাস্টার—যদিও অবসর নেওয়ার সময় এসে গেছে প্রায় আমাকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখাল। নতুন বানানো রাস্তা ধরে হেঁটে গেলাম আমরা, আমাকে দেখাতে দেখাতে নিয়ে গেল কী কী কাজ ওরা করেছে আসার পর থেকে এই কয় সপ্তাহে। মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমি, কাজের বহর দেখে শুধু নয়, তার পেছনে যে সংগঠন, যে প্রতিষ্ঠান—কত যত্ন নিয়ে তা গড়ে তোলা হয়েছে, তাই দেখেও। দ্বীপে নিজেদের একটা সরকার তৈরি করে ফেলেছে এরা, জনগণনাও হয়েছে—এর মধ্যেই মরিচঝাঁপির লোকসংখ্যা ত্রিশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে, আরও অনেক মানুষের জন্য এখনও জায়গা রয়ে গেছে। গোটা দ্বীপটাকে পাঁচটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে, প্রতিটি পরিবারের জন্য বরাদ্দ হয়েছে পাঁচ একর করে জমি। আরও একটা ব্যাপারে ওদের বিচক্ষণতার পরিচয় পেলাম—ওরা বুঝেছে যে আশেপাশের প্রতিবেশী দ্বীপগুলির সহায়তা না পেলে এই বিশাল পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। দ্বীপের চারভাগের এক ভাগ তাই রেখে দেওয়া হয়েছে ভাটির দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের জন্য। এর মধ্যেই বেশ কয়েকশো পরিবার চলে এসেছে। সেখানেও।

দ্বীপ পরিক্রমার শেষে আমার গাইডের দু'হাত জড়িয়ে ধরলাম আমি: "ভবিষ্যৎ আপনাদেরই পক্ষে, কমরেড।"

একটু হাসল লোকটি। বলল, "আপনাদের সকলের সাহায্য ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়।"

বোঝা গেল ও মনে মনে চিন্তা করছে কীভাবে কাজে লাগানো যায় আমাকে। বেশ ভাল লাগল আমার ব্যাপারটা। মনে হল ভাল লক্ষণ এটা—বাস্তববাদী চিন্তা।

“আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত,” বললাম আমি। “বলুন, কীভাবে কাজে লাগতে পারি আপনাদের।”

“সেটা কয়েকটা জিনিসের ওপর নির্ভর করছে,” ও বলল। “যেমন ধরুন, এখন আমাদের কাছে সবচেয়ে জরুরি হল জনমত তৈরি করা, সরকারের ওপর কোনও ভাবে চাপ সৃষ্টি করা, যাতে আমাদের নিজেদের মতো থাকতে দেওয়া হয় এখানে। এমনভাবে ওরা প্রচার করছে যেন এ জায়গাটাকে ধ্বংস করে ফেলছি আমরা; যাতে লোকে ভাবে যে আমরা কিছু গুণ্ডা, জোর করে জমি দখল করেছি এখানে এসে। কিন্তু আমরা যে ঠিক কী করছি, কেন এসেছি এখানে, সেটা আমরা মানুষকে জানাতে চাই। আমরা চাই সত্যিটা সবাই জানুক–কী কী করেছি আমরা এখানে এই ক'দিনে, কতটা সফল হয়েছে আমাদের উদ্দেশ্য। এই ব্যাপারে কোনও সাহায্য করতে পারেন আপনি? কলকাতায় খবরের কাগজে চেনাশোনা আছে আপনার?”

খারাপ লাগল না আমার লোকটির মনোভাব; ঠিকই তো, এই পথেই তো এগোনো উচিত এখন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাতে হল, “কাগজের লোকেদের সঙ্গে চেনাশোনা ছিল এক সময়, কিন্তু এখন তো আর নেই।”

“তা হলে হোমরা-চোমরা আর কাউকে চেনেন? পুলিশের লোক, কি ফরেস্ট রেঞ্জার, বা পার্টির নেতা-টেতা কাউকে?”

“না,” বললাম আমি। “সে রকম কাউকে তো আমি চিনি না।”

একটু বিরক্ত হল লোকটি। বলল, “তা হলে আর কী করবেন আপনি আমাদের জন্য বলুন তো? কী কাজ হবে আপনাকে দিয়ে?”

সত্যিই তো। কী কাজ হবে আমাকে দিয়ে? এ জগতে কত মানুষ আছে যারা সত্যিকারের কাজের লোক, যাদের সত্যিকারের কিছু উপযোগিতা আছে। যেমন ধর নীলিমা। কিন্তু আমার মতো একজন স্কুল মাস্টার?

“একটা কাজ করতে পারি,” আমি বললাম, “আমি পড়াতে পারি।”

“পড়াবেন?” মনে হল প্রাণপণে হাসি চাপার চেষ্টা করছে লোকটি। “কী পড়াবেন আপনি এখানে?”

“এই, যেখানে আপনারা এসেছেন সেই ভাটির দেশের কথা শেখাতে পারি বাচ্চাদের। আমার হাতে এখন অনেক সময় আর কিছুদিনের মধ্যেই রিটায়ার করব আমি।”

আমার বিষয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলল লোকটি। “আমাদের বাচ্চাদের এখানে নষ্ট করার মতো সময় নেই,” ও বলল। “খাবার জোগাড়ের জন্য বাড়ির বড়দের সাহায্য করতে হয় ওদের।”

তারপর একটু ভেবে আবার বলল, “অবশ্য পড়াশোনা করতে চায় এরকম ছাত্র যদি আপনি জোগাড় করতে পারেন তা হলে আমি কেন বাধা দেব? সে আপনার ব্যাপার; পড়ান, প্রাণে চায়।”

বিজয়গর্বে ফিরে এলাম আমি কুসুমের ঘরে। কী কী কথাবার্তা হয়েছে সব বললাম ওকে। “কিন্তু এখানে কাদের পড়াবেন সার আপনি?” স্পষ্ট আশঙ্কা ওর গলায়।

“কেন?” আমি বললাম। “তোর ছেলে ফকির আছে, এরকম আরও কয়েকজনকে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। যাবে না?” একটা অনিচ্ছার ছায়া যেন দেখতে পেলাম কুসুমের মুখে। প্রায় অনুরোধের সুরে তাই বললাম, “প্রতিদিন নয় রে। সপ্তাহে হয়তো একদিন, অল্প একটু সময়ের জন্য। আমি চলে আসব লুসিবাড়ি থেকে।”

“কিন্তু সার,” বলল কুসুম, “ফকির তো লিখতে পড়তে পারে না। এখানকার বেশিরভাগ বাচ্চারই সেই একই অবস্থা। ওদের কী শেখাবেন আপনি?”

সেটা ভাবিনি আমি আগে, কিন্তু যেন ঠোঁটের ডগায় কে জুগিয়ে দিল জবাবটা। বললাম, “কুসুম, ওদের আমি স্বপ্ন দেখতে শেখাব।”

অনুসরণ

খাঁড়ির মধ্যে মা ডলফিন আর তার ছানা যখন মাছ ধরতে ব্যস্ত, তখন পাশের খালে ডিঙিটাকে স্থির রাখতে দম বেরিয়ে যাচ্ছিল ফকিরের। স্রোত খুব বেশি এখানে, তার মধ্যেই কোনওরকমে একই জায়গায় চক্কর কেটে যাচ্ছিল ফকির, যাতে ডলফিনগুলো পিয়ার নজরের মধ্যে থাকে। যদিও হাওয়া নেই এক বিন্দু, তাও নদীতে এত ছোট ছোট ঢেউ আর ঘূর্ণি যে মনে হচ্ছে জল যেন ফুটছে।

ছ'খানা ডেটাশিট ভর্তি করার পর পিয়া ঠিক করল জল কতটা গভীর এখানে সেটা একবার মেপে দেখবে। নৌকোর সামনের দিকটাতেই বসেছিল ও, যেমন বসে সাধারণত, আর ফকির ছিল মাঝামাঝি জায়গায়, ঝপাঝপ দাঁড় ফেলছিল একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে। পিয়া ওর ডেস্থ সাউন্ডারটা জলে মাত্র ডুবিয়েছে, ঠিক সেই সময় হঠাৎই ফকিরের নজর গেল ওর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ফকিরের চোখ গোল গোল হয়ে গেল, এমন এক চিৎকার করল যে পিয়া যে অবস্থায় ছিল সে ভাবেই থমকে থেমে গেল, ওর কবজি পর্যন্ত তখনও জলে ডোবানো। দাঁড়-টাঁড় নৌকোর ওপর ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ফকির পিয়ার দিকে, হুমড়ি খেয়ে সামনে পড়ে অন্ধের মতো টান মারল ওর কবজি ধরে। উলটে পড়ে গেল পিয়া, জল থেকে ছিটকে উঠে এল ওর হাত, আর ডেপ্‌থ সাউন্ডারটা উড়ে গিয়ে পড়ল নৌকোর মাঝখানে।

ঠিক তখনই আচমকা জল তোলপাড় করে বিশাল একটা হাঁ-করা মুখ তিরবেগে উঠে এল নদী থেকে, এক মুহূর্ত আগেও পিয়ার কবজিটা যেখানে ছিল ঠিক সেই জায়গাটায়। চোখের কোনা দিয়ে পিয়া দেখল ঝকঝকে একজোড়া ধারালো দাঁতের সারি পাক মেরে ছিটকে উঠল তখনও ঝুলে থাকা হাতটার দিকে: এত কাছ ঘেঁষে গেল যে শক্ত খসখসে নাকের ডগাটা ঘষে গেল ওর কনুইয়ে, আর নিশ্বাসের সঙ্গে আসা জলের ছিটেয় ভিজে গেল হাতের সামনেটা। এক সেকেন্ড পরেই জলের তলা থেকে আসা প্রচণ্ড এক ধাক্কায় টলমল করে উঠল ডিঙিটা। এত জোরালো সে ধাক্কা, যে নৌকোর খোলের মধ্যে জমে থাকা জল ছিটকে উঠে এল, মড়মড় করে আওয়াজ হল একটা, আর ডিঙিটা এমনভাবে কাত হয়ে গেল, মনে হল নির্ঘাত উলটে যাবে। পিয়ার পায়ের কাছে রাখা ক্লিপবোর্ডটা পিছলে গিয়ে পড়ল জলে, নৌকোর পাটাতনের কাঠগুলো উলটে চলে এল হুড়মুড় করে।

টুটুল বসেছিল ছইটার ভেতরে। একটা বলের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে ব্যালান্স ঠিক রাখতে গিয়ে ডিগবাজি খেতে খেতে চলে এল সামনের দিকে। ঝপাস করে একটা আওয়াজ করে ফের সোজা হল নৌকোটা। একটা জলের পর্দা ছিটকে উঠল নদী থেকে। এক মুহূর্ত পরেই আরেকবার প্রচণ্ড ধাক্কা এল নীচ থেকে। এবার ডিঙির পেছনের দিকটায়। ভয়ানক দুলুনির মধ্যেই কোনও রকমে হাঁটু গেড়ে উঠে বসে একটা বৈঠা তুলে নিল ফকির। মাথার ওপরে সেটাকে এমন ভাবে তুলে ধরল, যাতে বৈঠার ডগাটা একটা ফলার মতো কাজ করে, তারপর প্রচণ্ড জোরে সেটা চালিয়ে দিল জলের ভেতরে। ঠিক সেই মুহূর্তেই আরেকবার ধাক্কা দিতে যাচ্ছিল কুমিরটা। বৈঠাটা গিয়ে পড়ল একেবারে ওর মাথার ওপর। ঘা-টা এত জোরে গিয়ে লাগল যে তার চোটে ঝপাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল কুমিরের হাঁ করা মুখটা। বৈঠাটাও টুকরো টুকরো হয়ে গেল সে আঘাতে, ফলাটা হাতলের থেকে ভেঙে চারকির মতো পাক খেতে খেতে ছিটকে গেল জলের ওপর দিয়ে। আর, বুজকুড়ি তুলতে তুলতে দৃষ্টির আড়ালে তলিয়ে গেল কুমিরটা। ডুব মারার পর এক মুহূর্তের জন্য জলের মধ্যে ভুতুড়ে একটা ছায়ার মতো ওটার আকৃতি নজরে এল পিয়ার। দেখল প্রায় এই ডিঙির সমান বড় ছিল সরীসৃপটা।

ইতোমধ্যে ফকির ঠিক হয়ে বসে একজোড়া বৈঠা তুলে নিয়েছে হাতে। ডলফিনগুলো যে খাঁড়িটার মধ্যে শিকার ধরছিল, স্রোতের টানে তার থেকে বেশ কয়েকশো মিটার সরে এসেছে নৌকোটা। এবার ফকির প্রাণপণে বৈঠা চালিয়ে এ খাঁড়ি সে খাঁড়ি দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আরও দূরে সরে যেতে লাগল জায়গাটা থেকে।

প্রায় মিনিট বিশেক ওইভাবে একটানা দাঁড় টেনে একটা সরু খালে এসে ঢুকল ওরা। এঁকেবেঁকে ঘন জঙ্গলে ভরা একটা দ্বীপের মধ্যে ঢুকে গেছে খালটা। তার মধ্যে দিয়ে নৌকোটাকে নিয়ে গিয়ে এমন একটা জায়গায় দাঁড় করাল ফকির যেখানে জোয়ারের টান আর বোঝা যায় না। নোঙর নামিয়ে চুপচুপে ভেজা গেঞ্জিটা গা থেকে টেনে খুলে ফেলল। তারপর গামছা নিয়ে বুক বেয়ে গড়িয়ে নামা ঘাম মুছতে লাগল।

দম ফিরে পেয়ে পিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, “লুসিবাড়ি?”

সাগ্রহে রাজি হয়ে গেল পিয়া। বলল, “ইয়েস। লেটস হেড ফর লুসিবাড়ি। ইটস টাইম।”

দ্বিতীয় পর্ব – জোয়ার

পুনরাগমনায় চ

ভেবেছিলাম মরিচঝাঁপির সাময়িক উত্তেজনা আমার চেহারায় যে ছাপ ফেলেছে, লুসিবাড়িতে ফিরতে ফিরতে তা মিলিয়ে যাবে : নদীর হাওয়ায় শরীরও স্নিগ্ধ হবে, আর হরেনের নৌকোর দুলুনিতে ধীর হয়ে আসবে আমার উত্তেজিত হৃৎস্পন্দন। কিন্তু কই? দেখা গেল ঠিক তার উলটোটাই ঘটছে : প্রতিটি বাঁক ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের সামনে যেন একে একে নতুন সব সম্ভাবনার দরজা খুলে যাচ্ছে। স্থির হয়ে আর বসে থাকতে পারলাম না। ছাতাটা এক ধারে সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালাম, দু'হাত ছড়িয়ে দিলাম দু'দিকে, যেন আলিঙ্গন করতে চলেছি বাতাসকে। হাওয়ার টানে পালের মতো ফুলে উঠল আমার ধুতি, আর আমি দাঁড়িয়ে রইলাম সটান মাস্তুলের মতো–যেন ডিঙিটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাব দিগন্তের দিকে।

"সার," চেঁচিয়ে উঠল হরেন, "বসে পড়ুন, বসে পড়ুন। নৌকো কাত হয়ে যাবে যে! একেবারে উলটে পড়বেন জলে।"

"তোমার মতো মাঝি থাকতে নৌকো কখনও উলটোতে পারে হরেন? তুমি ঠিক ভাসিয়ে রাখবে আমাদের।"

"সার, আজ আপনার কী হয়েছে বলুন তো?" হরেন জিজ্ঞেস করল। "আপনাকে আগের মতো তো আর লাগছে না–যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছেন একেবারে।"

"ঠিক বলেছ হরেন। আমি আর সে আমি নেই। একেবারে পালটে গেছি। আর তোমার জন্যই সম্ভব হয়েছে সেটা।"

"কী করে সার?"

"তুমিই তো আমাকে মরিচঝাঁপিতে নিয়ে গেলে, না কি?"

"না সার, ঝড়ে নিয়ে গেল।"

এই রকম বিনয়ী, আমাদের এই হরেন। "ঠিক আছে, ঝড়েই না হয় নিয়ে গেল," হাসলাম আমি। "এই ঝড়ই তা হলে আমাকে বুঝিয়ে দিল যে রিটায়ার করার পরেও একটা লোকের জীবনে পরিবর্তন আসতে পারে, তার পরেও নতুন করে আবার সব কিছু শুরু করা যায়।"

"কী শুরু করা যায় সার?"

"নতুন জীবন শুরু করা যায় হরেন, নতুন জীবন। এর পর যখন মরিচঝাঁপি যাব আমি, আমার ছাত্ররা সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। জীবনে কখনও যে ভাবে পড়ানোর সুযোগ পাইনি, সেইভাবে ওদের পড়াব আমি।"

"কী পড়াবেন সার ওদের? কী শেখাবেন?"

"কেন, আমি ওদের বলব—"

সত্যিই তো, কী বলব আমি ওদের? পাকা মাঝি বটে হরেন, ঠিক হাওয়া কেড়ে নিয়েছে আমার পাল থেকে।

বসে পড়লাম আমি। ভাল করে চিন্তা করা দরকার বিষয়টা নিয়ে।

ঠিক আছে, এই সব ছেলেমেয়েরা যে ধরনের কাল্পনিক কাহিনি-টাহিনির সঙ্গে পরিচিত সেইখান থেকেই শুরু করব আমি। "বল দেখি তোমরা, আমাদের পৌরাণিক গল্পগুলির সাথে ভূগোলের মিল কোথায়?" এরকম ভাবে আরম্ভ করা

যেতে পারে। প্রশ্নটা শুনে নিশ্চয়ই আগ্রহ জাগবে ওদের মনে। চোখ কুঁচকে মিনিট দুয়েক ভাববে, তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করবে–

"কোথায় মিল সার?"

"কেন? দেবদেবীদের কথা ভুলে গেলে?" বিজয়গর্বে পালটা প্রশ্ন করব আমি। "দেবদেবীদের বিষয়টাতেই তো মিল ভুগোল আর পুরাণের।"

ওরা একে অপরের দিকে তাকাবে, ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করবে, "সার কি ঠাট্টা করছেন আমাদের সঙ্গে? মজার কথা বলছেন কিছু?" অবশেষে মিনমিনে দ্বিধাগ্রস্ত গলায় কেউ একজন বলে উঠবে : "কিছু বুঝতে পারছি না তো সার।"

"ভাবো, ভাবো," বলব আমি। "ভাল করে ভেবে দেখলেই ঠিক বুঝতে পারবে। তখন দেখবে শুধু দেবদেবী কেন, অনেক বিষয়েই মিল আছে পুরাণ আর ভূগোলের মধ্যে। একেকটা পৌরাণিক কাহিনির নায়কদের কথা ভাবো, কী বিশাল তাদের চেহারা—এক দিকে এই সব স্বর্গের দেবদেবীরা, আরেক দিকে এই মাটির পৃথিবীর বিপুল প্রাণস্পন্দন—দুটোই আমাদের কাছে যেন অচেনা, অনেক দূরের কোনও জগৎ। আবার, পুরাণেই বলো কি ভূগোলেই বলো, দেখবে কাহিনিগুলো বা ঘটনাগুলো একের পর এক সব এমনভাবে চলতে থাকে যে প্রতিটা ঘটনারই একটা শুরু আর শেষ থাকে, কিন্তু একটা ঘটনার সঙ্গে পরেরটার একটা যোগ থেকে যায়। একটা কাহিনির শেষ থেকেই গজিয়ে ওঠে আরেকটা কাহিনি। তার পরে ধরো, সময়ের হিসেব—ওদিকে যেমন কলিযুগ, এদিকে তেমনি ভূগঠনের চতুর্থ যুগ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা খেয়াল করো—এই দুই ক্ষেত্রেই কিন্তু ঘটনাগুলো ঘটছে বিশাল সময় জুড়ে, কিন্তু এমন ভাবে সব কিছু হচ্ছে যে খুব ছোট করেও সেই গল্পগুলি বলে দেওয়া যায়।"

"কী করে, সার, কী করে? এরকম একটা গল্প বলুন না, সার।"

তখন আমি শুরু করব।

বিষ্ণুর উপাখ্যান দিয়েই শুরু করতে পারি। বামনাবতার রূপে কীভাবে মাত্র তিনটি বিশাল পদক্ষেপে গোটা পৃথিবীকে মেপে ফেলেছিলেন বিষ্ণু, সেই কাহিনি শোনাতে পারি। আমি ওদের বলব কেমন ভাবে ভগবানের সেই চলার পথে একবার একটুখানি ভুল পা ফেলার জন্য তাঁর পায়ের একটা লম্বা নখের ছোট্ট একটু আঁচড় লেগে গেল পৃথিবীর গায়ে। সেই আঁচড়ের দাগ থেকেই সৃষ্টি হল আমাদের এই চিরকালের চেনা নদী—যুগ যুগান্ত ধরে যে জগতের সমস্ত পাপ ধুয়ে নিয়ে চলেছে, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নদী—আমাদের এই গঙ্গা।

"গঙ্গা? পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নদী?" আমার কথার মারপ্যাঁচে এত উত্তেজিত হয়ে যাবে ওরা যে আর বসে থাকতে পারবে না। উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে বলবে, "কিন্তু সার, গঙ্গার থেকে লম্বা তো অনেক নদীই আছে : নীলনদ আছে, আমাজন আছে, মিসিসিপি আছে, ইয়াংসিকিয়াং আছে।" তখন আমি বের করব আমার গুপ্তধন, আমার এক ছাত্রের পাঠানো উপহার—সেটা হল ভূতাত্ত্বিকদের বানানো সাগরতলের একটা ম্যাপ। উলটো রিলিফ ম্যাপের মতো সে মানচিত্রে নিজের চোখেই দেখতে পাবে ওরা যে বঙ্গোপসাগরে পৌঁছেই গঙ্গার যাত্রা শেষ হয়ে যায়নি—ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিশে সমুদ্রের নীচে স্পষ্ট এক খাত ধরে আরও বহু দূর বয়ে চলে গেছে। এমনিতে যা জলের তলায় ঢাকা পড়ে থাকে, এই ম্যাপে ওরা তা দেখতে পাবে : দেখতে পাবে মাটির ওপর দিয়ে যতটা পথ গেছে গঙ্গা, তার চেয়ে অনেক দীর্ঘ পথ বয়ে গেছে সমুদ্রের তলার খাত ধরে।

"দেখো, বন্ধুগণ, নিজের চোখেই দেখে নাও," বলব আমি। "এই ম্যাপে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে পুরাণে যেমন বলা আছে ঠিক তেমনই একটা দৃশ্য গঙ্গা আর একটা লুপ্ত গঙ্গা সত্যি সত্যিই রয়েছে; একটা বয়ে চলেছে মাটির ওপর দিয়ে, আরেকটা বইছে জলের তলা দিয়ে। এবার দুটোকে জুড়ে নাও, তারপর দেখো গঙ্গা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নদী কি না।"

আর তার পরে, আমি ঠিক করলাম, ওদের সেই গ্রিক দেবীর গল্প শোনাব যিনি আমাদের এই গঙ্গার আসল মা। ভূগোলের পথ ধরে বহু বহু যুগ পিছিয়ে নিয়ে যাব ওদের, দেখাব এখন যেখান দিয়ে গঙ্গার ধারা বয়ে চলেছে সেই রেখা এক সময় ছিল উপকূল রেখা—এশীয় ভূখণ্ডের সর্বদক্ষিণ তটভূমি। এই ভারতবর্ষ তখন অনেক অনেক দুরে, অন্য গোলার্ধে। অস্ট্রেলিয়া আর অ্যান্টার্কটিকার সঙ্গে জোড়া ছিল এই দেশ তখন। আমি ওদের দেখাব এশিয়ার দক্ষিণের সেই সমুদ্র, যার নাম ছিল টেথিস। গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী টেথিস হলেন ওশেনাসের পত্নী। হিমালয় তখন ছিল না, আর এই সব পুণ্যতোয়া নদী—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, ব্রহ্মপুত্র তারা তখন কোথায়? আর নদী যেহেতু ছিল না, তাই কোনও ব-দ্বীপও ছিল না। এই বন্যাবিধৌত সমভূমিই বলো, কি পলল মৃত্তিকাই বলো, বা এই বাদাবনই বলো—এসবেরও কোনও চিহ্ন ছিল না। এক কথায়, আমাদের এই বাংলারই কোনও অস্তিত্ব ছিল না তখন।

তামিলনাড়ু আর অন্ধ্রপ্রদেশের এই সবুজ তীরভূমি তখন জমাট বরফে ঢাকা, কোনও কোনও জায়গায় সে বরফ পঞ্চাশ থেকে ষাট মিটার পর্যন্ত গভীর। এখন যেটা গঙ্গার দক্ষিণ কূল, সে জায়গা তখন বরফ-জমা এক সাগরতীর—ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে টেথিস সমুদ্রে, যে সমুদ্রের এখন আর কোনও অস্তিত্ব নেই।

আমি ওদের বলব কেমন করে আজ থেকে চোদ্দো কোটি বছর আগে অস্ট্রেলিয়া আর অ্যান্টার্কটিকা থেকে হঠাৎ ভেঙে বেরিয়ে এসে ভারতবর্ষ শুরু করল তার উত্তরমুখী যাত্রা। ওরা দেখবে কী বেগে ওদের এই উপমহাদেশ এগিয়ে চলেছে, পৃথিবীর অন্য কোনও ভূখণ্ডই কখনও সেই বেগ, অর্জন করতে পারেনি। ওরা দেখবে কীভাবে বিশাল এই ভূভাগের ওজনের চাপে ধীরে ধীরে গজিয়ে উঠছে হিমালয় পর্বত; দেখবে সেই বেড়ে ওঠা পর্বতমালার গায়ে কেমন করে জন্ম নিচ্ছে তিরতিরে একটা ছোট্ট নদী—আমাদের এই গঙ্গা। চোখের সামনে ওরা দেখতে পাবে ভারত যত উত্তরে এগোচ্ছে তত ছোট হয়ে আসছে টেথিস, ক্রমশ সরু হয়ে আসছে মাঝের ফাঁকটুকু। ওরা দেখবে কীভাবে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল সে সমুদ্র কেমন করে দুই ভূখণ্ড মিলে এক হয়ে গেল তাদের সাগর-মায়ের অস্তিত্বের মূল্যে। কিন্তু চোখের সামনে টেথিসের মৃত্যু দেখেও এতটুকু অশ্রুপাত করবে না ওরা, কারণ সঙ্গে সঙ্গে ওদের সামনেই তো জন্ম নেবে দুই নদী, যাদের মধ্যে ধরা থাকবে তার স্মৃতি, জন্ম নেবে টেথিসের দুই যমজ সন্তান—সিন্ধু আর গঙ্গা।

"বলতে পার, কেমন করে বলা যায় যে এক সময় সিন্ধু আর গঙ্গা নদী পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ছিল?"

"কী করে বলা যায় সার?"

"এই শুশুকদের দেখে। এক সময়কার সাগরবাসী এই প্রাণীই হল দুই যমজ নদীর জন্য রেখে যাওয়া টেথিস সমুদ্রের উত্তরাধিকার। সে উত্তরাধিকারকে সযত্নে লালন করেছে এই দুই নদী, আস্তে আস্তে আপন করে নিয়েছে তাকে। সিন্ধু আর গঙ্গা ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও নদীতেই এই জাতের শুশুক দেখতে পাওয়া যায় না।"

শুনতে শুনতে যদি দেখি অধৈর্য হয়ে পড়ছে ওরা, তখন এক প্রেমের গল্প বলে আমি শেষ করব আমার কথা। শান্তনু নামের সেই রাজার কথা বলব আমি ওদের, কেমন করে নদীর পাশ দিয়ে যেতে যেতে রাজা একদিন পরমাসুন্দরী একটি মেয়েকে দেখলেন সেই কাহিনি শোনাব আমি। সেই সুন্দরী আর কেউ নন, স্বয়ং গঙ্গা। কিন্তু রাজা সে কথা জানেন না। নদীর পাড়ে এলে যে কোনও স্থিতধী মানুষেরই মাথা ঘুরে যেতে পারে। তো, এই সুন্দরীকে দেখে শান্তনুর খুবই ভাল লেগে গেল, পাগলের মতো তার প্রেমে পড়ে গেলেন তিনি; রাজা প্রতিজ্ঞা করলেন রূপবতী যা চাইবেন তাই তাঁকে দেবেন তিনি, এমনকী তিনি যদি নিজের সন্তানদের জলে ভাসিয়ে দিতে চান তাতেও বাধা দেবেন না।

নদীর তীরে এক রাজার এই মুহূর্তের হৃদয়দৌর্বল্যের কাহিনি থেকে শুরু করেই লেখা হয়ে গেল মহাভারতের গোটা একখানা পর্ব।

সেকালের পুরাণকাররাও যে সত্যকে মেনে নিয়েছিলেন সামান্য এক স্কুলমাস্টার কী করে তাকে অস্বীকার করবে? যে-কোনও নদীতেই আসলে বয়ে চলে ভালবাসার স্রোত। "ছেলেমেয়েরা, এই তা হলে আজকের পড়া। এবার শোনো কবি কী বলেছেন :

"এক কথা, প্রেয়সীকে গান গাওয়া। আর, হায়, অন্য এক কথা সেই গুপ্ত, অপরাধী শোণিতের দেবতুল্য নদ।"

বন্দরের কাল

শুরুতে জলের স্রোত ছিল উলটোদিকে, আর দাঁড় টানছিল ফকির একা, ফলে খুবই ধীরে এগোচ্ছিল নৌকো। প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর জিপিএস-এ নৌকোর অবস্থান মেপে পিয়া দেখল এতটা সময়ে মাত্র তিন কিলোমিটার এসেছে ওরা। এতক্ষণে হঠাৎ ওর খেয়াল হল ফকিরের কাছে হয়তো বাড়তি এক জোড়া দাঁড় থাকতেও পারে। ইশারায় প্রশ্ন করে বুঝল

সত্যিই আছে আর একজোড়া দাঁড়। তক্তার নীচে নৌকোর খোলের মধ্যে রাখা আছে। দাঁড়দুটো। খুশি হয়ে উঠল পিয়া।

দাঁড়গুলোর হালও দেখা গেল ডিঙিটারই মতো, কোনও রকমে জোড়াতালি দিয়ে বানানো। ডালপালা ছাঁটা একজোড়া গাছের ডালের আগার দিকে বেঢপ ভাবে পেরেক দিয়ে আঁটা দুটো কাঠের টুকরো শুধু। ডিঙির কিনারায় পঁড় টানার জন্য কোনও আংটার বালাই নেই, শুধু দুটো খুঁটির ওপর ঠেকা দিয়ে বাইতে হবে। জলের মধ্যে বৈঠা নামাতেই স্রোতের টানে মোচড় খেয়ে গেল সেগুলো। আরেকটু হলেই ভেসে যাচ্ছিল পিয়ার হাত থেকে। হাতের আন্দাজটুকু আসতে খানিকটা সময় লাগল, তবে দু'জনে মিলে দাঁড় টানার ফলে নৌকোর গতি খানিকটা বাড়ল।

কিন্তু যত সময় যেতে লাগল পিয়া দেখল উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে উঠছে কাজটা : দুই হাতের তালুতেই বেশ কয়েকটা ফোঁসকা গজিয়ে উঠেছে, মুখে আর ঘাড়ে নুনের আস্তরণ পড়ে গেছে। প্রায় সন্ধে নাগাদ—সূর্য তখন ডুবুডুবু দাঁড় তুলে ফেলল পিয়া। গন্তব্য আর কত দূর সেটা জিজ্ঞেস করার ইচ্ছেটা আর দমন করে রাখতে পারল না। "লুসিবাড়ি?"

সেই সকাল থেকে প্রায় একটানা নৌকো বেয়ে চলেছে ফকির, কিন্তু এখনও ওর চেহারায় কোনও ক্লান্তির ছাপ পড়েনি। পিয়ার প্রশ্ন শুনে মুহূর্তের জন্য থেমে ঘাড় ফিরিয়ে দূরে জলের মধ্যে ঢুকে আসা জিভের মতো একটা চড়ার দিকে ইশারা করল ও। আশেপাশের দ্বীপগুলোর মধ্যে পরিষ্কার, বন জঙ্গলহীন জায়গাটা সহজেই নজরে পড়ছিল। শেষ পর্যন্ত চোখে দেখা যাচ্ছে দ্বীপটা সেটা যথেষ্টই স্বস্তির কথা, কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিল পিয়া, ডাঙায় পৌঁছতে আরও অনেকক্ষণ লাগবে ওদের। ঠিকই বুঝেছিল।

নৌকো পাড়ে ভেড়ার পর অবশেষে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে যখন নেমে এল ওরা, ততক্ষণে সূর্য অস্ত গেছে। প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে চারদিক। ফকির একটা পিঠব্যাগ তুলে নিল, অন্যটা পিয়া নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে নিল, তারপর টুটুলকে সামনে রেখে লাইন করে এগোতে লাগল আস্তে আস্তে। পিয়া শুধু ওদের দুজনের দিকে চোখ রেখে হেঁটে যাচ্ছিল, ফলে আশেপাশের দিকে খুব একটা নজর দিতে পারছিল না। চলতে চলতে হঠাৎ এক সময় থেমে গেল ফকির। বলল, "মাসিমা।" পিয়া তাকিয়ে দেখল একটা সিঁড়ির দিকে ইশারা করছে ও। একটা বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে শেষ হয়েছে সিঁড়িটা।

এই সেই জায়গা? ফকির কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে পিয়ার হাতে তুলে দিল। কী করা উচিত এখন? ওরা দুজনে একটু পিছিয়ে গেল। ফকিরের হাতে জালের মধ্যে কঁকড়ার পুঁটলি, আর কাপড়জামাগুলো বান্ডিল বেঁধে মাথায় তুলে নিয়েছে টুটুল। আবার হাত তুলে বন্ধ দরজাটার দিকে ইশারা করল ফকির। ওদের দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে বুঝতে পারল পিয়া, ওকে ওখানেই রেখে এখন ফিরে চলে যাবে ওরা। হঠাৎ কেমন যেন ভয় ভয় লাগল ওর। চেঁচিয়ে বলল, "ওয়েট। হোয়্যার আর ইউ গোয়িং?"

নানা রকম অদ্ভুত সব সম্ভাবনার কথা আগে থেকেই ঘুরপাক খাচ্ছিল পিয়ার মাথার ভেতরে, কিন্তু এরকম ভাবে ওকে একা দাঁড় করিয়ে রেখে একটা কথাও না বলে ওরা চলে যাবে, সেরকম যে কিছু হতে পারে তা কখনও ভাবেনি। এও মনে হয়নি যে ওদের চলে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা ভাবতেই এরকম একটা শীতল একাকিত্বের অনুভূতি এসে পেয়ে বসবে ওকে।

"ওয়েট। জাস্ট আ মিনিট।"

দূরে কোথাও একটা জেনারেটর চালু হল, আর পাশের একটা জানালা দিয়ে ঝকঝকে আলো এসে পড়ল ভেতর থেকে। এই ক'দিনে প্রাকৃতিক আলো-অন্ধকারেই সয়ে গিয়েছিল চোখ, হঠাৎ এই ফ্যাটফ্যাটে উজ্জ্বল ইলেকট্রিকের আলোয় মুহূর্তের জন্য যেন ধাঁধা লেগে গেল পিয়ার। দুয়েকবার পিটপিট করে দু'হাতের মুঠি দিয়ে চোখ কচলে নিল। নজর ফিরে পেতে তাকিয়ে দেখল চলে গেছে ওরা। দু'জনেই। ফকির আর টুটুল।

মনে পড়ল এখানে নিয়ে আসার জন্য ফকিরকে কোনও পারিশ্রমিক দেওয়া হয়নি। কী

করে আবার খুঁজে পাওয়া যাবে ওকে? কোথায় থাকে ফকির সে তো জানে না পিয়া। ওর পুরো নামটা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করে রাখা হয়নি। মুখের সামনে দু'হাত নিয়ে অন্ধকারের দিকে ফিরে চিৎকার করে একবার ডাকল, "ফকির!"

"কে?" জবাবটা এল একজন মহিলার গলায়, সামনে থেকে নয়, পেছন দিক থেকে। হঠাৎ খুলে গেল বন্ধ দরজাটা। পিয়া দেখল ছোট্টখাট্ট চেহারার বয়স্কা একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন ওর সামনে। মাথার চুলগুলো খড়ের আঁটির মতো, চোখে সোনালি ফ্রেমের একটা চশমা। "কে?"

দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল পিয়া। "কিছু মনে করবেন না, ঠিক জায়গাতে এসেছি কিনা জানি না, আসলে আমি মাসিমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছি।" মহিলা বুঝবেন কি বুঝবেন না সেসব না ভেবেই এক নিশ্বাসে হড়বড় করে ইংরেজিতে কথাগুলো বলে গেল পিয়া।

একটা অস্বস্তিকর মুহূর্ত। পিয়া টের পাচ্ছিল একজোড়া তীক্ষ্ণ সন্ধানী চোখ খুব ভাল করে জরিপ করে নিচ্ছে ওকে। নজর করল ওর নুনের দাগ-লাগা মুখ আর কাদামাখা সুতির প্যান্ট দেখতে দেখতে সোনালি ফ্রেম একবার ওপরে উঠছে, ফের নীচে নামছে। তারপর ওকে আশ্বস্ত করে বাঁশির মতো মিষ্টি সুরেলা ইংরেজিতে মহিলা বললেন, "একদম ঠিক জায়গাতেই এসেছ। কিন্তু তুমি কে বলো তো? আমি কি তোমাকে চিনি?"

"না," পিয়া বলল, "আপনি আমাকে চিনবেন না। আমার নাম পিয়ালি রয়। আপনার ভাগ্নের সঙ্গে ট্রেনে আমার আলাপ হয়েছিল।"

"কানাই?"

"হ্যাঁ। উনিই আমাকে এখানে আসতে বলেছিলেন।"

"বেশ বেশ। ভেতরে এসো। কানাই এক্ষুনি নীচে নেমে আসবে।" একপাশে সরে গিয়ে পিয়াকে ভেতরে ঢোকার জায়গা করে দিলেন মহিলা। "কিন্তু তুমি চিনে চিনে এখানে এলে কী করে বলো তো? একা তো নিশ্চয়ই আসনি?"

"না, না। একা আমি জীবনে খুঁজে বের করতে পারতাম না।"

"তা হলে কার সঙ্গে এলে? বাইরে তো কাউকে দেখলাম না।"

"আপনি দরজা খুলতে খুলতেই চলে গেল ওরা—" কথাটা শেষ করার আগেই দড়াম করে খুলে গেল দরজাটা। কানাই ভেতরে এল। বিস্ময়ে চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "আরে, পিয়া না?"

"হ্যাঁ।"

"আসতে পারলেন তা হলে?"

"চলে এলাম।"

"গুড, কানাই একগাল হাসল। এত তাড়াতাড়ি পিয়ার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবে ভাবেনি ও। মনে মনে একটু খুশি হল কানাই, শ্লাঘাও বোধ করল একটু। লক্ষণটা মনে হল ভালই। "বেশ একটা ইভেন্টফুল ট্রিপ হয়েছে মনে হচ্ছে?" ভাল করে একবার পিয়ার কাদামাখা জামাকাপড়গুলো দেখল কানাই। "তা, কী করে এলেন এখানে?"

"একটা দাঁড়-টানা নৌকোয়।"

"দাঁড়-টানা নৌকোয়?"

"হ্যাঁ। আসলে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর একটা অ্যাক্সিডেন্টে পড়েছিলাম।" লঞ্চ থেকে জলে পড়ে যাওয়া পর্যন্ত কী কী ঘটেছিল সংক্ষেপে বলল পিয়া। "আর তারপর সেই জেলেটি আমার পেছন পেছন জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল না হলে কী যে হত কে জানে। একগাদা জল খেয়ে ফেলেছিলাম আমি, কিন্তু ও ঠিক টেনেটুনে আমাকে নৌকোয় তুলে ফেলল। আমার তখন মনে হল ওই গার্ডদের লঞ্চে আবার গিয়ে ওঠাটা ঠিক নিরাপদ হবে না। ভাবলাম একটা আন্দাজে ঢিল মেরে দেখি, জেলেটিকে একবার জিজ্ঞেস করি ও মাসিমাকে চেনে কিনা। দেখলাম চেনে। তো, তখন বললাম ও যদি আমাকে লুসিবাড়িতে

পৌঁছে দেয় তা হলে কিছু টাকা দেব। অনেক আগেই আমরা পৌঁছে যেতাম এখানে, কিন্তু মাঝরাস্তায় আবার কয়েকটা ঘটনা ঘটল।"

"কী ঘটল আবার?"

"প্রথমে তো দেখা হল এক দল ডলফিনের সঙ্গে। তারপর, আজ সকালে একটা কুমিরের খপ্পরে পড়েছিলাম।"

"আরে সর্বনাশ!" নীলিমা বলল, "কারও কিছু হয়নি তো??

"না। কিন্তু হতেই পারত। একটা দাঁড় দিয়ে তারপর ওটাকে মেরে তাড়াল জেলেটি। একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার," বলল পিয়া।

"কী ভয়ংকর! কে ছিল জেলেটি? নাম বলেছে তোমাকে?" নীলিমা জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, বলেছে। ওর নাম ফকির।"

"ফকির?" নীলিমা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। "ফকির মণ্ডল ছিল কি?"

"পদবি তো বলেনি।"

"একটা ছোট ছেলে ছিল কি সঙ্গে?"

"হ্যাঁ, ছিল," পিয়া বলল। "টুটুল।"

"ও-ই," কানাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল নীলিমা, "এতক্ষণে বোঝা গেল কোথায় ছিল ও।"

"ওর খোঁজ করা হচ্ছিল নাকি?"

"হ্যাঁ, কানাই বলল, "ফকিরের বউ ময়না এখানকার হাসপাতালে কাজ করে। সে বেচারির তত চিন্তায় চিন্তায় প্রায় পাগল হবার দশা।"

"তাই নাকি? ছি ছি, মনে হয় আমারই জন্য এতটা দেরি হয়েছে। আমিই ওদের আটকে রেখেছিলাম এতক্ষণ, তা না হলে হয়তো আরও অনেক আগেই ফিরে আসত," বলল পিয়া।

"যাক গে," নীলিমা বলল ঠোঁট চেপে, "ভালয় ভালয় ফিরে যখন এসেছে আর চিন্তার কোনও কারণ নেই।"

"আশা করি নেই," পিয়া বলল। "আমার জন্য ওকে কোনও রকম ঝামেলায় পড়তে হলে খুব খারাপ লাগবে আমার। দু-দু'বার ও আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। আর ও-ই তো সোজা ওই ডলফিনের ঝকটার কাছে নিয়ে গেল আমাকে।"

"তাই নাকি? কিন্তু আপনি যে ডলফিনের খোঁজ করছেন সেটা ও বুঝল কী করে?" জিজ্ঞেস করল কানাই।

"আমি ওকে ছবি দেখালাম, একটা ফ্ল্যাশকার্ড," বলল পিয়া। "আর কিচ্ছু বলতে হয়নি ওকে। ও সোজা আমাকে ডলফিনগুলোর কাছে নিয়ে গেল। এক হিসেবে দেখতে গেলে ওই লঞ্চ থেকে পড়ে যাওয়াটা ভালই হয়েছিল আমার পক্ষে একা একা কিছুতেই আমি ওই ডলফিনগুলোকে খুঁজে পেতাম না। একবার দেখা করতেই হবে ওর সঙ্গে। অন্তত পয়সাটা তো ওকে দিতে হবে।"

"সে নিয়ে চিন্তা কোরো না," নীলিমা বলল। "ওরা এই কাছেই থাকে, এই ট্রাস্টের কোয়ার্টারে। সকালে কানাই নিয়ে যাবে তোমাকে।"

কানাইয়ের দিকে মুখ ফেরাল পিয়া। "খুব ভাল হয় যদি পারেন।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন পারব না?" বলল কানাই। "কিন্তু সে তো কাল সকালে। এখন আপাতত আপনার থাকা-টাকার একটা ব্যবস্থা করা যাক। জামাকাপড় পালটে রেস্ট নিন আপনি।"

এর পরে কী হবে তাই নিয়ে এতক্ষণ মাথাই ঘামায়নি পিয়া। এবার এখানে এসে পৌঁছনোর প্রাথমিক উত্তেজনাটুকু থিতিয়ে যেতে হঠাৎ এই ক'দিনের ক্লান্তির সমস্ত ভার যেন চেপে বসল ওর ওপর। "থাকার ব্যবস্থা?" ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল পিয়া। "কোথায়?"

"এখানেই। মানে, দোতলায়," বলল কানাই।

একটু অস্বস্তি লাগছিল পিয়ার। কানাই কি মনে করেছে পিয়া এখানে কানাইয়ের সঙ্গে থাকবে?

“কাছাকাছি কোনও হোটেল-টোটেল নেই?”

“হোটেল এখানে নেই,” নীলিমা বলল। “তবে ওপরে একটা গেস্ট হাউস আছে, সেখানে তিনটে খালি ঘর আছে। তুমি স্বচ্ছন্দে থাকতে পার। আর কেউ নেইও ওপরে, কানাই ছাড়া। ও যদি তোমায় বিরক্ত করে, তুমি সোজা নীচে নেমে এসে আমাকে একবার খালি খবরটা দেবে।”

হেসে ফেলল পিয়া। “না না, সে ঠিক আছে। আর নিজের দেখভাল করার উপায় আমার জানা আছে। তবে মাসিমার কাছ থেকে আমন্ত্রণটা আসায় একটু খুশি হল পিয়া: রাজি হওয়াটা যেন সহজ হয়ে গেল এর ফলে। বলল, “থ্যাঙ্ক ইউ। সত্যি, একটা রাত একটু ভাল করে বিশ্রাম নেওয়া দরকার। আমি দিন কয়েক এখানে থাকলে সত্যি কোনও অসুবিধা হবে না তো আপনাদের?”

“তোমার যত দিন ইচ্ছে থাকো,” বলল নীলিমা। “কানাই তোমাকে ঘুরে ঘুরে সব দেখিয়ে দেবে।”

“চলে আসুন,” একটা পিঠব্যাগ হাতে তুলে নিয়ে বলল কানাই। “এই দিকে।” সিঁড়ি দিয়ে কানাই দোতলায় নিয়ে গেল ওকে। রান্নাঘর আর বাথরুমটা দেখিয়ে দিয়ে তালা খুলে দিল একটা ঘরের। সুইচ টিপে টিউব লাইটটা জ্বালিয়ে কানাই দেখল ওর নিজের শোয়ার ঘরটার সঙ্গে এটার তফাত কিছু নেই। এখানেও সেই দুটো সরু সরু তক্তপোশ, প্রত্যেকটার সঙ্গে একটা করে মশারি লাগানো। দেয়ালে কোথাও কোথাও নতুন প্লাস্টার, অনেক জায়গায় গত বর্ষার সময়কার ড্যাম্পের ছোপ, ফাটল ধরেছে কিছু কিছু জায়গায়। উলটোদিকে গরাদ দেওয়া একটা জানালা। ট্রাস্টের কম্পাউন্ডের লাগোয়া ধানজমিগুলি দেখা যাচ্ছে জানালা দিয়ে।

“চলবে এতে?” একটা তক্তপোশের ওপরে পিয়ার পিঠব্যাগটা রেখে জিজ্ঞেস করল কানাই।

ঘরের ভেতরে ঢুকে চারদিকটা একবার দেখল পিয়া। এমনিতে যদিও খালি খালি, কিন্তু যথেষ্টই আরামদায়ক ঘরখানা : চাদরগুলি পরিষ্কার, এমনকী বিছানার পায়ের কাছে একটা কাঁচা তোয়ালেও ভাঁজ করে রাখা আছে। জানালার পাশে একটা টেবিল আর খাড়া-পিঠ চেয়ার। দরজাটা শক্তপোক্ত দেখে খুশি হল পিয়া। ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগানোর ব্যবস্থাও আছে।

“এত কিছু সত্যি আমি আশা করিনি,” পিয়া বলল। “অনেক ধন্যবাদ।”

মাথা নাড়ল কানাই, “ধন্যবাদ জানানোর কোনও প্রয়োজন নেই। আপনি আসাতে ভালই হয়েছে। একা একা একটু একঘেয়ে লাগছিল আমার।”

কী জবাব দেওয়া উচিত এ কথার বুঝতে না পেরে নিরপেক্ষ একটা হাসি হাসল পিয়া। “ঠিক আছে, নিজের মতো করে দেখেশুনে নিন,” বলল কানাই, “আমি ওপরের তলায় আছি, আমার মেসোর পড়ার ঘরে। কিছু দরকার লাগলে বলবেন।”

ভোজ

যে-কোনও একটা ছুতো পেলেই আবার মরিচঝাঁপি যাওয়ার জন্য মনে মনে তৈরিই। ছিলাম আমি, কিন্তু হরেন যে সুযোগ করে দিল তার চেয়ে ভাল অজুহাত আর কিছু হতে পারত না। ইতোমধ্যে ওর ছেলের ভর্তির ব্যবস্থাও করে দিয়েছি, ফলে স্কুলের আশেপাশে প্রায়ই দেখা হয়ে যেত আমার ওর সঙ্গে।

একদিন হরেন বলল, "সার, মরিচঝাঁপি থেকে খবর আছে। ওরা একদিন একটা ফিস্টির ব্যবস্থা করেছে ওখানে, কুসুম বার বার করে আপনাকে যেতে বলে দিয়েছে।"

আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমি। "ফিস্টি? কীসের ফিস্টি?"

"কলকাতা থেকে অনেক সব লোককে ওরা নেমন্তন্ন করেছে—কবি, লেখক, খবরের কাগজের লোকজন সব আসবে। ওদেরকে ওরা দ্বীপটার কথা বলবে, কী কী করেছে ওখানে সব দেখাবে।"

এতক্ষণে পরিষ্কার হল পুরো ব্যাপারটা : ওই উদ্বাস্তু নেতাদের বিচারবুদ্ধি দেখে নতুন করে আবার মুগ্ধ হলাম আমি। দেখা যাচ্ছে, ওরা বুঝতে পেরেছে যে এখানে টিকে থাকতে গেলে নিজেদের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে হবে। আর এ হল তারই প্রথম পদক্ষেপ। যেতে তো আমাকে হবেই। হরেন বলল ভোর থাকতেই বেরিয়ে পড়তে হবে। বললাম, আমি তৈরি হয়ে থাকব।

বাড়ি ফিরলাম যখন, নীলিমা এক পলক আমার মুখের দিকে তাকিয়েই বলল, "কী ব্যাপার? এরকম দেখাচ্ছে কেন তোমাকে আজকে?"

কেন এর আগে মরিচঝাঁপি নিয়ে নীলিমার সঙ্গে কোনও কথা বলিনি আমি? বোধ হয় মনে মনে আমি জানতাম নীলিমা কিছুতেই আমার এই উৎসাহের শরিক হবে না; হয়তো আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ওদের নিয়ে আমার এই উত্তেজনাকে লুসিবাড়িতে ওর এতদিনের কাজের প্রতি এক ধরনের বিশ্বাসভঙ্গ বলে মনে করবে। যাই হোক না কেন, আমার এই ভয় অচিরেই সত্যি বলে প্রমাণিত হল। এই উদ্বাস্তুদের মরিচঝাঁপিতে এসে ওঠার ঘটনাটার মধ্যে যে নাটকীয়তা আছে, আমার পক্ষে যতটা সম্ভব তা বর্ণনা করলাম; কীসের টানে মধ্য ভারতের নির্বাসন থেকে এই ভাটির দেশে এসে উপস্থিত হয়েছে ওরা সেটা ব্যাখ্যা করলাম; ওদের সব পরিকল্পনা, নতুন ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন, নতুন বাসভূমি গড়ে তোলার জন্য অটল সংকল্প—সব বুঝিয়ে বললাম ওকে।

আমাকে অবাক করে দিয়ে নীলিমা বলল মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের আসার কথা ও জানে : এ খবর ও পেয়েছে কলকাতায়, বিভিন্ন আমলা আর নেতাদের কাছ থেকে। ও বলল সরকারি লোকেদের চোখে ওই উদ্বাস্তুরা স্রেফ বেআইনি দখলদার; ওদের ওখানে থাকতে দেবে না সরকার; গণ্ডগোল একটা হবেই।

আমাকে বলল, "নির্মল, আমি চাই না যে তুমি ওখানে যাও। ওই রিফিউজিদের সঙ্গে আমার কোনও বিরোধ নেই, কিন্তু তুমি এসব ঝুটঝামেলার মধ্যে যাও সেটা আমি চাই না।"

সেই মুহূর্তেই খুব দুঃখের সঙ্গে আমি বুঝতে পারলাম, এখন থেকে আমাকে গোপনেই যোগাযোগ রাখতে হবে মরিচঝাঁপির সঙ্গে। আমার ইচ্ছে ছিল পরের দিনের ফিস্টের কথাটা ওকে বলব, কিন্তু এরপর সে কথা আর তুললাম না। নীলিমাকে যদ্র চিনি, ও ঠিক কোনও না কোনও উপায়ে আমার যাওয়াটা আটকে দেবে।

তা সত্ত্বেও ও চাপাচাপি না করলে মিথ্যে বলার কোনও বাসনা আমার ছিল না। আমাকে ঝোলা গোছাতে দেখে জিজ্ঞেস করল আমি কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা করছি কিনা।

"হ্যাঁ, কাল সকালেই বেরোতে হবে আমাকে।" বানিয়ে বানিয়ে বললাম মোল্লাখালিতে একটা স্কুলে নিমন্ত্রণ আছে।

স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আমার কথা বিশ্বাস করল না নীলিমা। খুব ভাল করে আমাকে একবার দেখে নিয়ে বলল, "তাই? তো, কার সঙ্গে যাবে শুনি?"

"হরেনের সঙ্গে," বললাম আমি।

"তাই নাকি? হরেনের সঙ্গে?" ওর গলার বাঁকা সুরটা শুনেই ভয় হল আমার । মনে হল শেষ পর্যন্ত বোধহয় ফাস হয়ে যাবে আমার গোপন কথাটা।

এই ভাবেই আমাদের দু'জনের সম্পর্কের মধ্যে অবিশ্বাসের জন্ম হল সেদিন।

কিন্তু ফিস্টটাতে আমি গেলাম। আমার সারা জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিনগুলির অন্যতম হয়ে থাকবে সেই দিনটা। আমি যদি কলকাতাতেই থেকে যেতাম তা হলে আমার জীবন কী রকম হত সেটা যেন সেদিন, অবসরের ঠিক আগের মুহূর্তে, এক ঝলক দেখতে পেলাম আমি। শহর থেকে অতিথি যারা এসেছিলেন সে রকম সব মানুষদের সঙ্গেই তো ওঠাবসা হত আমার : সাংবাদিক, আলোকচিত্রী, বিখ্যাত লেখক; তাদের মধ্যে ছিলেন সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সাংবাদিক জ্যোতির্ময় দত্ত। এমনকী আমার চেনাশোনা লোকও ছিল কয়েকজন, ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় যোগাযোগ ছিল ওদের সঙ্গে। একজন ছিল আমার এক সময়কার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং কমরেড—আমরা তখন খোকন বলে ডাকতাম তাকে। দূর থেকে ওকে সেদিন দেখলাম আমি। কী সুন্দর চেহারা হয়েছে ওর : কুচকুচে কালো চুল, মুখ থেকে যেন জ্যোতি ফুটে বেরোচ্ছে। যদি সাহিত্যচর্চা ছেড়ে না দিতাম, আমিও কি তা হলে আজকে এরকম জায়গায় পৌঁছতাম?

সারা জীবনের না করা কাজগুলোর জন্য সেদিন যেমন অনুতাপ হল সেরকম আমার আগে আর কখনও হয়নি।

উদ্বাস্তু নেতারা যখন অতিথিদের নিয়ে দ্বীপটা ঘুরে দেখাতে বেরোল, একটু দূর থেকে আমিও চললাম ওদের পেছন পেছন। কত কিছু যে দেখানোর আছে এমনকী আমি আগেরবার যখন এসেছিলাম তারপর থেকে এই ক'দিনে আরও কত কী করেছে ওরা। অনেক কাজ করে ফেলেছে এর মধ্যে। নুনের ভাটি তৈরি হয়েছে, টিউবওয়েল বসানো হয়েছে, আল দিয়ে জল আটকে মাছ চাষের ব্যবস্থা হয়েছে, একটা রুটি কারখানা চালু হয়েছে, নৌকোর মিস্ত্রিদের কাজের জায়গা তৈরি হয়েছে, মাটির জিনিস গড়ার জায়গা করা হয়েছে, কামারশালা খুলেছে, আরও কত কী। কিছু লোক নৌকো তৈরি করছে, কয়েকজন বসে জাল বুনছে, কাঁকড়া ধরার দোন বানাচ্ছে; ছোট ছোট বাজার মতো বসেছে কয়েকটা জায়গায়, সেখানে জিনিসপত্র কেনাবেচা হচ্ছে। এই সব কিছু হয়েছে মাত্র এই কয়েক মাসে! এ এক আশ্চর্য দৃশ্য—যেন এই কাদামাটির ওপর হঠাৎ করে একটা নতুন সভ্যতা গজিয়ে উঠেছে।

তারপরে ফিস্ট। সাবেকি ধরনে সুন্দর করে গুছিয়ে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, মাটিতে কলাপাতা পেতে গাছের ছায়ায় আসন দেওয়া হয়েছে অতিথিদের। যারা পরিবেশন করছিল তাদের মধ্যে কুসুমকে দেখতে পেলাম আমি। ও আমাকে। দেখাল কী বিশাল বিশাল সব ডেকচি আনা হয়েছে রান্নার জন্য। কত রকমের যে মাছ রাঁধা হয়েছে বড় বড় চিংড়ি, গলদা বাগদা দু'রকমেরই, তা ছাড়াও ট্যাংরা, ইলিশ, পার্শে, পুঁটি, ভেটকি, রুই আর চিতল।

একেবারে হতবাক হয়ে গেলাম আমি। অধিকাংশ লোকেরই এখানে দু'বেলা ভাত জোটে না, সে তো আমি ভাল করেই জানি। বুঝতে পারলাম না কী করে এই বিশাল ব্যবস্থা করল এরা।

কোথা থেকে এল এত সব? জিজ্ঞেস করলাম কুসুমকে।

যে যতটুকু পেরেছে দিয়েছে, ও বলল। বিশেষ কিছু তো কিনতে হয়নি—শুধু চালটা। বাকি সব তো নদী থেকেই এসেছে। কালকে পর্যন্ত আমরা সবাই জাল নিয়ে, ছিপ নিয়ে মাছ ধরেছি। বাচ্চারাও পর্যন্ত। পার্শে মাছগুলো দেখিয়ে খানিকটা গর্বের সঙ্গে বলল, "আজকে সকালে ছ'টা এই মাছ ধরেছে ফকির।"

আমি বিস্ময়বিমুগ্ধ। শহুরে মানুষদের হৃদয় জয় করার জন্য টাটকা মাছের চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে? অতিথিদের ঠিক বুঝেছে তো এরা!

কুসুম আমাকে বার বার বলল বসে পড়তে, কিন্তু আমি ঠিক পারলাম না। এই অতিথিদের

সঙ্গে এক পঙক্তিতে আমি কী করে বসব? "না রে কুসুম," বললাম। আমি। "যাদের খাইয়ে কাজ হবে তাদের খাওয়া। এত দামি খাবার আমাকে খাইয়ে কেন নষ্ট করবি খামখা?" একটা গাছের ছায়ায় বসে বসে দেখতে লাগলাম আমি। মাঝে মাঝে কুসুম কি ফকির এসে কলাপাতায় মুড়ে অল্প কিছু কিছু খাবার দিয়ে যেতে লাগল আমাকে।

একটু পরেই বোঝা গেল যে ওষুধে কাজ দিয়েছে : অতিথিরা একেবারে মুগ্ধ। উদ্বাস্তুদের কাজকর্মের গুণগান করে অনেক সব বক্তৃতা দেওয়া হল। সবাই এক বাক্যে স্বীকার করল যে মরিচঝাঁপিতে যা ঘটছে তার গুরুত্ব শুধু এই দ্বীপটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আজকে মরিচঝাঁপিতে যে বীজ বোনা হয়েছে, কে বলতে পারে তার থেকেই একদিন দলিতদের জন্য নতুন রাষ্ট্র না হলেও, অন্তত দেশের সমস্ত নিপীড়িত মানুষের জন্য নিশ্চিন্ত কোনও এক আশ্রয়স্থল গড়ে উঠবে না?

বেলা যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন আস্তে আস্তে খোকনের কাছে গিয়ে ওর চোখের সামনে দাঁড়ালাম আমি। ও এক পলক দেখল আমাকে, কিন্তু চিনতে পারল না। অন্যদের সঙ্গে যেমন কথা বলছিল, বলতেই থাকল। খানিক পরে গিয়ে ওর কনুইয়ে আলতো করে টোকা দিলাম একটা। বললাম, "এই যে, খোকন!"

অচেনা একজন লোকের কাছ থেকে এরকম অতি পরিচিতের মতো সম্বোধন শুনে ও বিরক্ত হল একটু। বলল, "কে মশাই আপনি?"

যখন বললাম আমি কে, ওর মুখটা হাঁ হয়ে ঝুলে গেল, আর সেই হা-এর ভেতরে জিভটা জালে পড়া মাছের মতো লটপট করতে লাগল। "তুই?" অবশেষে বাক্‌স্ফুর্তি হল ওর। "তুই?"

"হ্যাঁ, আমি।"

"এত বছর কোনও খবর নেই তোর, আমরা তো সবাই ভেবেছিলাম—"

"কী? মরে গেছি? দেখতেই পাচ্ছিস দিব্যি জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে আছি তোর সামনে।"

মনে হল ও প্রায় বলে ফেলতে যাচ্ছিল, "মরলেই ভাল হত," কিন্তু বলল না শেষ পর্যন্ত।

"কিন্তু এত বছর ধরে কী করছিলি তুই? কোথায় ছিলি?"

মনে হল আমার গোটা অস্তিত্বটার জন্যই যেন কৈফিয়ত চাওয়া হচ্ছে, যেন লুসিবাড়িতে এতগুলো বছর কী করে কাটিয়েছি তার হিসেব দিতে বলা হচ্ছে আমাকে।

কিন্তু ভদ্রতা রেখেই জবাবটা দিতে হল : "ইস্কুল মাস্টারি করছিলাম। এই কাছেই একটা জায়গায়।"

"আর লেখালিখি?"

কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। কী আর বলব? "ভালই করেছি ছেড়ে দিয়ে," বললাম অবশেষে।

"তোরা যা লিখছিস তার কাছে দাঁড়াতে পারত না আমার ওই সব লেখা।"

হায় লেখককুল! সামান্য তোষামোদেই কেমন গলে জল হয়ে যায়। আমার কাঁধে হাত দিয়ে ওখান থেকে একটু সরে এল ও। তারপর খানিকটা প্রশ্রয় দেওয়ার ভঙ্গিতে গলাটা একটু নামিয়ে—যেন বড়ভাই কথা বলছে ছোটভাইয়ের সঙ্গে, সেইভাবে—জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা নির্মল, এইসব রিফিউজিদের সঙ্গে তোর কী করে যোগাযোগ হল?"

বললাম, "আসলে এদের দু'-এক জনকে আমি চিনি। আর, রিটায়ার করারও সময় এসে গেছে, ভাবছিলাম এইখানে এসে এবার একটু আধটু মাস্টারি করব।"

"এইখানে?" খোকনের গলায় একটু দ্বিধার সুর। "কিন্তু সমস্যা হল, ওদের তো বোধহয় থাকতে দেওয়া হবে না এ জায়গায়।"

"ওরা তো আছেই এখানে," আমি বললাম। "এখন কি আর সরানো সম্ভব নাকি ওদের? রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে তো তা হলে।"

হাসল খোকন। "ভুলে গেছ বন্ধু, সে সময়ে কী বলতাম আমরা?"

"কী বলতাম?"

"ডিম না ভেঙে ওমলেট বানানো যায় না।"

বাঁকা হাসি হাসল খোকন। এরকম হাসি একমাত্র তারাই হাসতে পারে যারা এক সময়ে আদর্শের কথা বলেছে কিন্তু কখনও সেই আদর্শে বিশ্বাস করেনি, আর ভেবেছে অন্য সকলেও তাদেরই মতো বিশ্বাসহীন আদর্শের কথা প্রচার করে চলেছে। একবার ভাবলাম যা তা বলে দিই মুখের ওপর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কেউ যেন প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিয়ে আমাকে মনে করিয়ে দিল যে অতখানি গর্বিত হওয়ার অধিকার আমার নেই। নীলিমা যেমন বিশাল কাজ করেছে এই কয় বছরে। কিন্তু আমি কী করেছি? সারা জীবনে কী কাজটা করেছি আমি? উত্তর খোঁজার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুই মনে এল না।

বিকেল হয়ে গেছে। হরেন আর কুসুম বেরিয়েছে দেখতে যদি কিছু মাছ পাওয়া যায়। ফকির বসে আছে একটা কাঁকড়া ধরার সুতো নিয়ে। ভাটির দেশে এই সুতোগুলোকে বলে দোন। সুতোটা নিয়ে ওর খেলা করা দেখতে দেখতে আমার বুকের ভেতরটা যেন উথলে উঠল। কত কী বলার আছে, কত কথা ঘুরপাক খাচ্ছে আমার মাথার মধ্যে, সেগুলি কি সব না বলাই রয়ে যাবে? ওঃ, কতগুলো বছর অকারণে নষ্ট হয়েছে, জীবনের কতটা সময় অকারণে জলাঞ্জলি দিয়েছি। রিলকের কথা মনে পড়ল আমার, বছরের পর বছর কেটে গেছে একটা শব্দও লিখতে পারেননি, তারপর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সমুদ্রের তীরে এক দুর্গে বসে লিখে ফেললেন দুইনো এলিজির কতগুলো কবিতা। নিস্তব্ধতাও আসলে প্রস্তুতির একটা অঙ্গ। একেকটা মিনিট কাটছে, আর আমার মনে হচ্ছে ভাটির দেশের প্রতিটি খুঁটিনাটি যেন চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বলতায় স্পষ্ট হয়ে উঠছে আমার সামনে। মনে হল ফকিরকে বলি, "জানিস কি তুই, প্রতিটা দোনে হাজারটা করে টোপ থাকে? তিন হাত ছাড়া ছাড়া বাঁধা হয় একেকটা টোপ? প্রত্যেকটা দোন তাই তিন হাজার হাত লম্বা?"

কবি যে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন তা ছাড়া আর কীভাবে এই জগৎটার যশোকীর্তন করি বলো? সেই পথে চলতে গেলে আমাদের কুমোর আর মজুরের কথা বলতে হবে, বলতে হবে

'বরং এমন-কিছু তুলে ধরো, যা সহজ, আর বংশপরম্পর স্বচ্ছন্দে নূতন রূপ নিতে-নিতে এখন যা আমাদেরই অংশ হয়ে আমাদের হাতে, চোখে প্রাণবন্ত।'

আলাপ

স্নান সেরে জানালার পাশে চেয়ারটায় গা ডুবিয়ে বসল পিয়া। খানিক পরে দেখল ওর আর ওঠার ক্ষমতা নেই। এই কদিন স্রেফ উবু হয়ে আর আসন করে বসে থাকার পর একটা হেলান দেওয়ার জায়গা পেয়ে কেমন যেন এক অদ্ভুত আরামের অনুভূতি হচ্ছে। ইচ্ছেমতো পা-ও দোলানো যাচ্ছে–পড়ে যাওয়ার কোনও ভয় নেই। এখনও মনে হচ্ছে নৌকোর দুলুনি টের পাচ্ছে সারা শরীরে, কানে বাজছে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের ঝিরঝির শব্দ।

নৌকোয় চলার বোধটা ফেরত আসতেই হঠাৎ সকালের সেই ভয়ংকর ঘটনার কথা মনে পড়ে গা শিউরে উঠল পিয়ার। মাত্রই কয়েকঘন্টা আগের ঘটনা অনুভূতিগুলি যেন এখনও স্মৃতি হয়ে যায়নি; টাটকা, স্পষ্ট রয়ে গেছে মনের মধ্যে। পরিষ্কার দেখতে পেল পিয়া কুমিরটার মাথা মোচড় খেয়ে ঘুরে যাচ্ছে শূন্যে, দেখতে পেল এক মুহূর্ত আগেও ওর কবজিটা যেখানে ছিল ঠিক সেইখানটায় এসে খপাত করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সরীসৃপটার হাঁ মুখ : হাতটা ধরে ফেলবে বলে এত নিশ্চিত ছিল কুমিরটা, যে ওকে ডিঙি থেকে টেনে জলের ভেতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য শরীরের চলন যেরকম হওয়া দরকার ঠিক সেইভাবেই লাফ দিয়েছিল ওটা। পিয়া কল্পনা করল একটানে ওকে জন্তুটা নিয়ে চলে যাচ্ছে জলের নীচে, একবার মুহূর্তের জন্য আলগা হচ্ছে কামড়, তারপর ওর শরীরের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় এসে ফের বন্ধ হচ্ছে হাঁ-মুখ। দ্রুত ওকে নিয়ে চলে যাচ্ছে সেই অদ্ভুত উজ্জ্বল গভীরে, যেখানে সূর্যের আলোর কোনও দিক-দিশা নেই, যেখানে বোঝা যায় না কোনদিকে গেলে ওপরে ওঠা যাবে, আর কোনদিকে গেলে তলিয়ে যাবে আরও নীচে। লঞ্চ থেকে পড়ে যাওয়ার সময়কার আতঙ্কের কথা মনে পড়ে গেল ওর, মনে পড়ল সেই শরীর অবশ করা ভয়ের কথা, যখন চেতনার মধ্যে একটাই কথা বাজতে থাকে–এই অতল কারা থেকে মুক্তির কোনও উপায় নেই। পর পর এই সব দৃশ্যগুলো চোখের সামনে এসে এমন এক স্পষ্ট জীবন্ত মন্তাজ তৈরি হল যে পিয়ার হাত আবার থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। আর ফকিরের অনুপস্থিতিতে ঘটনাগুলিকে তখনকার থেকে অনেক বেশি ভয়াবহ মনে হল এখন।

জোর করে উঠে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল পিয়া। এখনও চাঁদ ওঠেনি, অন্ধকারে ঝুপসি কয়েকটা নারকেলগাছ আবছা নজরে আসছে, তার পরেই ফসল কাটা ন্যাড়া জমির বিস্তীর্ণ শূন্যতা। বাড়ির সামনের দিক থেকে একটা কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসছে : কোনও মহিলার গলা আর তার সঙ্গে কানাইয়ের ভারী গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

চেয়ার থেকে শরীরটাকে টেনে তুলে একতলায় নেমে এল পিয়া। দরজাটার সামনে হাতে একটা লণ্ঠন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কানাই লাল শাড়ি পরা এক মহিলার সঙ্গে কথা বলছে। খানিকটা অন্যদিকে ফিরে দাঁড়িয়েছিল মহিলা, পিয়াকে আসতে দেখে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে কানাইয়ের লণ্ঠনের আলোয় হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখের একটা পাশ। পিয়া দেখল ওরই কাছাকাছি বয়স হবে মেয়েটির, ভরা শরীর, চওড়া হাঁ মুখ আর বড় বড় ঝকঝকে দুটো চোখ। দুই ভুরুর মাঝে বড় একটা লাল টিপ আর মাথায় চকচকে কালো চুলের মাঝখান দিয়ে একটা ক্ষতচিহ্নের মতো মোটা করে টকটকে লাল সিঁদুরের দাগ।

“আরে এই যে পিয়া”, কানাই বলল ইংরেজিতে। ওর গলায় বাড়তি উচ্ছ্বাসের সুরটা থেকে পিয়া আন্দাজ করল ওকে নিয়েই কথা হচ্ছিল এতক্ষণ। দেখল মেয়েটি স্পষ্ট স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে, যেন বুঝতে পেরেছে ও কে, আর মনে মনে যাচাই করে নিচ্ছে ওকে। তারপর ওই খোলা নজরে জরিপ করার মতোই অস্বস্তিকর ভঙ্গিতে হঠাৎ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল মুখটা। কানাইয়ের হাতে কয়েকটা স্টেনলেস স্টিলের কৌটো ধরিয়ে দিয়ে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে; তারপর অন্ধকারে ঢাকা ট্রাস্ট চৌহদ্দির মধ্যে মিলিয়ে গেল কোথায়।

“কে ওই মহিলা?” পিয়া জিজ্ঞেস করল কানাইকে।

“বলিনি আপনাকে? ও তো ময়না, ফকিরের বউ।”

“তাই বুঝি?”

ফকিরের বউয়ের চেহারা যেমন কল্পনা করেছিল পিয়া তার থেকে ময়না এতটাই আলাদা যে ব্যাপারটা হজম করতে একটু সময় লাগল ওর। তারপর বলল, “বোঝা উচিত ছিল আমার।”

“কী বোঝা উচিত ছিল?”

“যে ও ফকিরের বউ। ছেলেটার চোখদুটো ঠিক ওর মতো।”

“তাই নাকি?”

“হ্যাঁ,” বলল পিয়া। “কী বলতে এসেছিল ও?”।

“এই যে, এই টিফিন ক্যারিয়ারটা দিয়ে গেল,” স্টিলের কৌটোগুলো তুলে দেখাল কানাই। “আমাদের রাতের খাবার আছে এর মধ্যে। হাসপাতালের রান্নাঘর থেকে ময়না নিয়ে এসেছে আমাদের জন্য।”

মুহূর্তের জন্য কানাইয়ের ওপর থেকে মনোযোগ সরে গেল পিয়ার। ওই মেয়েটির কথা ভাবছিল ও, ফকিরের বউয়ের কথা। ফকির আর টুটুলের কাছে ফিরে গেল বউটি, আর ওকে ফিরে যেতে হবে গেস্ট হাউসের দোতলার শূন্যতায় ভেবে অল্প একটু ঈর্ষা হল মনে। এই চিন্তায় নিজেরই লজ্জা লাগল পিয়ার, আর সেটা ঢাকার জন্য ও কানাইয়ের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে তাড়াতাড়ি বলল, “আমি যেরকম ভেবেছিলাম তার সঙ্গে কোনওই মিল নেই ওর।”

“মিল নেই?”

“না।” আবার পিয়া দেখল ঠিক উপযুক্ত শব্দটা কিছুতেই মনে আসছে না। বলল, “মানে, বেশ ভালই দেখতে, না?”

“আপনার তাই মনে হল?”

বুঝতে পারছিল পিয়া এ প্রসঙ্গটা এখানেই শেষ করে দেওয়া ভাল, কিন্তু তাও থামল না, ক্ষতস্থানের ওপর থেকে মামড়ি খুঁটে তোলার মতো বলেই যেতে লাগল : “তাই তো। বেশ সুন্দরীই বলা চলে।”

“ঠিকই বলেছেন, নিজেকে সামলে নিয়ে একটু মোলায়েম সুরে বলল কানাই। “খুবই অ্যাট্রাক্টিভ। কিন্তু আরও গুণ আছে ওর সেসব দেখতে গেলে খুব একটা সাধারণ মেয়ে নয় ময়না।”

“তাই নাকি? কী রকম?”

“অদ্ভুত ওর জীবনের কাহিনি,” বলল কানাই। “অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছে, শিগগিরই হয়তো পুরোদস্তুর নার্স হয়ে যাবে এই হাসপাতালে, নিজের এবং পরিবারের জন্য ও ঠিক কী চায় সেটা ও জানে, এবং সেটা অর্জন করার জন্য যে-কোনও বাধাকে তুচ্ছ করে এগিয়ে যাওয়ার জোর ওর আছে। ওর মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, এক ধরনের বলিষ্ঠতা আছে। অনেকদূর যাবে ওই মেয়ে।”

কানাইয়ের কথার মধ্যে কোথায় যেন একটা তুলনামূলক বিচারের আভাস রয়েছে মনে হল। সেই বিচারে ও নিজে কোন জায়গায় দাঁড়াবে মনে মনে না ভেবে পারল না পিয়া–ওর কখনওই বিশেষ কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না, আর পড়াশোনা শেখার জন্যও কখনও নিজের চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করতে হয়নি। ও জানে, কানাইয়ের চোখে ও একটা নরম-সরম, বাপ-মার আদরে মানুষ হওয়া সাদামাটা ধরনের মেয়ে। তবে এই ভাবে ওকে বিচার করার জন্য কানাইকে দোষ দেয় না পিয়া; কানাইয়ের সম্পর্কেও তো ওর যেমন মনে হয় যে বিশেষ একটা ধাঁচের ভারতীয় ছেলেরা যে রকম হয় সেই রকম ধরনের মানুষ ও–দাম্ভিক, আত্মকেন্দ্রিক, জোর করে নিজের মতামত অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে আগ্রহী–তবু, এ সব কিছু সত্ত্বেও অপছন্দ করার মতো নয়।

এবার একটা নিরাপদ দিকে কথা ঘোরাল পিয়া, “ওরা কি এই লুসিবাড়িরই লোক? ফকির আর ময়না?”

"না," কানাই বলল। "ওদের দুজনেরই বাড়ি ছিল অন্য একটা দ্বীপে, সাতজেলিয়ায়। এখান থেকে অনেকটা দূরে।"

"তা হলে ওরা এখানে কেন থাকে?"

"একটা কারণ হল ময়না এখানে নার্সিং-এর ট্রেনিং নিচ্ছে, আর একটা কারণ হচ্ছে ও ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে চায়। ফকির টুটুলকে নিয়ে মাছ ধরতে চলে গিয়েছিল বলেই তাই রেগে গেছে ময়না।"

"দু'দিন ধরে আমিও যে ছিলাম ওই নৌকোতে সেটা ও জানে?"

"জানে," বলল কানাই। "সবই জানে—ফরেস্ট গার্ড টাকা নিয়ে নিয়েছিল, আপনি জলে পড়ে গিয়েছিলেন, আপনাকে বাঁচাতে ফকির ঝাঁপ দিয়েছিল—সব। কুমিরের ঘটনাটাও জানে দেখলাম—বাচ্চাটা সব বলেছে ওকে।"

কানাই যে শুধু বাচ্চার কথাটাই উল্লেখ করছে সেটা লক্ষ করল পিয়া : তার মানে কি ফকির ময়নাকে বিশেষ কিছু বলেনি এই দু'দিনের ঘটনা সম্পর্কে, না কি ও অন্য রকম কিছু বিবরণ দিয়েছে? এই দুটো প্রশ্নের কোনওটারই উত্তর কানাইয়ের জানা আছে কিনা বুঝতে পারল না পিয়া, কিন্তু জিজ্ঞেসও করে উঠতে পারল না নিজে থেকে। তার বদলে বলল, "ময়না নিশ্চয়ই ভাবছে আমি কী করতে এসেছি এখানে?"

"সে তো বটেই," বলল কানাই। "আমাকে জিজ্ঞেসও করল। আমি বললাম যে আপনি একজন বৈজ্ঞানিক। খুব ইমপ্রেসড হল ও।"

"কেন?"

"বুঝতেই পারছেন, লেখাপড়া সংক্রান্ত যে-কোনও বিষয়েই ওর খুব আগ্রহ।"

"ওকে বললেন নাকি যে আমরা কাল যাব ওদের বাড়িতে?"

"বললাম," কানাই জবাব দিল। "ওরা থাকবে বাড়িতে, অপেক্ষা করবে আমাদের জন্য।" কথা বলতে বলতে দোতলায় গেস্ট হাউসে উঠে এসেছে কানাই আর পিয়া। হাতের টিফিন ক্যারিয়ারটা টেবিলের ওপর রাখল কানাই। "নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে আপনার?" বাটিগুলো আলাদা করতে করতে জিজ্ঞেস করল ও। "সব সময় এত খাবার নিয়ে আসে ময়না—আমাদের দুজনের কুলিয়ে বেশি হয়ে যাবে। দেখি কী এনেছে—ভাত আছে, ডাল আছে, মাছের ঝোল আছে, চচ্চড়ি আর বেগুন ভাজা। নিন, কী দিয়ে শুরু করবেন?"

পাত্রগুলোর দিকে একটু সংশয়ের দৃষ্টিতে তাকাল পিয়া। বলল, "কিছু মনে করবেন না আশা করি, কিন্তু এগুলোর একটাও কিছু খাওয়ার সাহস নেই আমার। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমাকে খুব সাবধানে থাকতে হয়।"

"এমনি ভাত খান হলে একটু," কানাই বলল। "সেটা তো খেতেই পারেন?" মাথা নাড়ল পিয়া। "হ্যাঁ, সেটা হয়তো খেতে পারি একটু—শুধু প্লেন, সাদা ভাত।"

"এই নিন।" কয়েক হাতা ভাত পিয়ার প্লেটে তুলে দিল কানাই। একটা চামচও দিল। তারপর জামার হাতাটা গুটিয়ে, নিজের থালাতে খানিকটা ভাত নিয়ে খেতে শুরু করল হাত দিয়ে।

খেতে খেতে লুসিবাড়ির বিষয়ে অনেক কথা বলল কানাই। ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের কথা বলল, কী করে এই দ্বীপে বসতি শুরু হল সে কথা বলল, নির্মল আর নীলিমা কীভাবে এখানে এসেছিল সেই গল্প করল। জায়গাটার বিষয়ে ও এত্ব কিছু জানে দেখে শেষে পিয়া জিজ্ঞেস করল, "আপনার কথা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছে যেন আপনি বহু দিন কাটিয়েছেন এখানে। কিন্তু সেটা তো ঠিক নয়, তাই না?"

পিয়ার বক্তব্য সমর্থন করল কানাই, "একেবারেই না। আমি এর আগে একবার মাত্র এসেছিলাম এখানে। ছোটবেলায়। সত্যি কথা বলতে কী, এখনও এত স্পষ্ট সব কিছু মনে আছে দেখে আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। আরও বিশেষ করে, কারণ আমাকে তো আসলে শাস্তি দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল এখানে।"

"কেন আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন?"

কাধ ঝাঁকাল কানাই। "আমি আসলে যে ধরনের মানুষ তাতে আমার পক্ষে এটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। আমি অতীত আঁকড়ে পড়ে থাকি না। সব সময় সামনের দিকে তাকিয়ে চলতে পছন্দ করি।"

"কিন্তু এখানে, এই লুসিবাড়িতে এখন তো আমরা অতীতে নেই, আমরা তো বর্তমানে আছি, তাই না?" হেসে বলল পিয়া।

"মোটেও না," জোর দিয়ে বলল কানাই। "আমার কাছে লুসিবাড়ি সবসময় অতীতেরই অংশ হয়ে থাকবে।"

ভাত শেষ হয়ে গিয়েছিল পিয়ার, টেবিল থেকে উঠে থালা বাসনগুলো গুছোতে শুরু করল ও। তাই দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল কানাই।

"আরে, বসে পড়ুন। আপনি আবার এগুলোতে কেন হাত দিচ্ছেন? ওসব ময়না করে নেবে এখন।"

"আমি ময়নার থেকে কিছু খারাপ করব না," পিয়া জবাব দিল।

কানাই কাঁধ ঝাঁকাল। "বেশ।"

নিজের প্লেটটা ধুতে ধুতে পিয়া বলল, "এই যে আপনি এখানে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন, এত কিছু করলেন, কিন্তু আমার এদিকে মনে হচ্ছে আমি তো আপনার সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না বলতে গেলে। শুধু নামটা ছাড়া।"

"তাই?" একটু অবাক হয়ে হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল কানাই। "কেমন করে ঘটল। এই আশ্চর্য ঘটনাটা বলুন তো? আমার খুব একটা বাক্ সংযম আছে বলে তো বাজারে কোনও দুর্নাম নেই।"

"তা হলেও, কথাটা সত্যি। এমনকী আপনি কোথায় থাকেন সেটা পর্যন্ত আমি জানি না।"

"এক্ষুনি সব সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছি," কানাই বলল। "আমি থাকি নতুন দিল্লিতে, আমার বয়স বিয়াল্লিশ এবং বেশিরভাগ সময়েই আমি সঙ্গিনীহীন।"

"তাই বুঝি?" একটু কম ব্যক্তিগত দিকে কথা ঘোরাল পিয়া, "আর আপনি তো ট্রান্সলেটর, তাই না? এই একটা কথা বলেছিলেন মনে আছে আমার।"

"একদম ঠিক। মৌখিক এবং লিখিত অনুবাদের কাজ করি আমি। যদিও এখন সেসব কিছুর চেয়ে ব্যবসাটাই বেশি করে করছি। বছর কয়েক আগে আমি খেয়াল করি যে দিল্লিতে পেশাদার ভাষাবিদের সংখ্যা খুব কম। তখন নিজেই একটা অফিস খুলে বসলাম। এখন আমার কোম্পানি সমস্ত রকম সংস্থার জন্য সব রকমের অনুবাদের কাজ করে—ব্যবসায়ীদের জন্য, বিভিন্ন দূতাবাসের জন্য, সংবাদমাধ্যমের জন্য, নানারকম সব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের জন্য—এক কথায়, যারাই পয়সা দেয় তাদেরই জন্য কাজ করি আমরা।"

"এ কাজের চাহিদা কী রকম বাজারে?"

"চাহিদা আছে, চাহিদা আছে," মাথা নেড়ে বলল কানাই। "দিল্লি এখন হল পৃথিবীর ব্যস্ততম কনফারেন্স সিটিগুলির মধ্যে একটা। মিডিয়ারও প্রচুর কাজ। কিছু না কিছু একটা সব সময় লেগেই আছে। আমি তো কাজ করে কুলিয়ে উঠতে পারি না অনেক সময়। ব্যবসা সমানে বেড়েই যাচ্ছে। এই তো কয়েকদিন আগেই আমরা চালু করলাম একটা স্পিচ ট্রেনিং অপারেশন। কল সেন্টারে যারা কাজ করে তাদের ইংরেজি উচ্চারণ শেখানোর জন্য। সেই বিভাগের কাজ তো এখন দিনে দিনে বাড়ছে।"

শুধু মাত্র ভাষার আদান প্রদানের ওপর নির্ভর করে যে একটা ব্যবসা দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায় এই ধারণাটাই খুব আশ্চর্য মনে হল পিয়ার। "তা হলে আপনি নিজেও নিশ্চয়ই

অনেকগুলো ভাষা জানেন, তাই না?"

"ছ'টা," মুচকি হেসে সঙ্গে সঙ্গে বলল কানাই। "হিন্দি, উর্দু আর বাংলাটাই প্রধানত কাজে লাগে এখন। আর ইংরেজি তো আছেই। তা ছাড়াও আরও দুটো জানি, ফরাসি আর আরবি—সেগুলোও সময়ে অসময়ে কাজে লেগে যায়।"

অদ্ভুত লাগল পিয়ার এই দুটো ভাষার কথা শুনে। "ফরাসি আর আরবি! এই ভাষাগুলো

আবার কী করে শিখলেন?”

“স্কলারশিপ,” একটু হেসে বলল কানাই। “বিভিন্ন সব ভাষার ব্যাপারে আমার সব সময়ই খুব আগ্রহ। ছাত্র অবস্থায় প্রায়ই ঢু মারতাম কলকাতার অলিয়স ফ্রঁসেতে। তারপর এটা ওটা নানা যোগাযোগে স্কলারশিপ পেয়ে গেলাম একটা। তারপর প্যারিসে যখন ছিলাম সেই সময় একটা সুযোগ এল টিউনিশিয়াতে গিয়ে আরবি শেখার। এরকম সুযোগ আর কে ছাড়ে? তারপর থেকে আর কখনও পেছনে তাকাতে হয়নি।”

একটা হাত তুলে ডান কানের রুপোর দুলটা খুঁটতে লাগল পিয়া। ভঙ্গিটার আত্মবিস্মৃত ভাবটা ছেলেমানুষি, কিন্তু তারই মধ্যে যুবতীসুলভ একটা সুষমাও রয়েছে। “আপনি তা হলে ঠিকই করে নিয়েছিলেন যে এই অনুবাদের কাজটাকেই এক সময় পেশা করবেন?”

“না না,” বলল কানাই। “একেবারেই না। আমি যখন আপনার বয়সি ছিলাম, কলকাতার আর পাঁচটা কলেজের ছাত্রর মতো তখন আমারও মাথার মধ্যে গজগজ করত কবিতার ভূত। পেশাদারি জীবনের শুরুতে আমার ইচ্ছে ছিল আমি জীবনানন্দ অনুবাদ করব আরবিতে আর অ্যাডোনিস অনুবাদ করব বাংলায়।”

“তারপর কী হল?” নাটকীয় ভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কানাই। “সংক্ষেপে বলতে গেলে, কিছুদিনের মধ্যেই আমি আবিষ্কার করলাম যে ভাষা হিসেবে যদিও বাংলা এবং আরবি দুটোরই সম্পদ অপরিমেয়, কিন্তু এই দুটোর কোনও ভাষাতেই শুধু সাহিত্যিক অনুবাদের কাজ করে পেট চালানো সম্ভব নয়। বড়লোক আরবদের বাংলা সাহিত্যের বিষয়ে কোনও আগ্রহই নেই, আর বড়লোক বাঙালিদের কীসে আগ্রহ আছে তাতে কিছুই যায় আসে না, কারণ সংখ্যায় তারা এত কম যে তাদের পক্ষে কিছু করে ওঠা সম্ভব নয়। একটা সময় এসে তাই আমি নিজেকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দিলাম, আর এইসব ব্যবসায়িক কাজ শুরু করলাম। তবে এটা বলতেই হবে খুবই ভাল সময়ে শুরু করেছি আমি : অনেক কিছু হচ্ছে এখন এই দেশে, আর তার অংশ হতে পারাটা বেশ একটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা আমার মনে হয়।”

পিয়ার মনে পড়ল বাবার কাছে শোনা ইন্ডিয়ার গল্প, যে দেশ ছেড়ে বাবা চলে গিয়েছিল আমেরিকায় : সে ছিল এমন এক দেশ যেখানে গাড়ি ছিল মাত্র দু'রকমের, আর যেখানে মধ্যবিত্ত জীবনকাঠামোর প্রধান ধর্ম ছিল বিদেশি যে-কোনও কিছুর প্রতি এক তীব্র আকর্ষণ। কিন্তু কানাই যে জগতে বাস করে এই লুসিবাড়ি বা ভাটির দেশের থেকে সে পৃথিবী যতটা দূরে, পিয়ার বাবার স্মৃতির ভারতের সঙ্গে তার দূরত্ব কোনও অংশে কম নয়।

“আপনার কখনও আবার সাহিত্যিক অনুবাদের কাজে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে হয় না?” ও জিজ্ঞেস করল কানাইকে।

“হয় কখনও কখনও। খুব বেশি হয় না। সব মিলিয়ে এটা স্বীকার করতেই হবে যে একটা গোটা অফিস চালাতে আমার বেশ ভালই লাগে। ভাবতে ভাল লাগে আমি লোকজনদের চাকরি দিচ্ছি, মাইনে দিচ্ছি, অর্থহীন ডিগ্রিওয়ালা ছাত্রছাত্রীদের কাজের সুযোগ করে দিচ্ছি। আর, পয়সা এবং স্বাচ্ছন্দ্যটাও যথেষ্ট উপভোগ করি আমি। সেটা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। পয়সাওয়ালা একা লোকের পক্ষে দিল্লি বেশ ভাল জায়গা। অনেক ইন্টারেস্টিং মহিলার সঙ্গে যোগাযোগ হয়।”

এই শেষ কথাটায় একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেল পিয়া। এক মুহূর্ত ঠিক বুঝে উঠতে পারল কী বলবে। বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে সদ্য বোয়া প্লেটগুলোকে গুছিয়ে রাখছিল ও। শেষ প্লেটটা রেখে একটা হাই তুলল, এক হাত তুলে আড়াল করল মুখটা।

“সরি।”

সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে কানাই বলল, “এত সব ঘটনার পরে নিশ্চয়ই খুব টায়ার্ড আপনি?”

“ভীষণ। মনে হচ্ছে ঘুমোতে যেতে হবে এবার।”

“এক্ষুনি?” জোর করে একটু হাসল কানাই, যদিও বোঝাই যাচ্ছিল বেশ একটু হতাশ হয়েছে ও। “অবশ্য ঠিকই তো, যা ধকলটা গেছে। আপনাকে বলেছি কি যে আর ঘণ্টাখানেক বাদে কিন্তু ইলেকট্রিক আলো বন্ধ হয়ে যাবে। হাতের কাছে মোমবাতি রাখবেন

একটা।”

“তার অনেক আগেই আমি ঘুমিয়ে পড়ব।”

“গুড। আশা করি ভাল করে বিশ্রাম নিতে পারবেন রাত্তিরটা। আর যদি কিছু দরকার হয়, ওপরে গিয়ে দরজা ধাক্কাবেন। আমি মেসোর পড়ার ঘরে থাকব।”

ঝড়

পরের সপ্তাহেই আবার মরিচঝাঁপি যাব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু হেডমাস্টারের রিটায়ার করার সময় অনেক টুকিটাকি কাজ আর নিয়মমাফিক অনুষ্ঠান থাকে—সেই সবের মধ্যে আটকে গেলাম আমি। অবশেষে সব ঝামেলা মিটল, সরকারিভাবে শেষ হয়ে গেল আমার কর্মজীবন।

কয়েকদিন পর আমার পড়ার ঘরে এসে কড়া নাড়ল হরেন। "সার!"

"কুমিরমারির বাজারে গিয়েছিলাম," ও বলল। "সেখানে কুসুমের সঙ্গে দেখা। ও কিছুতেই ছাড়বে না, বলল ওকে এখানে নিয়ে আসতে হবে।"

"এখানে!" প্রায় চমকে উঠলাম আমি। "এই লুসিবাড়িতে? কেন?"

"ও মাসিমার সঙ্গে দেখা করবে। মরিচঝাঁপির লোকেরা মাসিমার সাহায্য চায়।"

সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম আমি। এটাও স্থানীয় সমর্থন জোগাড়ের জন্য উদ্বাস্তুদের চেষ্টার অঙ্গ। তবে এই ক্ষেত্রে ওদের চেষ্টায় কোনও ফল হবে বলে মনে হল না আমার।

"হরেন, তুমি কুসুমকে বারণ করতে পারতে," বললাম আমি। "নীলিমার সঙ্গে দেখা করে ওদের কোনও লাভ হবে না।"

"বলেছিলাম সার। কিন্তু ও কিছুতেই ছাড়বে না।"

"ও কোথায় এখন?"

"নীচে সার। মাসিমার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু আপনার কাছে কাকে নিয়ে এসেছি দেখুন।" একপাশে সরে দাঁড়াল হরেন, আর আমি দেখলাম এতক্ষণ ধরে ওর আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিল ফকির।

"আমাকে একবার বাজারে যেতে হবে। ওকে তাই আপনার কাছে রেখে গেলাম।" পাঁচ বছরের ছেলেটাকে আমার কাছে বসিয়ে রেখে একদৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেল ও।

এতদিন মাস্টারি করতে করতে একাধিক বাচ্চার সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করতে হয় সেটাই জেনেছি, কিন্তু নিজের কোনও সন্তান না থাকায়, শুধুমাত্র একজন শিশুর সাথে কথা বলার অভ্যাস আমার ছিল না। এখন একজোড়া পাঁচ বছর বয়সি খোলা চোখের নজরের সামনে বসে আমি যা যা বলব ভেবে রেখেছিলাম সবই ভুলে গেলাম।

প্রায় আতঙ্কে ছেলেটাকে নিয়ে ছাদের ধারে গেলাম আমি। সামনে রায়মঙ্গলের মোহনার দিকে দেখিয়ে বললাম, "দেখো কমরেড, সামনে চোখ মেলে তাকাও, বলো আমাকে কী দেখতে পাচ্ছ।"

মনে হল আমি কী জানতে চাইছি সেটা নিজেকেই ও মনে মনে জিজ্ঞেস করছিল। খানিক এদিক ওদিক তাকিয়ে অবশেষে বলল, "বাঁধ দেখতে পাচ্ছি সার।"

"বাঁধ দেখতে পাচ্ছ? তা তো বটেই, বাঁধই তো দেখা যাচ্ছে।"

এই উত্তর আমি আদৌ আশা করিনি, কিন্তু খুবই স্বস্তি পেলাম মনে মনে জবাবটা পেয়ে। কারণ এই ভাটির দেশে বাঁধ শুধু যে মানুষের প্রাণরক্ষা করে তা তো নয়, বাঁধই তো আমাদের ইতিহাসের ভাঁড়ারঘর, অঙ্কের আকর, গল্পের খনি। এই বাঁধ যতক্ষণ আমার চোখের সামনে আছে, আমি জানি আমার কথা বলার বিষয়ের কোনও অভাব হবে না।

"ঠিক আছে কমরেড, চালিয়ে যাও। আবার দেখো, খুব ভাল করে দেখো। দেখি তো খুঁজে বের করতে পারো কিনা কোন কোন জায়গায় বাঁধটা সারাই করা হয়েছে। প্রত্যেকটা জায়গার জন্য আমি একটা করে গল্প বলব তোমাকে।"

হাত তুলে একটা জায়গার দিকে ইশারা করল ফকির। "ওইখানটায় কী হয়েছিল সার?"

"আচ্ছা, ওইখানটায়। কুড়ি বছর আগে ওই জায়গায় বাঁধটা ভেঙেছিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, ঝড়েও ভাঙেনি, কন্যাতেও ভাঙেনি। একটা লোক গিয়ে ওখানে বাঁধটা কেটে দিয়েছিল। কেন জানো? এক পড়শির সঙ্গে ওর ঝগড়া হয়েছিল, সেইজন্য। রাতের

অন্ধকারে চুপিচুপি গিয়ে বাঁধের ওই জায়গাটায় ও একটা গর্ত করে রেখে এল। ভাবল ওখান দিয়ে নোনা জল ঢুকে পড়শির খেতটা ডুবিয়ে দেবে। কিন্তু এটা ওর মাথায় আসেনি যে বাঁধ কেটে ও নিজেরও একই ক্ষতি করছে। তাই ওদের দু'জনের কেউই আর এখন এখানে থাকে না কারণ নোনা জল ঢোকার পর দশ বছর পর্যন্ত আর কিছু চাষ করা যায়নি ওই জায়গার জমিতে।"

"আর ওখানটায় সার? ওখানে কী হয়েছিল?"

"ওই জায়গার গল্পটা শুরু হয়েছিল একবার জোয়ারের সময়। কোটাল গোনে জল খুব বেড়ে গিয়েছিল সেবার, তারপরে ওখান দিয়ে উপচে এসে ঢুকেছিল গাঁয়ে। তখন বাঁধ সারাইয়ের ঠিকাদারি যাকে দেওয়া হল সে ছিল তখনকার গ্রামপ্রধানের শালা। সে তো বলল এমন করে সারিয়ে দেবে যে জীবনে আর জল ঢুকবে না ওখান দিয়ে। কিন্তু পরে দেখা গেল ও জায়গায় যত মাটি ফেলার পয়সা তাকে দেওয়া হয়েছিল তার মাত্র অর্ধেক পয়সার মাটি ফেলেছে। বাকি পয়সাটা অন্যসব শালাদের সঙ্গে ভাগ করে খেয়ে ফেলেছে।"

"আর ওই জায়গাটায় সার?"

ভাল গল্প বলিয়েদেরও মাঝে মাঝে থামতে জানতে হয়। জানতে হয় কখনও কখনও বিচক্ষণতার দাম সাহসের চেয়ে অনেক বেশি। "ওই জায়গাটার বিষয়ে কমরেড খুব বেশি কিছু আমি তোমাকে বলতে পারব না। ওখানে যারা থাকে তাদের দেখতে পাচ্ছ, ওই যে বাঁধের ধার ঘেঁষে পরপর ঘরগুলোতে? এখন ব্যাপার হল গিয়ে একবার ওই লোকগুলো একটা ভুল দলকে ভোট দিয়ে ফেলেছিল। ফলে অন্য আরেক পার্টি যখন ক্ষমতায় এল, তারা ঠিক করল শোধ নিতে হবে। সেই শোধ নেওয়ার জন্য ওরা কী করল? না, ওই জায়গায় বাঁধের গায়ে একটা গর্ত করে রেখে দিল। রাজনীতি যারা করে তারা এইরকমই হয়, তবে এই নিয়ে আর বেশি কথা না বলাই ভাল—এই বিষয়টা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব একটা ভাল নাও হতে পারে। তার চেয়ে বরং ওই জায়গাটা দেখো, ওই যে, আমি আঙুল দিয়ে যে জায়গাটা দেখাচ্ছি, ওইখানটা।"

যে জায়গাটার দিকে আমি ইশারা করলাম তিরিশের দশকের এক ঝড়ে সেখানে প্রায় কিলোমিটারখানেক বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে গিয়েছিল।

"একবার কল্পনা করো ফকির, কী কঠিন জীবন ছিল তোমার পূর্বপুরুষদের," বললাম আমি। "ওরা তখন মাত্রই এসেছে এই ভাটির দেশে, নতুন এসে বসত করেছে এই দ্বীপে। বছরের পর বছর ধরে নদীর সাথে লড়াই করে আস্তে আস্তে এই বাঁধের ভিতটা সবে বানিয়েছে। বহু পরিশ্রমে কয়েক মুঠো ধান আর আলুপটলও ফলাতে পেরেছে। বছরের পর বছর খুঁটির ওপর বাসা বানিয়ে থাকার পর অবশেষে নেমে আসতে পেরেছে মাটিতে। সমান জমিতে কয়েকটা বস্তি ঝুপড়ি বানাতে পেরেছে। এই সবকিছুই কিন্তু ওই বাঁধের কল্যাণে। এবার কল্পনা করো সেই ভয়াবহ রাতের কথা। ঝড় যখন এল তখন সবে কোটাল লেগেছে; ভাবো একবার, সেই চাল-উড়ে যাওয়া ঘরে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে বসে ওরা দেখছে জল বাড়ছে, বাড়ছে... এত বছরের পরিশ্রমে নদীকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য যে বালি আর মাটি জড়ো করেছিল ওরা, চোখের সামনে তার ওপর এসে আছড়ে আছড়ে পড়ছে ঢেউ। ভাবো একবার, কীরকম লাগছিল ওরা যখন দেখল মাটি গলিয়ে হু হু করে ঢুকে আসছে জোয়ারের জল, তাড়া করে আসছে পেছন পেছন, পালিয়ে বাঁচার কোনও উপায়ই নেই। আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি দোস্ত, সেদিন এই নদীর সামনে দাঁড়িয়ে ওই দৃশ্য দেখার চেয়ে বাঘের মুখে গিয়ে দাঁড়াতে বললেও রাজি হয়ে যেত ওদের যে কেউ।"

"আরও ঝড় হয়েছিল সার?"

"আরও অনেকবার ঝড় এসেছে ফকির, অনেকবার। দেখো ওই জায়গাটার দিকে তাকিয়ে দেখো," নদীর পাড়ে দ্বীপের একটা জায়গার দিকে দেখালাম আমি। দেখে মনে হয় যেন বিশাল কোনও দানব কোনওদিন লুসিবাড়ির নদীতীরের ওই জায়গা থেকে একটা টুকরো কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে। "দেখো। ১৯৭০ সালের ঝড়ে এই কাণ্ড হয়েছিল। বিশাল

ভাঙন ধরেছিল—দ্বীপের চার একর জমি ওখান থেকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল নদী। মুহূর্তের মধ্যে মাঠ ঘাট গাছপালা বাড়িঘর সবসুদ্ধ চলে গেল জলের তলায়।"

"সবচেয়ে বড় ঝড় ছিল ওটা?"

"না কমরেড, না। সবচেয়ে বড় ঝড় যেটাকে বলা হয়, সে হয়েছিল আমারও জন্মের আগে। এখানে লোকজন এসে বসত শুরু করারও অনেক আগে।"

"কবে সার?"

"সে ঝড় হয়েছিল ১৭৩৭ সালে। তার তিরিশ বছর আগে ঔরঙ্গজেব বাদশা মারা গেছেন, সারা দেশ জুড়ে নানা গোলমাল। কলকাতা শহরের সবে জন্ম হয়েছে। গোলমালের সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা এসে আস্তে আস্তে উঁকিয়ে বসছে। এই গোটা পুবদেশে তখন কলকাতা তাদের প্রধান বন্দর।"

"তারপর কী হল সার?"

"সে ঝড় হয়েছিল অক্টোবর মাসে। ওই সময়টাতেই বেশি ঝড় হয়—অক্টোবর আর নভেম্বর। সে ঝড়ের ঘা এসে লাগার আগেই বিশাল এক ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল এই ভাটির দেশে। বারো মিটার উঁচু সেই জলের দেওয়াল এসে ভেঙে পড়ল এখানে। কত বড় ঢেউ বুঝতে পারছ? ওইরকম একটা ঢেউ যদি এখন আসে, তা হলে তোমার দ্বীপ তো বটেই, আমাদের এই দ্বীপেও সবকিছু জলের তলায় চলে যাবে। এই ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে থাকলেও ডুবে যাব আমরা।"

"না।"

"হ্যাঁ, কমরেড, হ্যাঁ। কলকাতার কিছু ইংরেজ তখন এইসব মাপজোক করে সমস্ত লিখে রেখে দিয়েছিল। এতদূর পর্যন্ত জল উঠেছিল যে হাজার হাজার জন্তু জানোয়ার মারা পড়েছিল তাতে। সেই মরা জানোয়ারগুলো জলের টানে নদীর উজান বরাবর বহু দূর পর্যন্ত ভেসে গিয়েছিল। অনেক জায়গায় ডাঙার ভেতরে পর্যন্ত চলে গিয়েছিল সেইসব জীবজন্তুর লাশ। এমনকী নদী থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে ধানজমিতে, গ্রামের পুকুরের মধ্যে মরা বাঘ আর গণ্ডারের দেহ পাওয়া গিয়েছিল সেই ঝড়ের পরে। মাঠের পর মাঠ ছেয়ে গিয়েছিল মরা পাখির পালকে। আর সেই ঢেউ যখন এই ভাটির দেশের ওপর দিয়ে কলকাতার দিকে ধেয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় আরও একটা ঘটনা ঘটল—এক অকল্পনীয় ঘটনা।"

"কী ঘটল সার? কী ঘটল?"

"বিরাট এক ভূমিকম্প হল কলকাতায়।"

"সত্যি সত্যি?"

"সত্যি, দোস্ত। একেবারে খাঁটি সত্যি। সেই জন্যেই আরও এই ঝড়ের কথা মনে আছে লোকের। কোনও কোনও বৈজ্ঞানিকের ধারণা যে ঝড় আর ভূমিকম্পের মধ্যে কোনও একটা রহস্যজনক সম্পর্ক আছে। কিন্তু এই প্রথম দুটোই একসঙ্গে ঘটতে দেখা গেল।"

"তারপরে কী হল সার?"

"মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার বাড়ি ধসে পড়ল কলকাতায়। ইংরেজদের প্রাসাদ থেকে শুরু করে এমনি সাধারণ বাড়ি, কুঁড়েঘর, কিছুই রেহাই পেল না। ইংরেজদের যে গির্জা ছিল, তার চুড়োটা টুকরো টুকরো হয়ে এসে পড়ল মাটিতে। লোকে বলে শহরের একটা বাড়িরও নাকি চারটে গোটা দেওয়াল অক্ষত ছিল না। সেতু-টেতু সব উড়ে চলে গেল, জাহাজঘাটাগুলো জলের তোড়ে কোথায় ভেসে গেল, গুদামের ধানচাল কিচ্ছু বাকি রইল না, বারুদখানার বারুদও হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। দেশ-বিদেশের ছোটবড় জাহাজ সব নোঙর করা ছিল তখন নদীতে। তার মধ্যে ইংরেজদেরও দুটো জাহাজ ছিল—পাঁচশো টনের জাহাজ একেকটা। সেই জাহাজগুলোকে জল থেকে তুলে উড়িয়ে নিয়ে গেল ঝড়ে, গাছপালা ঘরবাড়ির ওপর দিয়ে উড়ে নদী থেকে আধ কিলোমিটার দূরে গিয়ে পড়ল সেগুলো। বিশাল বিশাল সব বজরা কাগজের ঘুড়ির মতো লাট খেতে খেতে উড়ে গেল। শোনা যায় সবসুদ্ধ কুড়ি হাজার জাহাজ, নৌকো, বজরা আর ডিঙি নষ্ট হয়েছিল ওই

একদিনে। যেগুলো টিকে ছিল, সেগুলি নিয়েও অদ্ভুত সব ঘটনার কথা শোনা যেতে লাগল।”

“কীরকম ঘটনা সার?”

“একটা ফরাসি জাহাজ ঝড়ের তোড়ে পাড়ের ওপর অনেকটা দূর পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল। কিন্তু জাহাজের মালপত্র সব নষ্ট হয়নি। ঝড়ের পরদিন, জাহাজের নাবিকদের মধ্যে যে ক'জন বেঁচেছিল তারা মাঠের মধ্যে দেখতে গেল—ওই ধ্বংসাবশেষ থেকে যদি কিছু উদ্ধার করা যায়। একজন মাল্লাকে পাঠানো হল জাহাজের খোলের ভেতর কী কী অক্ষত আছে গিয়ে দেখে আসতে। তারপর বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল, কিন্তু লোকটা আর বেরোয় না। বাইরে যারা ছিল, তারা চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করতে লাগল, কিন্তু কোনও সাড়া নেই। তখন আরেকজন লোককে পাঠানো হল। খোলের ভেতরে ঢুকে যাওয়ার পর তার কাছ থেকেও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তারপর আরও একটা লোক গেল, কিন্তু সেই একই ব্যাপার। বাইরে যারা ছিল তারা তখন খুব ভয় পেয়ে গেল। কেউ আর খোলের মধ্যে ঢুকতে রাজি হয় না। শেষে একটা আগুন জ্বালানো হল—অন্ধকার খোলের ভিতরে কী ব্যাপারটা হচ্ছে সেটা দেখার জন্য। আগুন যখন দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করল, সেই আলোয় দেখা গেল খোলের ভেতরটা জলে টইটম্বুর, আর তার মধ্যে সাঁতরে বেড়াচ্ছে এক প্রকাণ্ড কুমির। ওই তিনটে লোককে সেটাই মেরে ফেলেছে।

“এটা কিন্তু বানানো গল্প নয় কমরেড, এক্কেবারে খাঁটি সত্যি ঘটনা। এই সমস্ত বিবরণ লেখা নথিপত্র যত্ন করে রাখা আছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, যেখানে বসে দাস ক্যাপিটাল লিখেছিলেন মার্ক্স সাহেব।”

“ওরকম ঝড় তো আর হবে না, তাই না সার?”

বুঝতে পারলাম আমাদের এইসব নদীর খিদে কতটা হতে পারে সেটা আঁচ করার চেষ্টা করছে ফকির। ওর ছোট্ট মনটাকে শান্তি দিতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু সেরকম ছলনা করতে মন চাইল না। “সে কথা বলা যায় না বন্ধু। সত্যি কথা বলতে কী, ওরকম আবার ঘটবে। ঘটবেই। প্রচণ্ড ঝড় আসবে, ফুঁসে উঠবে নদী, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বাঁধ। এ শুধু সময়ের অপেক্ষা।”

“কী করে জানলেন সার?” মিনমিন করে জিজ্ঞেস করল ফকির।

“দেখো দোস্ত, সামনের দিকে চেয়ে দেখো। দেখো কত দুর্বল, পলকা আমাদের এই বাঁধ। এবার তার ওপারে জলের দিকে দেখো—দেখো কী বিপুল তার বিস্তার, কেমন ধীর শান্তভাবে বয়ে চলেছে। শুধু তাকিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে, আজ হোক কি কাল হোক, এই লড়াইয়ে নদীরই জয় হবে একদিন। কিন্তু শুধু চোখে দেখে যদি বিশ্বাস না হয়, তা হলে তোমাকে ভরসা করতে হবে তোমার কানের ওপর।”

“আমার কান?”

“হ্যাঁ। এসো আমার সঙ্গে।”

সিঁড়ি দিয়ে নেমে মাঠের ওপারে চললাম আমরা। লোকজন নিশ্চয়ই টেরিয়ে টেরিয়ে দেখছিল আমাদের দিকে এক লতপতে ধুতি পরে আমি চলেছি, রোদ আটকানোর জন্য ছাতা খুলে ধরেছি মাথায়, আর ছোট্ট ফকির ছেঁড়া হাফপ্যান্ট পরে আমার পায়ে পায়ে দৌড়ে চলেছে। সোজা বাঁধের কাছে গিয়ে আমার বাঁ কানটা মাটিতে চেপে ধরলাম আমি। “বাঁধের ওপর কান পাতো, তারপর মন দিয়ে শোনো। দেখি বুঝতে পারো কি না কী হচ্ছে।”

খানিক পরে ফকির বলল, “একটা আঁচড় কাটার শব্দ শুনতে পাচ্ছি সার। খুব আস্তে আস্তে হচ্ছে শব্দটা।”

“কিন্তু কীসের ওই শব্দটা?”

আরও খানিকক্ষণ কান পেতে শুনল ফকির। তারপর একটা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখ। “কাঁকড়া, তাই না সার?”

“ঠিক ধরেছ ফকির। সবাই শুনতে পায় না ওই আওয়াজ, কিন্তু তুমি পেলে। অগুন্তি

কাঁকড়া দিনরাত কুরে কুরে গর্ত করে চলেছে আমাদের এই বাঁধের ভেতর। এখন ভাবো এইসব কাঁকড়া আর জোয়ার, বাতাস আর ঝড়ের রাক্ষুসে খিদের সঙ্গে কতদিন পাল্লা দিতে পারবে আমাদের এই ঠুনকো মাটির বাঁধ? আর যখন এই বাঁধ ভেঙে যাবে তখন কার কাছে গিয়ে দাঁড়াব আমরা, কমরেড?”

“কার কাছে, সার?”

“কার কাছে? দেবদূতরাও না, মানুষও না, কেউই আমাদের ডাক শুনতে পাবে না সেদিন। আর জন্তু জানোয়ারদের কথা যদি বলো, তারাও শুনবে না আমাদের কথা।”

“কেন শুনবে না সার?”

“কারণটা কবি লিখে গেছেন, ফকির। কারণ ওই পশুরাও জেনে গেছে, এই ব্যাখ্যাত জগতে নেই আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য বা স্থিতিবোধ।”

আলোচনা

লুসিবাড়ি হাসপাতালের ট্রেনি নার্সদের জন্যও স্টাফ কোয়ার্টার্সের ব্যবস্থা আছে। ময়না সেখানেই থাকে। বাঁধের পাশেই একটা টানা লম্বা ব্যারাকের মতো বাড়িতে পরপর সব কোয়ার্টার্স। ট্রাস্টের সীমানার একপ্রান্তে মিনিট পাঁচেক লাগে গেস্ট হাউস থেকে হেঁটে যেতে।

বাড়িটার একেবারে শেষে ময়নার কোয়ার্টার্স। একটা বড় ঘর আর এক টুকরো উঠোন। দরজায় দাঁড়িয়ে কানাই আর পিয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল ময়না। সামনে যেতে হেসে নমস্কার করল হাতজোড় করে। তারপর উঠোনটার মধ্যে নিয়ে গেল ওদের। কয়েকটা ফোল্ডিং চেয়ার রাখা সেখানে ওদের জন্য।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে চারিদিকে একবার তাকাল পিয়া। "টুটুল কোথায়?"

"স্কুলে," ময়নার কাছ থেকে জেনে নিয়ে বলল কানাই।

"আর ফকির?"

"ওই যে, ওখানে।"

মাথা ঘুরিয়ে পিয়া দেখল ঘরের দরজার সামনেটায় উবু হয়ে বসে আছে ফকির। একটা তেলচিটে নীল পর্দায় আড়াল পড়ে গেছে খানিকটা। একবার মুখ তুলে তাকালও না ও। এমনকী চিনতে যে পেরেছে সেরকমও মনে হল না ওর হাবভাব দেখে। মাটির দিকে তাকিয়ে বসে বসে একটা কাঠি দিয়ে নকশা আঁকতেই লাগল। পরনে সেই একটা টি-শার্ট আর লুঙ্গি; কিন্তু ডিঙিতে দেখে যেটা মনে হয়নি, এখানে ওরই নিজের বাড়ির এই পরিবেশের মধ্যে সেগুলিকে কেমন রং-জ্বলা হতদরিদ্র চেহারার মনে হল পিয়ার। এমন একটা এড়িয়ে-যাওয়া গোমড়ানো ভাব নিয়ে বসেছিল ফকির যে মনে হল প্রচণ্ড চাপে পড়ে (ময়নার না প্রতিবেশীদের?) আজকে এখানে উপস্থিত থাকতে রাজি হয়েছে ও।

ফকিরের এই পরাজিত ভীত চেহারাটা বুকে শেলের মতো বিঁধল পিয়ার। যে লোকটা ওর প্রাণ বাঁচানোর জন্য এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল তার আবার কীসের ভয়? পিয়ার ইচ্ছে করছিল ফকিরের সামনে গিয়ে সোজা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে সহজ স্বাভাবিকভাবে কথা বলে ওর সঙ্গে। কিন্তু ওর ভঙ্গি দেখে মনে হল এখানে, ময়না আর কানাইয়ের উপস্থিতিতে, সেটা করলে ওর অস্বস্তি বাড়বে বই কমবে না।

কানাইও দেখছিল ফকিরকে। একান্তে ফিসফিস করে পিয়াকে বলল, "আমি ভেবেছিলাম শুধু টিয়াপাখিই ওইভাবে বসতে পারে।"

তখন পিয়া নজর করল, ও যেরকম ভেবেছিল সেরকম মেঝের ওপর বসে নেই ফকির, দরজার চৌকাঠটার ওপর উবু হয়ে বসে আছে ও, আর পাখি যেমন দাড়ের ওপর বসে, সেইভাবে পায়ের আঙুল দিয়ে আঁকড়ে রেখেছে কাঠটাকে।

ওদের কথাবার্তায় ফকিরের বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই দেখে অবশেষে পিয়া ঠিক করল ওর বউয়ের সঙ্গেই কথা বলবে ও। কানাইকে জিজ্ঞেস করল, "আমার জন্য একটু দোভাষীর কাজ করে দেবেন প্লিজ?"

কানাইয়ের মাধ্যমেই পিয়া ময়নাকে তার কৃতজ্ঞতা জানাল, তারপর বলল ফকির ওর জন্য যা করেছে তার জন্য ফকিরের পরিবারকে ও সামান্য কিছু উপহার দিতে চায়।

আগে থেকেই একতোড়া নোট গুছিয়ে নিয়ে এসেছিল পিয়া। বেল্টে বাঁধা ব্যাগ থেকে সেটা বের করতে করতে দেখল কানাই একটু পেছনে হেলে জায়গা করে দিচ্ছে, যাতে পাশের চেয়ার পর্যন্ত হাত বাড়িয়ে টাকাটা দিতে পারে পিয়া। ময়নাও একটা প্রত্যাশার হাসি মুখে নিয়ে একটু এগিয়ে বসেছে। বোঝাই যাচ্ছে ওরা দুজনেই আশা করে আছে পিয়া টাকাটা ময়নাকেই দেবে, ফকিরকে নয়। এক মুহূর্ত আগে পর্যন্ত পিয়াও সেরকমই ঠিক করেছিল, কিন্তু এখন টাকাটা হাতে নিয়ে ওর বিচারবুদ্ধি বিদ্রোহ করে উঠল—ওকে তো

নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে জল থেকে টেনে তুলেছিল ফকির, কাজেই এই টাকা ফকিরের হাতে দেওয়াটাই যুক্তিযুক্ত হবে। ফকির ওর জন্য যা কিছু করেছে তার পরে পিয়া ওর সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে পারে না যাতে মনে হয় ফকিরের কোনও অস্তিত্বই নেই। টাকাটা নিয়ে ও বউকে দেবে কি বাড়ির জন্য খরচ করবে সেটা একান্তই ওর ব্যাপার—ওর হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনও অধিকার তো পিয়ার নেই।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পিয়া, কিন্তু ময়নাও চট করে উঠে এসে ওর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল হাত পেতে। এইভাবে বাধা পাওয়ার পর তো পিয়ার আর কিছু করার থাকে না সেই অবস্থায় ওর পক্ষে যতটা সম্ভব শোভনভাবে ময়নার হাতেই টাকাটা তুলে দিল পিয়া।

"ময়না বলছে ওর স্বামীর তরফ থেকে এই উপহার নিয়ে ও খুব খুশি হয়েছে।"

পিয়া লক্ষ করল এই পুরো সময়টাই ফকির কিন্তু সেই একভাবে বসে রইল, একটুও নড়ল না—যেন এইভাবে অদৃশ্য মানুষের মতো থাকতেই ও অভ্যস্ত।

চেয়ারে ফিরে যেতে যেতে পিয়া শুনল ফকির কিছু একটা বলল, আর সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল ময়না।

"কী বলল ফকির?" ফিসফিস করে পিয়া জিজ্ঞেস করল কানাইকে।

"ও বলল এইরকম কিছুর জন্য টাকা নেওয়াটা ভাল দেখায় না।"

"আর ময়না কী জবাব দিল?"

"ময়না বলল, তা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই—ঘরে খাবার কিছু নেই, একটা পয়সাও নেই। শুধু কয়েকটা কাঁকড়া ছাড়া আর কিছু নেই।"

পিয়া কানাইয়ের মুখোমুখি ঘুরে বসে বলল, "দেখুন, ওদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে আমি নাক গলাতে চাই না, কিন্তু ব্যাপারটা শুধু আমার আর ময়নার মধ্যে থাকুক সেটাও চাই না আমি। ফকির কিছু বলে কিনা একটু দেখুন না। ওর সঙ্গেই কথা বলার দরকার আমার।"

"দেখি কী করতে পারি," বলল কানাই। চেয়ার ছেড়ে উঠে ও ফকিরের সামনে গেল। তারপর খানিকটা বন্ধুত্বের সুরে সহৃদয় গলায় একটু জোরে বলল, "হ্যাঁ গো ফকির, আমাকে চেনো তুমি? আমি মাসিমার ভাগনে, কানাই দত্ত।"

কোনও জবাব দিল না ফকির। কানাই আবার বলল, "আমি তোমার মাকে চিনতাম, তুমি জানো?"

এই কথায় ঘাড় তুলে তাকাল ফকির। আর এই প্রথম সামনাসামনি ফকিরের মুখটা দেখে অবাক হয়ে গেল কানাই। কী আশ্চর্য মিল কুসুমের চেহারার সঙ্গে চোয়ালের গড়ন, একটু ভেতরে ঢোকা ঘোলাটে চোখ, এমনকী চুলের ধরনটা আর ভাবভঙ্গিও পুরো ওর মা-র মতো। কিন্তু কথাবার্তা বলার কোনও উৎসাহ ওর মধ্যে দেখা গেল না। এক মুহূর্ত কানাইয়ের চোখাচোখি তাকিয়ে আবার মুখ ঘুরিয়ে নিল ও, কোনও জবাব দিল না প্রশ্নের। কানাই কটমট করে ওর দিকে একটু চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে আবার নিজের জায়গায় ফিরে এল।

"কী হল?" জিজ্ঞেস করল পিয়া।

"চেষ্টা করছিলাম, যদি কথা বলানো যায়। বললাম আমি ওর মাকে চিনতাম।"

"ওর মাকে? আপনি চিনতেন?"

"চিনতাম," বলল কানাই। "মারা গেছে ও। যখন ছেলেবেলায় এখানে এসেছিলাম তখন ওর মা-র সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার।"

"সেটা বললেন ওকে?"

"চেষ্টা করলাম," একটু হাসল কানাই। "কিন্তু আমাকে কোনও পাত্তাই দিল না ও।"

মাথা নাড়ল পিয়া। ওদের দুজনের মধ্যে কথা কী হয়েছে সেটা ও বুঝতে পারেনি, কিন্তু ফকিরের সঙ্গে কথা বলার সময় কানাইয়ের গলার দাক্ষিণ্যের সুরটুকু পিয়ার কান এড়ায়নি। এমন সুরে কথা বলছিল ও, যেন কোনও হাবাগবা চাকর বাকরের সঙ্গে কথা বলছে—খানিকটা মশকরার সঙ্গে একটু কর্তৃত্ব মেশানো একটা অদ্ভুত সুর। ফকির যে চুপ করেছিল তাতে একটুও অবাক হয়নি পিয়া—ওটাই ওর স্বাভাবিক আত্মরক্ষার কৌশল।

“যাক, ওকে আর ঘটানোর দরকার নেই, আমরা বরং এবার উঠি,” পিয়া বলল।

“আমি তো রেডি।”

“একটা কথা ওকে একটু বলে দিন তা হলে।”

পিয়া বলতে শুরু করল, আর ফকিরকে সেটা বাংলায় বলে দিতে লাগল কানাই। ভাল করে বুঝিয়ে পিয়া বলল ওই গর্জনতলার দহে যেরকম শুশুক আসে সেইরকম শুশুক নিয়ে ও গবেষণা করছে। গত দু'দিনে ও বুঝতে পেরেছে–আর ফকির সেটা আগে থেকেই জানে–যে দিনের বেলা জল যখন বাড়তে থাকে তখন শুশুকগুলো খাবারের খোঁজে দহটা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু কোন পথ দিয়ে কীভাবে ওরা চলাফেরা করে সেটা দেখতে আর বুঝতে চায় পিয়া। আর তার জন্য, ওর মনে হয়েছে, সবচেয়ে ভাল উপায় হল ফকিরকে নিয়ে আরেকবার ওই গর্জনতলায় ফিরে যাওয়া। এবার একটা বড় নৌকো নিয়ে যাবে ওরা, সম্ভব হলে একটা মোটরবোট; তারপর ওই দহটার কাছে গিয়ে নোঙর ফেলে শুশুকদের এই দৈনিক চলাচল লক্ষ করবে পিয়া। আর সে কাজে ফকির ওকে সাহায্য করবে। এই পুরো কাজটায় দিন কয়েক লাগবে–সব মিলিয়ে চার কি পাঁচদিন, কী দেখা যায় না যায় তার ওপরে নির্ভর করবে কদিন থাকতে হয়। খরচখরচা সব পিয়াই দেবে–নৌকোর ভাড়া, খাবার-দাবারের খরচ-টরচ সব–তা ছাড়াও এর জন্য একটা থোক টাকা পাবে ফকির, আর দিন প্রতি আরও কিছু টাকা দেবে পিয়া। আর সব যদি ভালয় ভালয় মেটে তা হলে একটা বোনাসও দেবে। সব মিলিয়ে মোটমাট তিনশো আমেরিকান ডলারের মতো রোজগার করতে পারবে ফকির।

পিয়া যেমন যেমন বলছিল সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করে যাচ্ছিল কানাই। শেষ কথাটা শুনে একটা হেঁচকি তোলার মতো আওয়াজ করে দু'হাতে মুখ ঢাকা দিল ময়না।

“টাকাটা কম বললাম?” একটু ব্যস্ত হয়ে পিয়া জিজ্ঞেস করল কানাইকে।

“কম বললেন? দেখলেন না ময়না কীরকম খুশি হয়েছে? ওদের পক্ষে একটা লটারি পাওয়ার মতো ব্যাপার এটা। আর টাকাটা সত্যি সত্যিই প্রয়োজন ওদের।”

“আর ফকির কী বলছে? ও কি একটা লঞ্চ-টঞ্চের ব্যবস্থা করতে পারবে?”

একটু চুপ করে শুনল কানাই। “ও বলছে, হ্যাঁ, এ কাজটা ও করবে। এক্ষুনি ও বেরিয়ে যাবে সব ব্যবস্থা করতে। তবে কোনও মোটরবোট এখানে নেই, ভটভটি দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে হবে আপনাকে।”

“সেটা কী জিনিস?”

“ডিজেলে চালানো নৌকোকে এখানে ভটভটি বলে,” কানাই বলল। “ইঞ্জিনের ভটভট আওয়াজের জন্য ওগুলোর এরকম নাম দেওয়া হয়েছে।”

“কীরকম নৌকো তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু একটা নৌকো জোগাড় করতে পারবে তো ও?” জিজ্ঞেস করল পিয়া।

“হ্যাঁ। কাল সকালেই একটা ভটভটি ও নিয়ে আসবে, আপনি দেখেশুনে নিতে পারবেন,” জবাব দিল কানাই।

“নৌকোর মালিককে ও চেনে তো?”

“হ্যাঁ। যার ভটভটি সে ওর বাবার মতো।”

ক্যানিং থেকে লঞ্চ ভাড়া করে ফরেস্ট গার্ড আর তার আত্মীয়ের সঙ্গে কী ঝামেলা হয়েছিল মনে পড়ল পিয়ার। জিজ্ঞেস করল, “আপনার কী মনে হয়, বিশ্বস্ত লোক তো?”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ,” বলল কানাই, “আসলে আমিও চিনি লোকটাকে। ওর নাম হল হরেন নস্কর। আমার মেসোরও অনেক কাজ করে দিত ও। নিশ্চিন্তে নিতে পারেন ওর নৌকো, আমি গ্যারান্টি দিতে পারি।”

“ঠিক আছে তা হলে।”

ফকিরের দিকে একপলক তাকিয়ে পিয়া দেখল হাসি ফুটেছে ওর মুখে। এক মুহূর্তের জন্য পিয়ার মনে হল ডাঙার গোমড়ামুখো বিরক্ত চেহারাটা সরে গিয়ে নৌকোর ওপরের

স্বাভাবিক মানুষটা যেন আবার ফিরে এসেছে। আবার জলের ওপর ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনায়, না বাড়িতে যে পাষাণভার চেপে থাকে বুকের ওপর তার থেকে দূরে যাওয়ার চিন্তায় ফকিরের মেজাজ খুশ হয়ে গেল সেটা অবশ্য বুঝতে পারল না পিয়া। তবে ফকিরের কাছে যার দাম আছে সেরকম কিছু করতে পেরেছে তাতেই ও খুশি।

"এই যে, শুনুন," কানাই কনুই দিয়ে একটু ঠেলা দিয়ে বলল পিয়াকে, "ময়না কী জিজ্ঞেস করছে আপনাকে।"

"কী জিজ্ঞেস করছে?"

"বলছে আপনার মতো এত উচ্চশিক্ষিত একজন বৈজ্ঞানিকের ওর স্বামীর মতো লোকের সাহায্য নেওয়ার কেন দরকার হয়—ও তো এক বিন্দুও লেখাপড়া জানে না।"

ভুরু কোঁচকাল পিয়া। বুঝতে পারল না; সত্যিই কি ময়না এতটাই তাচ্ছিল্য করে ওর স্বামীকে, নাকি ও আসলে বোঝাতে চাইছে ফকিরের বদলে অন্য কাউকে নিয়ে যাক পিয়া? কিন্তু অন্য কোনও লোককে তো নিয়ে যেতে চায় না পিয়া—বিশেষত সে যদি আবার ওই ফরেস্ট গার্ডের মতো লোক হয়।

পিয়া কানাইকে বলল, "আপনি প্লিজ ময়নাকে বলবেন, ওর স্বামী এখানকার নদীকে খুব ভাল চেনে। ফকিরের জ্ঞান তাই আমার মতো একজন বৈজ্ঞানিকের অনেক কাজে আসতে পারে।"

কথাটা ময়নাকে বুঝিয়ে দেওয়ার পর জবাবে ও এমন কিছু একটা তীক্ষ্ণ মন্তব্য করল যে হেসে ফেলল কানাই।

"হাসছেন কেন?" জিজ্ঞেস করল পিয়া।

"এত চালাক না মেয়েটা!" হাসতে হাসতেই বলল কানাই।

"কেন? কী বলল ও?"

"'জ্ঞান' আর 'গান' এই দুটো বাংলা শব্দ নিয়ে একটু মজা করল ও। বলল ওর স্বামীর জ্ঞানটা সত্যিই একটু বেশি থেকে গানটা আরেকটু কম থাকলে অনেক সুবিধা হত।"

অভ্যাস

কুসুম লুসিবাড়িতে আসায় আদৌ খুশি হয়নি নীলিমা। সেইদিন সন্ধেবেলা আমাকে বলল, "জানো, কুসুম আজকে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ওই মরিচঝাঁপির ঝামেলায় ট্রাস্টকে জড়াতে চাইছিল। ওরা চায় ওখানে কিছু চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে ট্রাস্ট ওদের সাহায্য করুক।"

"তুমি কী বললে?"

"আমি বলে দিয়েছি আমাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়," খুব ঠান্ডা দৃঢ় গলায় বলল নীলিমা।

"কেন সাহায্য করতে পারবে না ওদের?" প্রতিবাদ করলাম আমি। "ওরাও তো। মানুষ– অন্য সব জায়গার লোকেদের মতো ওদেরও অসুখ-বিসুখ করে, ওষুধপত্রের দরকার হয়।"

"এটা সম্ভব নয় নির্মল," বলল নীলিমা। "এই লোকগুলো দখলদার; ওই দ্বীপের জমি তো ওদের নয়, ওটা সরকারের সম্পত্তি। অমনি উড়ে এসে জুড়ে বসে পড়লেই হয়ে গেল? ওদের যদি ওখানে থাকতে দেওয়া হয়, লোকে তো ভাববে এই ভাটির দেশের যে-কোনও দ্বীপই এরকমভাবে ইচ্ছেমতো দখল করে নেওয়া যায়। জঙ্গলটার তা হলে কী হবে? পরিবেশের কথাটা কেউ একবার ভাববে না?"

জবাবে আমি বললাম, এই লুসিবাড়িও একসময় জঙ্গল ছিল–এই জমিও সরকারের সম্পত্তি ছিল এককালে। তা সত্ত্বেও স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটনকে তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য এখানে বসতি গড়ার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। এবং এত বছর ধরে নীলিমা বলে এসেছে উনি যা করেছেন সেটা খুবই প্রশংসাহ। তফাতটা তা হলে কী? এই উদ্বাস্তুদের স্বপ্নের মূল্য কি স্যার ড্যানিয়েলের স্বপ্নের মূল্যের চেয়ে কম? উনি ধনী সাহেব আর এরা ঘরছাড়া গরিব মানুষ বলে?

"কিন্তু নির্মল, স্যার ড্যানিয়েল যা করেছিলেন সে অনেককাল আগের কথা," বলল নীলিমা। একবার ভাবো এখন যদি সবাই সেরকম করতে শুরু করে কী হাল হবে এই গোটা জায়গাটার। জঙ্গলের কোনও চিহ্নই থাকবে না আর।"

"দেখো নীলিমা, ওই উদ্বাস্তুরা আসার আগেও কিন্তু মরিচঝাঁপিতে জঙ্গল সেভাবে ছিল না। দ্বীপের খানিকটা অংশ তো সরকারই ব্যবহার করছিল চাষবাসের জন্য। এখন পরিবেশের নামে যা বলা হচ্ছে সব বাজে কথা। যে মানুষগুলোর আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, তাদের ওই দ্বীপটা থেকে তাড়ানোর জন্যই শুধু বলা হচ্ছে এসব।"

"তা হতে পারে, কিন্তু ট্রাস্টকে আমি এই ব্যাপারে কিছুতেই জড়াতে দিতে পারি না," নীলিমা বলল। "আমাদের পক্ষে একটু বেশি ঝুঁকি হয়ে যাবে সেটা। হাসপাতালের রোজকার কাজ কীভাবে চলে তুমি তো জানো না, জানলে বুঝতে পারতে সরকারের সুনজরে থাকার জন্য কী করতে হয় আমাদের। নেতারা যদি একবার আমাদের পেছনে লাগে তা হলে তো হয়ে গেল। সেই ঝুঁকি আমি নিতে পারি না।"

এবার পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হল আমার কাছে। "তা হলে তুমি বলতে চাইছ যে বিষয়টার ন্যায়-অন্যায় নিয়ে তোমার কোনও বক্তব্য নেই। এই লোকগুলোকে তুমি সাহায্য করবে না, তার কারণ তুমি সরকারের সুনজরে থাকতে চাও।"

হাতদুটো মুঠো পাকিয়ে কোমরের কাছে রেখে দাঁড়াল নীলিমা। বলল, "তোমার কোনও বাস্তব ধারণা নেই নির্মল। তুমি এখনও তোমার ওই দুর্বোধ্য কবিতা আর বিপ্লবের ঝাপসা স্বপ্নের জগতেই বাস করছ। কিছু একটা সত্যি সত্যি গড়ে তোলা আর সেটার স্বপ্ন দেখা এক জিনিস নয়। কোনও জিনিস গড়ে তুলতে গেলে সবসময়েই বুঝেশুনে কিছু আপোশের রাস্তা বেছে নিতে হয়।"

নীলিমা যখন এই সুরে কথা বলে তখন সাধারণত আমি তর্কের মধ্যে আর যাই না। কিন্তু এবার ঠিক করলাম আমিও ছেড়ে কথা বলব না–"যে আপোশের রাস্তা তুমি নিয়েছ সেটা খুব

বুঝেশুনে বেছে নেওয়া বলে মনে হয় না আমার।”

আরও রেগে গেল নীলিমা। বলল, “নির্মল, একটা কথা আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই। তোমার জন্যেই কিন্তু আমরা প্রথম লুসিবাড়িতে এসেছিলাম, কারণ রাজনীতি করতে গিয়ে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলে তুমি, আর তারপর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে। আমার তো এখানে কিছুই ছিল না বাড়ির লোকজন না, বন্ধুবান্ধব না, চাকরিও না। কিন্তু আস্তে আস্তে আমি কিছু তো একটা গড়ে তুলেছি সত্যিকারের কিছু একটা, যেটা লোকের কাজে লাগছে, সামান্য হলেও যেটা মানুষের কিছু উপকারে আসছে। আর এতগুলো বছর ধরে তুমি শুধু বসে বসে আমার কাজের বিচার করে গেছ। কিন্তু এখন তো আমার কাজের ফল চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছ—এই হাসপাতালটা। আর এটাকে বাঁচানোর জন্য আমি কী করব যদি জিজ্ঞেস করো, তা হলে বলে রাখছি শোনো, মা তার বাচ্চাদের বাঁচানোর জন্য যেমন লড়াই করে, সেইভাবে শেষ পর্যন্ত লড়ে যাব আমি। এই হাসপাতালটার ভালমন্দ, এর ভবিষ্যৎ—এটাই তো আমার সব। তার কোনও ক্ষতি আমি হতে দেব না। এতদিন ধরে তোমার কাছে আমি খুব একটা কিছু চাইনি, কিন্তু এবার চাইছি—আমার একটাই অনুরোধ, মরিচঝাঁপির ব্যাপারটার মধ্যে তুমি জড়িয়ো না। আমি জানি সরকার ওদের থাকতে দেবে না ওখানে, আর এটাও জানি যারা যারা এর মধ্যে থাকবে তাদের কাউকে ওরা রেয়াত করবে না। তুমি যদি ওই উদ্বাস্তুদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ো, তা হলে আমার সারা জীবনের কাজ দিয়ে আমাকে তার মূল্য দিতে হতে পারে। এইটা মাথায় রেখো। এইটুকুই শুধু তোমার কাছে চাইছি আমি।”

আর কিছু বলার রইল না আমার। আমার চেয়ে বেশি তো আর কেউ জানে না কী ত্যাগ স্বীকার করেছে আমার জন্য ও। বুঝতে পারলাম, মরিচঝাঁপিতে গিয়ে সেখানকার বাচ্চাদের পড়ানোর স্বপ্ন শুধু আমার এ বুড়ো বয়সের ভীমরতি, অনিবার্য অবসরকে ঠেকিয়ে রাখার একটা ব্যর্থ চেষ্টা। বিষয়টা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করলাম আমি।

নতুন বছর এসে পড়ল—১৯৭৯—আর কিছুদিন পরেই হাসপাতালের জন্য চাঁদা তোলার কাজে আবার বেরিয়ে পড়ল নীলিমা। কলকাতার এক ধনী মাড়োয়ারি পরিবার একটা জেনারেটর দিতে রাজি হয়েছে; ওর এক মাসতুতো ভাই রাজ্য সরকারের মন্ত্রী হয়েছে, তার সঙ্গেও একবার দেখা করতে চায় নীলিমা। এমনকী মোরারজি দেশাই সরকারের এক বড় অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে একবার দিল্লিও যেতে হতে পারে। এত কিছু কাজ ওকে সামলাতে হবে।

নীলিমা যেদিন গেল, জেটি পর্যন্ত ওকে এগিয়ে দিতে গেলাম আমি। ঠিক নৌকোয় ওঠার মুখে ও বলল,”নির্মল, মরিচঝাঁপি নিয়ে যা বলেছি মনে রেখো। ভুলে যেয়ো না কিন্তু।”

নৌকো ছেড়ে দিল, আর আমিও ফিরে এলাম আমার পড়ার ঘরে। মাস্টারির কাজ মিটে গেছে, সময় কাটানোই এখন সমস্যা। বহু বছর পর আবার আমার খাতাটা খুললাম, ভাবলাম দেখি যদি কিছু লিখতে পারি। অনেকদিন ধরেই ভেবেছি একটা বই লিখব এই ভাটির দেশ নিয়ে—এত বছরে যা দেখেছি এখানে, যা কিছু জেনেছি জায়গাটার সম্পর্কে, সব থাকবে তাতে।

কয়েকদিন নিয়ম করে টেবিলটায় এসে বসলাম। বসে বসে দূরে রায়মঙ্গলের মোহনার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কত কথাই যে মনে এল। মনে পড়ল, যখন প্রথম এই লুসিবাড়িতে এলাম আমি, সূর্যাস্তের সময় পাখির ঝাঁকে অন্ধকার হয়ে যেত আকাশ। বহু বছর আর তত পাখি একসঙ্গে দেখি না। প্রথম যখন লক্ষ করলাম পাখির সংখ্যা কমে এসেছে, ভাবলাম হয়তো সাময়িক ব্যাপার, আবার পরে ফিরে আসবে ঝাঁকে ঝাকে। কিন্তু এল না। মনে পড়ল, একটা সময় ছিল যখন ভাটার সময় নদীর পাড়গুলো লাল হয়ে থাকত—চারদিকে থিকথিক করত লক্ষ লক্ষ কঁকড়া। সেই রং আস্তে আস্তে ফিকে হতে শুরু করল, এখন তো দেখাই যায় না আর। মনে মনে ভাবি গেল কোথায় সেই লক্ষ লক্ষ কঁকড়া? সেই পাখির ঝক?

বয়স মানুষকে মৃত্যুর চিহ্নগুলি চিনে নিতে শেখায়। হঠাৎ একদিনে সেগুলো দেখা যায়

না; অনেক বছর ধরে ধীরে ধীরে বোঝা যেতে থাকে তাদের উপস্থিতি। এখন আমার মনে হল সর্বত্র সেই চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি আমি—আমার মধ্যে শুধু নয়, এই গোটা জায়গাটায়, যেখানে তিরিশটা বছর আমি কাটিয়ে দিয়েছি। পাখিরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, মাছের সংখ্যা কমে আসছে, দিনে দিনে সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছে জমি। কতটুকু লাগবে এই গোটা ভাটির দেশটা জলের তলায় চলে যেতে? বেশি নয়—সমুদ্রের জলের স্তরের সামান্য একটুখানি হেরফেরই যথেষ্ট।

এই সম্ভাবনাটা নিয়ে যত ভাবতে লাগলাম, আমার মনে হতে লাগল খুব একটা সাংঘাতিক ক্ষতি কিছু হবে না সেরকম ঘটনা ঘটলে। এত যন্ত্রণার সাক্ষী এই দ্বীপগুলো—এত কষ্ট, এত দারিদ্র্য, এত বিপর্যয়, এত স্বপ্নভঙ্গ—এগুলো যদি আজকে হারিয়েও যায়, হয়তো মানবজাতির পক্ষে অকল্যাণকর হবে না সেটা।

তারপর মরিচঝাঁপির কথা মনে পড়ল আমার—যে জায়গাকে আমার মনে হচ্ছে কেবল চোখের জলে ভেজা, সেই একই দেশ তো কারও কারও কাছে সোনার সমান। কুসুমের গল্প মনে পড়ে গেল আমার—মনে পড়ল সেই দূর বিহারে ওর নির্বাসনের দিনগুলি, কেমন তখন ওরা এই ভাটির দেশে ফেরার স্বপ্ন দেখত, এই কাদামাটি এই জোয়ার-ভাটা কেমন ওদের মনকে টানত সেই কাহিনি মনে পড়ল। আরও বাকি যারা এসেছে মরিচঝাঁপিতে, কত কষ্ট সহ্য করেছে ওরা এখানে আসার জন্য, সেই কথাও মনে এল আমার। কীভাবে এই জায়গার প্রতি সুবিচার করতে পারি আমি? এমন কী লিখতে পারি এই দেশ সম্পর্কে আমি যা ওদের মনের টান আর ওদের স্বপ্নের সমান শক্তি ধরবে? কীরকম চেহারা হবে সে লাইনগুলোর? ঠিক করে উঠতে পারলাম না। আমি—নদীর মতো বহমান হবে কি সে লেখার গতি, না ছন্দোময় হবে জোয়ার-ভাটার মতো?

বইখাতা সব সরিয়ে রাখলাম আমি, ছাদে গিয়ে জলের দিকে তাকালাম। সেই মুহূর্তে আমার চোখে প্রায় অসহ্য লাগল ওই দৃশ্য। মনে হল দুই দিক থেকে দুই প্রচণ্ড টানে বুকটা ভেঙে যাচ্ছে আমার একদিকে আমার স্ত্রী, আরেকদিকে আমার বাগদেবী সেই নারী, যেরকম কেউ আগে আমার জীবনে কখনও আসেনি; একদিকে ধীর শান্ত দৈনন্দিন পরিবর্তনের জগৎ, আরেকদিকে বিপ্লবের মাতাল করা উত্তেজনা—একদিকে গদ্য, আরেকদিকে পদ্য।

ফিরে ফিরে মনে হতে লাগল, এই দ্বিধার কথা কল্পনা করে কি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছি। আমি? এইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অধিকার কি আমি কখনও অর্জন করেছি?

সেই মুহূর্তে সেই জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমি, যেখানে কবির কথায় আমরা নিজেদের বলি—

‘হয়তো বা বাকি থাকে কোনো ঢালুতে দাঁড়ানো বৃক্ষ, দ্রষ্টব্য দিনের পরে দিন, কিংবা কাল যেখানে হেঁটেছিলাম, সেই পথ, আর কোনো জট বাঁধা অভ্যাসের অদম্য সাধুতা—
বিদায়ে যা পরাঙ্মুখ, আমাদের ভক্ত সহবাসী।’

একটি সূর্যাস্ত

বিকেল ফুরিয়ে এসেছে। সূর্য ঢলে পড়েছে বিদ্যার মোহনায়। পিয়া ঠিক করল কানাইয়ের আমন্ত্রণের সুযোগটা নেবে একবার গেস্ট হাউসের ছাদে উঠে পড়ার ঘরের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ল ও।

"কে?" চোখ পিটপিট করতে করতে এসে দরজাটা খুলল কানাই। মনে হল একটা ঘোর থেকে যেন জেগে উঠেছে।

"ডিস্টার্ব করলাম?"

"না না, সেরকম কিছু না।"

"ভাবলাম একটু সূর্যাস্ত দেখি ছাদ থেকে।"

"গুড আইডিয়া—ভালই করেছেন চলে এসে।" হাতের বাঁধানো খাতাটা রেখে দিয়ে, পিয়ার সঙ্গে ছাদের পাঁচিলের ধারে এসে দাঁড়াল কানাই। শেষ বেলার সূর্যের আলোয় দূরে আকাশ আর মোহনায় তখন আগুন লেগেছে।

"অসাধারণ, তাই না?" জিজ্ঞেস করল কানাই।

"সত্যিই অসাধারণ।"

লুসিবাড়ির দ্রষ্টব্যগুলি এক এক করে পিয়াকে দেখাতে লাগল কানাই—ময়দান, হ্যামিলটনের কুঠি, হাসপাতাল, আরও এটা ওটা। দেখানো যখন শেষ হল ততক্ষণে ঘুরে ছাদের উলটোদিকটায় চলে এসেছে ওরা—সকালে যে রাস্তা ধরে গিয়েছিল, সেটার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। হাসপাতালের স্টাফ কোয়ার্টার্সগুলি সামনে চোখে পড়ছে। পিয়া বুঝতে পারল দু'জনেই ওরা ফকিরের বাড়ির ঘটনার কথা ভাবছে।

"কাজগুলো যে সব ঠিকঠাক হয়েছে আজকে, ভেবেই বেশ ভাল লাগছে আমার," পিয়া বলল।

"সব ঠিকঠাক হয়েছে মনে হয় আপনার?"

"হ্যাঁ, মনে হয়," বলল পিয়া। "অন্তত ফকির তো আবার যেতে রাজি হয়েছে। শুরুতে আমার বেশ সন্দেহই ছিল ও যাবে কিনা।"

"সত্যি কথা বলতে কী, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কী ভাবা উচিত," কানাই বলল। "এমন অদ্ভুত গোমড়া টাইপের ছেলে, কখন কী করবে বোঝা কঠিন।"

"কিন্তু বিশ্বাস করুন, যখন নৌকোয় থাকে তখন ও একেবারে অন্য মানুষ।"

"আপনি ঠিক জানেন, আপনার কোনও অসুবিধা হবে না ওর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে?"

জিজ্ঞেস করল কানাই। "বেশ কয়েকটা দিনের মামলা কিন্তু।"

"হ্যাঁ, জানি।" পিয়া বুঝতে পারছিল ফকিরের বিষয়ে কানাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই অদ্ভুত একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষত সকালের সেই নীরব ভর্ৎসনার ব্যাপারটা এখনও ভুলতে পারেনি কানাই। পিয়া আস্তে আস্তে বলল, "আমাকে ফকিরের মায়ের কথা বলুন না। কেমন মানুষ ছিলেন উনি?"

একটু ভাবল কানাই। "ফকির একদম ওর মায়ের চেহারাটা পেয়েছে," বলল অবশেষে। "কিন্তু আর কোনও মিল খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কুসুম ছিল টগবগে স্বভাবের মেয়ে, সবসময় হাসত, মজা করত। ফকিরের মতো একটুও নয়।"

"কী হয়েছিল ওনার?"

"সে অনেক লম্বা গল্প," জবাব দিল কানাই। "সবটা আমি জানিও না। এটুকু শুধু বলতে পারি, পুলিশের সঙ্গে একটা গণ্ডগোলে মারা গিয়েছিল ও।"

ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেল পিয়া। "কী করে?"

"একদল রিফিউজি এখানকার একটা দ্বীপ দখল করে বসেছিল—ও-ও তাদের সঙ্গে ছিল। কিন্তু সে জমির মালিকানা ছিল সরকারের। ফলে গোলমাল বাধল, আর বহু লোক মারা গেল। ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৭৯ সালে ফকিরের বয়স তখন খুব বেশি হলে পাঁচ কি ছয়। ওর

মা মারা যাওয়ার পরে হরেন নস্কর ওকে এনে মানুষ করে। হরেনই ওর বাবার মতো।”

“মানে ফকিরের জন্ম এখানে নয়?”

“না। ওর জন্ম হয়েছিল বিহারে,” বলল কানাই। “ওর বাবা-মা ওখানে থাকত তখন। তারপর ওর বাবা মারা যাওয়ার পর ওর মা ওকে নিয়ে এখানে চলে আসে।”

পিয়ার মনে পড়ল কল্পনায় ফকিরের পরিবারের কীরকম ছবি দেখেছিল ও—কীরকম দেখেছিল ওর বাবা-মা-র চেহারা, অনেক ভাইবোন। নিজের অন্তদৃষ্টির অভাবে নিজেরই খুব লজ্জা লাগল ওর। “এই একটা ব্যাপারে তা হলে ফকির আর আমার একটু মিল আছে,” বলল পিয়া।

“কী ব্যাপারে।”

“মাকে ছাড়া বড় হয়ে ওঠা।”

“আপনারও কি ছোটবেলায় মা মারা গিয়েছিলেন?” জিজ্ঞেস করল কানাই।

“ওর মতো অতটা ছোট ছিলাম না। আমার বারো বছর বয়সে মারা যান, আমার মা। ক্যানসার হয়েছিল। আমার অবশ্য মনে হয় তার অনেক আগে থেকেই মাকে হারিয়েছিলাম আমি,” পিয়া বলল।

“কেন?”

“কারণ আমাদের থেকে—মানে আমার বাবা আর আমার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল মা। ডিপ্রেশনে ভুগত। আর যত দিন গেছে অসুখটা বাড়তেই থেকেছে।”

“আপনার নিশ্চয়ই খুব কষ্টে কেটেছে সেই সময়টা?”

“মায়ের থেকে বেশি নয়,” পিয়া বলল। “মা কেমন ছিল জানেন, খানিকটা যেন অর্কিডের মতো, দুর্বল অথচ সুন্দর, অনেক অনেক লোকের যত্ন আর ভালবাসার ওপর নির্ভরশীল। মা যে ধরনের মানুষ ছিল, তাতে বাড়ি থেকে এতটা দূরে না গেলেই পারত। আমেরিকায় তো মা-র কিছুই ছিল না—বন্ধুবান্ধব না, কাজের লোকজন না, চাকরি না, নিজস্ব কোনও জীবনই ছিল না। ওদিকে বাবা ছিল যাকে বলে এক্কেবারে খাঁটি প্রবাসী—উদ্যমী, পরিশ্রমী, সফল মানুষ। নিজের কেরিয়ার নিয়েই ব্যস্ত সবসময়। আর আমি ব্যস্ত আমার স্বাভাবিক ছেলেমানুষি খেলাধুলো পড়াশোনা নিয়ে। আমার মনে হয় একটা হতাশার মধ্যে আস্তে আস্তে তলিয়ে যেতে শুরু করেছিল মা। তারপর একটা সময় এসে নিজেই হাল ছেড়ে দিয়েছিল।”

ওর হাতের ওপর হাত রেখে একটু চাপ দিল কানাই। “খুব খারাপ লাগছে আমার।”

কানাইয়ের কথার সুরের মধ্যে এমন কিছু একটা ছিল যেটা খুব অবাক করল পিয়াকে। ওকে সবসময় মনে হয়েছে ভীষণ আত্মকেন্দ্রিক, অন্যদের ব্যাপার নিয়ে কখনওই মাথা ঘামায় না। কিন্তু এখন ওর গলায় যে সহানুভূতির সুর সেটা তো আন্তরিক বলেই মনে হল।

একটু হেসে পিয়া বলল, “ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। আপনি বলছেন আমার জন্য আপনার খারাপ লাগছে, কিন্তু ফকিরের জন্য তো আপনার বিশেষ সহানুভূতি আছে বলে মনে হচ্ছে না। অথচ আপনি ওর মাকে চিনতেন। কেন বলুন তো?”

কথাটা শুনে শক্ত হয়ে গেল কানাইয়ের চোয়াল, তারপর একটু বাঁকা সুরে হেসে উঠল ও। বলল, “ফকিরের কথা যদি বলেন, তা হলে আমি বলব আমার সহানুভূতি ওর বউয়ের জন্যই বেশি।”

“তার মানে?”

“আজ সকালে ময়নার জন্য একটুও খারাপ লাগেনি আপনার?” জিজ্ঞেস করল কানাই। “একবার ভাবুন তো, ওরকম একটা লোকের সঙ্গে জীবন কাটানো কীরকম কঠিন ব্যাপার। তার ওপরে রুটিরুজি বলুন, মাথার ওপরে একটা ছাদ বলুন, সেসব কথাও তো ওকেই ভাবতে হয়। কী অবস্থা থেকে ও উঠে এসেছে কল্পনা করুন একবার ওর জাতপাতের সমস্যা, ওর বাড়ির পরিবেশ তার মধ্যে থেকেও যে আজকের দুনিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য কী করা দরকার সেটা মাথা খাঁটিয়ে বের করেছে ও, সেই ব্যাপারটা প্রশংসাজনক নয়? আর শুধু যেনতেনভাবে বেঁচে থাকা নয়, ভালভাবে বাঁচতে চায় ও, নিজেকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে

চায়।”

মাথা নাড়ল পিয়া। “বুঝেছি।” এতক্ষণে ও উপলব্ধি করল, কানাইয়ের পক্ষে এই লুসিবাড়ির মতো জায়গায় এসে ময়নার মতো একজন মেয়ের দেখা পাওয়াটা খুবই ভরসার কথা–নিজের জীবনে যে পথ কানাই বেছে নিয়েছে, ময়নার গোটা অস্তিত্বটা ওর কাছে যেন সেই পথেরই যৌক্তিকতা প্রমাণ করছে। কানাইয়ের পক্ষে বিশ্বাস করা খুবই জরুরি যে ওর নিজস্ব মূল্যবোধগুলো আসলে সমদর্শী, সংস্কারমুক্ত, গুণবাদী। ও মনে মনে ভাবতে পারলে ভরসা পাবে যে, “আমি নিজের জন্য যা চাই অন্য সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে তার আসলে কোনও তফাত নেই। বড়লোক গরিবলোক নির্বিশেষে যে কারওই সামান্য একটু উদ্যম আছে, একটু ক্ষমতা আছে, সে-ই চায় এই পৃথিবীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে–ময়নাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।” পিয়া বুঝতে পারল, যে আয়নায় কানাই নিজেকে দেখছে, ফকিরের মতো মানুষ সেখানে গাড়ির রিয়ারভিউ মিররের ওপর একটা ছায়া ছাড়া কিছু নয়, দ্রুত মিলিয়ে যাওয়া একটা উপস্থিতি মাত্র, চির-অতীত লুসিবাড়ি থেকে উঠে আসা ভূতের মতো। কিন্তু এটাও আন্দাজ করতে পারে পিয়া যে কানাই যে দেশে বাস করছে, সমস্ত নতুনত্ব এবং কর্মচাঞ্চল্য সত্ত্বেও এরকম অসংখ্য অদেখা ছায়াশরীরের উপস্থিতি সেখানে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না, যত জোরেই চিৎকার করা যাক না কেন, তাদের ফিসফিসে কণ্ঠস্বর পুরোপুরি চাপা দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

“আপনি সত্যিই ময়নাকে পছন্দ করেন, তাই না?” পিয়া জিজ্ঞেস করল।

“ঠিক কথাটা যদি জানতে চান, তা হলে বলব ওকে শ্রদ্ধা করি আমি,” জবাব দিল কানাই।

“সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু ফকিরের জায়গা থেকে যদি দেখেন, তা হলে ওর চেহারাটা হয়তো একটু অন্যরকম দেখাবে।”

“কী বলতে চাইছেন আপনি?”

“নিজেকে জিজ্ঞেস করেই দেখুন না,” বলল পিয়া। “ও যদি আপনার স্ত্রী হত তা হলে কেমন লাগত আপনার?”

হো হো করে হেসে উঠল কানাই। তারপর আবার যখন কথা বলতে শুরু করল তখন ওর গলার সুরের চটুলতায় দাঁতে দাঁত ঘষল পিয়া। “ময়না যে ধরনের মেয়ে তাতে ওর সঙ্গে ছোটখাটো একটা এক্সাইটিং সম্পর্কের কথা ভাবা চলতে পারে,” বলল কানাই। “মানে যাকে আমরা বলতাম ফ্লিং। কিন্তু তার থেকে বেশি কিছু নয়। সেরকম ক্ষেত্রে আপনার মতো কোনও মহিলাই আমার বেশি পছন্দের।”

হাতটা তুলে কানের দুলে আস্তে আস্তে আঙুল বোলাল পিয়া, খানিকটা যেন ভরসা পাওয়ার জন্য। তারপর একটু সতর্ক হাসি হেসে বলল, “আপনি কি ফ্লার্ট করছেন আমার সঙ্গে, কানাই?”

“কী মনে হয়?” একগাল হেসে কানাই পালটা প্রশ্ন করল।

“আমার অভ্যেস চলে গেছে,” বলল পিয়া।

“তা হলে তো সে ব্যাপারে কিছু করা উচিত আমাদের, তাই না?”

নীচের থেকে ভেসে আসা একটা চিৎকারে কথা থেমে গেল ওর। “কানাইবাবু!”

পাঁচিলের ওপর থেকে ঝুঁকে ওরা দেখল নীচের রাস্তার ওপর ফকির দাঁড়িয়ে রয়েছে। পিয়াকে দেখতে পেয়ে চোখ নামাল ও, মাটিতে পা ঘষতে লাগল আস্তে আস্তে। তারপর কানাইয়ের উদ্দেশ্যে দু'-একটা কী কথা বলেই হঠাৎ ঘুরে বাঁধের দিকে হেঁটে চলে গেল।

“কী বলল ও?” জিজ্ঞেস করল পিয়া।

“আপনাকে জানিয়ে দিতে বলল যে হরেন নস্কর কালকে ওর ভটভটি নিয়ে এখানে আসবে। আপনি গিয়ে দেখে নিতে পারেন। আর যদি মনে হয় ওটায় কাজ হবে, তা হলে পরশু সকালে রওয়ানা হয়ে যেতে পারেন, কানাই বলল।

“চমৎকার,” বলে উঠল পিয়া। “আমি বরং গিয়ে আমার জিনিসপত্রগুলি গুছিয়ে গাছিয়ে নিই।”

পিয়া লক্ষ করল মাঝপথে বাধা পড়ায় ও নিজে যতটা খুশি হয়েছে, ঠিক ততটাই বিরক্ত হয়েছে কানাই। ভুরুটা একটু কুঁচকে ও বলল, "আমারও মনে হয় এবার গিয়ে মেসোর খাতাটা নিয়ে বসা উচিত।"

হরেন যদি না থাকত, আবার হয়তো আমি আমার পুরনো অভ্যাসের চক্রেই ফিরে যেতাম; প্রবল ভালবাসায় যে অভ্যাসগুলো আঁকড়ে ধরে থাকে আমাকে, ছেড়ে যেতে চায় না কিছুতেই, তাদের মধ্যে থেকেই হয়তো সুখে কাটিয়ে দিতাম বাকি দিনগুলি। কিন্তু একদিন ঠিক খুঁজতে খুঁজতে এসে উপস্থিত হল হরেন। বলল, "সার, পৌষমাস তো শেষ হয়ে এল। বনবিবির পুজো তো এসেই গেল প্রায়। কুসুম আর ফকির একদিন গর্জনতলা যাবে বলছিল, তো আমি বলেছি ওদের নিয়ে যাব। কুসুম বলল আপনাকে একবার জিজ্ঞেস করতে, যদি যান।"

"গর্জনতলা? সেটা আবার কোথায়?"

"জঙ্গলের অনেক ভেতরে। ছোট একটা দ্বীপ। কুসুমের বাবা সেখানে বনবিবির একটা মন্দির বানিয়েছিল, তাই ও একবার যেতে চায় ওখানে।"

এ আরেক নতুন সমস্যা। এর আগে সব সময়ই যে-কোনও ধর্মীয় ব্যাপার থেকে আমি সাবধানে দূরে সরে থেকেছি। তা যে শুধু ধর্ম বিশ্বাসকে ভ্রান্ত চেতনা বলে মনে করি সে জন্যই নয়, সেই বিশ্বাস কত ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে দেশ বিভাগের সময় সেটা নিজের চোখে দেখেছি বলেও বটে। আর হেডমাস্টার হিসেবেও আমার মনে হয়েছে, হিন্দুই বল বা মুসলমানই বল, কোনও ধর্মের সঙ্গেই না জড়ানোটা আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। একটু আশ্চর্যের মনে হলেও, সেই কারণেই কখনও বনবিবির পুজো দেখিনি আমি, আর এই দেবীটি সম্পর্কে কোনও আগ্রহও কখনও হয়নি আমার। কিন্তু এখন তো আমি আর হেডমাস্টার নেই, কাজেই সেই নিয়মটাও আর খাটে না।

কিন্তু নীলিমা যে বারণ করে গেল, তার কী হবে? ও যে বার বার করে আমাকে মরিচঝাঁপি থেকে দূরে সরে থাকতে অনুরোধ করে গেল? নিজেকে বোঝালাম, এর সঙ্গে তো সেভাবে দেখতে গেলে মরিচঝাঁপির কোনও সম্পর্ক নেই, কারণ আমরা তো যাচ্ছি অন্য একটা দ্বীপে। "ঠিক আছে হরেন, আমি যাব গর্জনতলা। কিন্তু মনে রেখো, মাসিমার কানে যেন একটা কথাও না যায়।"

"সে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন সার।"

পরদিন ভোরবেলা হরেন এল, আর আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

শেষ যেবার মরিচঝাঁপি এসেছিলাম তারপর কয়েকমাস কেটে গেছে। সেখানে পৌঁছতেই চোখে পড়ল অনেক পরিবর্তন হয়েছে এর মধ্যে : আগের সেই উদ্দীপনা কেটে গেছে, একটা ভীতি আর সন্দেহর পরিবেশ যেন চেপে ধরেছে দ্বীপটাকে। একটা কাঠের ওয়াচ টাওয়ার বানানো হয়েছে, উদ্বাস্তুরা ছোট ছোট দলে নদীর পাড় ধরে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে। নৌকো পাড়ে ভিড়তেই বেশ কয়েকজন লোক এসে ঘিরে ধরল আমাদের। তারপর নানা জেরা। আপনাদের পরিচয় কী? কী দরকারে এসেছেন এখানে?

একটু অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যেই গিয়ে পৌঁছলাম কুসুমের কুঁড়েতে। দেখলাম ও-ও একটু মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছে। বলল কয়েক সপ্তাহ ধরেই নানাভাবে আরও চাপ দিতে শুরু করেছে সরকার। কয়েক জন অফিসার, পুলিশের লোকজন ঘুরে গেছে এর মধ্যে। দ্বীপ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য উদ্বাস্তুদের প্রথমে নানা রকম লোভ দেখিয়েছে। তাতে কাজ না হওয়ায় তারপর সরাসরি হুমকি দিয়েছে। যদিও হটেনি উদ্বাস্তুরা, কিন্তু একটা ভীতির পরিবেশ তৈরি হয়েছে : কেউ জানে না কী হবে এবার।

বেলা হয়ে গিয়েছিল, তাই পা চালিয়ে চললাম আমরা। কুসুম আর ফকির বনবিবি এবং তার ভাই শা জঙ্গলির ছোট ছোট মূর্তি গড়ে এনেছিল মাটি দিয়ে, সেগুলিকে হরেনের নৌকোয় তোলা হল। তারপর দ্বীপ ছেড়ে রওয়ানা হলাম আমরা।

নদীতে বেরিয়ে পড়বার পর স্রোতের টানে সবার মেজাজ ভাল হয়ে গেল। চারপাশে আরও অনেক নৌকো দেখতে পেলাম, সবাই কোথাও না কোথাও যাচ্ছে। পুজো দিতে।

কয়েকটা নৌকোয় দেখলাম কুড়ি-ত্রিশজন পর্যন্ত লোক আছে। সুন্দর রং করা বনবিবি আর শা জঙ্গলির বিশাল বিশাল মূর্তি নিয়ে যাচ্ছে তারা, সঙ্গে গানের লোকজন আর ঢাকঢোলও আছে দেখলাম।

আমাদের নৌকোয় শুধু আমরা চারজন—হরেন, ফকির, কুসুম আর আমি।

"তোমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে এলে না কেন হরেন? তারা সব কোথায়?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"ওরা সব আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেদের সঙ্গে গেছে," কেমন একটু মিনমিন করে জবাব দিল হরেন। "ওদের নৌকোটা বড়।"

একটা মোহনায় এসে পৌঁছলাম আমরা। মোহনা পেরোতে পেরোতে লক্ষ করলাম কোনও মন্দির অথবা ঠাকুর দেবতার মূর্তি-টুর্তির সামনে এলে মানুষ যেমন করে, হরেন আর কুসুম সেই রকম ভক্তিভরে বারবার নমস্কার করছে। ফকির দেখলাম খুব মন দিয়ে লক্ষ করছে, আর ওদের দেখাদেখি ও-ও হাতদুটো একবার কপালে ঠেকাচ্ছে, আরেকবার বুকের কাছে নিয়ে আসছে।

"কী ব্যাপার বল তো?" একটু আশ্চর্য হয়েই জিজ্ঞেস করলাম আমি। "কী দেখতে পেলে তোমরা? এখানে তো কোনও মন্দির-টন্দির নেই? আমি তো চারিদিকে জল ছাড়া আর কিছু দেখছি না।"

হেসে উঠল কুসুম। প্রথমে তো কিছুতেই বলবে না, তারপর একটু সাধাসাধি করতে শেষে বলল, ভাটির দেশকে ভাগ করার জন্য বনবিবি যে গণ্ডী টেনে দিয়েছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে, ওই মাঝ-মোহনায় আমরা সেই গণ্ডী পেরোলাম। অর্থাৎ মানুষদের জগৎ আর দক্ষিণরায় এবং তার চেলা চামুণ্ডা সব দৈত্য দানবদের জগতের মাঝের সীমানাটা পেরিয়ে এলাম আমরা। ভেবে একটু শিউরে উঠলাম যে আমার কাছে একটা সত্যিকারের কাটাতারের বেড়া যেরকম, কুসুম আর হরেনের কাছে এই কাল্পনিক রেখা ঠিক সেরকমই বাস্তব।

আমার চোখেও এখন যেন চারিদিকের দৃশ্য সব নতুন ঠেকতে লাগল—সবকিছুই মনে হতে লাগল অপ্রত্যাশিত, বিস্ময়কর। সময় কাটানোর জন্য একটা বই নিয়েছিলাম সঙ্গে, কিন্তু এখন মনে হল একদিক থেকে দেখতে গেলে তো এই ভূদৃশ্যের সঙ্গে বইয়ের খুব একটা তফাত নেই—এও তো ঠিক সেই পর পর সাজানো পাতার মতো, কিন্তু একটা পাতা আরেকটার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই বই মানুষ খোলে নিজের নিজের রুচি এবং শিক্ষা, স্মৃতি এবং সাধ অনুযায়ী : একজন ভূতাত্ত্বিকের চোখের সামনে তার এক রকম পাতা খুলে যায়, নৌকোর মাঝি দেখতে পায় অন্য এক পাতা, জাহাজের পথপ্রদর্শক বা শিল্পীর জন্যেও সে রকম আলাদা আলাদা পাতা রয়েছে এ বইয়ে। কখনও কখনও সে পাতার লাইনগুলির নীচে দাগ টানা থাকে, যে দাগ কিছু মানুষ দেখতেই পায় না, আবার কিছু মানুষের কাছে সে দাগ প্রত্যক্ষ বাস্তব, বৈদ্যুতিক তারের মতোই মারাত্মক।

আমার মতো একজন শহুরে লোকের কাছে এই ভাটির দেশের জঙ্গল ছিল শুধুমাত্র এক শূন্যতা, যেখানে সময় স্থির হয়ে আছে। এখন আমি বুঝতে পারলাম, সে ছিল আমার চোখের ভুল। আসল ঘটনা ঠিক তার উলটো। সময়ের চাকা এখানে এত দ্রুত ঘুরছে যে তা চোখে দেখাই যায় না। অন্য জায়গায় একটা নদীর গতিপথ বদলাতে কয়েক দশক লাগে, কখনও কখনও কয়েকশো বছর পর্যন্ত লেগে যায়; এক যুগ লেগে যায় একটা দ্বীপ গড়ে উঠতে। কিন্তু পরিবর্তনই হল ভাটির দেশের ধর্ম। এক এক সপ্তাহে এখানে নদীর খাত বদলায়, দিনে দিনে গড়ে ওঠে বা মিলিয়ে যায় গোটা দ্বীপ। অন্য জায়গায় নতুন করে একটা জঙ্গল তৈরি হতে কয়েক শতক, এমনকী কয়েক হাজার বছর পর্যন্ত লেগে যায়, কিন্তু এখানে মাত্র দশ কি পনেরো বছরে নেড়া একটা দ্বীপ ঢেকে যায় ঘন বাদাবনে। এরকম কি হতে পারে, যে পৃথিবীর ছন্দটাই অনেক দ্রুত হয়ে গেছে এখানে এসে? আর সেইজন্যই এত তাড়াতাড়ি এখানে ঘটছে সমস্ত কিছু?

রয়্যাল জেমস অ্যান্ড মেরি নামের সেই বিলিতি জাহাজের কথা মনে পড়ে গেল আমার।

১৬৯৪ সালে সেই জাহাজ এই ভাটির দেশের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। রাতের অন্ধকারে এক চড়ায় ধাক্কা খেয়ে বহু মাস্তুলবিশিষ্ট সেই বিশাল সমুদ্রপোত তলিয়ে গেল জলে। ক্যারিবিয়ান সাগর কি ভূমধ্যসাগরের শান্ত জলে যদি এই দুর্ঘটনা ঘটত, তা হলে কী হত? সাগরতলের প্রাণী এবং উদ্ভিদে নিশ্চয়ই ছেয়ে যেত সে ধ্বংসাবশেষ এবং সেই অবস্থাতেই রয়ে যেত শত শত বছর। ডুবুরি আর অভিযাত্রীরা নিশ্চয়ই সেখানে নেমে খুঁজে বেড়াত হারিয়ে যাওয়া ধনরত্ন। কিন্তু এখানে? মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সেই বিশাল জাহাজটাকে স্রেফ হজম করে ফেলল এই ভাটির দেশ। এতটুকু চিহ্নও আর রইল না কোথাও।

এটাই এরকম একমাত্র ঘটনা নয়। স্মৃতির পথে পিছু হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ল এমন অসংখ্য প্রাচীন জাহাজের সলিল সমাধি ঘটেছে এই ভাটির দেশের নদী-খাঁড়িতে। সেই ১৭৩৭-এর ভয়ংকর ঝড়ে তো দু'ডজনেরও বেশি জাহাজডুবি হয়েছিল এখানে। আর ১৮৮৫-তে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্টিম নেভিগেশন কোম্পানির গর্ব সেই দুই স্টিমার, আর্কট আর মাহরাট্টা তো এখানেই তলিয়ে গিয়েছিল জলে। আর ১৮৯৭-এ সিটি অব ক্যান্টারবেরির ডুবে যাওয়ার ঘটনাই বা ভুলি কী করে? কিন্তু সেসব দুর্ঘটনার জায়গায় গেলে কিছুই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না এখন। এই হিংস্র স্রোতের করাল গ্রাস থেকে কোনও কিছুরই কোনও ছাড় নেই; সব কিছুই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে শেষ পর্যন্ত মিহি পলির চেহারা নেয়, রূপান্তর ঘটে পরিণত হয় নতুন কোনও পদার্থে।

মনে হল যেন গোটা ভাটির দেশটাই কবির কণ্ঠে বলছে : "জীবন যাপিত হয় রূপান্তরে।"

মরিচঝাঁপিতে এখন বিকেল। দ্বীপের এই ওয়ার্ডের উদ্বাস্তুদের মিটিং থেকে এক্ষুনি ফিরল কুসুম আর হরেন। গুজব যা শোনা গিয়েছিল সেটা সত্যি। নদীর অন্য পারে যে গুণ্ডাবাহিনী জড়ো হয়েছে ওদেরই এখানে নিয়ে আসা হবে উদ্বাস্তুদের তাড়ানোর জন্য। কিন্তু সে আক্রমণ শোনা গেল খুব সম্ভবত কাল শুরু হবে। আরও কয়েক ঘণ্টা সময় হাতে আছে আমার।

রাতের খাবার দেখে পিয়ার মনে হল ওর খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাস সম্পর্কে ময়নাকে কেউ কিছু বলেছে। সাধারণ ভাত আর মাছের ঝোল ছাড়াও এ বেলা ময়না নিয়ে এসেছে খানিকটা আলুসেদ্ধ আর দুটো কলা। ভাল লাগল পিয়ার। হাত জোড় করে ময়নাকে ধন্যবাদ জানাল ও।

ময়না চলে যাওয়ার পর পিয়া কানাইকে জিজ্ঞেস করল ও কি এ ব্যাপারে ময়নাকে কিছু বলেছে? মাথা নাড়ল কানাই : "না তো।"

"তা হলে নিশ্চয়ই ফকির।" সাগ্রহে আরও এক হাতা আলুসেদ্ধ তুলে নিল পিয়া। "এখন শুধু একটু ওভালটিন থাকলেই সোনায় সোহাগা হত।"

"ওভালটিন?" আশ্চর্য হয়ে প্লেট থেকে চোখ তুলে তাকাল কানাই। "আপনি ওভালটিন ভালবাসেন?" মাথা নেড়ে পিয়া হ্যাঁ বলাতে হাসতে শুরু করল ও। "মার্কিন দেশেও আজকাল লোকে ওভালটিন খাচ্ছে নাকি?"

"এই অভ্যাসটা আসলে দেশ থেকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল আমার বাবা মা," জবাব দিল পিয়া। "স্টক ফুরোলে ওখানকার ইন্ডিয়ান দোকান থেকে কিনে নিত। আর আমি পছন্দ করি কারণ জিনিসটা সঙ্গে রাখাও সহজ, আর জলে জলে ঘোরার সময় বানিয়ে খেয়ে নিতেও কোনও ঝামেলা নেই।"

"তার মানে আপনার ওই ডলফিনদের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াবার সময় আপনি ওভালটিন খেয়েই কাটান?"

"কখনও কখনও।"

প্লেট ভরে ভাত ডাল আর হেঁচকি তুলে নিতে নিতে দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়াল কানাই। "এই প্রাণীগুলোর জন্যে অনেক কষ্ট করেন আপনি, না?"

"আমি ঠিক সেভাবে দেখি না ব্যাপারটাকে।"

"আপনার এই জন্তুগুলো কি খুব ইন্টারেস্টিং?" জিজ্ঞেস করল কানাই। "মানে, ওদের নিয়ে চর্চা করার জন্যে আগ্রহ হতে পারে লোকের?"

"আমি তো যথেষ্টই ইন্টারেস্ট পাই," পিয়া বলল। "আর অন্তত একটা কারণ আমি বলতে পারি যাতে আপনার মনেও একটু আগ্রহ জাগতে পারে।"

"বলুন, শুনছি," জবাব দিল কানাই। "সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছি প্ররোচিত হইবার জন্য। বলুন, কী সেই কারণ?"

"একেবারে প্রথম দিকে যে জায়গাগুলোতে এই জাতীয় শুশুকের নমুনা পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলির মধ্যে একটা হল কলকাতা," পিয়া বলল। "একটু ইন্টারেস্ট পাচ্ছেন কি এবার?"

"কলকাতা?" কানাইয়ের চোখে অবিশ্বাস। "মানে আপনি বলতে চান কলকাতায় এক সময় ডলফিন দেখা যেত?"

"যেত। শুধু ডলফিন কেন, তিমি মাছও দেখা যেত এক সময়," পিয়া বলল। "তিমি মাছ?" হেসে ফেলল কানাই। "রসিকতা করছেন?"

"রসিকতা নয়, সত্যি সত্যিই একটা সময় এইসব জলচর প্রাণীদের প্রচুর সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যেত কলকাতায়।"

"বিশ্বাস হচ্ছে না," স্পষ্ট জবাব কানাইয়ের। "মানে, এরকম কিছু হলে সেটা আমি নিশ্চয়ই জানতে পারতাম।"

"কিন্তু ঘটনাটা সত্যি," বলল পিয়া। "আপনাকে বলেই ফেলি, এই যে গত সপ্তাহে আমি কলকাতা হয়ে এলাম, সেটা ছিল বলতে পারেন আমার প্রাণীবৈজ্ঞানিক তীর্থযাত্রা।"

হাসিতে ফেটে পড়ল কানাই। "প্রাণীবৈজ্ঞানিক তীর্থযাত্রা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ," পিয়া বলল। "কলকাতায় আমার মাসতুতো বোনেরাও হেসেছিল কথাটা শুনে, কিন্তু সত্যি জানেন, এক বর্ণও বাড়িয়ে বলছি না, এবার কলকাতায় তীর্থেই এসেছিলাম

আমি।”

“আপনার মাসতুতো বোনেরা?” জিজ্ঞেস করল কানাই।

“হ্যাঁ। আমার মাসিমার দুই মেয়ে। দু’জনেই আমার চেয়ে বয়সে ছোট। একজন স্কুলে পড়ে, আরেক জন কলেজে। বেশ ব্রাইট, স্মার্ট দুটো মেয়ে। ওরা বলল কলকাতায় যেখানে যেখানে আমি যেতে চাই, বাড়ির গাড়িতে করে নিয়ে যাবে আমায়। ড্রাইভার আছে, কোনও অসুবিধা হবে না। ওরা মনে হয় ভেবেছিল আমি টুকটাক কেনাকাটা করতে চাইব। তাই যখন বললাম আমি কোথায় যেতে চাই ওরা অবাক হয়ে গেল : বটানিকাল গার্ডেনস! ওখানে কী করতে যাবে?”

“ঠিক প্রশ্ন। বটানিকাল গার্ডেনের সঙ্গে ডলফিনের কী সম্পর্ক?” কানাই প্রশ্ন করল।

“সম্পর্ক আছে,” বলল পিয়া। “নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরিতে এই বটানিকাল গার্ডেনের ভার ছিল খুব দক্ষ কয়েকজন প্রকৃতিবিদের ওপর। তাদেরই একজন ছিলেন এই গ্যাঞ্জেটিক ডলফিনের আবিষ্কর্তা উইলিয়াম রক্সবার্গ।

“কলকাতার এই বটানিকাল গার্ডেনে বসেই ১৮০১ সালে রক্সবার্গ সেই বিখ্যাত প্রবন্ধ লেখেন, যাতে তার নদীজলের ডলফিন আবিষ্কারের কথা জানতে পারে সারা পৃথিবী। এই ডলফিনের নাম তিনি দিয়েছিলেন ডেলফিনাস গ্যাঞ্জেটিকাস (কলকাতার বাঙালিরা এই প্রাণীকে বলে শুশুক’)। পরে অবশ্য জানা গেল খ্রিস্টীয় প্রথম শতকেই রোমান পণ্ডিত প্লিনি দ্য এল্ডার এই ভারতীয় ডলফিনদের বিষয়ে লিখে গেছেন। তাঁর বইয়ে তিনি এই প্রাণীদের প্লাটানিস্টা বলে উল্লেখ করেছেন। এই তথ্য জানার পর পরিবর্তন করা হল রক্সবার্গের দেওয়া নাম। জুওলজিক ইনভেন্টরির তালিকায় এই শুশুকরা এখন প্লাটানিস্টা গ্যাঞ্জেটিকা রক্সবার্গ ১৮০১। বহু বছর পরে, জন অ্যান্ডারসন নামে বটানিকাল গার্ডেনে রক্সবার্গের এক উত্তরসূরি বাথটাবের মধ্যে একটা ডলফিনের বাচ্চা পুষেছিলেন। কয়েক সপ্তাহ বেঁচে ছিল বাচ্চাটা।

“কিন্তু মজার ব্যাপার কী জানেন,” বলল পিয়া, “বাথটাবে ডলফিন পুষলেও অ্যান্ডারসন কিন্তু জানতেন না যে এই প্লাটানিস্টারা চোখে দেখতে পায় না। ওরা যে কাত হয়ে সাঁতার কাটে সেটাও উনি লক্ষ করেননি।”

“তাই বুঝি?”

“হ্যাঁ।”

“সেই বাথটাবটা খুঁজে পেলেন নাকি?” আরও একটু ভাত নেওয়ার জন্য হাত বাড়াল কানাই।

হেসে ফেলল পিয়া। “না। তবে তাতে বিশেষ দুঃখ হয়নি আমার। ওখানে যে যেতে পেরেছি তাতেই আমি খুশি।”

“তো, এর পরে কোথায় গেলেন তীর্থ করতে?” জিজ্ঞেস করল কানাই।

“সেটা শুনলে আরও আশ্চর্য হবেন আপনি,” পিয়া বলল। “সল্ট লেক।”

চোখ কপালে উঠে গেল কানাইয়ের। “মানে, আমাদের সল্ট লেক উপনগরী?”

“উপনগরী তো আর চিরকাল ছিল না,” দ্বিতীয় কলাটার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে জবাব দিল পিয়া।

“১৮৫২ সালে জায়গাটা ছিল স্রেফ একটা জলা জমি৷ তারই মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকটা পুকুর আর দিঘি। সে বছর জুলাই মাসে একবার বিশাল এক বান এল,” বলে চলল পিয়া। “ফুলে ফেঁপে উঠল গোটা বদ্বীপের সব নদী। জলের তোড় ঢুকে এল অনেক ভেতর পর্যন্ত। কলকাতার আশেপাশে সমস্ত জলা আর বাদা ভেসে গেল। তারপর জল যখন নামতে শুরু করল, সারা কলকাতায় গুজব ছড়িয়ে গেল শহরের পুবদিকের এক নোনা জলের ঝিলের মধ্যে নাকি এক দল বিশাল সামুদ্রিক জীব আটকা পড়ে রয়েছে। সে সময় কলকাতার বটানিকাল গার্ডেনের সুপারিন্টেডেন্ট ছিলেন ইংরেজ প্রকৃতিবিদ এডওয়ার্ড ব্লিথ। খবরটা শুনে তো তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কারণ ঠিক তার আগের বছরেই মালাবার উপকূলে এভাবে আটকা পড়েছিল একটা তিমি মাছ। সাতাশ মিটার লম্বা সে মাছটাকে টুকরো

টুকরো করে কেটে ফেলেছিল সেখানকার গ্রামের লোকেরা। ছুরি, কুড়ুল, বর্শা যে যা পেয়েছিল হাতের কাছে তাই নিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল প্রাণীটার ওপর। ওখানকার এক ইংরেজ পাদরিকে সেই তিমি মাছের টাটকা আর শুকনো মাংস নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিল লোকে, বলেছিল সে নাকি খুব সুস্বাদু মাংস। এই জীবগুলোকেও যদি ঠিকমতো পরীক্ষা করার আগেই কেটেকুটে খেয়ে নেয় সবাই? এই ভেবে তাড়াতাড়ি সল্ট লেকের দিকে রওনা হলেন ব্লিথ সাহেব।

"প্রাণীগুলোর মরা-বাঁচা নিয়ে সাহেবের যে বিশেষ দুশ্চিন্তা ছিল তা নয়, তবে ওদের মারার কাজটা উনিই নিজের হাতে করতে চেয়েছিলেন, এই যা," বলল পিয়া।

"আকাশে তখন চড়চড়ে রোদ, গোটা জলাটার থেকে যেন ভাপ উঠছে। বাড়তি বানের জলটাও নেমে গেছে। সল্ট লেকে পৌঁছে সাহেব দেখলেন ছোট একটা এঁদো পুকুরে প্রায় গোটা বিশেক প্রাণী কিলবিল করছে। গোল ধরনের মাথা, সারা শরীর কালো, শুধু পেটের দিকের রংটা সাদা। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ প্রাণীগুলো একেকটা চার মিটারেরও বেশি লম্বা। ডোবাটায় জল তখন এতই কম যে প্রাণীগুলোর সারা শরীর ডুবছে না, পিঠের ছোট পাখনাগুলোর ওপর দুপুরের রোদ পড়ে পিছলে যাচ্ছে। খুবই বিপদে পড়েছে প্রাণীগুলো। এমনকী একটা কাতর আর্তনাদের মতো শব্দও পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। প্রথমটায় ব্লিথের মনে হল ওগুলি বোধহয় খাটো পাখনাওয়ালা পাইলট তিমি, গ্লোবিসেফ্যালাস ডিডাকটর। আটলান্টিক মহাসাগরে এদের বেশি দেখা যায়। বছর ছয়েক আগে ব্রিটিশ শারীরতত্ত্ববিদ জে ই গ্রে এই তিমি আবিষ্কার করেছিলেন। নামকরণটাও গ্রে সাহেবেরই।

"ইনি কি গ্রেজ অ্যানাটমির সেই গ্রে?" কানাই জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ। ইনিই তিনি।"

"ডোবাটার চারপাশে ততক্ষণে বহু লোক জড়ো হয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে ব্লিথ দেখলেন তারা কেউ প্রাণীগুলোকে মারে-টারেনি। অনেকে বরং সারা রাত ধরে খাটা-খাটনি করেছে ওদের বাঁচানোর জন্য। সরু একটা খালের মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে জন্তুগুলোকে নদীতে ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। মনে হল তিমি মাছের মাংসের প্রতি এখানকার গ্রামের লোকেদের বিশেষ আসক্তি নেই। প্রাণীগুলিকে মেরে যে তেল বের করা যেতে পারে সেটাও বোধহয় এদের জানা নেই। ব্লিথ শুনলেন অনেকগুলো প্রাণীকেই এর মধ্যে নদীতে ছেড়ে দিতে পেরেছে গ্রামবাসীরা। বেশ কয়েক ডজনের বড় একটা ঝাক নাকি ছিল এই ডোবায়। তার থেকে এই কয়েকটা এখনও রয়ে গেছে। যে গতিতে উদ্ধারকাজ চলছে, সাহেবের মনে হল খুব বেশি সময় আর হাতে নেই। অবশিষ্ট প্রাণীগুলোর মধ্যে থেকে সব চেয়ে ভাল দেখে দুটোকে বেছে নিলেন ব্লিথ। সঙ্গীদের বললেন পাড়ে খুঁটি পুঁতে । তার সঙ্গে শক্ত দড়ি দড়া দিয়ে সেগুলোকে বেঁধে রাখতে। ভাবলেন পরদিন উপযুক্ত যন্ত্রপাতি নিয়ে এসে ঠিকমতো ব্যবচ্ছেদের বন্দোবস্ত করা যাবে।

"কিন্তু পরদিন সকালে ফিরে এসে সাহেব দেখলেন সব ভো ভা। দুটো তিমির একটাও সেখানে নেই," পিয়া বলল। "গ্রামের লোকেরা দড়ি কেটে জলে ছেড়ে দিয়েছে তাদের। কিন্তু ব্লিথও দমবার পাত্র নন। শেষ যে ক'টা প্রাণী সেখানে ছিল, তাদের মধ্যে থেকে দুটোকে ডাঙায় তুলে এনে চটপট কেটেকুটে ফেললেন। তারপর দীর্ঘক্ষণ ধরে হাড়গুলোকে পরীক্ষা করে সাহেব সিদ্ধান্তে এলেন এগুলো একেবারে নতুন প্রজাতির প্রাণী। এদের নাম উনি দিলেন ইন্ডিয়ান পাইলট হোয়েল, গ্লোবিসেফ্যালাস ইন্ডিকাস।

"এইখানে আমার একটা থিয়োরি আছে," মুচকি হেসে পিয়া বলল। "ব্লিথ যদি সেদিন সল্ট লেকে না যেতেন তা হলে উনিই একদিন ইরাবড়ি ডলফিন আবিষ্কার করতে পারতেন।"

ডান হাতের তর্জনী থেকে একটা ভাতের দানা চেটে নিল কানাই। "কেন?"

"কারণ ছ'বছর পর প্রথম ওর্কায়েলার নমুনাটা যখন উনি দেখলেন, তখন খুব বড় একটা ভুল করে ফেললেন ব্লিথ সাহেব।"

"সেটা আবার কোথায় দেখলেন উনি?"

"কলকাতায়। একটা মাছের বাজারে," হেসে বলল পিয়া। "কেউ এসে ওনাকে বলেছিল, এরকম একটা অদ্ভুত প্রাণী বাজারে এসেছে। খবরটা শুনে তো দৌড়ে গেলেন সাহেব সেখানে। প্রাণীটাকে এক নজর দেখেই সিদ্ধান্ত করলেন ওটা আসলে একটা বাচ্চা পাইলট তিমি। ছ'বছর আগে সল্ট লেকে যে প্রাণীগুলোকে দেখেছিলেন, সেই জাতের। ওই সল্ট লেকের প্রাণীগুলোকে কিছুতেই মাথা থেকে বের করতে পারেননি ব্লিথ।"

"তা হলে আপনার এই সাধের ডলফিনদের আবিষ্কারকর্তা ব্লিথ সাহেব নন?" জিজ্ঞেস করল কানাই।

"নাঃ," বলল পিয়া। "একটুর জন্যে সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে গেল ব্লিথবাবুর। তার প্রায় বছর পঁচিশেক পরে কলকাতা থেকে সাড়ে ছ'শো কিলোমিটার দূরে বিশাখাপত্তনমে আরেকটা এই রকম ছোট মাপের গোল-মাথা জলজন্তুর দেহ পাওয়া গেল। এবারে তার কঙ্কালটা সোজা নিয়ে যাওয়া হল ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। সেখানে তো হইচই পড়ে গেল। লন্ডনের শারীরতত্ত্ববিদরা কঙ্কালটা পরীক্ষা করলেন। ব্লিথ সাহেব যা দেখতে পাননি, এই পণ্ডিতদের কিন্তু তা চোখ এড়াতে পারল না। দেখা গেল প্রাণীটা মোটেই পাইলট তিমির বাচ্চা নয়। এটা একটা নতুন প্রজাতির জীব–খুনে তিমি ওর্সিস ওর্সার দূর সম্পর্কের আত্মীয়! কিন্তু ওর্সার সঙ্গে অনেক অমিলও আছে। একেকটা খুনে তিমি লম্বায় দশ মিটার পর্যন্ত হতে পারে, কিন্তু এই নতুন প্রাণীটার দৈর্ঘ্য মেরেকেটে আড়াই মিটার। আবার, খুনে তিমিরা মেরু সাগরের হিম ঠান্ডা জলে থাকতে ভালবাসে, কিন্তু তাদের এই আত্মীয়ের পছন্দ নিরক্ষীয় অঞ্চলের উষ্ণ জল–তা সে নোনা জলও হতে পারে, আবার মিঠেও হতে পারে। বিশালকায় ওর্সার তুলনায় এতই নরম-সরম এই প্রাণীটা, যে এর নামকরণের সময় : পণ্ডিতদের একটা ক্ষুদ্রত্ববাচক শব্দ ভেবে বের করতে হল। নাম ঠিক করা হল ওর্কায়েলা–ওর্কায়েলা ব্রেভিরোস্ট্রিস।

"আপনি বলতে চান এই খুনেলা তিমি একটা ধরা পড়েছিল কলকাতায়, আর-একটা বিশাখাপত্তনমে?" একটু খটকার সুর কানাইয়ের গলায়।

"হ্যাঁ।"

"তা হলে এদের 'ইরাবড়ি ডলফিন' বলা হচ্ছে কেন?"

"সে আরেক কাহিনি। এই ইরাবড়ি ডলফিন নামটা দিয়েছিলেন জন অ্যান্ডারসন–সেই যে সাহেব নিজের বাথটাবে শুশুক পোষার চেষ্টা করেছিলেন," পিয়া বলল। "১৮৭০-এর দশকে অ্যান্ডারসন বার দুয়েক প্রাণিতাত্ত্বিক অভিযানে বার্মা হয়ে দক্ষিণ চিন পর্যন্ত গিয়েছিলেন। ইরাবড়ি নদীর ভাটি বেয়ে তারা যখন যাচ্ছিলেন, সেই সময়ে কোনও ওর্কায়েলা তাঁদের চোখে পড়েনি। উজানের দিকে কিন্তু প্রচুর সংখ্যায় দেখা গেল ডলফিনগুলোকে। নোনা জলের ডলফিন আর মিষ্টি জলের ডলফিনদের মধ্যে শারীরবৃত্তীয় কিছু তফাতও রয়েছে মনে হল। অ্যান্ডারসন সিদ্ধান্তে এলেন, এই নদীর ডলফিনদের নিশ্চয়ই দুটো আলাদা প্রজাতি রয়েছে: ওর্কায়েলা ব্রেভিরোস্ট্রিস-এর এক তুতো ভাই আমদানি করলেন সাহেব–ওর্কায়েলা ফ্লিউমিনালিস৷ তার হিসেব মতো এই হল ইরাবড্ডি ডলফিন, এশিয়ার সব নদীর আসল বাসিন্দা।

"অ্যান্ডারসনের দেওয়া নামটা রয়ে গেল, কিন্তু তার সিদ্ধান্তটা টিকল না," বলল পিয়া। "বেশ কয়েকটা কঙ্কাল পরীক্ষা করে গ্রে সাহেব রায় দিলেন দুটো নয়, ওর্কায়েলার একটার বেশি জাত হয় না। এদের মধ্যে এক দল সমুদ্র উপকূলের নোনা জলে থাকতে ভালবাসে, আর এক দল পছন্দ করে নদীর মিষ্টি জল, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই; আর এটাও ঠিক যে এই দুই দলের মধ্যে কোনও মেলামেশা নেই, কিন্তু শারীরবৃত্তীয় কোনও অমিল এদের মধ্যে নেই। লিনিয়ান সারণিতে এই ডলফিনদের নাম শেষ পর্যন্ত হল ওর্কায়েলা ব্রেভিরোস্ট্রিস গ্রে ১৮৮৬।

"আয়রনিটা হল ব্লিথ বেচারির কপালে কোনও কৃতিত্বই শেষ পর্যন্ত জুটল না," পিয়া বলে চলল। "শুধু যে ওর্কায়েলা আবিষ্কারের সুযোগটা ভদ্রলোকের হাত ফসকে গেল তাই নয়,

দেখা গেল সল্ট লেকের জলায় আটকে পড়া প্রাণীগুলোকেও চিনতে ভুল করেছিলেন সাহেব। ওগুলো আসলে ছিল খাটো-পাখনা পাইলট তিমিই। গ্রে দেখিয়ে দিলেন গ্লোবিসেফ্যালাস ইন্ডিকাস বলে কোনও প্রাণী জগতে নেই।"

মাথা নাড়ল কানাই। "এরকমই ছিল সে যুগে। ওর্সার তুলনায় ওর্কায়েলা যেমন, লন্ডনের তুলনায় সেরকমই ছিল কলকাতা।"

নিজের প্লেটটা বাসন ধোয়ার সিঙ্কে নিয়ে যেতে যেতে হেসে ফেলল পিয়া। "সন্দেহ মিটেছে? কলকাতা যে জলচর প্রাণীবিদ্যার একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল সে কথা বিশ্বাস হচ্ছে এখন?"

একটা হাত তুলে কানের লতিতে আঙুল বোলাল পিয়া। আগেও এ অভ্যাসটা লক্ষ করেছে কানাই। নর্তকীর মতো মাধুর্যময় আবার একই সাথে শিশুর মতো কোমল এ ভঙ্গিটা যতবার দেখে ততবার বুকটা ধক করে ওঠে কানাইয়ের। পরের দিনই চলে যাবে পিয়া, ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল ওর।

প্লেটটা টেবিলের ওপর রেখে হাত ধুতে বাথরুমে গেল কানাই। মিনিটখানেক বাদেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে সিঙ্কের সামনে এসে পিয়ার কনুইয়ের কাছটায় গিয়ে দাঁড়াল।

"আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে, বুঝলেন?"

"কী?" কানাইয়ের চোখের চকচকে ভাব দেখে একটু সতর্ক গলায় বলল পিয়া। "আপনার কালকের এই অভিযানে কীসের অভাব আছে বলুন তো?"

"কীসের?" কানাইয়ের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ঠোঁট চেপে জিজ্ঞেস করল পিয়া।
"একজন ট্রান্সলেটরের," কানাই বলল। "হরেন আর ফকির ওদের দুজনের কেউই ইংরেজি বলতে পারে না, কাজেই একজন অনুবাদক সঙ্গে না থাকলে আপনি ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন কী করে?"

"কেন? গত কয়েক দিন তো আমি দিব্যি চালিয়ে দিয়েছি।"

"কিন্তু তখন তো আপনার সঙ্গে এত মাঝিমাল্লা ছিল না।"

মাথা নেড়ে সায় দিল পিয়া। মনে হল, ঠিকই, কানাই সঙ্গে থাকলে অনেকটাই সুবিধা হবে কাজের। কিন্তু ওর ষষ্ঠেন্দ্রিয় একটা সতর্কবার্তাওপাঠাচ্ছিল। মনের গভীরে কোথায় যেন বোধ হচ্ছিল কানাইয়ের উপস্থিতি ঝামেলাও ডেকে আনতে পারে। একটু সময় নিয়ে বিষয়টা বোঝার জন্য ও জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু আপনার তো এখানে কাজ রয়েছে?"

"কাজ বলতে সেরকম কিছু নয়," বলল কানাই। মেসোর নোটবইটা প্রায় শেষ হয়েই এসেছে। আর ওটা এখানে বসেই যে পড়তে হবে তারও কোনও মানে নেই। লেখাটা আমি সঙ্গেও নিয়ে যেতে পারি। সত্যি বলতে কী, এই গেস্ট হাউসে একটু হাঁপিয়ে উঠেছি আমি। দু-এক দিন বাইরে ঘুরে এলে মন্দ হয় না।"

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল কানাইয়ের ব্যগ্রতাটা। তা ছাড়াও একটু বিবেক দংশনও যে হচ্ছিল না তাও নয়–কানাইয়ের আতিথেয়তা যে ত্রুটিহীন সেটা তো অস্বীকার করা যাবে না। সে উদারতার কিছুটা প্রতিদান দিতে পারলে এই গেস্ট হাউসে থাকাটা অনেক সহজ হবে ওর পক্ষে, মনে হল পিয়ার।

"ঠিক আছে তা হলে, চলে আসুন," সামান্য একটু দ্বিধার পর বলল পিয়া। "ভালই হবে আপনি সঙ্গে এলে।"

এক হাত দিয়ে অন্য হাতের তালুতে এক ঘুষি মারল কানাই। "থ্যাঙ্ক ইউ!" কিন্তু উচ্ছ্বাসের এই প্রকাশে নিজেই মনে হল ও একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। অপ্রতিভ ভাবটা ঢাকতে তাড়াতাড়ি বলল, "আমার কতদিনের শখ একটা এক্সপিডিশনে যাওয়ার। যেদিন থেকে জানতে পেরেছি যে ইয়ংহাজব্যান্ডের তিব্বত অভিযানের সময় আমার ঠাকুর্দার কাকা তাঁর সঙ্গে ট্রান্সলেটর হিসেবে গিয়েছিলেন, সেইদিন থেকেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছি আমাকেও একদিন একটা অভিযানে যেতেই হবে।"

নিয়তি

বইটা সরিয়ে রেখে কুসুমকে জিজ্ঞেস করলাম, "ঠিক কোন জায়গাটায় যাচ্ছি আমরা বল তো? দ্বীপটার নাম গর্জনতলা কেন?"

"গর্জনগাছের জন্য ওই রকম নাম হয়েছে সার। ওখানে অনেক গর্জনগাছ আছে তো।"

"তাই বুঝি?" এই ব্যাপারটা এতক্ষণ আমার মনে আসনি। গর্জন শব্দের অন্য মানেটাই মাথার মধ্যে ঘুরছিল। "তা হলে বাঘের ডাকের জন্য নামটা হয়নি?"

হাসল ওরা। "তাও হতে পারে।"

"কিন্তু গর্জনতলাতে কেন যাচ্ছি আমরা? মানে ওই জায়গাটাতেই কেন যাচ্ছি, অন্য কোথাও কেন নয়?"

"সে আমার বাবার জন্য সার," বলল কুসুম।

"তোর বাবার জন্য?"

"হ্যাঁ। অনেক বছর আগে ওই দ্বীপটায় এসে বাবা একবার প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল।"

"তাই নাকি? কী হয়েছিল?"

"জিজ্ঞেস করলেন বলে বলছি স্যার। কিন্তু আমি জানি আপনি বিশ্বাস করবেন না, হয়তো হাসবেন।

"সে অনেক কাল হল, আমার জন্মের বহু বহু দিন আগে; বাবা একদিন জেলে ডিঙি নিয়ে একা পড়েছিল ঝড়ে—ভীষণ তুফানে। সেই তুফানের তোড় ফুঁসে ফুঁসে আসে, তার ঝাঁপটের ঘায়ে, নৌকো ভেঙে ভেসে গেল কুটোর মতন। হাবুডুবু খেতে খেতে গাছের এক গুঁড়ি ধরে কোনওমতে বাবা বেঁচে গেল প্রাণে। ঢেউয়ের ধাক্কায় আর জলের টানেতে, গিয়ে পৌঁছল সেই গর্জনতলা। গাছে চড়ে উঠে বসে গামছার পাকে বাঁধল ডালের সাথে নিজের শরীর। হু হু শব্দে ধেয়ে আসে ঝড়ের ঝাঁপট, দু'হাতে আঁকড়ে ধরে বাবা সেই ডাল। আচমকাই থেমে গেল সব তাণ্ডব, নিশ্চুপ হয়ে গেল গোটা জঙ্গল। তুফানের ধাক্কায় নুয়ে পড়া গাছ সব ফের খাড়া হল, শান্ত হল নদী। চাঁদ নেই আকাশেতে, কালিমাখা রাত, নিঝুম আঁধারে চোখ অন্ধ মনে হয়।

"হঠাৎ প্রচণ্ড এক বাজ পড়ে যেন। থরথর কেঁপে ওঠে সব গাছপালা ভীষণ এক গর্জনে। আর তার সাথে নাকে আসে বদগন্ধ, বাবা শিউরে ওঠে। নাম নেওয়া মানা যার সেই জানোয়ার ওত পেতে আছে কোথা শিকারের খোঁজে। আতঙ্কে অজ্ঞান বাবা গাছের ওপরে কোনওমতে ঝুলে থাকে গামছার বাঁধনে। সেই অচেতন স্বপ্নে আসে বনবিবি, বলে, 'ওরে মুখ, তোর কেন এত ভয়? আমাকে বিশ্বাস কর, এ দ্বীপ আমার। যে মানুষ মনে সাচ্চা, এই জঙ্গলে তার কোনও ভয় নেই, আমি আছি পাশে।

"ভোরের আলো ফুটলেই দেখিস তখন ভাটার সময় হবে। দ্বীপ পার হয়ে উত্তর দিক পানে হেঁটে চলে যাস। নজর রাখিস জলে, অধৈর্য হস নে দেখবি এ জঙ্গলে তুই একা নোস। আমি আছি কাছাকাছি। দূতেরা আমার তোর পাশে পাশে আছে। তারাই আমার চোখ আর কান সেটা মনে রেখে দিস। যতক্ষণ ভাটা চলে সঙ্গ দেবে তারা। তারপর আসবে তোর মুক্তির সময়। জেলে ডিঙি ভেসে যাবে ওই পথ দিয়ে। তোকে নিয়ে গিয়ে তারা পৌঁছে দেবে ঘরে।"

এত সুন্দরভাবে বলা এরকম একটা গল্প শুনে মুগ্ধ না হয়ে উপায় কী? হেসে জিজ্ঞেস করলাম, "এরপর তুই নিশ্চয়ই বলবি যে পরদিন সকালে হুবহু ওই রকমই সব ঘটেছিল?"

"ঘটেছিল তো সার। যেমন যেমন স্বপ্নে দেখেছিল বাবা, ঠিক সেই রকম। পরে একবার ওই দ্বীপে ফিরে গিয়ে বনবিবির একটা থান তৈরি করে এসেছিল বাবা। যতদিন বাবা বেঁচেছিল, প্রতি বছর বনবিবির পুজোর সময়ে সবাই মিলে আমরা গর্জনতলায় আসতাম।"

আমার হাসি পেয়ে গেল। বললাম, "আর ওই দেবীর দূতদেরও নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছিল তোর বাবা?"

"দেখেছিল তো। একটু পরেই আপনি নিজেও দেখতে পাবেন সার," বলল কুসুম।

এবার হো হো করে হেসে ফেললাম আমি। "আমিও দেখতে পাব? আমার মতো অবিশ্বাসী নাস্তিক? আমার ওপরে কি এত দয়া হবে দেবীর?"

"হ্যাঁ সার," আমার ব্যঙ্গ উপেক্ষা করে কুসুম বলল। "কোথায় খুঁজতে হবে জানা থাকলে যে কেউই দেখতে পায় বনবিবির দূতদের।"

ছাতার আড়ালে বসে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি। তন্দ্রা ভাঙল কুসুমের ডাকে। পৌঁছে গেছি আমরা গর্জনতলায়।

ধড়মড় করে উঠে বসলাম। এতক্ষণ ধরে এই সময়টার জন্য অপেক্ষা করছি আমি—কখন কুসুমের বিশ্বাসী মনের ভুল ভেঙে দেওয়ার সুযোগ পাব। ভাটা পড়ে গেছে। বাঁকের মুখে খানিকটা জায়গায় স্থির হয়ে আছে জল—ঠিক সেইখানটাতেই এসে থেমেছে আমাদের নৌকো। ডাঙা এখনও খানিকটা দূরে। দূত-টুত বা অন্য কোনও দৈব দৃশ্য কিছুই দেখা যাচ্ছে না কোথাও। নিজের ওপর একটু খুশি না হয়ে পারলাম না। জয়ের আনন্দ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে করতে কুসুমকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী রে, কোথায় গেল তোর দেবীর দূতেরা?"

"দেখতে পাবেন সার, একটু সবুর করুন।"

হঠাৎ একটা অদ্ভুত আওয়াজ কানে এল—আমার মনে হল যেন সশব্দে নাক ঝাড়ছে কেউ। সবিস্ময়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম কিছু একটা অদৃশ্য হয়ে গেল জলের তলায়। শেষ মুহূর্তে কালো চামড়ার একটু আভাস শুধু চোখে পড়ল।

"কী ওটা?" আশ্চর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। "কোথা থেকে এল? কোথায় চলে গেল?"

"ওই যে," অন্য আরেক দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল ছোট্ট ফকির। "ওইখানে।"

ঘুরে দাঁড়িয়ে আরেকটা ওরকম জীব দেখতে পেলাম আমি। জলের মধ্যে ডিগবাজি খাচ্ছে। একটা তিনকোনা পাখনাও দেখতে পেলাম এক ঝলক। আগে কখনও দেখিনি, কিন্তু বুঝতে পারলাম ওগুলো কোনও এক জাতের ডলফিন হবে। তবে এখানকার নদীতে যে শুশুক দেখেছি আমি, তার সঙ্গে এদের তফাত আছে। শুশুকের পিঠে এরকম কোনও পাখনা হয় না।

"ওগুলো কী? জিজ্ঞেস করলাম আমি। "কোনও এক ধরনের শুশুক নিশ্চয়ই।"

এবার কুসুমের হাসার পালা। "আমি আমার নিজের মতো নাম দিয়েছি ওদের। আমি ওদের বনবিবির দূত বলি।" ওরই জিত। অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই।

যতক্ষণ নৌকোটা ওখানে দাঁড়িয়ে রইল, জন্তুগুলো খেলা করে বেড়াতে লাগল আমাদের চারপাশে। কেন এখানে এসেছে ওরা? এতক্ষণ ধরে একই জায়গায় রয়েছেই বা কেন? জবাব খুঁজে পেলাম না। তারপর হঠাৎ এক সময় দেখলাম একটা ডলফিন জল থেকে মাথা তুলে সোজা আমার দিকে তাকাল। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম কী করে কুসুম এত সহজে জন্তুগুলোকে অন্য কিছু বলে বিশ্বাস করতে পেরেছে। ওর চোখে যা বনবিবির চিহ্ন বলে মনে হয়েছে, আমার কাছে তাই মনে হল কবির চোখের দৃষ্টি। মনে হল সে চোখ যেন আমাকে বলছে :

"বোবা পশু শান্ত ঘাড় উঁচু করে আমাদের চুলচেরা দেখে নিতে চায়।এবং তারই আরেক নাম বুঝি নিয়তি..."

মেঘা

সকালে একটা সাইকেল ভ্যান ভাড়া করে ফকিরের জোগাড় করা ভটভটিটা দেখতে গেল পিয়া আর কানাই। ইট-বসানো রাস্তা দিয়ে ঝাঁকুনি খেতে খেতে গ্রামের দিকে চলেছে। ভ্যান। পিয়া বলল, "ওই নৌকোর মালিককে আপনি চেনেন বলছিলেন না? কীরকম লোক ও?"

"আমি যখন ছোটবেলায় এখানে এসেছিলাম তখন ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমার,

কানাই বলল। "ওর নাম হরেন। হরেন নস্কর। খুব যে চিনি সেটা বলা ঠিক হবে না, তবে এটুকু বলতে পারি যে আমার মেসোর সঙ্গে ওর ভালই যোগাযোগ ছিল।"

"আর ফকিরের কে হয় ও?"

"ধর্মবাপ বলতে পারেন," জবাব দিল কানাই। "ফকিরের মা মারা যাওয়ার পর হরেনের কাছেই থাকত ও।"

বাঁধের গোড়ার কাছে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল হরেন। ফকির দাঁড়িয়ে ছিল পাশে। এক নজর দেখেই হরেনকে চিনতে পারল কানাই—সেই গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, চওড়া কাঁধ। শরীরে খানিকটা চর্বি জমেছে এই ক'বছরে। ভুঁড়ি হয়েছে একটু। ফলে বুকের ছাতিটা আগের চেয়েও চওড়া মনে হচ্ছে। বয়েসের সঙ্গে গম্ভীর হয়েছে মুখের ভাঁজগুলি—চোখ দুটো দেখাই যায় না প্রায়। তবে সাথে সাথে একটা ভারিক্কি ভাবও এসেছে চেহারায়। হাবভাবে যূথপতির গাম্ভীর্য। দেখলেই বোঝা যায় এ মানুষটা আশেপাশের সব লোকেদের শ্রদ্ধার পাত্র। পোশাক-আশাকেও স্বাচ্ছল্যের আভাস ডোরাকাটা লুঙ্গিটা সযত্নে মাড় দিয়ে ইস্ত্রি করা, গায়ের জামা ধবধবে সাদা। হাতে ভারী মেটাল স্ট্র্যাপের ঘড়ি, জামার পকেট থেকে একটা সানগ্লাস উঁকি দিচ্ছে।

"আমাকে চিনতে পারছেন হরেনদা?" হাত জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গি করল কানাই। "আমি সারের ভাগ্নে।"

"চিনব না কেন?" হরেন নিরুত্তাপ। "বাড়ি থেকে আপনাকে শাস্তি দিয়ে এখানে পাঠানো হয়েছিল সত্তর সালে। সেই আগুনমুখা ঝড়ের বছর। তবে আপনি তো বোধহয় ঝড়ের আগেই ফিরে গিয়েছিলেন।"

"ঠিক বলেছেন। তা আপনার ছেলেমেয়েরা কেমন আছে? তখন তো বোধহয় তিনটি ছিল, তাই না?"

"ওরা নিজেরাই এখন ছেলেপুলের বাপ-মা হয়ে গেছে," হরেন বলল। "এই যে, এ হল আমার এক নাতি," স্মার্ট নীল টি-শার্ট আর জিনস পরা একটা ছেলের দিকে ইশারা করল ও। "ওর নাম নগেন। এই সবে ইস্কুল শেষ করেছে। ও-ও যাবে আমাদের সঙ্গে নৌকোয়।"

"বেশ বেশ," কানাই বলল। "এবার এনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হলেন শ্রীমতী পিয়ালি রায়, বৈজ্ঞানিক। ইনিই আপনার ভটভটিটা ভাড়া করছেন।"

পিয়ার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝোকাল হরেন। বলল, "চলুন তা হলে, ভটভটিটা দেখে নিন একবার।"

হরেনের পেছন পেছন বাঁধের ওপর উঠে এল পিয়া আর কানাই। সামনে নদীর বুকের ওপর ঢোকা লম্বাটে একটা বালির চড়া দেখা যাচ্ছে। এটাই লুসিবাড়ির জেটি। তার পাশে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে হরেনের ভটভটি। তার গলুইয়ের সামনে বড় বড় সাদা অক্ষরে লেখা 'এম ভি মেঘা।

এমনিতে নজরে ওঠার মতো কিছু নয় নৌকোটা। কেমন একটু অদ্ভুত ভাবে ভেসে আছে জলের ওপর। জায়গায় জায়গায় রং চটে গেছে, এখানে ওখানে বেড়ানো—পুরনো টিনের খেলনার মতো দেখতে খানিকটা। হরেনের কিন্তু ওর ভটভটি নিয়ে গর্বের শেষ নেই। বিশদভাবে তার গুণকাহিনি বর্ণনা করল ও। এ পর্যন্ত নাকি বহু সওয়ারি বয়েছে এই মেঘা। কখনও কেউ মন্দ বলতে পারেনি। কত পিকনিক পার্টিকে নিয়ে গেছে পাখিরালায়, কত বর আর বরযাত্রীকে নিয়ে দূর দূর দ্বীপে পৌঁছে দিয়েছে সেসব গল্প কানাইকে শোনাল হরেন।

খুব একটা অবিশ্বাস্য মনে হল না গল্পগুলো। কারণ বাইরে থেকে দেখে জরাজীর্ণ মনে হলেও, জায়গা অনেক আছে নৌকোটায়। একটু গাদাগাদি হলেও, প্রয়োজন হলে যে এ ভটভটিতে অনেক লোক উঠতে পারে সে ব্যাপারে সন্দেহের বিশেষ কোনও কারণ দেখা গেল না। নৌকোর ভেতর দিকটা খানিকটা বড়সড় একটা গুহার মতো। সারি সারি বেঞ্চি পাতা। টানা লম্বা জানালায় হলুদ তেরপলের পর্দা ঝুলছে। গুহার এক প্রান্তে ইঞ্জিন ঘর, আরেক প্রান্তে রান্নার জায়গা। ওপরে একটা ছোট ডেক, সারেঙের ঘর, আর ছোট্ট ছোট্ট দুটো কেবিন। শেষ প্রান্তে টিন দিয়ে ঘেরা একটা বাথরুম। সেখানে মেঝেতে একটা গর্ত ছাড়া আর কিছুই নেই, তবে মোটের ওপর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

"দেখতে আহামরি কিছু নয়," স্বীকার করল কানাই। "তবে কাজ চলে যাবে মনে হয়। ওপরের কেবিনদুটোর একটায় আপনি থাকতে পারবেন, আর একটায় আমি। তা হলে ইঞ্জিনের আওয়াজটাও কানে লাগবে না, আর ধোঁয়াও খেতে হবে না।"

"আর ফকির কোথায় থাকবে?" পিয়া জিজ্ঞেস করল।

"ফকির নীচে থাকবে। হরেন আর ওর হেল্পার, মানে ওর নাতির সঙ্গে।"

"ব্যাস, মাত্র দু'জন? আর কোনও লোকজন লাগবে না?" প্রশ্ন করল পিয়া।

"নাঃ। বেশ ফাঁকায় ফাঁকায় যাওয়া যাবে," বলল কানাই।

আরেকবার সন্দেহের দৃষ্টিতে মেঘার দিকে তাকাল পিয়া। "রিসার্চের পক্ষে আদর্শ নৌকো বলা যাবে না এটাকে, তবে মনে হয় মোটামুটি চালিয়ে নিতে পারব আমি। একটাই শুধু সমস্যা আছে।"

"কী সমস্যা?"

"এই গামলাটায় চড়ে ডলফিনগুলোকে ফলো করব কী করে সেটাই ভাবছি। সরু খাঁড়ি-টাড়িতে তো এটা ঢুকতে পারবে না।"

পিয়ার প্রশ্নটা হরেনকে অনুবাদ করে শোনাল কানাই। হরেনের জবাবটা আবার ইংরেজিতে বলে দিল পিয়াকে : ফকিরের ডিঙিটাও যাবে ওদের সঙ্গে। দড়ি দিয়ে মেঘার সঙ্গে বাঁধা থাকবে ওটা। তারপর পিয়ার কাজের জায়গায় পৌঁছলে ভটভটিটা এক জায়গায় অপেক্ষা করবে, আর পিয়া ফকিরের সঙ্গে ডিঙিতে করে ডলফিনদের পেছন পেছন যেতে পারবে।

"সত্যি?" এই জবাবটাই শুনতে চাইছিল পিয়া। "এই একটা জায়গায় অন্তত ফকির আমার থেকে এগিয়ে।"

"কী মনে হয়? চলবে?" জিজ্ঞেস করল কানাই।

"চলবে না মানে? চমৎকার আইডিয়া," পিয়া বলল। "ছোট ডিঙিতেই ডলফিনদের ফলো করা বেশি সুবিধার।"

কানাইয়ের মধ্যস্থতায় ভটভটির ভাড়া-টাড়াগুলো ঠিক করা হয়ে গেল চটপট। ভাড়ার খানিকটা অংশ দিতে চাইল কানাই, কিন্তু কিছুতেই রাজি হল না পিয়া। শেষে রফা হল রসদ যা লাগবে তার খরচটা দু'জনে ভাগ করে নেবে। হরেনকে কিছু টাকা তক্ষুনি দিয়ে দেওয়া হল, চাল, ডাল, তেল, চা, মিনারেল ওয়াটার, গোটাদুয়েক মুরগি আর বিশেষ করে পিয়ার জন্য প্রচুর পাউডার দুধ কেনার জন্য।

"ওঃ, এত এক্সাইটেড লাগছে আমার," গেস্ট হাউসের পথে ফিরতে ফিরতে বলল পিয়া। "মনে হচ্ছে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি। গেস্ট হাউসে ফিরে আজ সকালেই জামাকাপড়গুলো কেচে ফেলব।"

"আমিও মাসিকে গিয়ে খবরটা দিই। দিনকয়েক যে থাকব না সেটা জানাই। মাসি আবার কী বলবে কে জানে," কানাই বলল।

দরজা খোলাই ছিল। ঘরে ঢুকে কানাই দেখল টেবিলের সামনে বসে আছে নীলিমা, হাতে চায়ের কাপ। হাসিমুখে তাকাল কানাইয়ের দিকে। কিন্তু তারপরেই হাসি মিলিয়ে গিয়ে ভাজ

পড়ল কপালে। "কী ব্যাপার রে কানাই? কিছু গণ্ডগোল হয়েছে?"
"না, গণ্ডগোল কিছু হয়নি," একটু অস্বস্তির সুর কানাইয়ের গলায়। "তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম মাসি। আমি কয়েক দিন থাকব না।"
"ফিরে যাচ্ছিস নাকি?" আশ্চর্য হয়ে বলল নীলিমা। "এইতো মাত্র এলি, এখনি চলে যাবি?"
"ফিরে যাচ্ছি না গো," কানাই বলল। "তুমি রাগ কোরো না মাসি, আসলে পিয়া একটা ভটভটি ভাড়া করেছে ওর সার্ভের জন্য। তো, ওর একজন দোভাষীর দরকার।"
"ও, আই সি," নীলিমা বলল ইংরেজিতে। "তার মানে তুই ওর সঙ্গে যাচ্ছিস?"
নির্মলের স্মৃতি নীলিমার কাছে যে কতখানি, সেটা ভাল করেই জানে কানাই। নরম গলায় তাই বলল, "ভাবছিলাম নোটবইটাও নিয়ে যাব সঙ্গে। অবশ্য যদি তোমার আপত্তি না থাকে।"
"সাবধানে রাখবি তো?"
"নিশ্চয়ই।"
"কতটা পড়লি এ কয়দিনে?"
"অনেকটাই পড়া হয়ে গেছে," জবাব দিল কানাই। "ফিরে আসার আগেই শেষ হয়ে যাবে মনে হয়।"
"বেশ। এই নিয়ে আর এখন কিছু জিজ্ঞেস করব না তোকে,"নীলিমা বলল। "কিন্তু একটা কথা বল কানাই, ঠিক কোথায় যাচ্ছিস তোরা?"
কানাই মাথা চুলকোতে লাগল। কোথায় যে যাওয়া হচ্ছে সেটা তো ও জানেই না। জিজ্ঞেস করার কথাটাও মাথায় আসেনি। কিন্তু কোনও ব্যাপারেই নিজের অজ্ঞানতা প্রকাশ করাটা স্বভাবে নেই ওর। তাই যে নদীর নাম মুখে এল বলে দিল মাসিকে। "মনে হয় তারোবাঁকি নদী পর্যন্ত যাব আমরা। একেবারে ফরেস্টের ভেতরে।"
"জঙ্গলে যাচ্ছিস?" একটু চিন্তিত চোখে কানাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল নীলিমা।
"তাই তো জানি," কানাইয়ের গলায় অনিশ্চয়তা।
চেয়ার ছেড়ে উঠে ওর সামনে এসে দাঁড়াল নীলিমা। "কানাই, ভাল করে ভেবেচিন্তে যাচ্ছিস তো?"
"হ্যাঁ, ভাবব না কেন? ভেবেছি তো," নিজেকে হঠাৎ একটা স্কুলে-পড়া ছেলের মতো মনে হল কানাইয়ের।
"আমার মনে হয় না তুই ভেবেচিন্তে যাচ্ছিস," নীলিমা কোমরে হাত রাখল। "অবশ্য তোকে দোষ দেওয়াও যায় না। আমি জানি, বাইরের লোকেরা ধারণাই করতে পারে না কী ধরনের বিপদ হতে পারে এখানকার জঙ্গলে।"
"মানে তুমি বাঘের কথা বলছ?" কানাইয়ের ঠোঁটে মুচকি হাসির আভাস। "পিয়ার মতো একটা তাজা সুস্বাদু খাবার মুখের সামনে থাকলে বাঘে আমার দিকে ফিরেও তাকাবে না।"
"কানাই!" এক ধমক দিল নীলিমা। "এটা ঠাট্টার বিষয় নয়। আমি জানি, এই টুয়েন্টিফার্স্ট সেঞ্চুরিতে দাঁড়িয়ে নিজেকে বাঘের শিকার বলে কল্পনা করাটা তোর পক্ষে সহজ নয়, কিন্তু বাঘের অ্যাটাক এই সুন্দরবনে কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। প্রতি সপ্তাহে অন্তত এ রকম দু-তিনটে ঘটনা এখানে ঘটে।"
"সে কী! এত আকছার?" কানাই জিজ্ঞেস করল।
"হ্যাঁ। তার চেয়ে বেশি বই কম নয়। দাঁড়া, একটা জিনিস তোকে দেখাই," কানাইয়ের কনুই ধরে ঘরের অন্যপ্রান্তে দেওয়ালের গায়ের সারি সারি বইয়ের তাকগুলোর কাছে নিয়ে গেল নীলিমা। "দেখ," নীলিমা একটা ফাইলের বান্ডিলের দিকে ইশারা করল। "বছরের পর বছর ধরে লোকের মুখে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে আমি এই আনঅফিশিয়াল রেকর্ড রেখে যাচ্ছি। আমার হিসেব মতো প্রতি বছর একশোরও বেশি মানুষ এখানে বাঘের পেটে যায়। এটা কিন্তু শুধু সুন্দরবনের ইন্ডিয়ান অংশটার কথা বলছি আমি। বাংলাদেশের ভাগটাও যদি ধরিস তা হলে বোধহয় সংখ্যাটা দ্বিগুণেরও বেশি গিয়ে দাঁড়াবে। সব মিলিয়ে হিসেব করলে

দেখা যাবে প্রতি একদিন অন্তর একটা করে মানুষ বাঘে নেয় এই সুন্দরবনে। অন্তত।"

চোখ কপালে উঠে গেল কানাইয়ের। "বাঘের হাতে যে মানুষ মরে এখানে সেটা জানতাম, কিন্তু সংখ্যাটা এত বেশি সেটা ধারণা ছিল না।"

"সেটাই সমস্যা," নীলিমা বলল। "কেউই জানে না ঠিক কত লোক বাঘের কবলে পড়ে সুন্দরবনে। কোনও হিসেবই ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত– সরকারি খাতাপত্রে যা হিসেব দেখানো হয়, সংখ্যাটা তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি।"

কানাই মাথা চুলকাল। "এই বাড়াবাড়িটা নিশ্চয়ই রিসেন্ট ব্যাপার। লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার জন্যও তো হতে পারে? হয়তো বাঘের থাকার জায়গায় মানুষের হাত পড়ছে, বা ওরকম কিছু কারণে?"

"কী যে বলিস," নীলিমা একটু বিরক্ত হল। "শত শত বছর ধরে এইভাবে মানুষ মরছে এখানে। লোকসংখ্যা যখন এখনকার তুলনায় খুবই সামান্য ছিল তখনও একই ঘটনা ঘটেছে। এইটা দেখ," বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে ওপরের তাক থেকে একটা ফাইল টেনে নামাল নীলিমা। তারপর নিয়ে গেল নিজের টেবিলে। "দেখ। এখানে দেখ। দেখতে পাচ্ছিস সংখ্যাটা?"

খোলা পাতাটার দিকে তাকিয়ে কানাই দেখল নীলিমা যেখানে আঙুল রেখেছে ঠিক তার ওপরে লেখা রয়েছে একটা সংখ্যা : ৪,২১৮।

"সংখ্যাটা লক্ষ কর কানাই," বলল নীলিমা। "এটা হল মাত্র ছ'বছরের হিসেব। ১৮৬০ থেকে ১৮৬৬-র মধ্যে এই এতগুলো তোক বাঘের পেটে গিয়েছিল এই নিম্নবঙ্গে। এটা জে. ফেরারের দেওয়া হিসেব। এই ফেরার ছিলেন একজন ইংরেজ প্রকৃতিবিদ। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার' নামটা ওনারই দেওয়া। একবার কল্পনা কর কানাই–চার হাজারেরও বেশি মানুষ মরেছে মাত্র ছ'বছরে। গড়ে প্রতিদিন দু'জন করে। একশো বছরে সংখ্যাটা তা হলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে একবার ভেবে দেখ।"

"ষাট-সত্তর হাজার।" ভুরু কুঁচকে ফাইলের খোলা পাতাটার দিকে তাকিয়ে রইল কানাই। "বিশ্বাস করা কঠিন।"

"কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এটা নির্জলা সত্যি," নীলিমা বলল। "তোমার কী মনে হয় মাসি? কেন এরকম হয়?" জিজ্ঞেস করল কানাই। "কী হতে পারে কারণটা?"

চেয়ারে বসে পড়ল নীলিমা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "জানি না রে কানাই। এত রকম সব থিয়োরি আছে এই নিয়ে, কোনটা যে বিশ্বাস করব বুঝে উঠতে পারি না।"

"তবে একটা বিষয়ে সব তাত্ত্বিকরাই এক মত, এই ভাটির দেশের বাঘের স্বভাবচরিত্র অন্য সব জায়গার বাঘেদের থেকে একেবারে আলাদা," বলল নীলিমা। অন্যান্য জায়গার বাঘেরা মানুষকে আক্রমণ করে একমাত্র খুব বিপাকে পড়লে–পঙ্গু হয়ে গেলে বা কোনও কারণে অন্য কোনও শিকার ধরতে অক্ষম হয়ে গেলে। কিন্তু ভাটির দেশের বাঘের জন্য সে তত্ত্ব আদৌ খাটে না। স্বাস্থ্যবান বা কমবয়সি বাঘেদেরও এখানে মানুষখেকো হতে দেখা যায়। কারও কারও মতে এর কারণ হল এখানকার অদ্ভুত পরিবেশতন্ত্র–একমাত্র এই জঙ্গলেই বাঘেদের চারণভূমির অর্ধেকের বেশি অংশ প্রতিদিন ডুবে যায় জোয়ারের জলে। জল তাদের ঘ্রাণচিহ্ন ধুয়ে দেয়, ফলে যে প্রবৃত্তিগত ক্ষমতায় বাঘেরা নিজেদের এলাকা চিনে নিতে পারে তা ঘুলিয়ে যায়। সেইজন্যেই এত হিংস্র হয়ে ওঠে এখানকার বাঘেরা। সুন্দরবনের বাঘের হিংস্রতার কারণ সম্পর্কে যে কয়েকটা তত্ত্বের কথা শোনা যায় তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নীলিমার। কিন্তু এই তত্ত্ব মেনে নিলেও সে ব্যাপারে করার তো কিছু নেই।

বছর কয়েক পর পরই কেউ না কেউ একটা না একটা নতুন তত্ত্ব এনে হাজির করে। আর মাঝে মাঝে তার সাথে থাকে অদ্ভুত সব সমাধানের উপায়। ১৯৮০-র দশকে একবার এক জার্মান প্রকৃতিবিদ বললেন নরমাংসের প্রতি এখানকার বাঘেদের এই আসক্তির সঙ্গে সুন্দরবনে মিষ্টি জলের অভাবের সম্পর্ক আছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের খুব মনে ধরেছিল

সেই থিয়োরি। বাঘেদের জন্য চটপট কয়েকটা মিষ্টি জলের পুকুর খোঁড়া হয়ে গেল জঙ্গলের ভেতরে।

"ভাব একবার কাণ্ডটা!" নীলিমা বলল। "বাঘের জল খাওয়ার জন্য পুকুর! আর সেটা করা হচ্ছে এমন এক জায়গায় যেখানে মানুষের তেষ্টার কথাটা কেউ ভাবেও না!"

সে যাই হোক, এই পুকুর-টুকুর খোঁড়া সবই শেষ পর্যন্ত বৃথা গেল। বিন্দুমাত্র কোনও লাভ হল না। বাঘের আক্রমণ যেমন চলছিল চলতেই থাকল।

"তার কিছুদিন পর এল আরেকটা নতুন থিয়োরি। ইলেকট্রিক শক," নীলিমার চোখের কোণে চিকচিক করছে হাসি।

"এক বিশেষজ্ঞের মনে হল পাভলভ তার কুকুরদের যেভাবে একটা নিয়মে অভ্যস্ত করেছিলেন, সেই একই পদ্ধতিতে সুন্দরবনের বাঘেরও অভ্যাস পালটে দেওয়া যেতে পারে। মাটি দিয়ে অনেকগুলো প্রমাণ সাইজের মানুষের মূর্তি বানানো হল। তারপর সেগুলোর গায়ে তার জড়িয়ে সেই তার জুড়ে দেওয়া হল গাড়ির ব্যাটারির সঙ্গে। এই বৈদ্যুতিক মানুষ-পুতুলগুলোকে এবার বসানো হল জঙ্গলের মধ্যে বিভিন্ন দ্বীপে। প্রথম প্রথম কিছুদিন মনে হল ওষুধ ধরেছে। লোকের মনে ফুর্তি আর ধরে না। কিন্তু কয়েকদিন পরেই আবার শুরু হল হানা। মূর্তিগুলো যেমন কে তেমন পড়ে রইল, আর আগের মতোই ফের মরতে লাগল মানুষ।

"আরেকবার, এক ফরেস্ট অফিসারের মাথায় এরকমই আরেকটা অদ্ভুত আইডিয়া এল। জঙ্গলে যারা যাবে, তারা যদি মাথার পেছনদিকে একটা মুখোশ পরে নেয় তা হলে কেমন হয়? যুক্তিটা হল—বাঘে তো মানুষকে সাধারণত পেছনদিক থেকে আক্রমণ করে, তাই ওই একজোড়া রং করা চোখকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলে নিশ্চয়ই সেখান থেকে পালিয়ে যাবে। এই থিয়োরিটাও সকলের খুব পছন্দ হল। প্রচুর মুখোশ তৈরি করে বিলি করা হল সর্বত্র। সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হল অসাধারণ এক এক্সপেরিমেন্ট শুরু হয়েছে সুন্দরবনে। আইডিয়াটার চিত্রগুণ লোকের বেশ মনে ধরল। একের পর এক টেলিভিশন ক্যামেরা এল, এমনকী কয়েকজন পরিচালক ফিল্মও বানিয়ে ফেললেন গোটাকতক।

"কিন্তু বাঘেদের দিক থেকে আদৌ কোনও সহযোগিতা পাওয়া গেল না। বোঝাই গেল, মুখ আর মুখোশের তফাত ধরতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হচ্ছে না তাদের।"

"মানে তুমি বলতে চাইছ যে এই সবকিছু বুঝে শুনে হিসেব করে শিকার ধরার ক্ষমতা আছে এখানকার বাঘের?" জিজ্ঞেস করল কানাই।

"জানি না রে কানাই। আমি তো পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে এখানে আছি, কিন্তু একবারও বাঘ দেখিনি। দেখতে চাইও না। এখানকার লোকে যেটা বলে সেটা আমি খুব মানিঃ জঙ্গলে বাঘ দেখে সে গল্প বলার জন্য জ্যান্ত ফিরে আসার সম্ভাবনা খুবই কম। সেইজন্যেই তোকে বলছি কানাই, খেয়াল হল আর জঙ্গলে চলে গেলাম, সেরকম করা মোটেই উচিত নয়। যাওয়ার আগে ভাল করে একবার ভেবে দেখিস, সত্যিই তোর যাওয়ার কোনও প্রয়োজন আছে কি না।"

"কিন্তু আমার তো জঙ্গলে যাওয়ার কোনও প্ল্যান নেই," কানাই বলল। "আমি তো থাকব ভটভটিতে। সেখানে আর বিপদ কেন হবে?"

"ভটভটিতে থাকলে কোনও বিপদ হতে পারে না ভেবেছিস?"

"হ্যাঁ। আমরা তো জলের ওপরে থাকব। পাড় থেকে অনেক দূরে। সেখানে আর কী হবে?

"তা হলে একটা ঘটনার কথা বলি তোকে। ন'বছর আগে এই লুসিবাড়ি থেকেই একবার একটা বাচ্চা মেয়েকে বাঘে নিয়েছিল। পরে দেখা গেল সে বাঘটা পুরো বিদ্যা নদীর মোহনা সাঁতরে এসেছিল এখানে। তারপর শিকার ধরে আবার ফিরে গিয়েছিল মোহনা পেরিয়ে। দূরত্বটা কত জানিস?"

"না।"

"ছয় ছয় বারো কিলোমিটার, যাতায়াত মিলিয়ে। আর সুন্দরবনের বাঘের পক্ষে সেটা কোনও দূরত্বই নয়। একটানা তেরো কিলোমিটার পর্যন্ত সাঁতরে গিয়ে শিকার ধরেছে বাঘ সেরকম ঘটনাও ঘটেছে এখানে। তাই কখনওই ভাবিস না যে জলের ওপর আছিস বলে বিপদের কোনও সম্ভাবনা নেই। নৌকো আর ভটভটিতে বাঘের হানার কথা আকছারই শোনা যায় এখানে। এমনকী মাঝনদীতেও। প্রত্যেক বছর বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটে এরকম।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ," মাথা নাড়ল নীলিমা। "আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় তা হলে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের যে-কোনও লঞ্চ দেখলেই বুঝতে পারবি কতখানি ঝুঁকি নিয়ে চলাফেরা করতে হয় এখানে। একেকটা লঞ্চ একেবারে ভাসমান দুর্গের মতো। আমার কবজির মতো ইয়া মোটা মোটা লোহার গরাদ দেওয়া জানালায়। ফরেস্ট গার্ডদের সঙ্গে বন্দুক থাকা সত্ত্বেও এই রকম দুর্ভেদ্য করে বানানো হয় লঞ্চগুলিকে। তোর ওই ভটভটির জানালায় কি কোনও গরাদ-টরাদের বালাই আছে?"

মাথা চুলকাল কানাই। "মনে পড়ছে না ঠিক।"

"কিছু বলার নেই," বলল নীলিমা। ব্যাপারটা লক্ষ করারই কোনও প্রয়োজন মনে করিসনি তুই। কোন বিপদের মধ্যে পা বাড়াচ্ছিস সেটা তুই বুঝতে পারছিস বলে মনে হচ্ছে না। জন্তু জানোয়ারের কথা যদি ছেড়েও দিই–এইসব ভটভটি আর নৌকোগুলোই তো সবচেয়ে বিপজ্জনক। প্রতি মাসে কোথাও না কোথাও একটা-দুটো নৌকোডুবি লেগেই আছে।"

"তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পার মাসি। কোনওরকম কোনও ঝুঁকি নেব না আমি," কানাই বলল।

"কিন্তু একটা কথা তুই বুঝতে পারছিস না কানাই। আমার মনে হচ্ছে তুই নিজেই সবচেয়ে বড় ঝুঁকি। অন্য সবাই কোনও না কোনও প্রয়োজনে যাচ্ছে, কিন্তু তুই তো যাচ্ছিস স্রেফ একটা খেয়ালের বশে। জঙ্গলে যাওয়ার কোনও দরকার তো তোর নেই।"

"তা নয়, একটা কারণ আছে–" কিছু না ভেবেই কথাটা বলতে শুরু করেছিল কানাই। সচেতন হতে হঠাৎ থেমে গেল মাঝপথে।

"কানাই? তুই কিছু লুকোচ্ছিস আমার কাছ থেকে?"

"না না, সেরকম কিছু নয়," কী বলবে ঠিক ভেবে উঠতে না পেরে মাথা নিচু করল কানাই।

তীক্ষ্ণ চোখে বোনপোর দিকে তাকাল নীলিমা। "ওই মেয়েটা, তাই না? পিয়া?" কোনও জবাব দিল না কানাই। মুখ ঘুরিয়ে তাকাল অন্য দিকে। হঠাৎ গলার সুরে প্রচণ্ড শ্লেষ ঝরিয়ে নীলিমা বলল, "তোরা সব এক রকম, তোরা পুরুষরা। তোদের মতো হিংস্র প্রাণীরা যদি মানুষ বলে পার পেয়ে যায় তা হলে বাঘেদের আর কী দোষ?" এত তেতো সুর মাসির গলায় আগে কখনও শোনেনি কানাই।

কানাইয়ের কনুইটা ধরে আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগোল নীলিমা। "সাবধান, কানাই খুব সাবধান, বলে রাখলাম।"

স্মৃতি

ডলফিনগুলোর সঙ্গে আধঘণ্টাখানেক কাটানোর পর গর্জনতলার দিকে ফের নৌকো বাইতে শুরু করল হরেন। দ্বীপের কাছাকাছি পৌঁছে আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসতে লাগল ও।

"এসে গেলাম প্রায়। ভয়টা এবার টের পাচ্ছেন সার?"

"ভয়?" জিজ্ঞেস করলাম আমি। "ভয় কেন পাব হরেন? তুমি তো সঙ্গে আছ।"

"ভয়টাই তো রক্ষা করে সার। ভয়ই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে এখানে। ভয় না থাকলে বিপদ দুগুণ বাড়ে।"

"তার মানে তোমার ভয় করছে, তাই না?"

"হ্যাঁ সার। বুঝতে পারছেন না আমার মুখ দেখে?"

ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম সত্যিই ওর মুখে অচেনা একটা ছায়া দেখতে পাচ্ছি আমি–একটা সতর্ক সন্ত্রস্ত ভাব, চোখের দৃষ্টিতে একটা বাড়তি তীক্ষ্ণতা। কেমন যেন ছোঁয়াচে সেই গা ছমছমে ভাব। কয়েক মুহূর্ত পরেই আমারও বেশ ভয় ভয় করতে লাগল। হরেনকে বললাম আমিও ভয় পাচ্ছি ওর মতো।

'হ্যাঁ গো হরেন, টের পাচ্ছি।"

"ভাল সার, খুব ভাল।"

পাড় যখন আর মিটার বিশেক দূরে, হঠাৎ নৌকো বাওয়া বন্ধ করে দাঁড় তুলে নিল হরেন। চোখ বন্ধ করে কী যেন বিড়বিড় করতে শুরু করল, আর নানা রকম অদ্ভুত ইশারা ইঙ্গিত করতে লাগল হাত দিয়ে।

"কী করছে বল তো ও?" কুসুমকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"আপনি জানেন না সার? ও বাউলে তো, তাই বড় শেয়ালের মুখ বন্ধ করার মন্তর পড়ছে। সে জানোয়ার আমাদের যাতে কোনও ক্ষতি না করে তার ব্যবস্থা করছে ও।"

অন্য সময় হলে হয়তো হেসে ফেলতাম। কিন্তু এখন তো আমি ভয় পেয়েছি : ভয়ের অভিনয় আর করতে হচ্ছে না আমাকে। আমি জানি যে মন্ত্র পড়ে বাঘের মুখ বন্ধ করার ক্ষমতা আসলে হরেনের নেই। যদি থাকত, তা হলে তো মন্ত্র পড়ে ঝড়ও ডেকে আনতে পারত। কিন্তু তা সম্ভব নয়। তবুও ওর অর্থহীন বিড়বিড়ানি শুনে মনে মনে স্বস্তি পেলাম আমি। ও তো কোনও বাহাদুরি দেখানোর চেষ্টা করছে না, জাদুকরের মতো সম্মোহনের ভঙ্গি করছে না, বরং একজন মিস্ত্রির মতো মন দিয়ে নিজের কাজটুকু করছে–শেষবারের মতো আরেকটু প্যাঁচ দিয়ে নিচ্ছে নাট বল্টগুলিতে, কিছু যাতে আলগা না রয়ে যায়। হরেনের এই ভাবটাই অনেকটা আশ্বস্ত করল আমাকে।

"এবার মন দিয়ে আমার কথাটা শুনুন সার," বলল হরেন। "আপনি তো আগে জঙ্গলে আসেননি, তাই একটা নিয়ম আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি। এটা ভুলবেন না।"

"কী নিয়ম হরেন?"

"নিয়মটা হল, পাড়ে যখন উঠবেন, নিজের কোনও অংশ আপনি সেখানে রেখে আসতে পারবেন না। থুতু ফেলতে পারবেন না, পেচ্ছাপ করতে পারবেন না, পায়খানা করতে পারবেন না–যা খেয়ে এসেছেন তা এখানে দিয়ে যেতে পারবেন না। এই নিয়ম যদি না মানেন তা হলে কিন্তু আমাদের সক্কলের বিপদ।"

কেউ হাসেনি, ঠাট্টাও কেউ করেনি আমাকে নিয়ে, কিন্তু কেমন যেন মনে হল হরেনের কথার সুরে একটা হালকা বিদ্রূপের ছোঁয়া রয়েছে।

"না গো হরেন, কাজকম্ম সব সেরেই এসেছি। কোনও চিন্তা নেই। ভয়ে একেবারে অবশ না হয়ে পড়লে কিচ্ছু ছেড়ে যাব না এখানে," বললাম আমি।

"ঠিক আছে সার। শুধু বলে রাখলাম আপনাকে।"

আবার দাঁড় বাইতে শুরু করল হরেন। ডাঙা আরেকটু কাছে আসার পর এক ধার দিয়ে

লাফিয়ে জলে নেমে পাড়ের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল নৌকোটাকে। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম ফকিরও নেমে গেল নদীতে হরেনের পেছন পেছন। জল ওর চিবুক ছুঁই-ছুঁই, কিন্তু তার মধ্যেই নৌকোর গায়ে কাধ ঠেকিয়ে ঠেলা দিতে লাগল গায়ের জোরে।

ওরা কিন্তু কেউ অবাক হল না। ওর মা আমার দিকে ফিরে তাকাল। মনে হল ছেলের গর্বে যেন ফেটে পড়ছে। বলল, "দেখেছেন সার? নদী ওর রক্তে আছে।"

মনে হল আমিও যদি বলতে পারতাম এভাবে! মনে হল যে-কোনও মূল্য দিতে রাজি আছি আমি, যদি এইভাবে একবার বলতে পারি আমার রক্তেও তো আছে নদী, সমস্ত পাপের ভার নিয়ে বয়ে চলেছে আমার শিরায় শিরায়। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে নিজেকে আরও বেশি করে বহিরাগত মনে হতে লাগল আমার। তবুও, শেষ পর্যন্ত কাদায় যখন নামলাম, অনুভব করলাম এত দিন ভাটির দেশে থাকা আমার সার্থক হয়েছে। এই গভীর তলতলে পাঁকের মধ্যে পায়ের পাতাদুটোকে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটুকু অন্তত শিখিয়েছে আমাকে এই দেশ। হরেন কুসুমদের পেছন পেছন নিরাপদেই পাড় পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে পারলাম আমি।

এবার বাদাবনের ভেতরে ঢোকার পালা। হরেন চলেছে সবার আগে, দা দিয়ে ঝোঁপ জঙ্গল সাফ করতে করতে। তার পেছনে কুসুম—মাটির মূর্তিদুটো কাঁধের ওপর ধরা। আর আমি সবার শেষে। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে বেড়াজালের মতো ঘন এই বাদাবনের মধ্যে যদি একটা বাঘ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার ওপরে, আমার তো কোনওদিকে পালাবারও ক্ষমতা থাকবে না। একেবারে খাঁচায়-পোরা তৈরি খাবার পেয়ে যাবে মুখের সামনে।

কিন্তু কোনও অঘটন ঘটল না। একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছলাম আমরা। কুসুম এগিয়ে গেল ঠাকুরের থানের দিকে। থান বলতে মাটি থেকে খানিকটা উঁচু একটা বেদি, চারপাশে বাঁশ দিয়ে ঘেরা, আর মাথায় একটা গোলপাতার ছাউনি। সেখানেই বনবিবি আর তার ভাই শা জঙ্গলির মূর্তিগুলি নামিয়ে রাখলাম আমরা। কুসুম খান কয়েক ধূপকাঠি জ্বালাল, আর জঙ্গল থেকে কিছু ফুলপাতা এনে মূর্তি দুটোর পায়ের কাছে রাখল হরেন।

এই পর্যন্ত বেশ স্বাভাবিক ভাবেই চলছিল ঘটনাক্রম, সাধারণ ঘরোয়া পুজোআর্চায় যেমন হয়। ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতেও মাকে এভাবে ঠাকুরপুজো করতে দেখেছি আমি। তফাত শুধু পারিপার্শ্বিকের। কিন্তু তারপরে হঠাৎ সুর করে একটা মন্ত্র বলতে শুরু করল হরেন। ভীষণ আশ্চর্য হয়ে শুনলাম ও বলে চলেছে :

বিসমিল্লা বলিয়া মুখে ধরিনু কলম/ পয়দা করিল যিনি তামাম আলম * বড় মেহেরবান তিনি বান্দার উপরে/ তার ছানি কেবা আছে দুনিয়ার পরে *

একেবারে তাজ্জব বনে গেলাম। আমি তো ভেবে এসেছিলাম একটা হিন্দু পুজোতে যাচ্ছি। তারপর এই প্রার্থনার মধ্যে এত আরবি শব্দ শুনে আমার মনের অবস্থাটা কী রকম হল সহজেই কল্পনা করতে পার। কিন্তু ছন্দটা তো নিঃসন্দেহে পাঁচালির। বাড়িতে কি মন্দিরে কত পুজোতে ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি এই একই সরল পয়ার ছন্দের পাঁচালি-পাঠ।

তন্ময় হয়ে শুনছিলাম হরেনের মন্ত্রোচ্চারণ। মূল ভাষাটা বাংলা, কিন্তু এত আরবি-ফারসি শব্দ তাতে মেশানো, যে সবটা ভাল বোঝা যাচ্ছিল না। গল্পটা অবশ্য আমার চেনা : সেই দুখের দুর্দশার কাহিনী। কেমন করে তাকে একটা নির্জন দ্বীপে ব্যাঘ্রদানব দক্ষিণ রায়ের মুখে ফেলে চলে আসা হয়েছিল, আর সেখান থেকে কীভাবে বনবিবি আর শা জঙ্গলি তাকে রক্ষা করলেন সেই গল্প।

এক এক করে সকলের পুজো দেওয়া শেষ হল। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ফাঁকা জায়গাটুকু পেরিয়ে আমরা আবার গিয়ে ডিঙিতে উঠলাম। নৌকো করে মরিচঝাঁপির দিকে যেতে যেতে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এত লম্বা এই মন্ত্র তুমি কোথায় শিখলে হরেন?"

খানিকটা যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ও তাকাল আমার দিকে। "এ তো আমি ছেলেবেলা থেকেই জানি সার। বাবাকে তো শুনতাম এই মন্তর পড়তে, সেই শুনে শুনে শিখেছি।"

"মানে মুখে মুখেই এটা চলে আসছে? শুধু শুনে শুনে মনে রেখে দিতে হয়?"

"তা কেন স্যার?" হরেন বলল। "ছাপা বইও পাওয়া যায়। একখানা আমার কাছেও

আছে।” নিচু হয়ে নৌকোর খোলের ভেতরে অন্যান্য জিনিসপত্রের মধ্যে থেকে হলদে হয়ে যাওয়া ছেঁড়া একটা চটি বই বের করে আনল ও। “এই যে সার, দেখুন।”

প্রথম পাতায় দেখলাম বইয়ের নাম লেখা আছে বনবিবির কেরামতি অর্থাৎ বনবিবি জহুরানামা। বইটা খুলতে গিয়েই কিন্তু একটা ধাক্কা খেলাম : এ তো আরবি কেতাবের মতো ডাইনে থেকে বাঁয়ে পাতা উলটে পড়তে হয়, বাংলা বইয়ের মতো বদিক থেকে ডাইনে নয়। ছন্দপ্রকরণ যদিও বাংলা লোককথার ধরনের : দ্বিপদী পয়ারে লেখা। দুটো করে লাইনের একেকটা শ্লোক—এক এক লাইনে মাত্রা সংখ্যা মোটামুটি বারো, আর প্রতি লাইনের মাঝামাঝি জায়গায় একবার করে যতি।

বইটা দেখলাম একজন মুসলমান ভদ্রলোকের লেখা। লেখকের নাম দেওয়া আছে আব্দুর রহিম। সাধারণ মাপকাঠিতে বিচার করলে খুব একটা সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ বলা চলে না লেখাটাকে। প্রতি জোড়া লাইনে মোটা দাগের একটা ছন্দমিল যদিও আছে, কিন্তু পুরো লেখাটা দেখতে আদৌ কবিতার মতো নয়। গদ্যের মতো একটানা। মাঝে মাঝে শুধু তারা চিহ্ন আর দুই দাড়ি দেওয়া। অন্য ভাবে বলতে গেলে লেখাটা দেখতে গদ্যের মতো কিন্তু পড়তে পদ্যের মতো—অদ্ভুত একটা মিশ্রণ, প্রথমটায় মনে হল আমার। তার পরে আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম বিষয়টার অসাধারণত্ব। গদ্য এখানে ছন্দ আর তালের সিঁড়িতে ভর করে পদ্যের জগতে উত্তীর্ণ হচ্ছে—এক কথায় চমৎকার।

“কবে লেখা হয়েছে এ বইটা?” আমি জিজ্ঞেস করলাম হরেনকে। “তুমি জানো?”

“এ তো পুরনো বই স্যার। অনেক, অনেক পুরনো।”

অনেক, অনেক পুরনো? কিন্তু প্রথম পাতাতেই তো দেখতে পাচ্ছি এক জায়গায় লেখা আছে, “কেহ দিবা নিশি চলে আতলস পরিয়া/ ছায়ের করিয়া ফেরে চৌদ্দলে চড়িয়া।”

হঠাৎ মনে হল এই কাহিনির জন্ম নিশ্চয়ই উনিশ শতকের শেষে অথবা বিশ শতকের প্রথম দিকে, যখন নতুন বাসিন্দারা সবে আসতে শুরু করেছে এই ভাটির দেশে। সে কারণেই হয়তো লোককথা আর ধর্মশাস্ত্র, নিকট আর দূর, বাংলা আর আরবির মিশ্রণে এরকম আশ্চর্য চেহারা নিয়েছে এই জহুরানামা। কে বলতে পারে?

অবশ্য কী-ই বা হতে পারে তা ছাড়া? নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে তোত আমি দেখেছি—শুধু পলি বয়ে আনা নদীর ঢেউ ছাড়াও, কাছের দূরের নানা ভাষার স্রোত বার বার এসে আছড়ে পড়েছে এই ভাটির দেশে, এখানকার মাটিতে মিশে আছে। তাদের চিহ্ন। বাংলা, ইংরেজি, আরবি, হিন্দি, আরাকানি—আরও কত ভাষা কে জানে। এক ভাষার স্রোত গিয়ে মিশেছে অন্য ভাষায়, জন্ম দিয়েছে সেই প্রবাহে ভাসমান অগুন্তি ছোট ছোট ভাষা জগতের। চৈতন্যোদয় হল আমার : এ ভাটির দেশে মানুষের বিশ্বাসও এখানকার বিশাল সব মোহনার মতো। সে মোহনা শুধু অনেক নদীর মিলনের জায়গাই নয়, সে হল বহু পথের সংযোগস্থল। সে সব পথ নানা দিকে টেনে নিয়ে যায় মানুষকে—এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এমনকী এক বিশ্বাস থেকে আরেক বিশ্বাসে, এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে।

বিষয়টা মাথায় এমন চেপে বসল যে তক্ষুনি কাঁধের ঝোলা থেকে নোটবই বের করে কয়েকটা লাইন টুকতে শুরু করে দিলাম আমি। ঘটনাচক্রে এই নোটবইটাই ছিল সেদিন আমার সঙ্গে। খুদে খুদে ছাপার অক্ষর, চোখ কুঁচকে বেশ কষ্ট করে পড়তে হচ্ছিল আমাকে। এক সময় অন্যমনস্ক ভাবে ফকিরের হাতে তুলে দিলাম চটি বইটা—অনেক সময় ক্লাসে ছাত্রদের যেমন দিতাম—বললাম, “জোরে জোরে পড়ো, লিখে নিই।”

ও জোরে জোরে উচ্চারণ করতে থাকল শব্দগুলো, আর আমি লিখতে শুরু করলাম। লিখতে লিখতে হঠাৎ একটা কথা খেয়াল হল আমার। কুসুমকে বললাম, “আচ্ছা, তুই না বলেছিলি ফকির লিখতে পড়তে পারে না?”

“হ্যাঁ সার। ও তো লেখাপড়া শেখেনি,” জবাব দিল কুসুম। “তা হলে?”

একটু হেসে ফকিরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল কুসুম। “এটা তো ওর মুখস্থ। এত বার আমার কাছ থেকে শুনেছে যে কথাগুলো ওর মাথায় গেঁথে গেছে একেবারে।”

সন্ধে হয়ে গেছে। আমার লেখার যাতে অসুবিধা না হয় সে জন্য সামনে একটা মোমবাতি রেখে গেছে কুসুম। ওদিকে হরেন অধৈর্য হয়ে উঠছে। ফকিরকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পড়েছে ওর ওপর। শুধু কুসুম আর আমি এখন থাকব এখানে। জলের ওপর থেকে ভেসে আসছে টহলদার নৌকোর শব্দ। গোটা দ্বীপটাকে ঘিরে ফেলেছে নৌকোগুলো। অন্ধকার আর একটু গাঢ় না হলে ফকিরকে নিয়ে পালাতে পারবে না হরেন।

কিন্তু আর সবুর সইছে না হরেনের। এখনই বেরোতে চায় ও। আমি বললাম, “আর কয়েকটা ঘণ্টা অপেক্ষা করো। সারাটা রাত তো পড়েই রয়েছে।” আমার সঙ্গে গলা মেলাল কুসুমও। হরেনকে ডেকে নিয়ে গেল বাইরে : “চলো, তোমার নৌকোয় যাই। সারকে একটু একা থাকতে দাও।”

মধ্যস্থ

নোটপত্র গোছানো, জামাকাপড় কাঁচা আর যন্ত্রপাতি পরিষ্কারের কাজ শেষ হতে হতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নেমে গেল। পিয়া ঠিক করল এখনই শুয়ে পড়বে। রাতের খাওয়ার জন্য আর অপেক্ষা করবে না। এরপরে কবে আবার কপালে একটা বিছানা জুটবে তার তো কোনও ঠিক নেই। তাই আজকে রাতে এই বিছানাটার সদ্ব্যবহার করাই ভাল। যতটা পারা যায় ঘুমিয়ে নেবে ও। কানাই ছাদের স্টাডিতে পড়াশোনা করছে, ওকে আর খামখা ডিস্টার্ব করার দরকার নেই। এক গ্লাস ওভালটিন গুলে নিয়ে নীচে ফাঁকায় নেমে এল পিয়া।

চাঁদ উঠে গেছে অনেকক্ষণ। রুপোলি আলোয় পিয়া দেখতে পেল নীলিমা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মনে হল কী যেন একটা গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। পিয়ার পায়ের শব্দ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

এক হাতে ওভালটিনের গ্লাস, অন্য হাতটা দিয়ে বাতাসে ঢেউয়ের মতো একটা আঁক কাটল পিয়া: "হ্যালো।"

জবাবে একটু হাসল নীলিমা। কী যেন বলল বাংলায়। খানিকটা আপশোসের সুরে পিয়া বলল, "সরি। বুঝতে পারলাম না।"

"আরে, তাই তো," নীলিমা বলল। "আমারই তো সরি বলা উচিত। বার বার খালি ভুলে যাই আমি। আসলে তোমার চেহারাটার জন্যই একটুও খেয়াল থাকে না আমার। খালি নিজেকে মনে করাতে থাকি যাতে বাংলা না বলি তোমার সঙ্গে, তাও ঠিক বেরিয়ে যায় মুখ ফসকে।"

হাসল পিয়া। "আমার মা বলত বাংলা ভাষাটা না-জানার জন্য একদিন দুঃখ করব আমি। মনে হয় ঠিকই বলত মা।"

"কিন্তু একটা কথা বলো তো বাছা," নীলিমা বলল, "জানতে ইচ্ছে করছে বলেই জিজ্ঞেস করছি—তোমার বাবা-মা কেন তোমাকে কখনও বাংলা শেখাতে চেষ্টা করেননি?"

"মা একটু চেষ্টা করেছিল," বলল পিয়া। "আমারই বিশেষ আগ্রহ ছিল না। আর বাবার কথা যদি বলেন, তা হলে মনে হয় বিষয়টা নিয়ে বাবার নিজের মনেই একটু সন্দেহ ছিল।

"সন্দেহ? তোমাকে বাংলা শেখানোর ব্যাপারে?"

"হ্যাঁ," পিয়া বলল। "পুরো গল্পটা একটু কমপ্লিকেটেড। আসলে আমার ঠাকুরদা-ঠাকুরমাও ছিলেন প্রবাসী বাঙালি—বার্মায় থাকতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেখানকার ঘরবাড়ি ছেড়ে ওদের দেশে ফিরে আসতে হয়েছিল। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বড় হবার ফলে প্রবাসী বা উদ্বাস্তুদের বিষয়ে নিজের মতো করে কয়েকটা থিয়োরি তৈরি করে নিয়েছিল বাবা। বাবার ধারণা হল ভারতীয়রা বিশেষ করে বাঙালিরা কখনওই ভাল পর্যটক হতে পারে না। কারণ তাদের চোখ সব সময় ফেরানো থাকে পেছন দিকে ঘরের দিকে। তাই যখন আমরা আমেরিকায় গেলাম, বাবা ঠিক করল যে এই ভুল করবে না। সে দেশের মতো করেই খাপ খাইয়ে নেবে নিজেকে।"

"তাই উনি তোমার সঙ্গে সব সময় ইংরেজিতে কথা বলতেন?"

"হ্যাঁ," পিয়া বলল। "আর এর জন্যে অনেকটাই ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল বাবাকে, সেটা ভুললে চলবে না। কারণ ইংরেজি ভাষাটা খুব ভাল বলতে পারত না বাবা। এখনও, এই এতদিন বিদেশে থাকার পরেও পারে না। বাবা পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, ফলে কথা যখন বলে ইংরেজিটা খানিকটা যেন কন্সট্রাকশন ম্যানুয়েলের মতো শোনায়।"

"তোমার মায়ের সঙ্গে কী ভাষায় কথা বলতেন উনি?"

"নিজেদের মধ্যে বাবা-মা বাংলাই বলত," হেসে বলল পিয়া। অবশ্য যখন ওরা কথা বলত। আর দু'জনের মধ্যে কথা যখন বন্ধ থাকত তখন আমিই ছিলাম ওদের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। তবে এই বার্তাবাহকের কাজ করার সময় বাবা-মাকে ইংরেজিতে কথা বলতে বাধ্য করতাম আমি—তা না হলে কিছুতেই খবর পৌঁছে দিতাম না।"

কোনও জবাব দিল না নীলিমা। একটু অস্বস্তি হল পিয়ার। ভুল করে কোনও বেফঁস কথা বলা হয়ে গেল নাকি? কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই নিজের আঁচলের কোনাটা ধরে মুখের কাছে নিয়ে গেল নীলিমা। দু'চোখে টলটল করছে জল।

"আই অ্যাম সরি," তাড়াতাড়ি বলল পিয়া। "আমি কি অন্যায় কিছু বলে ফেলেছি?"

"না বাছা। অন্যায় কিছু বলনি। আমি খালি তোমার ছোটবেলার কথা ভাবছিলাম—কেমন করে বাবা-মার কথাগুলো পৌঁছে দিতে পরস্পরের কাছে। স্বামী-স্ত্রী যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলতে পারে না সেটা যে কত দুঃখের কথা সে তোমাকে কী বলব বাছা। তাও তো তুমি ছিলে তোমার বাবা-মার মাঝখানে। যদি কেউ না থাকত তা হলে—"

কথাটা শেষ করল না নীলিমা। থেমে গেল আবার। পিয়া বুঝতে পারছিল ব্যক্তিগত কোনও ব্যথার জায়গায় ছুঁয়ে ফেলেছে না বুঝে। নীলিমার ধাতস্থ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল চুপ করে।

"আমাদের বাড়িতে তো ছেলেপুলে বলতে ওই কানাই-ই একবার এসে ছিল কিছুদিনের জন্য," অবশেষে বলল নীলিমা। "আমার স্বামীর কাছে সেইটুকুই যে কতখানি ছিল সেটা আগে আমি কল্পনাও করতে পারিনি। শুধু নিজের কথাগুলো কাউকে বলে যাওয়ার জন্যেই যে কী আকুলতা ছিল মানুষটার, কী বলব। তারপরেও কত বছর ধরে যে আমাকে বলেছে, কানাইটা যদি আবার এসে কিছুদিন থাকত। আমি মনে করিয়ে দিতাম, কানাই তো আর ছোটটি নেই, বড় হয়ে গেছে। তারও নিজের কাজকর্ম আছে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যেত না আমার স্বামীর। কতবার যে চিঠি লিখেছে কানাইকে, এখানে আসার জন্য।"

"কানাই আসেনি?"

"নাঃ," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল নীলিমা। "ও তখন খুবই ব্যস্ত। ব্যবসায় উন্নতি করছে। তার দামটাও তো দিতে হবে। নিজের জন্যে ছাড়া আর কারও জন্যেই সময় ছিল না ওর। নিজের মা-বাবার জন্যেও না। আমাদের কথা তো ছেড়েই দাও।"

"ও কি সব সময়ই এই রকম?" পিয়া জিজ্ঞেস করল। "এই রকম উদ্যমী?"

"কেউ কেউ বলে স্বার্থপর," জবাব দিল নীলিমা। "আসলে কানাইয়ের মুশকিলটা কী জানো তো? ও সব সময়ই একটু বেশি চালাক। সব কিছু খুব সহজেই হাতে এসে গেছে তো, তাই বেশির ভাগ মানুষের কাছে দুনিয়াটা যে কী রকম সে বোধটাই ওর কখনও হয়নি।"

পিয়া বুঝতে পারল তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী নীলিমা ঠিকই চিনেছে তার ভাগ্নেকে। কিন্তু সে ধারণাটা প্রকাশ না করাই ভাল মনে হল। ভদ্রতা রাখতে বলল, "আমি তো ওকে সামান্যই দেখেছি, আমি আর কী বলব?"

"ঠিকই," বলল নীলিমা। "তবে তোমাকে একটু সাবধান করে দিই বাছা। আমার ভাগ্নেকে আমি ভালবাসি ঠিকই, কিন্তু একটা কথা আমার বলে দেওয়া উচিত যে কানাই হল সেই ধরনের মানুষ যারা মনে করে যে মেয়েরা তাদের কাছাকাছি এলেই প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাবে। দুঃখের বিষয় হল পৃথিবীতে বোকা মেয়ের তো অভাব নেই। অনেকেই আছে যারা এই রকম লোকেদের ধারণাকে সত্যি বলে প্রমাণ করে। কানাই মনে হয় সব সময় সেই রকম মেয়েদেরই খুঁজে বেড়ায়। তোমরা কী বল জানি না, আমাদের সময় তো এ ধরনের লোকেদের আমরা বলতাম লম্পট'।" নীলিমা কথা শেষ করল। ভুরু উপরে তুলে জিজ্ঞেস করল, "আমার কথাটা বুঝতে পেরেছ তো?"

"বুঝেছি।"

মাথা নেড়ে শাড়ির আঁচলে নাক মুছল নীলিমা। "যাকগে, আর ভ্যাজর ভ্যাজর করব না। কাল তো তোমার অনেক কাজ, তাই না?"

"হ্যাঁ," বলল পিয়া। "আমরা সকাল সকালই বেরিয়ে পড়ব। সত্যি, ভাবতেই ভাল লাগছে।"

পিয়ার কাঁধের ওপর একটা হাত দিয়ে ওকে বুকের কাছে টেনে নিল নীলিমা। "শোনো বাছা, খুব সাবধানে থাকবে। জঙ্গল ভয়ংকর জায়গা, মনে রাখবে। আর সব সময় জন্তু

জানোয়াররাই যে শুধু ভয়ের কারণ তা কিন্তু নয়।”

ঘেরাটোপে

আমি গর্জনতলা থেকে ঘুরে আসার কয়েকদিন পর নীলিমা ফিরল তার কাজ শেষ করে। সঙ্গে নিয়ে এল বাইরের পৃথিবীর অজস্র খবর। নানা গল্প করতে করতে এ কথা সে কথার মাঝখানে হঠাৎই বলল, "আর মরিচঝাঁপিতেও মনে হয় এবার কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।"

আমার কান খাড়া হয়ে উঠল। "কী ঘটতে যাচ্ছে?"

"মনে হয় সরকার এবার ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত করতে চায়। সেরকম দরকার হলে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া হবে ঠিক হয়েছে শুনলাম।"

কিছু বললাম না, শুধু মনে মনে ভাবতে লাগলাম কী করে খবরটা পৌঁছে দেওয়া যায় কুসুমের কাছে, কী করে সাবধান করে দেওয়া যায় ওদের। কিন্তু খুব দ্রুত ঘটনা গুরুতর মোড় নিল। সাবধান করে দেওয়ার কোনও পথই রইল না। পরদিন শোনা গেল বন সংরক্ষণ আইনে মরিচঝাঁপিতে যাতায়াত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সরকার। পুরো এলাকায় জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা। তার মানে চারজনের বেশি লোক এক জায়গায় জড়ো হওয়াও নিষিদ্ধ।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নদী বেয়ে স্রোতের মতো ছড়িয়ে যেতে শুরু করল নানা গুজব। শোনা গেল কয়েক ডজন পুলিশের নৌকো ঘিরে রেখেছে গোটা দ্বীপটাকে, কাদানে গ্যাস আর রাবার বুলেট চালানো হয়েছে, দ্বীপে কোনও খাবার-দাবার বা জল নিয়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে না মরিচঝাঁপির লোকেদের, বেশ কয়েকটা নৌকো ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে, কয়েক জন নাকি মারাও গেছে। সময় যত যেতে লাগল গুজবগুলিও তত ফুলেফেঁপে উঠতে থাকল; মনে হল যেন যুদ্ধ লেগেছে শান্ত নিরিবিলি এই ভাটির দেশে।

নীলিমার কথা ভেবেই প্রাণপণে স্থির থাকার চেষ্টা করছিলাম আমি। মনের মধ্যে যে উথাল পাথাল চলছিল তাকে বাইরে প্রকাশ হতে দিচ্ছিলাম না। কিন্তু সেদিন সারারাত কিছুতেই দু'চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। সকাল হতেই মনে মনে বুঝলাম মরিচঝাঁপিতে যেতে আমাকে হবেই। যে-কোনও উপায়েই থোক। তার জন্যে এমনকী নীলিমার সঙ্গে বিবাদে যেতেও আমি প্রস্তুত। আমার সৌভাগ্য, পরিস্থিতি সেদিকে যায়নি—অন্তত এখনও পর্যন্ত নয়। ভোরবেলায় স্কুলের কয়েকজন মাস্টারমশাই এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। তাঁদেরও কানে এসেছে গুজবগুলো, আর আমারই মতো তারাও চিন্তায় আছেন ওই দ্বীপবাসীদের জন্য। এতটাই উদ্বিগ্ন তাঁরা, যে একটা ভটভটি পর্যন্ত ভাড়া করে ফেলেছেন মরিচঝাঁপি যাওয়ার জন্য : যদি কোনওভাবে মিটমাটের একটা রাস্তা বের করা যায়। মাস্টারমশাইরা জিজ্ঞেস করলেন আমিও তাঁদের সঙ্গে যেতে রাজি আছি কি না। আমি তো এক পা তুলে খাড়া।

সকাল দশটা নাগাদ ছাড়ল আমাদের ভটভটি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দূর থেকে দেখা গেল আমাদের গন্তব্য। এখানে একটা কথা বলে রাখি—মরিচঝাঁপি বিশাল দ্বীপ, ভাটির দেশের সবচেয়ে বড় দ্বীপগুলির একটা। এখানকার তটরেখার দৈর্ঘ্য প্রায় কুড়ি কিলোমিটার। প্রথম যখন চোখে পড়ল দ্বীপটা, তখনও আমরা প্রায় দু-তিন কিলোমিটার দূরে। দেখলাম ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে দ্বীপের ওপর।

খানিক পরেই দেখা গেল সরকারি মোটরবোটগুলিকে। টহল দিচ্ছে দ্বীপের চারপাশে। আমাদের ভটভটিওয়ালা দেখলাম বেশ ভয় পেয়ে গেছে। অনেক কাকুতি-মিনতি করে তাকে আরেকটু কাছাকাছি যেতে রাজি করানো গেল। রাজি সে হল বটে, কিন্তু একটা শর্তে : আমাদের নৌকো যাবে নদীর অন্য পাড় ধরে—দ্বীপ থেকে যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে। অতএব সে ভাবেই এপাশের কিনারা ঘেঁষে এগোতে লাগলাম আমরা, আর আমাদের দৃষ্টি ফেরানো রইল অন্যদিকে, মরিচঝাঁপির দিকে।

এভাবে চলতে চলতে একটা গ্রামের কাছাকাছি এসে পৌঁছলাম আমরা। দেখতে পেলাম পাড়ের ওপর বহু লোক জড়ো হয়েছে, ব্যস্তসমস্ত ভাবে তারা একটা নৌকোয় প্রচুর মালপত্র বোঝাই করছে। ভটভটি বা পালের নৌকো নয় কিন্তু, এমনি সাধারণ ডিঙি নৌকো, হরেনের

যেরকম একটা ছিল। খানিকটা দূর থেকেও দিব্যি বোঝা গেল নৌকোটাতে রসদ বোঝাই করছে ওরা—বস্তা বস্তা চাল-ডাল আর জেরিক্যান ভর্তি খাবার জল। তারপর এক এক করে অনেকে গিয়ে উঠে পড়ল নৌকোটাতে। বেশিরভাগই পুরুষ, তবে কিছু মহিলা এবং বাচ্চাও ছিল। কয়েকজন তো বোঝাই যাচ্ছিল দিনমজুর—কাজের জন্য গিয়েছিল অন্য কোনও দ্বীপে, তারপরে আর ফিরতে পারেনি। বাকিরা মনে হল কোনও কারণে আত্মীয়স্বজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, আর এখন যে-কোনও রকমে ফেরার চেষ্টা করছে মরিচঝাঁপিতে। তবে কারণ যাই হোক না কেন, ওদের গরজটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। গাদাগাদি করে এই রকম একটা পলকা ডিঙিতে ওঠার ঝুঁকি নিতেও তাই দ্বিধা ছিল না ওদের। অবশেষে নৌকো যখন ছাড়ল তখন তাতে অন্তত ডজন দুয়েক লোক। কোনও রকমে টলমল করতে করতে স্রোতের মুখে গিয়ে পড়ল ডিঙিটা। টইটম্বুর ভর্তি ওইটুকু একটা মোচার খোলা—কীভাবে যে ভেসে ছিল না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। খানিকটা দূর থেকে রুদ্ধশ্বাসে আমরা দেখতে লাগলাম। সকলেরই বুক দুরুদুরু—কী হয় কী হয়। বোঝাই যাচ্ছিল ওদের আশা পুলিশকে এড়িয়ে কোনও রকমে পৌঁছতে পারবে মরিচঝাঁপিতে, আটকা-পড়া দ্বীপবাসীদের কাছেও পৌঁছে দেবে কিছু রসদ। এখন পুলিশ কী করবে? আমাদের নৌকোয় প্রত্যেকেরই দেখলাম এ ব্যাপারে নিজস্ব কিছু বক্তব্য রয়েছে।

হঠাৎ, ঠিক যেন আমাদের সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটানোর জন্যই, বাগনা নদী বেয়ে গর্জন করতে করতে ধেয়ে এল একটা পুলিশের স্পিডবোট। তিরবেগে ডিঙিটার কাছে পৌঁছে তার চারদিকে পাক খেতে লাগল সেটা। পুলিশের বোটে দেখা গেল একটা লাউডস্পিকার আছে। যদিও আমরা বেশ খানিকটা দূরেই ছিলাম, মাইকে পুলিশ কী বলছে তার দু-একটা টুকরো ঠিকই কানে এসে পৌঁছচ্ছিল। ডিঙির মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে যেখান থেকে এসেছে আবার সেখানেই ফেরত যেতে বলছিল ওরা। জবাবে নৌকোর লোকেরা কী বলল সেটা শুনতে পেলাম না, কিন্তু ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছিল পুলিশগুলোকে মিনতি করছে ওরা, বলছে ওদের যেতে দিতে মরিচঝাঁপিতে।

ফল হল উলটো। পুলিশের লোকগুলো ভয়ানক খেপে চিৎকার করতে লাগল। মাইকে। আচমকা, বাজ পড়ার মতো, একটা বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। শূন্যে গুলি ছুঁড়েছে পুলিশ।

এবার নিশ্চয়ই ফিরে আসবে নৌকোর লোকগুলো? মনে মনে আমরা সবাই চাইছিলাম ওরা ফিরে আসুক। কিন্তু তার বদলে যা হল সে একেবারে অপ্রত্যাশিত। হঠাৎ নৌকোর সব লোক এক সাথে গলা মিলিয়ে চিৎকার করতে শুরু করল : "আমরা কারা? বাস্তুহারা।"

জলের ওপর দিয়ে ভেসে আসা করুণ সেই চিৎকার শুনে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হল আমার। সেই মুহূর্তে মনে হল প্রতিবাদ নয়, এ যেন বিশ্বজগতের কাছে ওই মানুষগুলির ব্যাকুল জিজ্ঞাসা। যেন হতবুদ্ধি এই মানবজাতির হয়ে প্রশ্ন করছে ওরা। আমরা কারা? কোথায় আমাদের স্থান? সেই উচ্চারণ শুনতে শুনতে মনে হল ওরা তো আমারই হৃদয়ের গভীরতম অনিশ্চয়তার কথা বলছে—নদীর কাছে, স্রোতের কাছে। আমি কে? কোথায় আমার স্থান? কলকাতায় না এই ভাটির দেশে? ভারতে সীমান্তের ওপারে? গদ্যে না পদ্যে?

তারপর আমরা শুনতে পেলাম সে প্রশ্নের জবাব। নৌকো থেকে ভেসে এল কয়েকটা পুনরাবৃত্ত শব্দের একটা নতুন শ্লোগান : "মরিচঝাঁপি ছাড়ছি না, ছাড়ছি না, ছাড়ব না।"

ভটভটির ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলাম। অপূর্ব! যে জায়গা ছাড়তে প্রাণ চায় না সেই তো আমার দেশ।

ওদের চিৎকারে আমার ক্ষীণ কণ্ঠ মিলিয়ে আমিও বলে উঠলাম, "মরিচঝাঁপি ছাড়ব না!"

মোটরবোটের পুলিশগুলো উদ্বাস্তুদের ওই শ্লোগানের কী অর্থ করতে পারে সেটা ভাবার কথা আমার খেয়াল হয়নি। মিনিট কয়েক ধরে একই জায়গায় থেমে ছিল বোটটা; হঠাৎ দেখলাম ইঞ্জিন চালু করল। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে নৌকোটার থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। খানিকক্ষণ পর্যন্ত মনে হল মন গলেছে পুলিশদের, উদ্বাস্তুদের ডিঙিটাকে ওরা চলে যেতে

দেবে।

কিন্তু শিগগিরই ভুল ভাঙল। খানিকদূর যাওয়ার পর একটা চক্কর খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল বোটটা। তারপর হঠাৎ প্রচণ্ড গতিতে সোজা ছুটতে লাগল মানুষ আর মালপত্রে ভরা টলমলে নৌকোটার দিকে। ধাক্কাটা লাগল নৌকোর ঠিক মাঝখানটায়। চোখের সামনে কাঠের তক্তাগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে গেল চতুর্দিকে। জলের মধ্যে আঁকুপাকু করতে লাগল ডজন দুয়েক ছেলেবুড়ো মেয়েম।

হঠাৎ খেয়াল হল কুসুম আর ফকিরও তো থাকতে পারে ওদের মধ্যে। ধক করে উঠল আমার বুকের ভেতর।

আমরা চেঁচিয়ে আমাদের ভটভটিওয়ালাকে বললাম জায়গাটার আরেকটু কাছাকাছি যেতে—যদি একটু সাহায্য করতে পারি মানুষগুলোকে। ও একটু ইতস্তত করছিল, ভয় পাচ্ছিল যদি পুলিশ কিছু বলে। অনেক করে বোঝানো হল ভয়ের কোনও কারণ নেই, একদল স্কুলের মাস্টারমশাইকে পুলিশ কিচ্ছু বলবে না। অবশেষে রাজি হল ও।

আমরা এগোতে শুরু করলাম। খুব আস্তে আস্তে যেতে হচ্ছিল, পাছে জলের মধ্যে কারও সঙ্গে ধাক্কা লেগে যায়। ভটভটির ওপর থেকে হাত বাড়িয়ে দিলাম ভাসন্ত লোকগুলির দিকে। একজন দু'জন করে ডজনখানেক লোককে টেনে তোলা হল। ভাগ্যক্রমে জল খুব একটা গভীর ছিল না, অনেকেই তার মধ্যে পাড়ে গিয়ে উঠে পড়েছে।

ভটভটিতে টেনে তোলা একটা লোককে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কুসুম মণ্ডলকে চেনো? ও কি ওই নৌকোয় ছিল?" দেখা গেল লোকটা চেনে কুসুমকে। মাথা নাড়ল ও। কুসুম মরিচঝাঁপিতেই আছে। প্রচণ্ড একটা স্বস্তিতে অবসন্ন হয়ে গেল শরীর। কিন্তু দ্বীপের ওপর ঘটনা যে কোন দিকে মোড় নিচ্ছে সে তখন আমি কিছুই জানি না।

এদিকে পুলিশের লোকগুলো তো তেড়ে এল আমাদের দিকে। ধমকে জিজ্ঞেস করল, "কে আপনারা? কী করছেন এখানে?"

আমাদের কোনও কথাতেই কান দিল না ওরা। বলল পুরো এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি আছে, বেআইনি জমায়েতের জন্য গ্রেফতার হয়ে যেতে পারি আমরা।

গুটিয়ে গেলাম আমরা। সবাই সাধারণ ইস্কুলমাস্টার, অনেকেরই বউ-বাচ্চা আছে; চুপচাপ পাড়ে গিয়ে জল থেকে টেনে তোলা মানুষগুলোকে নামিয়ে দিয়ে রওয়ানা হলাম ঘরের দিকে।

কলমের কালি ফুরিয়ে গেছে, পেন্সিলের টুকরোটার যেটুকু বাকি আছে এবার সেটা দিয়ে লিখছি। বাইরে পায়ের শব্দ শুনলেই মনে পড়ে যাচ্ছে যে-কোনও সময় কুসুম আর হরেন ফিরে আসবে, আর এসেই তক্ষুণি রওনা হয়ে পড়তে চাইবে হরেন। কিন্তু থামার উপায় নেই আমার। এখনও কত কী বলা বাকি রয়ে গেছে।

কথা

ছাদের ঘরের নিশ্চিন্ত আরামে বসে রাতের খাওয়ার কথা ভুলেই গিয়েছিল কানাই। কম্পাউন্ডের জেনারেটর থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলোটা যখন নিভে গেল তখনও ও একমনে লেখাটা পড়ছে। আলো নিভতে মনে পড়ল ঘরের কোথাও একটা কেরোসিনের লক্ষ রয়েছে। অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে সেটা খুঁজছে কানাই, এমন সময় কার যেন পায়ের শব্দ পাওয়া গেল দরজার কাছে।

"কানাইবাবু?"

হাতে একটা মোমবাতি নিয়ে ময়না দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। "দেশলাই লাগবে?" জিজ্ঞেস করল কানাইকে। "আমি তো টিফিন ক্যারিয়ারটা নিয়ে যেতে এসেছিলাম। দেখলাম আপনি এখনও খাননি।"

"নীচেই যাচ্ছিলাম আমি," বলল কানাই। "এ ঘরে কোথায় একটা হারিকেন ছিল না? খুঁজে পাচ্ছি না।"

"ওই তো ওখানে।"

মোমবাতি হাতে হারিকেনের কাছে গিয়ে কাঁচটা খুলে ফেলল ময়না। পলতেটা জ্বালাতে যেতেই হাত পিছলে গেল। মোমবাতি হারিকেন দুটোই ছিটকে পড়ল মাটিতে। চুরমার হয়ে গেল কাঁচটা আর কেরোসিনের কটু গন্ধে ভরে গেল সারা ঘর। মোমবাতিটা গড়াতে গড়াতে চলে গেল ঘরের এক কোণে। শিখা নিভে গেলেও সলতের ডগায় একটু লাল আভা তখনও দেখা যাচ্ছে। "জলদি!" মেঝের উপর উবু হয়ে বসে পড়ে মোমটার দিকে হাত বাড়াল কানাই। "পলতেটা টিপে নিভিয়ে দাও। নইলে কেরোসিনে আগুন ধরে সারা বাড়ি জ্বলে যাবে এক্ষুনি।"ময়নার হাত থেকে মোমবাতিটা নিয়ে বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মধ্যে টিপে নিজেই পলতেটা নিভিয়ে ফেলল কানাই। "যাক, নিভে গেছে। এবার কাঁচের টুকরোগুলো পরিষ্কার করতে হবে।"

"সে আমি করছি কানাইবাবু।"

"দু'জনে মিলে করলে তাড়াতাড়ি হবে।" ময়নার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে হাত দিয়ে সাবধানে মেঝেটা মুছতে লাগল কানাই।

"খাবারটা তো ঠান্ডা হয়ে গেল কানাইবাবু," বলল ময়না। "খেয়ে নেননি কেন?"

"কালকের জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম," কানাই বলল। "ভোরবেলাতেই বেরিয়ে পড়তে হবে তো। আমিও যাচ্ছি, জানো কি?"

"জানি। মাসিমা বলেছেন। আপনি যাবেন শুনে আমি একটু খুশি হয়েছি।"

"কেন? আমার জন্যে খাবার আনতে আর ভাল লাগছে না?"

"না না," বলল ময়না। "সে জন্যে নয়।"

"তা হলে?"

"আপনিও ওদের সঙ্গে যাবেন সেটা জেনেই অনেকটা শান্তি পেয়েছি। ওরা একা থাকবে না।"

"কারা?"

"ওরা দু'জন," হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল ময়নার গলা।

"মানে ফকির আর পিয়া?"

"আর কে? যখন শুনলাম আপনি ওদের সঙ্গে যাবেন, এত নিশ্চিন্ত লাগল যে কী বলব। সত্যি কথা বলতে কী, আমি ভাবছিলাম যদি আপনি ওর সঙ্গে একটু কথা বলেন..."

"ফকিরের সঙ্গে? কী ব্যাপারে কথা বলব?"

"ওই যে, ওই মেমসাহেব মেয়েটার ব্যাপারে। আপনি যদি ওকে একটু বুঝিয়ে বলেন, মেয়েটা এখানে শুধু ক'দিনের জন্যে এসেছে, আবার ফিরে চলে যাবে..."

"কিন্তু সে কথা তো ফকির জানে। জানে না?"

অন্ধকারের মধ্যে শাড়ির খসখস শব্দ শোনা গেল। কাপড়টা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিল ময়না। "তাও, আপনার কাছ থেকে একবার শুনলে ভাল হবে, কানাইবাবু। কে জানে মনে মনে কী সব ভেবে বসে আছে ও। এত এত টাকা দিচ্ছে তো। ওই মেয়েটার সঙ্গেও যদি একটু কথা বলতে পারেন ভাল হয়। যদি একটু বুঝিয়ে বলেন, এরকমভাবে মাথা ঘুরিয়ে দিলে ফকিরের তাতে ভাল হবে না।"

"কিন্তু আমাকে কেন বলছ ময়না?" আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল কানাই। "আমি কী বলব বল?"

"কানাইবাবু, এখানে তো আপনিই শুধু ওদের দুজনের সঙ্গে কথা বলতে পারেন ফকিরের সঙ্গেও পারেন, আর ওই মেয়েটার সঙ্গেও পারেন। আপনিই তো ওদের দু'জনের মাঝখানে আছেন। আপনিই তো ওদের একজনের কথা শুনে আরেকজনকে বলবেন। আপনাকে ছাড়া ওদের কেউ তো জানতেই পারবে না অন্যজনের মনে কী আছে। এখন সবই আপনার হাতে কানাইবাবু। আপনি যা ইচ্ছে করবেন তাই বলাতে পারবেন ওদের মুখ দিয়ে।"

"আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না ময়না," ভুরু কুঁচকে বলল কানাই। "কী বলতে চাইছ তুমি বলো তো? কীসের ভয় পাচ্ছ তুমি?"

"ও একটা মেয়ে, কানাইবাবু," প্রায় ফিসফিস করে বলল ময়না। "আর ফকির একটা পুরুষ মানুষ।"

অন্ধকারের মধ্যে ময়নার দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইল কানাই। "আমিও তো একটা পুরুষ মানুষ, ময়না। তোমার কি মনে হয়, আমার কিংবা ফকিরের মধ্যে একজনকে যদি বেছে নিতে হয়, ও কাকে পছন্দ করবে?"

হ্যাঁ না কিছুই জবাব দিল না ময়না। ধীরে ধীরে বলল, "আমি কী করে বলব কানাইবাবু, কী আছে ওর মনে?"

ময়নার কথায় দ্বিধার সুরে একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল কানাই। "আর তুমি? যদি সম্ভব হত তুমি কাকে বেছে নিতে আমাদের দু'জনের মধ্যে, ময়না?"

"কী বলছেন আপনি কানাইবাবু? ফকির আমার স্বামী," শান্ত গলায় জবাব দিল ময়না। কিন্তু কানাই হাল ছাড়ার পাত্র নয়। "তুমি তো এত বুদ্ধিমতী মেয়ে ময়না, কত কী করতে পারো, ফকিরের কথা তুমি ভুলে যাও। তুমি বুঝতে পারছ না, ওর সঙ্গে থাকলে তুমি জীবনে কিছুই করে উঠতে পারবে না?"

"ও আমার ছেলের বাবা কানাইবাবু," বলল ময়না। "আমি ওকে ছেড়ে যেতে পারি না। আমি যদি চলে যাই তা হলে ওর কী হবে?"

হাসল কানাই। "ঠিক আছে, ও তোমার স্বামী কিন্তু তা হলে তুমি নিজে কেন ওর সঙ্গে কথা বলতে পারছ না? এই কাজটা কেন তোমার হয়ে আমাকে করে দিতে হবে?"

"ও আমার স্বামী, সেইজন্যেই এই নিয়ে ওর সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি না কানাইবাবু," শান্তভাবে জবাব দিল ময়না। "একজন বাইরের লোকের সঙ্গেই শুধু এসব নিয়ে কথা বলা যায়।"

"তুমি নিজে যেটা করতে পারছ না সেটা একজন বাইরের লোক কী করে পারবে?"

"পারবে কানাইবাবু," ময়না বলল। "কারণ মুখের কথা হল গিয়ে বাতাসের মতন। যখন হাওয়া দেয় তখন দেখবেন জলের ওপরে কেমন ঢেউ ওঠে। আসল নদীটা থাকে তার নীচে— তাকে দেখাও যায় না শোনাও যায় না। নদীর ভেতর থেকে কিন্তু হাওয়া দিয়ে ঢেউ তোলা যায় না। সেটা করা যায় বাইরে থেকে। সেটা করার জন্যেই আপনার মতো কাউকে আমার দরকার।"

আবার হেসে উঠল কানাই। "মুখের কথা বাতাসের মতো হতে পারে ময়না, কিন্তু সে কথার মারপ্যাঁচ তো দেখছি তোমার দিব্যি জানা আছে।"

উঠে পড়ে টেবিলটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল কানাই। "আচ্ছা, সত্যি করে বলো তো ময়না, তোমার কি কখনও মনে হয় না অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে যদি তুমি থাকতে তা হলে কেমন

হত? কখনও কৌতূহল হয় না তোমার?"

একটা হালকা ঠাট্টার সুর ছিল কানাইয়ের কথাটার মধ্যে। ঠিক সেটাই দরকার ছিল ময়নাকে উশকে দেওয়ার জন্য। চটে উঠল ময়না। "আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছেন, তাই না কানাইবাবু? আপনি চান আমি একবার হা বলি, আর তাই নিয়ে আপনি মজা করবেন। সব লোককে বলে বেড়াবেন আমি এরকম বলেছি, তাই না? আমি গাঁয়ের মেয়ে হতে পারি, কিন্তু এত বোকা নই যে আপনার এই কথার জবাব দেব। যে মেয়ের সঙ্গেই আপনার দেখা হয় তার সঙ্গেই আপনি এই খেলা খেলেন–ঠিক বুঝতে পেরেছি আমি।"

ঠিক জায়গায় ঘা লাগল ময়নার এই শেষ কথাটায়। একটু যেন কুঁকড়ে গেল কানাই। তড়িঘড়ি বলল, "ময়না, শোনো, রাগ কোরো না–আমি খারাপ কিছু বলতে চাইনি।"

শাড়ির খসখস শব্দ শোনা গেল আবার। উঠে পড়ে এক টানে দরজাটা খুলে ফেলল ময়না। তারপর অন্ধকারের মধ্যেই কানাই শুনতে পেল ও বলছে, "ওই মেমসাহেবের সঙ্গে মনে হয় আপনার ভালই জমবে কানাইবাবু। সেটা হলেই আমাদের সকলের মঙ্গল।"

অপরাধ

বেশ কয়েকদিন ধরে চলল পুলিশি অবরোধ। পুরো ব্যাপারটাই আমাদের হাতের বাইরে, কিছুই করতে পারছি না, শুধু শুনতে পাচ্ছি নানারকম গুজব—কানে আসছে খুব সাবধানে খরচ করা সত্ত্বেও খাবার-দাবার সব শেষ হয়ে গেছে, খিদের জ্বালায় অনেকে নাকি ঘাস পর্যন্ত খাচ্ছে। সব টিউবওয়েলগুলো ভেঙে দিয়েছে পুলিশ, দ্বীপে কোনও খাওয়ার জল পাওয়া যাচ্ছে না। তেষ্টায় লোকে পুকুর-ডোবার জল খাচ্ছে, ফলে নাকি মারাত্মক কলেরা ছড়িয়ে পড়েছে মরিচঝাঁপিতে।

একদিন অবশেষে উদ্বাস্তুদের একজন পুলিশের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে এল। সাঁতরে পার হয়ে গেল গারল নদী—নিঃসন্দেহে খুবই বীরত্বব্যঞ্জক কাজ। কিন্তু তাতেই সে থেমে থাকল না। বহু কষ্ট করে শেষে গিয়ে পৌঁছল কলকাতায়। সেখানকার সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা করে তাদের সমস্ত বৃত্তান্ত জানাল। পুরো ব্যাপারটা ফলাও করে ছাপা হল খবরের কাগজে। হুলুস্থুল পড়ে গেল চারদিকে। নাগরিক মঞ্চগুলি নানা জায়গায় আপিল করল, তুমুল হইচই হল বিধানসভায়, শেষে হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়াল ব্যাপারটা। আদালত রায় দিল এভাবে দ্বীপবাসীদের ঘেরাও করে রাখা বেআইনি, অবিলম্বে অবরোধ ওঠাতে হবে সরকারকে।

মনে হল একটা বড় জিত হল উদ্বাস্তুদের। খবরটা যেদিন আমাদের কাছে পৌঁছল, তার পরদিন দেখি বাঁধের কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে হরেন। মুখ ফুটে কিছু বলতে হল না—ঝোলা গুছিয়ে নিয়ে গুটিগুটি গিয়ে চেপে বসলাম ওর নৌকোয়। তারপর রওয়ানা দিলাম।

মনের মধ্যে তখন বেশ একটা ফুরফুরে ভাব। ভাবছি মরিচঝাঁপি গিয়ে নিশ্চয়ই দেখব মোচ্ছব চলছে, সকলে জয়ের আনন্দে মাতোয়ারা। কিন্তু পৌঁছে দেখি চিত্রটা একেবারেই অন্যরকম। এ কয়দিনের ঝড়ের আঘাতটা মারাত্মকভাবে লেগেছে মরিচঝাঁপিতে। তা ছাড়া অবরোধ উঠলেও পুলিশরা কিন্তু চলে যায়নি। এখনও তারা দ্বীপে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, সকলকে বলছে দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে।

কুসুমকে দেখে তো বুক ফেটে গেল আমার। শুকিয়ে কাঠির মতো হয়ে গেছে শরীর, চামড়া কুঁড়ে বেরিয়ে আসা হাড়গুলো যেন গোনা যায়। এত দুর্বল যে মাদুর ছেড়ে ওঠার ক্ষমতাটুকুও নেই। বরং ফকিরের ওপর দেখা গেল ততটা লাগেনি অবরোধের ধাক্কা—বাচ্চা বলেই হয়তো। ওই দেখাশোনা করছে মায়ের।

দেখেশুনে আমার মনে হল ফকির যাতে খেতে পায় সেইজন্য এই কয়দিন নিজে কিছু খায়নি কুসুম। কিন্তু দেখা গেল ব্যাপারটা অতটা সরল নয়। বেশিরভাগ সময়টাতেই কুসুম ফকিরকে ঘরে আটকে রাখার চেষ্টা করেছে, চারিদিকে থিকথিকে পুলিশের মধ্যে বাইরে যেতে দিতে চায়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কঁক-ফোকর খুঁজে ফকির মাঝে মাঝেই বেরিয়ে গেছে, কখনও কয়েকটা কাঁকড়া, কখনও বা কিছু মাছ ধরে নিয়ে এসেছে। তার অধিকাংশটা কুসুম ওকেই খাইয়ে দিয়েছে। আর নিজে খেয়েছে একরকমের বুনো শাক—এখানকার লোকেরা তাকে বলে জাদু পালং। প্রথম প্রথম খেতে মন্দ লাগেনি। কিন্তু তারপর বোঝা গেল কী মারাত্মক ছিল সেই শাক। ভয়ানক পেটের গণ্ডগোল হল কুসুমের ওটা খেয়ে। একেই তো কয়েকদিন কোনও পুষ্টিকর খাবার পেটে পড়েনি, তার ওপর এই পেট খারাপ। সেইজন্যই এইরকম দশা দাঁড়িয়েছে কুসুমের।

ভাগ্যিস বুদ্ধি করে কিছু রসদ সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম আমরা খানিকটা চাল ডাল আর তেল। কুসুমের ঝুপড়ির মধ্যে এখন সেগুলি ঠিকমতো গুছিয়ে রাখতে লাগলাম। কিন্তু কুসুম সেসব কিছুই খাবে না। কোনওরকমে মাদুর থেকে উঠে একটা ব্যাগ টেনে তুলল নিজের কাঁধে, হরেন আর ফকিরকে বলল বাকিগুলো তুলে নিতে।

"আরে দাঁড়া দাঁড়া, কী করছিস তুই?" ভীষণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি। "কোথায় যাচ্ছিস এগুলো নিয়ে? এ তো আমরা তোর জন্যে নিয়ে এসেছি।"

"আমি তো এগুলো রাখতে পারব না সার। এখন সব খাবার-দাবার খুব হিসেব করে খরচ

করছি আমরা এখানে। এগুলো নিয়ে গিয়ে আমাদের পাড়ার নেতার কাছে জমা করতে হবে এক্ষুনি।”

যুক্তিটা আমি বুঝতে পারলাম। কিন্তু তাও অনেক করে বোঝালাম কুসুমকে—সবকিছু ভাগ করে খাওয়া হচ্ছে বলে যে সমস্তটাই উজাড় করে দিয়ে দিতে হবে তার কোনও মানে নেই। এর থেকে দু'-এক মুঠো চাল ডাল আলাদা করে রেখে দেওয়াটা কিছু অনৈতিক হবে না। বিশেষ করে ও যখন একটা বাচ্চার মা। তার দেখাশোনাও তো ওকে করতে হবে।

আমরা কাপে করে মেপে খানিকটা চাল ডাল তুলে রাখছি দেখে কাঁদতে শুরু করে দিল কুসুম। ওর সেই চোখের জল দেখে যেন একটা ঝাঁকুনি লাগল আমার আর হরেনের। এত ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও যে কুসুম সাহস আর মনোবল হারায়নি, তাকে এমন করে ভেঙে পড়তে দেখাটা বুকে শেল বেঁধার মতো যন্ত্রণাদায়ক। মায়ের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরল ফকির, আর পাশে বসে কুসুমের কাঁধে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল হরেন। আমি বসে রইলাম স্থাণু হয়ে। আমার তো কিছু দেওয়ার নেই এখানে, শুধু মুখের কথা ছাড়া।

“কী হল কুসুম?” জিজ্ঞেস করলাম আমি। “কী ভাবছিস রে?”

“কী জানেন সার,” আঁচলে চোখ মুছে বলল কুসুম, “খিদে-তেষ্টাটা তবু সহ্য হয়, কিন্তু তার চেয়েও বেশি কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে এই ক'দিনে। এই ঝুপড়ির মধ্যে অসহায়ভাবে বসে বসে শোনা—বাইরে পুলিশের দল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, বারবার মাইকে বলছে আমাদের প্রাণের দাম এক কানাকড়িও নয়—সে যে কী ভয়ংকর সে আপনাকে কী বলব। বসে বসে খালি শুনেছি, এই দ্বীপকে রক্ষা করতে হবে গাছেদের জন্য, বন্য পশুদের জন্য। এই দ্বীপ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সম্পত্তি, ব্যাঘ্র প্রকল্পের অংশ। সারা পৃথিবীর মানুষের পয়সায় এই প্রকল্প চলছে। প্রতিদিন খালি পেটে এখানে বসে বসে কতবার যে এই কথাগুলো শুনতে হয়েছে তার কোনও হিসেব নেই। মনে মনে ভেবেছি কারা এইসব লোক, যারা এত ভালবাসে বনের পশুদের যে তাদের জন্যে আমাদের মেরে ফেলতেও কোনও আপত্তি নেই? তারা কি জানে তাদের নাম করে কী করা হচ্ছে এখানে? কোথায় থাকে এই মানুষেরা? তাদের ঘরে কি ছেলেমেয়ে আছে? মা আছে? বাবা আছে? যত ভেবেছি তত মনে হয়েছে এই গোটা পৃথিবীটাই জন্তু জানোয়ারদের জায়গা হয়ে গেছে; আর আমাদের দোষ, আমাদের অপরাধ যে আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি, যেভাবে সবসময় মানুষ বাঁচার চেষ্টা করেছে, সেভাবে এই জল মাটির ওপর নির্ভর করে বাঁচতে চেয়েছি। সেই বাঁচার চেষ্টাকে যদি কেউ অপরাধ বলে মনে করে তা হলে সে ভুলে গেছে এভাবেই মানুষ বেঁচে এসেছে এতটা কাল মাছ ধরে, জঙ্গল সাফ করে আর সেই জমিতে চাষ করে।”

কথাগুলো শুনে আর ওর ভাঙাচোরা মুখটা দেখে এত খারাপ লাগল আমার—এই অকর্মণ্য সাধারণ ইস্কুল মাস্টারের—যে মাথাটা ঘুরতে শুরু করল হঠাৎ। মাদুরের ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়তে হল আমাকে।

বিদায় লুসিবাড়ি

গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে হাসপাতালের রাস্তা ধরে কানাই যখন হাঁটতে শুরু করল লুসিবাড়ি তখন ভোরের কুয়াশায় ঢাকা। এই সাতসকালেও দেখা গেল একটা সাইকেল ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে গেটের সামনে। সেটাকে নিয়ে আবার গেস্ট হাউসে ফিরল কানাই। পিয়া আর ভ্যানওয়ালার সঙ্গে হাত লাগিয়ে মালপত্রগুলো তুলে ফেলল ভ্যানের পিছনে। মালপত্র বলতে খুব একটা বেশি কিছু না—কানাইয়ের সুটকেস, পিয়ার পিঠব্যাগ দুটো, আর গেস্ট হাউস থেকে ধার করা বালিশ কম্বলের একটা বান্ডিল।

বেশ জোরেই চলছিল ভ্যানটা। খানিকক্ষণের মধ্যেই গ্রামের সীমানায় এসে পড়ল ওরা। বাঁধের কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ সামনের দিকে ইশারা করল ভ্যানওয়ালা। "ওই দেখুন, কী যেন একটা হচ্ছে ওখানে, ওই বাঁধের ওপরে।"

ভ্যানের তক্তার ওপর পা ঝুলিয়ে পেছন ফিরে বসেছিল কানাই আর পিয়া। ভ্যানওয়ালার কথা শুনে গলা বাড়িয়ে কানাই দেখল বাঁধের একেবারে ওপরে বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছে। মনে হল ওপারে কিছু একটা হচ্ছে কোনও প্রতিযোগিতা বা ওইরকম একটা কিছু। ভিড়ের সবাই মন দিয়ে দেখছে, কেউ কেউ মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠছে, মনে হল যেন উৎসাহ দিচ্ছে কাউকে। মালপত্র ভ্যানে রেখে কানাই আর পিয়াও উঠল বাঁধের ওপর, কী হচ্ছে দেখে আসতে।

ভাটা পড়ে গেছে। চড়াটার একেবারে শেষে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে মেঘা। পাশে ফকিরের ডিঙি। সেটাই দেখা গেল সম্মিলিত জনতার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। নৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে ফকির আর টুটুল। তাদের পাশে হরেন আর তার সেই তেরো-চোদ্দো বছরের নাতি। একটা মাছধরা সুতোকে প্রাণপণে টেনে ধরে আছে ওরা। টানটান সুতোটা চিকচিক করছে আলো লেগে, তীব্র গতিতে জল কেটে এঁকেবেঁকে ছুটছে ডাইনে বাঁয়ে।

লোকজনকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল একটা শঙ্করমাছ গেঁথেছে ফকিরের বঁড়শিতে। কানাই আর পিয়ার চোখের সামনেই হঠাৎ ছাই রঙের চ্যাপটা জীবটা এরোপ্লেনের মতো ছিটকে উঠে এল জল থেকে। ফকিররা সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে গিয়ে ধরল সেটাকে। মনে হল যেন বিশাল একটা ঘুড়িকে টেনে নামিয়ে আনার চেষ্টা করছে। হাতে গামছা জড়িয়ে সর্বশক্তিতে মাছটাকে ধরে রেখেছে ওরা। আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে আসছে প্রাণীটার আছাড়ি পিছাড়ি। শেষ পর্যন্ত ডিঙির কিনার দিয়ে ঝুঁকে পড়ে দায়ের এক কোপে মাছটার ভবলীলা সাঙ্গ করল ফকির।

শিকার ডাঙায় এনে ফেলার পর ভিড় করে সেটাকে ঘিরে দাঁড়াল সবাই। পিয়া আর কানাইও গেল দেখতে। পাখনাগুলো মেলে ধরার পর দেখা গেল প্রায় মিটার দেড়েকের মতো চওড়া মাছটা। লেজের দৈর্ঘ্য মোটামুটি তার অর্ধেক। ওরা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই একজন মাছওয়ালা দর দিল ওটাকে কেনার জন্য। রাজি হয়ে গেল ফকির। কিন্তু মাছটা নিয়ে যাওয়ার আগে দায়ের এক কোপে লেজটা কেটে নিয়ে ফকির টুটুলকে দিল সেটা। দেওয়ার ভঙ্গিটার মধ্যে এমন একটা আড়ম্বরের ভাব ছিল যে মনে হল যেন কোনও যুদ্ধ জয় করে আনা রত্নভাণ্ডার ছেলের হাতে তুলে দিচ্ছে ফকির।

"টুটুল ওটা দিয়ে কী করবে?" জিজ্ঞেস করল পিয়া।

"খেলবে-টেলবে আর কী," জবাব দিল কানাই। "আগেকার দিনে রাজা জমিদাররা এই শঙ্করমাছের লেজের চাবুক দিয়ে অবাধ্য প্রজাদের শাসন করত। ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার। কিন্তু খেলনা হিসেবে জিনিসটা মন্দ নয়। আমারও একটা ছিল ছোটবেলায়।"

টুটুল তখনও মুগ্ধ হয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে লেজটাকে, এমন সময় ভিড় ঠেলে হঠাৎ ময়না এসে দাঁড়াল ওর সামনে। ঘাবড়ে গিয়ে একছুটে মায়ের নাগালের বাইরে পালাল টুটুল, গিয়ে লুকোল ফকিরের পেছনে। ছেলের গায়ে লেগে যাবে ভয়ে দু'হাতে রক্তমাখা দা-টা মাথার ওপরে তুলে ধরল ফকির। আর মায়ের হাত এড়িয়ে বাপের চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচতে

লাগল টুটুল। ভিড়ের সমস্ত লোক হো হো করে হেসে উঠল দৃশ্যটা দেখে।

ডিউটিতে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে বেরিয়েছে ময়না। পরনে নার্সের পোশাক—নীল পাড় সাদা শাড়ি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টুটুলকে যখন ও ধরতে পারল, শাড়ি ততক্ষণে জলে কাদায় মাখামাখি। এত লোকের সামনে অপদস্থ হয়ে ঠোঁটদুটো অল্প অল্প কঁপছে ময়নার। ফকিরের দিকে ঘুরে তাকাল ও। চোখ নামিয়ে ফেলল ফকির। দা থেকে মুখের ওপর গড়িয়ে পড়া একটা রক্তের ফোঁটা মুছে নিল হাতের পেছনে।

"তোমাকে বলেছিলাম না ওকে সোজা স্কুলে নিয়ে যেতে?" ঝাঝালো গলায় বলল ময়না। "তুমি ওকে এখানে নিয়ে চলে এসেছ?"

ছেলের হাত থেকে শঙ্করমাছের লেজটা ছিনিয়ে নিল ও। বিষম খাওয়ার মতো একটা সম্মিলিত আওয়াজ উঠল ভিড় থেকে। একটানে লেজটাকে নদীর মধ্যে ছুঁড়ে দিল ময়না। মুহূর্তে স্রোতের টানে মিলিয়ে গেল ফকিরের বিজয়স্মারক। তারপর হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে চলল টুটুলকে। কান্নায় মুচড়ে গেল ছেলেটার মুখ। চোখদুটো চেপে বন্ধ করে চলতে লাগল মায়ের পেছন পেছন, যেন জোর করে দৃষ্টির আড়াল করে দিতে চাইছে চারপাশের সবকিছুকে।

কানাইয়ের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সামান্য কমে এল ময়নার চলার গতি। মুহূর্তের জন্য একবার চোখাচোখি হল দু'জনের। তারপর ছেলের হাত ধরে একদৌড়ে বাঁধের গা বেয়ে নেমে গেল ও। ময়না চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার পর ফিরে তাকাল কানাই। দেখল ফকির একদৃষ্টে চেয়ে আছে ওর দিকে, মেপে নিচ্ছে ওকে। মনে হল কানাইয়ের সঙ্গে ময়নার নির্বাক ভাব বিনিময় নজরে পড়েছে ফকিরের—মনে মনে বোঝার চেষ্টা করছে তার মানেটা।

হঠাৎ খুব অস্বস্তি হতে লাগল কানাইয়ের। তাড়াতাড়ি পিয়ার দিকে ফিরে ও বলল, "চলুন, মালপত্রগুলো নামিয়ে ফেলি গিয়ে।"

ধকধক দমদম আওয়াজ তুলল ইঞ্জিন। ধীরে ধীরে লুসিবাড়ির চর ছেড়ে সরে যেতে লাগল মেঘা, আর ভটভটিটার পেছন পেছন দমকে দমকে এগোতে লাগল ফকিরের ডিঙি। মেঘার ইঞ্জিনের গতি বদলের সঙ্গে সঙ্গে এক-একবার টান পড়ছে ডিঙিতে বাঁধা দড়িতে, পরক্ষণেই আবার ঢিলে হয়ে যাচ্ছে। এই এলোমেলো গতিতে হঠাৎ ধাক্কা-টাক্কা যাতে না-লেগে যায়। সেজন্য ভটভটিতে না উঠে ডিঙিতেই রয়ে গেল ফকির। হাতে একটা লগি নিয়ে বসে রইল নৌকোর গলুইয়ে—ভটভটির খুব কাছে চলে এলে লগি দিয়ে ঠেলে সরিয়ে নিয়ে আসবে ডিঙিটাকে।

মেঘার ওপরের ডেকে সারেং-এর ঘরের পাশে দুটো উঁচু কাঠের চেয়ার রাখা, তারই একটায় গিয়ে বসেছিল কানাই। মাথার ওপর রোদ আড়াল করার জন্য একটা তেরপল টাঙানো। নির্মলের নোটবইটা কোলের ওপর খুলে রেখেছে কানাই, কিন্তু পড়ছে না। সার্ভের কাজের জন্য জিনিসপত্র গুছিয়ে তৈরি হচ্ছে পিয়া, তাকিয়ে তাকিয়ে তা-ই দেখছে ও।

গলুইয়ের সামনের দিকটা যেখানটায় একটু ছুঁচোলো হয়ে সামনে এগিয়ে গেছে, একেবারে তার কাছটায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল পিয়া। রোদ-হাওয়ার মুখোমুখি। ঠিকমতো দাঁড়িয়ে প্রথমে দূরবিনটা ঝুলিয়ে নিল গলায়, তারপর অন্য যন্ত্রপাতির বেল্টটা বাঁধতে লাগল। বেল্টের একদিকে লাগানো রয়েছে ক্লিপবোর্ড, আর অন্যদিকে ঝুলছে দু'খানা যন্ত্র—জিপিএস ট্র্যাকার আর ডেথ সাউন্ডার। বেল্ট-টেল্ট বাঁধা হয়ে গেলে তারপর দূরবিনটা তুলে নিয়ে চোখে লাগাল পিয়া। পা দুটো অনেকখানি ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে, অল্প অল্প দুলছে ভটভটির দুলুনির সাথে সাথে। একমনে জলের দিকেই তাকিয়ে যদিও, কিন্তু কানাই বুঝতে পারছিল চারপাশে যা যা হচ্ছে—নৌকোর ওপরে কি নদীর পাড়ে—সবকিছুর প্রতিই বেশ সতর্ক রয়েছে পিয়া।

সূর্য যত ওপরে উঠতে লাগল ততই বাড়তে থাকল জলের ওপর থেকে ঠিকরে আসা আলোর তীব্রতা। বেলার দিকে একটা সময়ে সেই জোরালো বিচ্ছুরণে মুছে গেল জল আর

আকাশের সীমারেখা। সানগ্লাস পরেও নদীর দিকে বেশিক্ষণ চোখ রাখা যায় না। পিয়া কিন্তু নির্বিকার। কী আলো, কী হাওয়া, কিছুতেই যেন কিছু আসে যায় না ওর। ভটভটির ঝাঁকুনি সামলানোর জন্য হাঁটুদুটো একটু ভাজ করে দাঁড়িয়ে কাজ করে যাচ্ছে একটানা, শরীরটা অল্প দুলছে পাশাপাশি, মনে হচ্ছে যেন খেয়ালই করছে না ঢেউয়ের দুলুনি। এতক্ষণে একটাই শুধু আপোশ করেছে—রোদ আড়াল-করা একটা টুপি বের করে পরে নিয়েছে মাথায়। তেরপলের আড়ালে বসে আলোর বিপরীতে ছায়ার মতো পিয়ার শরীরটা দেখতে পাচ্ছিল কানাই, চওড়া কানাওয়ালা টুপি আর যন্ত্রপাতি-ঝোলানো বেল্ট সমেত অনেকটা আমেরিকান কাউবয়দের মতো মনে হচ্ছিল ওর চেহারাটাকে।

বেলার দিকে হঠাৎ একবার একটু উত্তেজনার সঞ্চার হল বোটে। শোনা গেল ডিঙি থেকে চিৎকার করছে ফকির। ইশারায় হরেনকে ইঞ্জিন বন্ধ করতে বলে ডেকের পেছন দিকটায় দৌড় লাগাল পিয়া। কানাইও ছুটল পেছন পেছন, কিন্তু যতক্ষণে ও গিয়ে পৌঁছেছে তখন আর দেখার মতো কিছুই নেই।

"কী হল বলুন তো?"

একটা ডেটাশিটের ওপর ব্যস্ত হয়ে কীসব লিখে চলছিল পিয়া, মুখ তুলে তাকাল না। "ফকির একটা গ্যাঞ্জেটিক ডলফিন দেখতে পেয়েছে," লিখতে লিখতেই জবাব দিল ও। "ভটভটির ডানদিকে, শ' দুয়েক মিটার পেছনে। এখন আর চেষ্টা করে লাভ নেই, দেখতে পাবেন না। এতক্ষণে সাবধান হয়ে গেছে ওটা।"

পিয়ার গলায় সামান্য একটু হতাশা লেগে রয়েছে মনে হল কানাইয়ের। "এটাই কি প্রথম আজকে?"

"হ্যাঁ," উৎসাহের সুরে জবাব দিল পিয়া। "এটাই প্রথম। তাতে অবশ্য আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। যা আওয়াজ।"

"ওরা কি ভটভটির শব্দে ভয় পেয়ে গেছে মনে হয়?"

"হতেই পারে," পিয়া বলল। "আবার এরকমও হতে পারে যে আওয়াজটা মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত জলের নীচে ডুব দিয়ে থাকছে। যেমন ধরুন এই ডলফিনটা—আমরা ওটাকে পেরিয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে আসার পর জল থেকে মাথা তুলল ও।"

"আচ্ছা, আগে কি এখানে আরও বেশি ডলফিন দেখা যেত?"

"সে তো যেতই," বলল পিয়া। "এইসব অঞ্চলের নদী-নালায় বিভিন্ন প্রজাতির জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণী একসময় গিজগিজ করত। পুরনো তথ্য ঘাঁটলেই সে বিষয়ে নানা খোঁজখবর পাওয়া যায়।"

"তারা সব গেল কোথায়?"

"ব্যাপারটা কী জানেন, পরিবেশের পরিবর্তনের জন্যেই মনে হয় ডলফিনের সংখ্যা ক্রমশ কমে এসেছে এখানে। হয়তো আচমকা বড় রকমের কিছু একটা ঘটেছিল কোনও সময়।"

"তাই?" বলল কানাই। "আমার মেসোরও এইরকমই একটা ধারণা ছিল।"

"ধারণাটা ভুল ছিল না," পিয়া একটু গম্ভীর। "একটা স্থায়ী বসবাসের জায়গা ছেড়ে যদি চলে যেতে শুরু করে এইরকম প্রাণীরা, বুঝতে হবে কোথাও খুব, খুব সাংঘাতিক কিছু একটা গোলমাল হয়েছে।"

"সে গোলমালটা কী হতে পারে বলে মনে হয় আপনার?"

"কোথা থেকে শুরু করি বলুন তো?" একটু শুকনো হেসে জিজ্ঞেস করল পিয়া। "বাদ দিন সেসব কথা। এই ইতিহাস ঘাঁটতে শুরু করলে চোখের জল সামলানো মুশকিল।"

খানিক পরে একটু জল খেয়ে নেওয়ার জন্যে পিয়া চোখ থেকে দূরবিনটা নামাতে কানাই বলল, "তো, আপনার কি তা হলে এটাই কাজ? এরকমভাবে সারাদিন জলের দিকে তাকিয়ে থাকা?"

কানাইয়ের পাশে এসে বসে পড়ল পিয়া। বোতল কাত করে খানিকটা জল গলায় ঢেলে বলল, "হ্যাঁ। সেটারও অবশ্য একটা পদ্ধতি আছে, কিন্তু বেসিক্যালি কাজটা তাই-ই। জলের

দিকে তাকিয়ে থাকা। কিছু দেখতে পেলে ভাল, না পেলেও আফশোস খুব একটা নেই। সেটাও একটা তথ্য। সবটাই কাজে লাগে।"

না বোঝার ভাব করে মুখ বাঁকাল কানাই। বলল, "যার কাজ তাকে সাজে। আমি হলে তো পুরো একটা দিনও এই কাজ করে উঠতে পারতাম না। ভীষণ একঘেয়ে মনে হত।"

বোতলের জলটা শেষ করে ফেলল পিয়া। হাসল আবার। "সেটা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু এই কাজের ধরনটাই তাই, জানেন? হয়তো অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে বসে আছেন কিন্তু কিছুই ঘটছে না, আবার কখনও হয়তো সাংঘাতিক ব্যস্ততা। আর সে ব্যস্ততাটাও মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য। এই কাজের ছন্দটার সঙ্গে মানিয়ে নিতে খুব কম লোকই পারে। আমার তো মনে হয় দশ লাখে একটা পাওয়া যায় সেরকম লোক। সে কারণেই এখানে ফকিরের মতো একটা লোককে পেয়ে খুব আশ্চর্য হয়েছি আমি।"

"আশ্চর্য হয়েছেন? কেন?"

"ডলফিনটাকে কেমন স্পট করল ও দেখলেন তো?" বলল পিয়া। "যেন সব সময়ই জলের দিকে নজর রেখে চলেছে ও। নিজের অজান্তেই। এর আগেও অনেক অভিজ্ঞ জেলের সঙ্গে কাজ করেছি আমি, কিন্তু এরকম অদ্ভুত ইন্সটিংক্ট আমি কারওর মধ্যে দেখিনি। নদীর বুকের ভেতরটা পর্যন্ত যেন দেখে নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে ওর।"

পিয়ার কথাটা হজম করতে এক মুহূর্ত সময় লাগল কানাইয়ের। "তা হলে ওর সঙ্গেই কাজ চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে আপনার?"

"ওর সঙ্গে আবার কাজ করার ইচ্ছে তো আমার আছে বটেই," বলল পিয়া। "আমার মনে হয় ফকিরের সঙ্গে মিলে কাজ করতে পারলে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারা যাবে।"

"মনে হচ্ছে আপনার কিছু একটা লং-টার্ম প্ল্যান রয়েছে?" মাথা নাড়ল পিয়া। "সত্যি বলতে কী, সেরকম ইচ্ছে একটা আছে। একটা প্রজেক্টের কথা আমার মাথায় ঘুরছে, সেটা যদি হয় তা হলে বেশ কয়েক বছরই হয়তো এখানে থেকে যেতে হবে আমাকে।"

"এখানে? মানে এই সুন্দরবনে?"

"হ্যাঁ।"

"সত্যি?" কানাইয়ের ধারণা ছিল সামান্য কয়েকদিনের জন্যেই ইন্ডিয়ায় এসেছে পিয়া। কিন্তু ও যে এদেশে বেশ কিছুদিন থেকে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে তাও কোনও শহর-টহরে নয়, সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও এই ভাটির দেশের জলকাদার মধ্যে সেটা জানতে পেরে বেশ একটু অবাকই হয়ে গেল কানাই।

"আপনি ভাল করে ভেবে নিয়েছেন তো? এইরকম একটা জায়গায় থাকতে পারবেন আপনি বছরের পর বছর?" ও জিজ্ঞেস করল।

"কেন পারব না?" কানাইয়ের প্রশ্নটা শুনে একটু অবাকই হল পিয়া। "না পারার তো কিছু নেই।"

"আর এখানে থাকলে এই ফকিরের সঙ্গেই কাজ করবেন?"

মাথা নাড়ল পিয়া। "খুবই খুশি হব যদি তা সম্ভব হয়। কিন্তু সেটা আমার মনে হয় ফকিরের ওপরই নির্ভর করছে।"

"অন্য আর কেউ কি আছে যার সঙ্গে আপনি কাজটা করতে পারেন?"

"সেটা এক ব্যাপার হবে না কানাই," পিয়া বলল। "ফকিরের পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা অসাধারণ। সকলের এরকম থাকে না। গত ক'দিন ওর সঙ্গে কাজ করতে যে কী ভাল লেগেছে সেটা আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। এত সুন্দর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা আমার খুব কমই হয়েছে।"

কানাইয়ের মনের ভেতরে কোথায় হঠাৎ একটা ঈর্ষার তীক্ষ্ণ খোঁচা লাগল। নিজেকে সামলাতে না-পেরে একটু ব্যঙ্গের সুরে বলল, "আর এই পুরো সময়টায় ও যা যা বলেছে তার একটা বর্ণও আপনি বুঝতে পারেননি। ঠিক বলছি?"

"পারিনি," সম্মতিতে মাথা নাড়ল পিয়া। "কিন্তু মজার ব্যাপারটা কী জানেন? আমাদের

দু'জনের মধ্যে এত বিষয়ে মিল যে ভাষার ব্যবধানটার জন্য অসুবিধাই হয়নি কোনও।"

"শুনুন পিয়া," স্পষ্ট গলায় খানিকটা কর্কশভাবে বলল কানাই। "নিজের সঙ্গে তুলনা করার চেষ্টা করবেন না। ফকির আর আপনার মধ্যে কোনও মিল কোনওকালে ছিল না, এখনও নেই। ফকির একটা জেলে, আর আপনি একজন সায়েন্টিস্ট। যে জীবজগৎ আপনার কাছে গবেষণার বিষয়, ওর চোখে সেটা খাবার জিনিস। জীবনে কখনও চেয়ারে বসেনি ও, আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি। কল্পনা করতে পারেন প্লেনে চড়লে ওর কী অবস্থা হবে?" জেটপ্লেনের সারি সারি চেয়ারের মধ্যে দিয়ে লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে ফকির হেঁটে যাচ্ছে দৃশ্যটা কল্পনা করেই হেসে ফেলল কানাই। "আপনাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র কোনও মিল নেই পিয়া। থাকতে পারে না। আপনারা দুজনে দুটো আলাদা দুনিয়ার মানুষ, আলাদা জগতের। আপনার ওপর বজ্রাঘাত হতে যাচ্ছে বুঝতে পারলেও আপনাকে সেটা জানানোর কোনও উপায় নেই ফকিরের হাতে।"

ঠিক তক্ষুনি, কানাইয়ের কথার সূত্র ধরেই যেন, হঠাৎ ফকিরের চিৎকার শোনা গেল—ভটভটির ইঞ্জিনের শব্দের ওপর গলা চড়িয়ে চেঁচিয়ে বলছে, "কুমির! কুমির!"

"কী বলল ওটা?" ডেকের পেছনদিকে দৌড়ে গেল পিয়া। কানাইও দৌড়াল ওর সঙ্গে সঙ্গে।

ডিঙির ওপর ছইয়ের গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নদীর ভাটির দিকে ইশারা করছে ফকির। "কুমির!"

"কী দেখতে পেয়েছে ও?" দূরবিন তুলে চোখে লাগাল পিয়া।

"আ ক্রোকোডাইল।"

এরকম একটা তাৎক্ষণিক উদাহরণ হাতের সামনে পেয়ে সেটা ব্যবহার করার সুযোগটা আর ছাড়তে পারল না কানাই। "আপনি নিজেই দেখুন পিয়া, যদি আমি এখন এখানে না থাকতাম আপনি বুঝতেই পারতেন না কী দেখে চেঁচিয়ে উঠল ফকির।"

দূরবিনটা চোখ থেকে নামিয়ে বোটের সামনে ফিরে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল পিয়া। ঠান্ডা গলায় বলল, "আপনার বক্তব্য আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি কানাই। থ্যাঙ্ক ইউ।"

"শুনুন," পিছু ডাকল কানাই। "পিয়া—" কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। পিয়া ফিরে গেছে নিজের জায়গায়। মাফ চাওয়ার জন্য ঠোঁটের ডগায় আসা শব্দগুলি গিলে নিতে হল কানাইকে।

মিনিট কয়েক পর কানাই দেখল বোটের সামনের দিকটায় ফের গিয়ে দাঁড়িয়েছে পিয়া, চোখের সঙ্গে সাঁটা দূরবিন, এমন মগ্ন হয়ে তাকিয়ে আছে জলের দিকে যে কানাইয়ের মনে হল ও যেন পুঁথিপড়া পণ্ডিত—কোনও পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার করার চেষ্টা করে যাচ্ছে গভীর মনোযোগে। পৃথিবী যেন নিজের হাতে লিখে রেখেছে দুষ্পাঠ্য সেই পুঁথি। দেখতে দেখতে কানাইয়ের মনে পড়ল ও নিজে প্রায় ভুলেই গেছে কেমন লাগে কোনও কিছুর দিকে এভাবে নিবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে থাকতে। কোনও ভোগ্যদ্রব্য নয়, সুখসুবিধার উপকরণ নয়, লালসা নিবৃত্তির বস্তু নয়—এরকম আপাত-অর্থহীন কিছুর দিকে এমন নিমগ্ন হয়ে চেয়ে থাকা আর হয় না এখন। অথচ একটা সময় ছিল যখন ও-ও পারত এইভাবে মনটাকে একটা বিন্দুতে নিয়ে আসতে; ঠিক এইরকম একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত অজানার দিকে—যেন একটা চশমার ভেতর দিয়ে। কিন্তু ওর সেই দৃশ্যবস্তু লুকোনো থাকত বিভিন্ন বিজাতীয় ভাষার গভীরে। ভাষার সেই দিগন্তছোঁয়া প্রান্তরে পৌঁছে অদ্ভুত একটা তৃষ্ণার বোধ জাগত মনে, ঠিক কোন পথ দিয়ে এসে অন্য বাস্তবেরা এক জায়গায় মিলে যায় খুঁজে বের করার ইচ্ছে হত সেটা। সে যাত্রার পথের বাধাগুলির কথাও এখন স্পষ্ট মনে পড়ল কানাইয়ের—সেই হতাশার কথা, যখন এক এক সময় মনে হত কিছুতেই ওই শব্দগুলিকে ঠিকমতো তুলে আনা যাবে না ঠোঁটে, ঠিক ঠিক ওই আওয়াজগুলো মুখ দিয়ে বের করতে পারা যাবে না কোনওদিন, যেমন দরকার ঠিক সেভাবে বাক্য জুড়ে জুড়ে কথা বলা আর হয়ে উঠবে না, চেনা ছক ভেঙে গুঁড়িয়ে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে সবকিছু। শুধুমাত্র একটা উদগ্র ইচ্ছায় তখন দ্রুতগতি

হয়ে উঠত মন, আর সে উত্তেজনা মনে মনে এখনও অনুভব করছে কানাই। কাম্য বস্তুর চেহারাটা কেবল পালটে গেছে, সেই তীব্র বাসনা এখন জলজ্যান্ত একটা মেয়ের চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওর সামনে, এই বোটের ওপর রক্তমাংসে গড়া সেই ভাষার শরীর।

ব্যাঘাত

লুসিবাড়ি ছাড়ার পর থেকেই নির্মলের নোটবইটা নিয়ে হরেনের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ খুঁজছিল কানাই। বেশ খানিকক্ষণ পর মেঘা যখন অবশেষে একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ল, তখন ও আস্তে আস্তে উঠে সারেঙের ঘরটায় গিয়ে ঢুকল। নোটবইটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এটা চিনতে পারেন হরেনদা?"

সামনে জলের দিকে চেয়েছিল হরেন। মুহূর্তের জন্য একবার নজর ফিরিয়ে দেখল নোটবইটা। নিরুত্তাপ গলায় বলল, "হ্যাঁ। সার ওটা আমাকে রাখতে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন আপনাকে দিয়ে দিতে।"

হরেনের সংক্ষিপ্ত জবাবে একটু চুপসে গেল কানাই। নির্মলের লেখায় বিভিন্ন প্রসঙ্গে এতবার হরেনের উল্লেখ আছে যে কানাই ভেবেছিল নোটবইটা দেখে ঠিক আবেগের বন্যায় ভেসে না গেলেও দু-একটা পুরনো স্মৃতি নিশ্চয়ই উশকে উঠবে ওর মনে।

"মেসো আপনার কথা অনেক লিখেছে এর মধ্যে," ওকে একটু উৎসাহিত করার জন্য বলল কানাই। হরেন কিন্তু চোখই সরাল না জল থেকে। মাথাটা অল্প একটু নাড়াল শুধু।

ওর পেট থেকে কিছু বের করা খুব একটা সহজ কাজ হবে না বুঝতে পারল কানাই। এতটাই কি কম কথা বলে ও? নাকি বাইরের লোকের সামনে মুখ খুলতে চাইছে না? বলা মুশকিল।

"কোথায় ছিল খাতাটা?" কানাই নাছোড়বান্দা। "কোত্থেকে বেরোল এতদিন পরে?"

গলাটা একটু সাফ করে নিল হরেন। বলল, "হারিয়ে গিয়েছিল।"

"কী করে?"

"আপনি জানতে চাইলেন তাই বলছি," বলল হরেন। "সার খাতাটা আমাকে দেবার পর আমি ওটাকে বাড়ি নিয়ে গেলাম। তারপর জল-টল যাতে না লাগে সেজন্য ভাল করে । প্লাস্টিকে মুড়ে আঠা লাগিয়ে আঠাটা শুকোনোর জন্যে রোদে দিলাম। তো বাড়ির কোনও বাচ্চা (ফকির কি?) ওটাকে খেলার জিনিস ভেবে উঠিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল। তারপর বাচ্চাদের যেমন স্বভাব—বেড়ার খাঁজের মধ্যে ওটাকে লুকিয়ে রেখে ভুলেই গেল সে কথা। আমি চারদিকে কত খুঁজলাম, কিছুতেই পেলাম না। তারপর আস্তে আস্তে আমিও একসময় ভুলে গেলাম খাতাটার কথা।"

"শেষপর্যন্ত কী করে পাওয়া গেল তারপর?"

"বলছি সে কথা," শান্ত, মাপা গলায় বলতে লাগল হরেন। "প্রায় বছর খানেক হবে—আমি ঠিক করলাম আমাদের পুরনো চালাঘরটা ভেঙে একটা পাকা বাড়ি বানাব। সেই ঘর ভাঙার সময়ই খুঁজে পাওয়া গেল ওটা। আমাকে যখন এনে দিল খাতাটা আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না কী করব ওটাকে নিয়ে। ডাকে পাঠাতে চাইনি, যদি ঠিকানা ভুল হয়ে যায়। আর মাসিমাকে নিয়ে গিয়ে যে দেব, সে সাহসও আমার ছিল না। কত বছর হল ওনার সঙ্গে কোনও কথাই হয়নি। তারপর খেয়াল হল ময়না তো যায় মাঝে মাঝে গেস্ট হাউসে। শেষে ওর হাত দিয়েই পাঠিয়ে দিলাম খাতাটা। ওকে বললাম, "এটা নিয়ে চুপচাপ সারের পুরনো পড়ার ঘরটাতে গিয়ে রেখে দিয়ে আয়। সময় হলে ওরা ঠিক খুঁজে পাবে। তো এই হল ঘটনা।"

এই বলে মুখ বন্ধ করল হরেন। এমনভাবে কথাটা শেষ করল যে বোঝা গেল এই বিষয়ে আর কোনও বাক্যব্যয় করতে রাজি নয় ও।

ঘণ্টা তিনেক একটানা চলার পর হঠাৎ একবার ইঞ্জিনের শব্দটা মুহূর্তের জন্য বেতালা শোনাল পিয়ার কানে। মেঘার ডেকের ওপর একইভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ও, কিন্তু শুরুতে সেই যে একটা গ্যাঞ্জেটিক ডলফিনকে একঝলক দেখা গিয়েছিল, তারপর থেকে এ পর্যন্ত কিছুই আর চোখে পড়েনি। তার ফলে ওর সেই দহটাতে তাড়াতাড়ি গিয়ে পৌঁছনোর ইচ্ছেটা আরও বেড়েছে বই কমেনি৷ এইসময় যদি ইঞ্জিন গড়বড় করে তা হলে খুবই

আফশোসের ব্যাপার হবে। জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই কান খাড়া করে ইঞ্জিনের আওয়াজটা শুনতে লাগল পিয়া। খানিকক্ষণের মধ্যেই ধকধক শব্দের ছন্দটা আবার ফিরে আসতে হাঁফ ছাড়ল ও।

কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য নয়। মিনিট পনেরো পরেই ফের তাল কাটল ইঞ্জিনের। একটা ফঁপা ফটফট আওয়াজ হল কয়েকবার, তারপর ক্লান্ত কাশির মতো কয়েকটা শব্দ, তারপর আচমকা সব চুপচাপ। মোহনার মাঝ বরাবর এসে একেবারে থেমে গেল মেঘার ইঞ্জিন।

পিয়া বুঝতে পারছিল এ গোলমাল সহজে সারবার নয়। এত বিরক্ত লাগছিল যে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতেও ইচ্ছে করছিল না। কেউ না কেউ এক্ষুনি সেটা জানাতে আসবে নিশ্চয়ই, তাই ইঞ্জিনঘরের দিকে এগিয়ে দেখার চেষ্টা না করে নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইল ও। বাতাসে ঢেউ তোলা নদীর দিকে চেয়ে দেখতে লাগল এক মনে।

যা ভাবা গিয়েছিল, খানিক বাদেই গুটিগুটি পায়ে কানাই এসে দাঁড়াল পাশে। "একটা খারাপ খবর আছে পিয়া।"

"আজকে আর হবে না, তাই তো?"

"মনে হয় না।"

হাত তুলে দূরে পাড়ের দিকে ইশারা করল কানাই। ওখানে একটা ছোট গ্রাম আছে। স্রোতের টানে টানে ওই পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়াটা নাকি খুব একটা সমস্যা হবে না, হরেন বলেছে। সেখানে হরেনের কিছু আত্মীয়স্বজন আছে। তাদের একজন নাকি এইসব ইঞ্জিন-টিঞ্জিনের কাজ জানে। সব যদি ঠিকঠাক চলে তা হলে কাল সকাল নাগাদ গর্জনতলার দিকে রওয়ানা হওয়া যেতেও পারে।

পিয়া মুখ বাঁকাল। "কী আর বলব? কী আর করা যাবে এ ছাড়া।"

"নাঃ। সত্যিই আর কোনও উপায় নেই।"

ইতোমধ্যে ভটভটিটাকে ঘুরিয়ে নিয়েছে হরেন। বোটের মুখ এখন দূরের ওই গাঁয়ের দিকে। খানিকক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল স্রোতের টানে ধীরে ধীরে মোহনা পেরিয়ে যাচ্ছে ওরা। যদিও ভাটা পড়ে গেছে, ফলে নদীর টান এখন ওদের অনুকূলে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভয়ানক আস্তে আস্তে এগোচ্ছে মেঘা। অবশেষে যখন গন্তব্য স্পষ্টভাবে নজরে এল, দিন তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

দেখা গেল মোহনার ঠিক ধারে নয় গ্রামটা। একটু ভেতরে, কয়েক কিলোমিটার চওড়া একটা নদীর পাড়ে। ভাটা চলছে বলে এখন পাড়টাকে মনে হচ্ছে আকাশছোঁয়া, বোট থেকে। গ্রামটা চোখেই পড়ছে না। বাঁধের মাথায় শুধু দেখা যাচ্ছে বেশ কয়েকটা জটলা—কিছু লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন অপেক্ষা করছে মেঘার জন্য। ভটভটিটা কাছাকাছি পৌঁছতে দেখা গেল কয়েকজন নেমে আসছে কাদা ভেঙে, হাত নাড়ছে ওদের উদ্দেশে। জবাবে বোটের রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে হাত দুটো মুখের সামনে জড়ো করে এক হাঁক পাড়ল হরেন। খানিক বাদেই দেখা গেল একটা নৌকো সড়সড় করে পাড় বেয়ে নেমে জলে পড়ল, তারপর আস্তে আস্তে এসে থামল মেঘার পাশে। দুটো লোক ছিল নৌকোটায়। একজনকে আলাপ করিয়ে দিল হরেনের আত্মীয় বলে, সামনের গ্রামটাতেই সে থাকে, পেশায় জেলে। আর অন্যজন তার বন্ধু, পার্ট-টাইম মোটর মিস্ত্রি। বেশ খানিকক্ষণ ধরে চলল আলাপ পরিচয়ের পালা, তারপর ওদের দুজনকে নিয়ে হরেন নেমে গেল ভটভটির খোলের ভেতর। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিস্ত্রির যন্ত্রপাতির আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল গোটা বোটে। হাতুড়ি-বাটালির প্রবল খটখট শব্দের মধ্যে অস্ত গেল সূর্য।

খানিক পরে সন্ধের আবছায়া চিরে হঠাৎ বিকট একটা জান্তব আওয়াজ শোনা গেল; মনে হল প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে কাতর আর্তনাদ করছে কেউ। হাতে টর্চ নিয়ে পিয়া আর কানাই দৌড়ে বেরিয়ে এল নিজের নিজের কেবিন থেকে। দু'জনেরই মাথায় একই চিন্তা। কাউকে নিশ্চয়ই বাঘে ধরেছে, তাই না?" জিজ্ঞেস করল পিয়া।

"জানি না।"

রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে চেঁচিয়ে হরেনকে কী একটা জিজ্ঞেস করল কানাই। এক মুহূর্তের জন্য থেমে গেল হাতুড়ির আওয়াজ। তারপরেই খোলের ভেতর থেকে ভেসে এল। হরেনদের অট্টহাসির শব্দ।

"ব্যাপারটা কী?" পিয়া কানাইয়ের দিকে তাকাল।

কানাইয়ের মুখেও হাসি। বলল, "আমি জিজ্ঞেস করলাম কাউকে বাঘে ধরেছে কিনা, তাতে ওরা বলল গাঁয়ে একটা মোষ বাছুর বিয়োচ্ছে, ওটা তারই আওয়াজ।"

"কী করে জানল ওরা?"

"কারণ মোষটার মালিক হরেনের আত্মীয়। বাঁধের একেবারে পাশেই ওদের বাড়ি—ওই দিকটায়।"

পিয়াও হেসে ফেলল এবার। "আমরা মনে হয় খামখাই ঘাবড়ে যাচ্ছি।" দু' হাতের আঙুলগুলো জড়ো করে লম্বা একটা আড়মোড়া ভাঙল ও। হাই তুলল একবার। "সকাল সকাল শুয়ে পড়তে হবে মনে হচ্ছে।"

"আজকেও?" একটু বিরক্তির আভাস কানাইয়ের গলায়। তারপর, যেন বিরক্ত ভাবটাকে চাপা দেওয়ার জন্যই যোগ করল, "খাওয়া-দাওয়া করবেন না?"

"একটা নিউট্রিশন বার খেয়ে নেব। তাতেই কাল সকাল পর্যন্ত চলে যাবে আমার। কিন্তু আপনার কী প্ল্যান? অনেক রাত পর্যন্ত জাগবেন নাকি?"

"হ্যাঁ, কানাই বলল। "মনুষ্যজগতের অধিকাংশের মতো এই অধমেরও নিশাকালে কিঞ্চিৎ আহার্য গ্রহণের বদভ্যাস আছে। আর, আজকে তারপরেও খানিকক্ষণ জেগে থাকার পরিকল্পনা আছে আমার—মেসোর নোটবইটা আজকেই পড়ে শেষ করব ঠিক করেছি।"

"পড়া কি প্রায় হয়ে এসেছে?"

"হ্যাঁ, শেষের দিকে," বলল কানাই।

লুসিবাড়িতে যখন পৌঁছলাম তখনও আমার শরীর বেশ খারাপ। নীলিমা হরেনকে বকাবকি করতে লাগল। বলল, "তোমার জন্যেই এরকম হল। কেন বারবার ওকে টেনে নিয়ে যাও মরিচঝাঁপিতে? দেখো তো এখন, কীরকম অসুস্থ হয়ে পড়ল মানুষটা।"

সুস্থ যে আমি ছিলাম না সে কথা ঠিক—নানারকম স্বপ্ন, কল্পনা আর ভয়ের চিন্তায় সবসময় ভরে থাকত মাথাটা। এমনও অনেকদিন হয়েছে যে বিছানার থেকে ওঠারই ক্ষমতা হয়নি—চুপচাপ শুধু শুয়ে থেকেছি আর রিলকের কবিতা পড়েছি, ইংরেজিতে আর বাংলায়।

আমার সঙ্গে অনেক নরম সুরে কথা বলত নীলিমা তখন। "কতবার বলিনি তোমাকে ওখানে না যেতে? বলো? বলিনি এইরকম অবস্থা দাঁড়াবে একদিন? তুমি যদি সত্যি সত্যি কিছু করতে চাও তা হলে তো ট্রাস্টের কাজেই সাহায্য করতে পারো। হাসপাতালটার জন্যে কিছু কিছু কাজ করতে পারো। তার জন্য মরিচঝাঁপিতে কেন যেতে হবে?"

"সে তুমি বুঝবে না নীলিমা।"

"কেন নির্মল? বলো আমাকে। কিছু কিছু গুজব আমার কানে এসেছে। সবাই নানারকম কানাঘুষো করছে। কুসুমের সঙ্গে কি এসবের কোনও সম্পর্ক আছে?"

"এটা তুমি কী বললে নীলিমা? এতগুলি বছর তো আমার সঙ্গে কাটালে—কখনও কি এ ধরনের কোনও চিন্তার কোনও কারণ ঘটেছে?"

নীলিমা কাঁদতে শুরু করল। "লোকে তো সেসব কথা বুঝবে না নির্মল। চারদিকে কুৎসিত গুজব রটছে, কান পাতা যায় না।"

"নীলিমা, এ সমস্ত গুজবে কান দেওয়া কি তোমাকে মানায়, বলো?"

"তা হলে কুসুমকে এখানে নিয়ে এসো। ও এখানে থেকে ট্রাস্টের কাজ করুক। তুমিও করো।"

কী করে ওকে বোঝাব আমি, যে ট্রাস্টের কাজ করার জন্য আমার থেকে ভাল লোক অনেক আছে। আমি তো এখানে শুধু কলম পেষার কাজ করতে পারব, যন্ত্রের মতো, দম দেওয়া খেলনার মতো। কিন্তু মরিচঝাঁপির ব্যাপারটা আলাদা। রিলকে আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন কী করতে পারি আমি ওখানে। আমারই জন্য একটা কবিতায় গোপন সংকেত রেখে গেছেন কবি—শুধু আমার জন্য। সে সংকেতের লুকোনো অর্থ খুঁজে বের করেছি আমি। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। শুধু সেই ব্রাহ্মমুহূর্তের জন্য বসে আছি আমি, অপেক্ষা করে আছি একটা ইশারার জন্য। সে ইশারা পেলে কী করব সেটা আর বলে দিতে হবে না।

কারণ, কবি নিজেই আমাকে বলে গেছেন—

'এখানেই উচ্চার্যের মাতৃভূমি। এই তার কাল। বল, তা ঘোষণা কর...'

দিনের পর দিন চলে গেল, সপ্তাহের পর সপ্তাহ—অবশেষে শরীরে বল ফিরে পেতে লাগলাম আমি, মনে হল আস্তে আস্তে আবার গিয়ে বসা যেতে পারে পড়ার ঘরটাতে। প্রতিদিন সকাল আর দুপুরগুলো কাটাতে লাগলাম ওখানে বিস্তীর্ণ শূন্য সেই সময়প্রান্তর পার করতাম মোহনার দিকে তাকিয়ে, বসে বসে চেয়ে দেখতাম কেমন করে আস্তে আস্তে জল নামছে, খালি হচ্ছে মোহনা, ফের ভরে যাচ্ছে, ফের খালি হচ্ছে, ফের ভরে যাচ্ছে, দিনের পর দিন, পৃথিবীর মতো ক্লান্তিহীন।

একদিন দুপুরে, দ্বিপ্রহরিক বিশ্রামের পর অন্যান্য দিনের তুলনায় খানিকটা আগেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছি নীচে, এমন সময় নীলিমার গলা কানে এল। গেস্ট হাউসে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে, গলার স্বরে বুঝতে পারলাম কে, আগের দিন রাতে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হয়েছিল আমার। লোকটি কলকাতার ডাক্তার, সাইকিয়াট্রিস্ট। নীলিমা বলছিল খুব ভয় পাচ্ছে ও, খুবই চিন্তায় আছে আমাকে নিয়ে। ও এমন একটা খবর জানতে পেরেছে যেটা শুনলে আমি নাকি অস্থির হয়ে পড়ব, কী করে সেটা আমার থেকে গোপন রাখা যায় সে বিষয়ে

ডাক্তারবাবুর পরামর্শ চাইছিল।
“খবরটা কী?” জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার।
“আপনার হয়তো ব্যাপারটা সেরকম সাংঘাতিক কিছু মনে হবে না,” বলল নীলিমা। “এখান থেকে কিছু দূরে একটা দ্বীপ আছে—মরিচঝাঁপি বলে—সেইটার দখল নিয়ে গণ্ডগোল। একদল বাংলাদেশি উদ্বাস্তু ওই দ্বীপটায় এসে উঠেছে, আর কিছুতেই যেতে চাইছে না। আমার কাছে খবর আছে সরকার খুব কড়া হাতে ওদের মোকাবিলা করার জন্য তৈরি হচ্ছে এখন।”
“ওঃ, সেই উদ্বাস্তু সমস্যা!” বললেন ডাক্তার। “যতসব ঝামেলা। তো, আপনার স্বামীর তাতে কী? ওই দ্বীপে ওনার চেনাশুননা কেউ আছে নাকি? ওনার সঙ্গে ওদের সম্পর্কটা কী?”
এক মুহূর্ত চুপ করে রইল নীলিমা। তারপর গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে একটু দ্বিধার সঙ্গে বলল, “আপনাকে ব্যাপারটা আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না ডাক্তারবাবু। আমার স্বামী যখন রিটায়ার করলেন, তারপর থেকেই ওঁর হাতে আর বিশেষ কোনও কাজ তো নেই—তাই উনি ওই মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের ভালমন্দের সঙ্গে আস্তে আস্তে জড়িয়ে ফেলেছেন নিজেকে। এখন আমাদের যে সরকার আছে তারা ওদের বিরুদ্ধে কিছু করবে সেটা উনি ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারেন না। উনি সেই আগেকার আমলের বামপন্থী মানুষ। আজকালকার অনেকের মতো নন, এখনও উনি মনেপ্রাণে ওই আদর্শে বিশ্বাস করেন। এদিকে, এখন যারা ক্ষমতায় আছে তারা অনেকেই ওঁর এক সময়কার বন্ধু বা রাজনৈতিক সহকর্মী। আসলে—কী বলব—আমার স্বামী ঠিক প্র্যাকটিকাল মানুষ নন, বাস্তব জগৎটার সম্পর্কে ওঁর ধারণা খুব সীমিত। উনি বুঝতে পারেন না, একটা পার্টি যখন ক্ষমতায় আসে তাকে রাজ্যশাসনের কাজ করতে হয়। তার কতগুলি সীমাবদ্ধতা থাকে। আমি ভয় পাচ্ছি মরিচঝাঁপিতে যা ঘটতে যাচ্ছে সেটা যদি উনি জানতে পারেন, সে মোহভঙ্গের আঘাত উনি সহ্য করতে পারবেন না—ওঁর পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে সেটা।”
“তা হলে সেসব ওনাকে না জানানোই ভাল,” ডাক্তারের গলা শোনা গেল। “কী করতে কী করে বসবেন, বলা তো যায় না।”
“একটা কথা বলুন ডাক্তারবাবু,” নীলিমা বলল, “কয়েকদিন কি ওঁকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায় না?”
“তা যায়। সেটাই মনে হয় ভাল হবে।”
আর কিছু শোনার ছিল না আমার। পড়ার ঘরে ফিরে গিয়ে চটপট কয়েকটা জিনিস ঝোলায় পুরে নিলাম। তারপর চুপি চুপি নেমে এসে তাড়াতাড়ি হাঁটা দিলাম গ্রামের দিকে। ভাগ্যক্রমে ঘাটে একটা নৌকো ছিল তখন, তাতে করে সোজা চলে গেলাম সাতজেলিয়া—হরেনের খোঁজে।
“এক্ষুনি আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে হরেন,” দেখা হতেই ওকে বললাম। “সরকার মরিচঝাঁপি আক্রমণ করবে ঠিক করেছে, খবর পেয়েছি আমি।”
খবর ওর কাছেও কিছু কম ছিল না। নানারকম গুজব ওরও কানে এসেছে—বাসভর্তি লোক বাইরে থেকে এসে নাকি জড়ো হয়েছে মরিচঝাঁপির আশেপাশের গ্রামগুলিতে, গুণ্ডা-মস্তান ধরনের লোক সব। ভাটির দেশের মানুষ এরকম লোক আগে কখনও দেখেনি। পুলিশের নৌকো সবসময় টহল দিচ্ছে দ্বীপের চারদিকে; ঢোকা কি বেরোনো প্রায় অসম্ভব।
“হরেন, কুসুম আর ফকিরকে ওখান থেকে বের করে আনতেই হবে আমাদের। এই অঞ্চলের নদীনালা তোমার থেকে ভাল কেউ চেনে না। ওখানে গিয়ে পৌঁছনোর কোনও একটা পথ বের করা যাবে না?” ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।
মিনিটখানেক কী চিন্তা করল হরেন। তারপর বলল, “আজ চাঁদ থাকবে না আকাশে। যাওয়া গেলেও যেতে পারে। চেষ্টা করে দেখি একবার।”
সন্ধের মুখে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। বেশ খানিকটা খাবার আর জল নিয়ে নিলাম সঙ্গে।

খানিক পরেই অন্ধকার ঘনিয়ে এল। আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু হরেন তারই মধ্যে কী করে যেন ঠিক চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নৌকোটাকে। খুব ধীরে ধীরে চলছিলাম আমরা, একেবারে পাড় ঘেঁষে। কথাবার্তা বলছিলাম ফিসফিস করে।

"আমরা এখন কোথায় হরেন?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

ও দেখলাম একেবারে নিখুঁতভাবে বলে দিল আমাদের অবস্থান। "এই গারল পেরিয়েছি। ঝিল্লায় ঢুকেছি এবার। বেশি দূর নেই আর, একটু পরেই পুলিশের নৌকো দেখতে পাবেন।" মিনিট কয়েক পরেই দেখতে পেলাম বোটগুলোকে—সগর্জনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সার্চলাইটের আলোয় ধুয়ে দিচ্ছে নদীটাকে। প্রথমে একটা, তারপর আরেকখানা, তারপর আরও একটা। খানিকক্ষণ পাড় ঘেঁষে চুপটি করে লুকিয়ে রইলাম আমরা। কতক্ষণ পরপর বোটগুলো আসছে সে সময়টা মনে মনে মেপে নিল হরেন। তারপর আবার রওয়ানা হলাম। খানিক চলে, খানিক থেমে একটা সময় পুলিশ-নৌকোর নজরদারির এলাকা পেরিয়ে গেলাম আমরা।

একটু বাদেই গোত্তা খেয়ে পাড়ের নরম মাটিতে গিয়ে ঠেকল আমাদের নৌকো। "এসে গেছি সার," জানান দিল হরেন। "পৌঁছে গেছি মরিচঝাঁপিতে।"দু'জনে মিলে টেনেটুনে ডিঙিটাকে বাদাবনের আড়ালে নিয়ে গিয়ে তুললাম—যাতে জল থেকে চোখে না পড়ে। হরেন বলল দ্বীপের লোকেদের সব নৌকো পুলিশ নাকি ডুবিয়ে দিয়েছে। আমাদের নৌকোটা তাই ভাল করে ঢেকেঢুকে আড়াল করে রাখলাম, তারপর জল আর খাবার-দাবার যা যা সঙ্গে এনেছিলাম সেগুলি নিয়ে নদীর পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছলাম কুসুমের কুঁড়েতে। সেখানে পৌঁছে আমরা তো অবাক। কুসুমের কোনও হেলদোলই নেই। দিব্বি আছে এখনও। সারা রাত ধরে আমরা ওকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম—এক্ষুনি ওর চলে যাওয়া উচিত দ্বীপ ছেড়ে, কিন্তু কোনও কথাই ও কানে তুলল না।

"মরিচঝাঁপি ছেড়ে কোথায় যাব? আর কোথাও তো আমি যেতে চাই না," ওর সাফ জবাব। কী কী গুজব আমাদের কানে এসেছে ওকে বললাম, বললাম চারপাশের সব কটা গাঁয়ে বাইরে থেকে তোক এসে জড়ো হয়েছে, যে-কোনও সময়ে হামলা শুরু হয়ে যাবে। হরেন নিজের চোখে দেখেছে, বাস ভর্তি করে এসেছে সব। "কী করবে ওরা?" কুসুম বলল। "এখনও দশ হাজারের বেশি লোক আমরা এখানে আছি। ভরসা করে থাকতে হবে। হাল ছাড়লে চলবে কেন?"

"কিন্তু ফকিরের কী হবে?" জিজ্ঞেস করলাম আমি। "ভালমন্দ একটা কিছু যদি ঘটে যায়, ও তা হলে কী করবে?"

"ঠিক বলেছেন সার," আমার সঙ্গে সুর মেলাল হরেনও। "তুই যদি না যেতে চাস, তা হলে ফকিরকে অন্তত দিয়ে দে আমার সঙ্গে। কয়েকটা দিন অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে রাখি, তারপর এখানকার ঝামেলা-টামেলা মিটে গেলে আবার এসে দিয়ে যাব।"

বোঝা গেল এই নিয়ে আগে থাকতেই ভেবে রেখেছিল কুসুম। বলল, "ঠিক আছে তা হলে, তাই করা যাক। ফকিরকে নিয়ে যাও তোমরা, সাতজেলেতে নিয়ে কয়েকদিন রাখো, তারপর এখানকার ঝড়ঝাঁপটা থামলে নিয়ে এসো আবার।"

কথা বলতে বলতে ফর্সা হয়ে গিয়েছিল আকাশ। আর ফেরা যাবে না এখন। হরেন বলল, "রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। অন্ধকার না হলে পুলিশ বোটের নজর এড়িয়ে বেরোতে পারব না।"

এবার আমার পালা ওদের অবাক করে দেওয়ার। বললাম, "হরেন, আমি কিন্তু থেকেই যাচ্ছি।"

ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেল ওরা। বিশ্বাসই করতে পারছিল না। বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল কেন আমি থেকে যেতে চাই, কিন্তু আমি সেসব কথা এড়িয়ে গেলাম। কত কিছুই তো ওদের বলতে পারতাম আমি লুসিবাড়িতে আমার জন্য যে ওষুধের ব্যবস্থা করা আছে সে কথা বলতে পারতাম, নীলিমার সঙ্গে ডাক্তারের কথোপকথনের কথা বলতে পারতাম অথবা

দিনের পর দিন কী শূন্যতাবোধ নিয়ে সময় কাটিয়েছি আমার পড়ার ঘরটায় সেই কথাও বলতে পারতাম। কিন্তু এসব কিছুর বিন্দুমাত্র গুরুত্ব আছে বলে মনে হল না আমার। ঘটনা হল মরিচঝাঁপিতে আমার থেকে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে এতটুকু কোনও সংশয় ছিল না আমার মনে। এই নোটবইটা দেখিয়ে বললাম, "আমাকে থাকতেই হবে রে, একটা জরুরি লেখা লিখে ফেলতে হবে এখানে বসে।"

আর সময় নেই। মোমবাতিটা দপদপ করছে। পেনসিলটা ছোট্ট হয়ে গেছে ক্ষয়ে ক্ষয়ে। আমি শুনতে পাচ্ছি ওরা এগিয়ে আসছে। আশ্চর্য মনে হচ্ছে হো হো করে হাসতে হাসতে আসছে ওরা। হরেন এক্ষুনি বেরিয়ে যেতে চাইবে জানি, কারণ রাত আর বেশি বাকি নেই। ভাবতেই পারিনি এই গোটা নোটবইটা লিখে শেষ করে ফেলতে পারব আমি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখছি পুরোটা ভরেই গেল। এটাকে এখানে রেখে আর লাভ নেই। ঠিক করেছি দিয়ে দেব হরেনের সঙ্গে, যাতে কোনও না কোনও সময় তোমার হাতে গিয়ে পৌঁছয় এটা, কানাই। আমি নিশ্চিত জানি সারাজীবনে জগতের যেটুকু মনোযোগ আমি আকর্ষণ করতে পেরেছি, তার থেকে অনেক বেশি তুমি পারবে। এই খাতা নিয়ে কী করবে সেটা তুমিই ঠিক কোরো। আমি সবসময় তরুণদের ওপর ভরসা রেখে এসেছি। আমার প্রজন্মের মানুষদের তুলনায় তোমরা আদর্শের দিক দিয়ে ঋদ্ধতর হবে, কম শুভনাস্তিক হবে, কম স্বার্থপর হবে—এ আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।

ওরা ভেতরে ঢুকে এসেছে। মোমের আলোয় ওদের মুখগুলো দেখতে পাচ্ছি আমি। ওদের হাসিতে আমি কবির সেই পংক্তিগুলি প্রত্যক্ষ করছিঃ

'দেখো, আমি বেঁচে আছি। কোন পথ্যে? শৈশব অথবা ভাবীকাল, কোনওটাই হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না… অস্তিত্বের অনন্ত পর্যায় আমার হৃদয় থেকে উৎসারিত।'

খাতাটা রাখতে গিয়ে কানাই দেখল হাত কাঁপছে ওর। লফের ধোঁয়ায় ভরে গেছে কেবিন, কেরোসিনের গন্ধ চারিদিকে; মনে হল দম বন্ধ হয়ে আসছে। শোয়ার জায়গা থেকে একটা কম্বল তুলে গায়ে পেঁচিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল কেবিন থেকে। বাইরে বেরোতেই ধক করে কড়া বিড়ির গন্ধ এসে লাগল নাকে। বাঁদিকে ফিরে বোটের সামনের দিকটায় তাকাল কানাই।

সেখানে পাশাপাশি পাতা দুটো আরাম চেয়ার। তার একটায় বসে আছে হরেন। পা দুটো বোটের গলুইয়ের কাছে রেখে বিড়ি টানছে। কানাই কেবিনের দরজা বন্ধ করতে ফিরে তাকাল ও।

"এখনও জেগে?"

"হ্যাঁ, কানাই বলল। "এইমাত্র মেসোর খাতাটা পড়ে শেষ করলাম।"

জবাবে আবেগহীন একটা আওয়াজ করল হরেন গলা দিয়ে।

হরেনের পাশের চেয়ারটায় গিয়ে বসল কানাই। "আপনার নৌকোয় ফকিরকে নিয়ে ফিরে আসার কথা দিয়েই শেষ হয়েছে মেসোর লেখা।"

চোখটা একটু নামাল হরেন, জলের দিকে। যেন ফিরে তাকাল অতীতের ভেতর। খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, "আরেকটু আগেই বেরিয়ে পড়া উচিত ছিল আমাদের। জলের টানের সুযোগটা পাওয়া যেত তা হলে।"

"আর মরিচঝাঁপিতে তারপর কী হল? আপনি জানেন?" বিড়িতে আরেকটা টান দিল হরেন। "আর সবাই যা জানে তার থেকে বেশি কিছু আমি জানি না। সবই গুজব বলতে পারেন।"

"কী গুজব?"

অল্প একটু ধোঁয়া পাক খেয়ে বেরিয়ে এল হরেনের নাক দিয়ে। "শুনেছিলাম হামলাটা শুরু হয়েছিল তার পরের দিন। আশেপাশের গাঁ-গুলোতে যেসব গুণ্ডারা জড়ো হয়েছিল তাদের সকলকে লঞ্চে, ডিঙিতে, ভটভটিতে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মরিচঝাঁপিতে। ওরা গিয়ে সব ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিল, দ্বীপের লোকেদের নৌকো-টৌকো যা ছিল ডুবিয়ে দিল, খেতখামার সব নষ্ট করে দিল।" স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে গলা দিয়ে একটা আওয়াজ করল হরেন।

"যা যা করা যায় তার কোনওটাই বাকি রাখেনি।"

"তা হলে কুসুম আর আমার মেসো–ওদের কী হল?"

"ঠিক কী যে হল সেটা কেউই জানে না। তবে আমি যতটা শুনেছিলাম তা হল, একদল মেয়েকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ওরা। কুসুম তাদের মধ্যে ছিল। লোকে বলে ওদের ওপরে অত্যাচার করে তারপর নাকি নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, যাতে ভেসে যায় স্রোতের টানে। বেশ কিছু মানুষ মারা গিয়েছিল মরিচঝাঁপিতে সেদিন। সাগর টেনে নিয়েছিল ওদের সবাইকে।"

"আর আমার মেসোর কী হল?"

"অন্য অনেকের সঙ্গে ওনাকেও একটা বাসে তুলে দেওয়া হয়েছিল। ওই মধ্যপ্রদেশ না কোথায়, যেখান থেকে ওরা এসেছিল সেখানে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু কোথাও একটা এসে নিশ্চয়ই ছেড়ে দিয়েছিল ওনাকে, কারণ শেষপর্যন্ত তো উনি ক্যানিং-এ গিয়ে পৌঁছেছিলেন।"

এই পর্যন্ত বলে হরেন নিজের পকেট হাতড়াতে শুরু করল। বেশ খানিকক্ষণ চলল পকেটের ভেতর ওর খোঁজাখুঁজি। বিড়বিড় করে গালি দিতে লাগল নিজের মনে। অবশেষে পকেট থেকে যখন বিড়িটা বের করল, ততক্ষণে কানাইয়ের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে নির্মল আর কুসুমের প্রসঙ্গ থেকে কথা ঘোরানোর চেষ্টা করছে হরেন। খানিক পরে তাই বেশ একটা অমায়িক গলায় যখন জিজ্ঞেস করল, "কালকে তা হলে কখন রওয়ানা হবেন ভাবছেন?" কানাই আশ্চর্য হল না।

কিন্তু হরেনকে কথা ঘোরাতে দেবে না ও ঠিক করেছে। "আচ্ছা, একটা কথা বলুন হরেনদা, আপনিই তো আমার মেসোকে মরিচঝাঁপি নিয়ে গিয়েছিলেন; মেসো ওই জায়গাটার সঙ্গে এতটা জড়িয়ে পড়েছিলেন কেন বলুন তো? আপনার কী মনে হয়?"

"জড়িয়ে তো কমবেশি সবাই পড়েছিল তখন," ঠোঁট ওলটাল হরেন।

"কিন্তু ধরুন, কুসুম আর ফকির আপনার আত্মীয় ছিল। ওদের জন্য আপনার ভাবনা হতে পারে–সেটা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু সারের ব্যাপারটা কী? ওনার কাছে কেন এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল মরিচঝাঁপির ঘটনাটা?"

চুপ করে বিড়ি টানতে লাগল হরেন। অবশেষে বলল, "আপনার মেসো অন্য আর পাঁচটা মানুষের মতো ছিলেন না কানাইবাবু। লোকে বলত ওনার মাথায় গণ্ডগোল ছিল। আর পাগলে কী না করে ছাগলে কী না খায়, কে বলতে পারে বলুন?"

"একটা কথা বলুন হরেনদা," কানাই নাছোড়বান্দা, "এরকম কি হতে পারে যে মেসো কুসুমের প্রেমে পড়েছিলেন?"

উঠে পড়ল হরেন। নাকঝাড়া দিয়ে এমন একটা ভাব করল যে পরিষ্কার বোঝা গেল সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে ওর। বিরক্ত কাটাকাটা গলায় তারপর বলল, "দেখুন কানাইবাবু, আমি মুখুসুখু মানুষ। আপনি যা বলছেন সেসব কথা আপনারা শহুরে লোকেরা ভাবতে পারেন, কিন্তু আমার ওসব ভাবার মতো সময় নেই।"

টান মেরে বিড়িটা দূরে ছুঁড়ে ফেলল হরেন। ঘঁাৎ করে আগুন নেভার শব্দ কানে এল। "যান, গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন এখন," বলল হরেন। "কাল সকাল সকাল বেরোতে হবে।"

রবিবারের ডাকঘর

সকাল সকালই শুয়ে পড়েছিল পিয়া। মাঝরাত্রে ঘুমটা চটে গেল হঠাৎ, উঠে বসে পড়ল বাঙ্কের ওপর। কয়েকটা মিনিট ধরে চেষ্টা করল যদি আবার ঘুম আসে। লাভ হল না। হাল ছেড়ে দিয়ে কম্বলটা গায়ে পেঁচিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল ডেকের উপর। চাঁদের আলোয় ধুয়ে যাচ্ছে চারদিক। এত ফটফটে জ্যোৎস্না, যে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে গেল ও, পিটপিট করে সইয়ে নিতে হল চোখ। একটু অবাক হয়ে দেখল কানাইও বসে আছে বাইরে। ছোট একটা কেরোসিন লণ্ঠনের আলোয় কী পড়ছে একমনে। এগিয়ে গিয়ে অন্য চেয়ারটায় বসে পড়ল পিয়া। বলল, "এখনও জেগে? মেশোর নোটবুকটা পড়ছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ। পড়া আসলে হয়ে গেছে, আরেকবার উলটে পালটে দেখছিলাম।"

"আমি একটু দেখতে পারি?"

"নিশ্চয়ই।" খাতাটা বন্ধ করে পিয়ার দিকে এগিয়ে দিল কানাই। আলগোছে নোটবইটা নিয়ে খুলে ধরল পিয়া।

"খুব খুদে খুদে লেখা।"

"হ্যাঁ," বলল কানাই। "পড়া একটু কঠিন।"

"বাংলায় লেখা, তাই না?"

"হ্যাঁ।" সাবধানে খাতাটা বন্ধ করে কানাইকে ফিরিয়ে দিল পিয়া। "কী আছে এর মধ্যে?" মাথা চুলকোল কানাই। নোটবইয়ের বিষয়বস্তু কীভাবে বর্ণনা করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। "কী নিয়ে মানে... নানারকম বিষয় নিয়েই লেখা আছে; বিভিন্ন জায়গার কথা, অনেক সব লোকেদের কথা, এইসব আর কী–"।

"সেসব লোকেদের কাউকে আপনি চেনেন?"

"চিনি। আমাদের ফকিরের মাকে নিয়েও অনেক কথা লেখা আছে এই নোটবইতে। ফকিরের কথাও আছে–তবে মেসো ওকে যখন দেখেছিলেন তখন ও খুবই ছোট।"

বিস্ময়ে চোখ গোল গোল হয়ে গেল পিয়ার। "ফকির আর ওর মা? ওদের কথা কী করে এল?"

"আপনাকে বলেছিলাম না, যে কুসুম–ফকিরের মা–এখানকার একটা দ্বীপে বসতি তৈরির একটা চেষ্টার সঙ্গে জড়িত ছিল?"

"তা বলেছিলেন।"

হাসল কানাই। "মনে হয় নিজের অজান্তেই খানিকটা কুসুমের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন আমার মেসো।"

"তাই লিখেছেন উনি এই খাতায়?"

"না," জবাব দিল কানাই। "কিন্তু সে উনি লিখতেনও না।"

"কেন?"

"উনি যেরকম ছিলেন, যে যুগের যে জায়গার মানুষ ছিলেন–তাতে এরকম কিছু লেখাটাকে বাঁচালতা মনে করতেন হয়তো," কানাই বলল।

নিজের ছোট ছোট কেঁকড়া চুলে আঙুল বোলাল পিয়া। "বুঝলাম না ঠিক। আচ্ছা, উনি কী ধরনের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন?"

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল কানাই। প্রশ্নটা ভাবতে সময় নিল একটু। তারপর বলল, "একটা সময় উনি ছিলেন প্রগতিবাদী। এমনকী এখনও যদি আপনি আমার মাসিকে জিজ্ঞেস করেন, মাসি বলবেন মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের সঙ্গে মেসো জড়িয়ে পড়েছিলেন কারণ বিপ্লবের ভূতটাকে উনি মাথা থেকে কখনও তাড়াতে পারেননি।"

"আপনি মনে হচ্ছে মাসির সঙ্গে একমত নন?"

"না," জবাব দিল কানাই। "আমার মনে হয় মাসির ধারণাটা ভুল। আমার চোখে মেসোর ঘাড়ে যে ভূত ভর করেছিল তা রাজনীতির নয়, শব্দবাক্য-অক্ষরের। কিছু কিছু মানুষ থাকে দেখবেন যারা কবিতার জগতেই জীবন কাটায়। আমার মেসো ছিলেন সেইরকম একজন

লোক। মাসির পক্ষে এরকম মানুষকে বুঝে ওঠাটা কঠিন ছিল কিন্তু মেসোর ধরনটাই ছিল ওই। কবিতা পড়তে ভালবাসতেন উনি, বিখ্যাত জার্মান কবি রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা। আমাদের কয়েকজন নামকরা কবি সেসব কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেছেন। রিলকে বলেছিলেন, 'জীবন যাপিত হয় পরিবর্তনে', আর আমার মনে হয় কবির এই কথাটা মেসো মর্মে মর্মে গেঁথে নিয়েছিলেন—কাপড় যেমন কালি শুষে নেয়, সেইভাবে। ওঁর কাছে কুসুম ছিল রিলকের সেই পরিবর্তনের ধারণার মূর্ত রূপ।"

"মার্ক্সবাদ আর কবিতা?" ভুরু তুলে শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল পিয়া। "একটু অদ্ভুত কম্বিনেশন—না?"

"তা ঠিক," কানাই সায় দিল। "আসলে এই ধরনের পরস্পর বিরোধিতাগুলি ছিল ওঁদের প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য। যেমন, মেসোর মতো বস্তুবোধশূন্য মানুষ আমি দুটো দেখিনি, কিন্তু নিজেকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে ভালবাসতেন উনি।"

"তার মানেটা ঠিক কী?"

"ওঁর কাছে তার মানে হল, এ জগতে সমস্ত কিছুই পরস্পর সম্পর্কিত—গাছপালা, আকাশ, জল-হাওয়া, মানুষ-জন, কাব্য-কবিতা, বিজ্ঞান, প্রকৃতি—সবকিছু। খুঁজে খুঁজে তথ্য সংগ্রহ করতেন মেসো সবসময়, অনেক পাখি যেমন চকচকে কিছু দেখলেই চুরি করে নিয়ে গিয়ে বাসায় জড়ো করে, তেমনি। কিন্তু সেসব তথ্য যখন উনি একসঙ্গে গেঁথে তুলতেন, সেগুলো হয়ে উঠত একেকটা গল্প—এক ধরনের কাহিনি।"

হাতের মুঠোয় চিবুকের ভর রেখে বসল পিয়া। "যেমন?"

মিনিট খানেক ভাবল কানাই। "মেসোর বলা একটা গল্প আমার এক্ষুনি মনে পড়ছে—কিছুতেই ভুলতে পারি না আমি গল্পটা।"

"কী নিয়ে সেটা?"

"ক্যানিং-এর কথা মনে আছে আপনার, গঞ্জ মতো যে জায়গাটায় এসে ট্রেন থেকে নামলাম আমরা?"

"কেন মনে থাকবে না?" পিয়া বলল। "ওখানেই তো পারমিটটা পেলাম আমি। আমার অবশ্য জায়গাটাকে খুব একটা স্মরণীয় স্থান বলে মনে হয়নি।"

"ঠিকই বলেছেন," বলতে লাগল কানাই। "আমি প্রথম ওখানে যাই ১৯৭০ সালে, মেসো আর মাসির সঙ্গে লুসিবাড়ি আসার পথে। জঘন্য লেগেছিল জায়গাটা আমার মনে হয়েছিল বীভৎস কাদা-প্যাঁচপ্যাটে ছোট শহর একটা। সেইরকমই একটা কিছু বোধহয় বলেছিলাম আমি। আর মেসো তো সঙ্গে সঙ্গে খেপে আগুন। প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন আমার ওপর, একটা জায়গা কীরকম সেটা নির্ভর করে তুমি তাকে কীভাবে দেখছ তার ওপর। তারপর একটা গল্প বললেন আমাকে। এমন অদ্ভুত গল্প, যে আমি ভাবলাম সেটা বুঝি তক্ষুনি বানালেন মুখে মুখে। কিন্তু পরে যখন বাড়ি ফিরে গেলাম, সত্যি সত্যিই বইপত্র ঘেঁটে দেখেছিলাম আমি—এক বিন্দুও বানিয়ে বলেননি মেসো।"

"কী ছিল গল্পটা?" জিজ্ঞেস করল পিয়া। "মনে আছে আপনার? আমার শুনতে ইচ্ছে করছে।"

"বেশ। মেসো যেমন যেমন বলেছিলেন সেভাবেই আমি আপনাকে বলার চেষ্টা করছি," কানাই বলল। "কিন্তু একটা ব্যাপার আপনাকে মনে রাখতে হবে—মেসো গল্পটা বলেছিলেন বাংলায়। আমি কিন্তু মনে মনে অনুবাদ করে সেটা বলব আপনাকে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন আপনি।"

আকাশের দিকে তর্জনী তুলে বলতে শুরু করল কানাই: "ঠিক আছে তা হলে বন্ধুগণ, আমি বলছি, তোমরা মন দিয়ে শোনো। আমি এখন তোমাদের বলব মাতলা নদীর কথা, এক ঝড়ে-পাওয়া মাতালের কথা, আর ক্যানিং নামে এক লাটসাহেবের মাতলামির কথা। শোনো, কান পেতে শোনো।

.

এই ভাটির দেশের অন্য আরও অনেক জায়গার মতোই ক্যানিং-এর নামও দিয়েছিলেন একজন ইংরেজ সাহেব। সে সাহেব আবার যে সে সাহেব নয়, একেবারে লাটসাহেব–ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং। এই লাটসাহেব আর তার লেডি দেশজুড়ে যেখানে সেখানে নিজেদের নাম ছড়িয়ে বেড়াতে ভালবাসতেন। তাদের পরবর্তী প্রজন্মের রাজনীতিকরা যেমন নিজেদের ছাই ছড়াতে পছন্দ করতেন, অনেকটা সেইরকম। অদ্ভুত অদ্ভুত সব জায়গার নাম আছে এই সাহেব-মেমের নামে রাস্তার নাম, জেলের নাম, পাগলাগারদের নাম। মজার ব্যাপারও অনেক হত। যেমন, লেডি ক্যানিং ছিলেন লম্বা, রোগা, একটু বদমেজাজি, কিন্তু কলকাতার এক মিঠাইওয়ালার মাথায় কী খেলল কে জানে, নতুন একটা মিষ্টি তৈরি করে তার নাম দিয়ে দিল মেমসাহেবের নামে। সে মিঠাই কিন্তু গোল, কালো আর রসে টইটম্বুর–মানে লেডি ক্যানিং-এর চেহারা কি স্বভাব কোনওটার সঙ্গেই কোনও মিল নেই তার। তবুও কপাল খুলে গেল মিষ্টিওয়ালার। হু হু করে বিক্রি হতে লাগল তার আবিষ্কৃত সেই নতুন মিঠাই। এত পরিমাণে লোকে সে মিষ্টি খেতে লাগল যে 'লেডি ক্যানিং'–এই পুরো কথাটা উচ্চারণ করতে যে সময় লাগে সে সময়টাও দিতে চাইল না তারা। মুখে মুখে মিষ্টিটার নাম হয়ে দাঁড়াল 'লেডিগেনি'।

এখন, লোকের মুখে ভাষা এবং শব্দের পরিবর্তনের নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম আছে। সেই নিয়মে যদি লেডি ক্যানিং হয়ে দাঁড়ায় লেডিগেনি, পোর্ট ক্যানিং-এর নামও তা হলে আস্তে আস্তে পালটে পোটুগেনি বা পোড়গেনি হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, তাই না? কিন্তু দেখ বন্ধুগণ, এই বন্দর শহরের নাম কিন্তু অপরিবর্তিত রয়ে গেল। এখনও মানুষ ওই লাটসাহেবের নামেই চেনে ক্যানিংকে।

কিন্তু কেন? কেন একজন লাটসাহেব তার সুখের সিংহাসন ছেড়ে এই মাতলার কাদায় এসে নিজের নামের চাষ করতে গেলেন?

মহম্মদ বিন তুঘলকের কথা মনে আছে তো তোমাদের? সেই পাগলা বাদশা, যিনি দিল্লি শহর ছেড়ে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এক অজ পাড়াগাঁয়? সেই একই ভূতে ধরেছিল বিলিতি সাহেবদেরও। একদিন হঠাৎ ওরা ঠিক করল নতুন একটা বন্দর চালু করতে হবে, বাংলাদেশের একটা নতুন রাজধানীর প্রয়োজন–দ্রুত পলি জমছে কলকাতার হুগলি নদীতে, ওদের তাই মনে হল কলকাতা বন্দরের ডকগুলি আর কিছুদিনের মধ্যেই বুজে যাবে কাদায়। যথারীতি, সব প্ল্যানার আর সার্ভেয়াররা বেরিয়ে পড়ল দলে দলে, পরচুলা আর চাপা পাতলুন পরে চষে বেড়াতে লাগল সারা রাজ্য, মাপজোক আর ম্যাপ তৈরি শুরু হয়ে গেল পুরো দমে। অবশেষে, এই মাতলার তীরে এসে একটা জায়গা পছন্দ হল ওদের। জেলেদের ছোট্ট একটা গ্রাম, তার সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নদী, আর সে নদী এমন চওড়া যে দেখলে মনে হয় সোজা সাগর পর্যন্ত বিছানো এক রাজপথ।

এখন, এটা তো সবাই জানে যে বাংলায় মাতলা' কথাটার মানে মত্ত। আর এ নদীকে যারা চেনে তারা ভালই জানে কেন এর এই নাম। কিন্তু নাম আর শব্দ নিয়ে মাথা ঘামানোর এত সময় কোথায় সেই ইংরেজ টাউন প্ল্যানারদের? সোজা লাটসাহেবের কাছে ফিরে গিয়ে তাঁকে জানাল কী চমৎকার জায়গা একখানা খুঁজে পাওয়া গেছে। শোনাল কেমন বিশাল চওড়া আর গভীর নদী, সোজা গিয়ে মিশেছে সাগরে, তার পাশে কেমন সুন্দর টানা সমতল জায়গা; লাটসাহেবকে তাদের প্ল্যান আর ম্যাপ-ট্যাপ যা যা ছিল দেখাল, সেখানে কী কী বানানোর পরিকল্পনা আছে শোনাল তাঁকে–হোটেল, বেড়ানোর জায়গা, পার্ক, বিরাট বিরাট প্রাসাদ, ব্যাঙ্ক, রাস্তাঘাট আরও কত কী। ওঃ, দারুণ সুন্দর একখানা শহর গড়া যাবে ওই মাতলার তীরে–কোনও কিছুর কোনও অভাব থাকবে না বাংলার সেই নতুন রাজধানীতে।

ঠিকাদারদের ডেকে সব বুঝিয়ে-টুঝিয়ে দেওয়া হল, কাজও শুরু হয়ে গেল চটপট: হাজার হাজার মিস্ত্রি, মহাজন আর ওভারসিয়াররা এসে জড়ো হল মাতলার পাড়ে, শুরু করল খোঁড়াখুঁড়ি। মাতলার জল খেয়ে মাতালের মতো কাজ করতে লাগল তারা, সব বাধা তুচ্ছ করে–এমনকী ১৮৫৭-র বিদ্রোহের সময়ও বন্ধ হল না কাজ। তোমরা যদি তখন এই মাতলার

পাড়ে থাকতে বন্ধুগণ, তোমরা জানতেও পারতে না যে উত্তর ভারতে কেমন গ্রাম থেকে গ্রামে খবর চালাচালি হচ্ছে চাপাটির সঙ্গে, মঙ্গল পাণ্ডে কখন বন্দুক ঘুরিয়ে ধরেছে তার অফিসারদের দিকে, কাতারে কাতারে কোথায় খুন হয়ে যাচ্ছে নারী শিশু, কোথায় বিদ্রোহীদের উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কামানের মুখে বেঁধে। এখানে প্রশান্ত নদীর পারে কাজ চলতে লাগল অবিশ্রাম: বাঁধ তৈরি হল, ভিত খোঁড়া হল, নদীর ধার ঘেঁষে বানানো হল রাস্তা, বসানো হল রেলের লাইন। এবং এই পুরো সময়টা ধরে শান্ত ধীর গতিতে বয়ে চলল মাতলা, অপেক্ষা করে রইল। কিন্তু নদীও সব সময় তার সব গোপন কথা আড়াল করে রাখতে পারে না। এখানে যখন বন্দর তৈরির কাজ চলছিল, ঠিক সেই সময় কলকাতা শহরে বাস করতেন এক ভদ্রলোক, স্বভাব তারও অনেকটা এই মাতলা নদীরই মতো। সামান্য একটা শিপিং ইন্সপেক্টরের চাকরি করতেন তিনি ইংরেজ সাহেব, নাম হেনরি পিডিংটন। ভারতে আসার আগে এই পিডিংটন সাহেব কয়েক বছর কাটিয়েছিলেন ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে। সেখানকারই কোনও এক দ্বীপে থাকার সময় প্রেমে পড়েছিলেন সাহেব। না, কোনও মহিলাকে ভালবাসেননি ভদ্রলোক, এমনকী এরকম নির্জন জায়গায় বেশিদিন কাটালে অনেক সাহেব যেমন পাগলের মতো তাদের কুকুরকে ভালবাসে, সেরকমও কিছু ঘটেনি তার জীবনে। মিস্টার পিডিংটন সেখানে ঝড়ের প্রেমে পড়েছিলেন। ওই সব দ্বীপে সে ঝড়ের নাম ছিল হারিকেন, আর সেই হারিকেনকেই ভীষণ ভালবেসে ফেললেন সাহেব। অনেক লোক যেমন পাহাড় বা আকাশের তারা ভালবাসে, পিডিংটনের ভালবাসা কিন্তু ঠিক সেরকম ছিল না। ঝড় ছিল তার কাছে বইয়ের মতো, সংগীতের মতো। প্রিয় লোক বা : গায়কের প্রতি যেরকম একটা টান থাকে মানুষের, ক্যারিবিয়ানের তুফান ঠিক সেইভাবে টানত সাহেবকে। পিডিংটন ঝড়কে পড়তেন, শুনতেন, বুঝতে চেষ্টা করতেন, ঝড় নিয়ে চর্চা করতেন। ঝড়কে এত ভালবাসতেন উনি যে নতুন একটা নামই তৈরি করে ফেললেন–'সাইক্লোন'।

এখন, আমাদের কলকাতা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মতো অতটা রোমান্টিক জায়গা হতে পারে, কিন্তু পিডিংটন সাহেবের প্রণয়চর্চার জন্য এ শহরও কোনও অংশে খারাপ ছিল না। ঝড়ের ভয়াল রূপের হিসাবে যদি বিচার করা যায়, দেখা যাবে বঙ্গোপসাগরের স্থান অন্য সব সমুদ্রের ওপরে–সে ক্যারিবিয়ান সাগরই হোক, কি দক্ষিণ চিন সমুদ্র। আমাদের এই সাগরের তুফান থেকেই তো 'টাইফুন' শব্দটা তৈরি হয়েছে, তাই না?

লাটসাহেবের নতুন বন্দরের কথা একদিন কানে এল পিডিংটনের। ওঁর কিন্তু এতটুকু সময় লাগল না বুঝতে যে কী মত্ততা লুকিয়ে আছে এই নদীর মধ্যে। এই মাতলার পাড়ে দাঁড়িয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে সাহেব বললেন, "ওই সার্ভেয়ারদের তুমি কঁকি দিতে পার, কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার ওসব চালাকি খাটবে না। তোমার কী ধান্দা তা আমার জানতে কিছু বাকি নেই। বাকিরাও যাতে জানতে পারে সে ব্যবস্থাও আমি শিগগিরই করছি।"

মনে মনে হাসল মাতলা। বলল, "যাও না, এক্ষুনি যাও। বলো না গিয়ে। তোমাকেই সবাই বলবে মাতলা–বলবে লোকটা নাকি নদী আর ঝড়ের মনের কথা পড়তে পারে।"

কলকাতায় নিজের বাড়িতে বসে একের পর এক চিঠি লিখতে লাগলেন পিডিংটন। প্ল্যানারদের লিখলেন, সার্ভেয়ারদের লিখলেন–কী বিপজ্জনক কাজ তারা করছে বললেন সে কথা; বললেন ভাটির দেশের এত গভীরে শহর গড়ার চিন্তা নিছক পাগলামি বই কিছু নয়; বাদাবন হল সাগরের সঙ্গে লড়ার জন্য বাংলার অস্ত্র, প্রকৃতির প্রচণ্ড আক্রমণ থেকে, দক্ষিণ বাংলাকে আড়াল করে রাখে এই জঙ্গল; ঝড়, ঢেউ, আর জলোচ্ছ্বাসের প্রথম ঝাঁপটাটা এই সুন্দরবনই সামলায়। ভাটির দেশ যদি না থাকত কবে জলের তলায় চলে যেত বাংলার সমতলক্ষেত্র: এই বাদাবনই তো এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছে পশ্চাভূমিকে। কলকাতার দীর্ঘ আঁকাবাঁকা সমুদ্রসড়ক আসলে হল সাগরের তুমুল শক্তির হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। সেই তুলনায় তো এই নতুন বন্দর ভয়ানক অরক্ষিত। কখনও যদি সেরকম জোরালো স্রোত আর হাওয়ার টান ওঠে তা হলে সামান্য একটা ঝড়েই ভেসে যাবে গোটা জায়গাটা–সাইক্লোনের টানে একটা ঢেউ ওঠার শুধু অপেক্ষা। মরিয়া হয়ে পিডিংটন

ভাইসরয়কে পর্যন্ত লিখে ফেললেন একটা চিঠি: বিষয়টা আরেকবার ভাল করে ভেবে দেখতে অনুরোধ করলেন, ভবিষ্যদ্বাণীও করলেন—বললেন, সত্যি সত্যি যদি বন্দর তৈরি হয় এই জায়গায়, পনেরো বছরের বেশি সে বন্দর টিকবে না। একদিন আসবে, যখন প্রচণ্ড সাইক্লোনের সঙ্গে আছড়ে পড়বে লোনা জলের বিশাল ঢেউ, ডুবিয়ে দেবে গোটা বসতিটাকে; এর জন্য মানুষ হিসাবে এবং বৈজ্ঞানিক হিসাবে নিজের মানসম্মান পণ রাখতেও তিনি রাজি—লিখলেন পিডিংটন।

খ্যাপা সাহেবের এসব কথায় অবশ্য কেউই কান দিল না; প্ল্যানারদের বা লাটসাহেবের কারওরই এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো সময় ছিল না। কে পিডিংটন? সামান্য একটা শিপিং ইন্সপেক্টর বই তো কেউ নয়। সাহেবদের জাতপাতের হিসেবে একেবারে নীচের দিকে তার স্থান। লোকে ফিসফাস করতে শুরু করল—আসলে মানুষটা একটু খ্যাপাটে তো, মাথায় অল্পবিস্তর গণ্ডগোল থাকাও বিচিত্র নয়। ও-ই তো কিছুদিন আগে বলেছিল না, যে ঝড় হল গিয়ে আসলে এক রকমের 'আশ্চর্য ধূমকেতু'?

সুতরাং কাজ চলতেই থাকল, বন্দরও তৈরি হয়ে গেল। বাঁধানো রাস্তাঘাট হল, রং-টং করা তকতকে সব হোটেল ঘরবাড়ি হল, মোটকথা যেমন যেমন ভাবা হয়েছিল ঠিক সেইভাবে বানানো হল শহরটাকে। তারপর একদিন খুব হইহল্লা করে ঢাকঢোল বাজিয়ে উৎসব হল, ভাইসরয় পা রাখলেন মাতলার পাড়ে, নতুন বন্দরের নাম দিলেন পোর্ট ক্যানিং।

পিডিংটন সাহেবকে কিন্তু সে উৎসবে যোগ দিতে ডাকা হয়নি। কলকাতার রাস্তায় তাকে দেখা গেলেই এখন লোকজন হাসি তামাশা করে: ওই যে, ওই দেখ রে, মাতাল পিডিংটন বুড়ো যাচ্ছে। ওই লোকটাই তো নতুন বন্দরের কাজ আটকানোর জন্য জ্বালিয়ে মারছিল লাটসাহেবকে। কী একটা যেন ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিল না? আবার নাকি মানসম্মান পণ রেখেছিল নিজের?

অপেক্ষা করো, অপেক্ষা করো, বললেন পিডিংটন—পনেরো বছর সময় দিয়েছি আমি। মাতাল সাহেবের ওপর দয়া হল মাতলার। পনেরো বছর তো অনেক লম্বা সময়, এর মধ্যেই যথেষ্ট ভোগান্তি হয়েছে লোকটার। একটা বছর সাহেবকে অপেক্ষা করিয়ে রাখল মাতলা, তারপর আরও এক বছর, তারপর আরও এক। এই করে করে কেটে গেল পাঁচ পাঁচটা বছর। অবশেষে একদিন, ১৮৬৭ সালে, যেন শক্তিপরীক্ষার সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে ফুঁসে উঠল নদী। আছড়ে পড়ল ক্যানিং-এর ওপর। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভেসে গেল শহরটা—কঙ্কালটুকু শুধু পড়ে রইল।

বিশাল কোনও তুফান নয়, পিডিংটন ঠিক যেমনটি বলেছিলেন, সেইরকম সাধারণ একটা ঝড় উঠেছিল। সেই ঝড়ের হাওয়ায় নয়, তার সঙ্গে ওঠা একটা ঢেউয়ে একটা জলোচ্ছ্বাসে—গুঁড়িয়ে গেল গোটা শহর। তার চার বছর পর, ১৮৭১ সালে, অবশেষে পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করা হল বন্দরটাকে। যে বন্দরের একদিন পুব সাগরের রানি হয়ে ওঠার কথা ছিল, টক্কর দেওয়ার কথা ছিল বোম্বাই, সিঙ্গাপুর আর হংকং-এর সঙ্গে, সে এখন হয়ে গেল মাতলার কেনা বাঁদী—ক্যানিং।"

"মেশোর সব গল্পেরই শেষটা কিন্তু সবসময় রাখা থাকত সেই রিলকের জন্য,"কানাই বলল। বুকের ওপর হাত রেখে আবৃত্তি করতে লাগল:

'তবু, হায়, কী-অদ্ভুত আর্তিপুরে জনপদগুলি... আহা, দেবদূত, তিনি কেমন পায়ের তলে ধ্বস্ত করে দেবেন ওদের সান্ত্বনা বাজার, যার এক পাশে তৈরি করা গির্জেটি নগদ মূল্যে ক্রীত হয়ে, পড়ে আছে হতাশ ও পরিচ্ছন্ন—রুদ্ধ, যেন রবিবারে পোস্টাপিস।'

"বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা," বলল কানাই। পিয়া ততক্ষণে হাসতে শুরু করেছে। "সেই ১৮৬৭ সালে মাতলা যেদিন লাটসাহেবের সাধের স্বপ্নকে গুঁড়িয়ে দিল, তারপর থেকে এভাবেই রয়ে গেছে ক্যানিং—রবিবারের ডাকঘরের মতো।"

একটি হত্যা

মেঘার কেবিনগুলোর প্রত্যেকটার মধ্যেই একটা করে উঁচু প্ল্যাটফর্ম মতো জায়গা আছে, বাঙ্ক হিসাবে ব্যবহার করার জন্য। সেখানে কম্বল চাদর আর বালিশ পেতে একটা বিছানা বানিয়ে নিয়েছিল কানাই। খুব একটা শৌখিন কিছু না, তবে মোটামুটি আরামদায়ক। তার ওপরে শুয়ে বেশ ভালই ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ লোকজনের গলার আওয়াজে ঘুমটা ভেঙে গেল। মনে হল চারিদিকে অনেক লোকের হইচই। কিছু আওয়াজ দূর থেকে ভেসে আসছে, কিছু কাছ থেকে। হাতড়ে টর্চটা নিয়ে ঘড়ি দেখল কানাই—রাত তিনটে। ওপরের ডেক থেকে হরেন আর তার নাতির গলা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে, দুজনেই মনে হল খুব উত্তেজিত।

ঘুমোতে যাওয়ার আগে জামাকাপড় ছেড়ে শুধু একটা লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে নিয়েছিল কানাই, এখন গা থেকে কম্বলটা সরাতেই হাওয়ার ঠান্ডা ভাবটা টের পেল বেশ। কেবিন থেকে বেরোনোর আগে একটা কম্বল তুলে পেঁচিয়ে নিল গায়ে। হরেন আর তার নাতি কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে পড়ে তাকিয়ে ছিল পাড়ের দিকে।

"কী হয়েছে?" কানাই জিজ্ঞেস করল।

"ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। গায়ে কিছু একটা হয়েছে মনে হচ্ছে।"

মাঝনদীতে নোঙর করা রয়েছে বোটটা। বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে জোয়ারও লেগে গেছে; পাড় থেকে ওদের দূরত্ব এখন কম করে এক কিলোমিটার। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তুলো তুলো মেঘের মতো হিম উঠে এসেছে জলের বুক থেকে: ভোরের কুয়াশার মতো ঘন না হলেও দূরের পাড়ি অনেকটা আবছা লাগছে তাতে। কাঁপা কাঁপা হিমের চাদরের মধ্যে দিয়ে দেখা গেল কয়েকটা কমলা রং-এর আলোর বিন্দু খুব তাড়াতাড়ি এদিক ওদিক নড়াচড়া করছে, যেন জ্বলন্ত মশাল নিয়ে পাড় বেয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে কিছু লোক। কুয়াশা সত্ত্বেও এতটা দূর থেকে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে তাদের গলার আওয়াজ। এতগুলি লোক এই মাঝরাত্তিরে কেন এভাবে ছুটোছুটি করছে সেটা হরেন আর তার নাতিও মনে হল ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

হঠাৎ কনুইয়ে কার একটা ছোঁয়া পেল কানাই। ঘুরে তাকিয়ে দেখল পিয়া দাঁড়িয়ে আছে পাশে, চোখ ঘষছে হাত মুঠো করে। "কী হয়েছে?"

"সেটাই বোঝার চেষ্টা করছি। এরাও কেউ বলতে পারছে না।"

"ফকিরকে একবার জিজ্ঞেস করুন না।"

ভটভটির পেছন দিকটায় গেল কানাই, পিয়াও গেল সঙ্গে সঙ্গে। নীচে নৌকোর ওপর টর্চের আলো ফেলতে দেখা গেল জেগেই আছে ফকির, একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে নৌকোর মাঝখানটায় বসে আছে জড়োসড়ো হয়ে। মুখে আলো পড়তে হাত তুলে চোখ আড়াল করল। টর্চটা নিভিয়ে দিল কানাই। একটু ঝুঁকে পড়ে কী কথা বলল ফকিরের সঙ্গে।

"ও জানে কী হয়েছে?" পিয়া জানতে চাইল।

"না। ডিঙি নিয়ে যাবে বলছে পাড়ে। বলছে চাইলে আমরাও যেতে পারি ওর সঙ্গে।"

"সে তো যাবই।"

ফকিরের নৌকোয় চড়ে বসল কানাই আর পিয়া। নাতিকে ভটভটিটার দায়িত্বে রেখে হরেনও চলে এল ওদের সঙ্গে।

পাড় পর্যন্ত যেতে প্রায় মিনিট পনেরো লাগল। এগোতে এগোতেই বোঝা যাচ্ছিল, একটা নির্দিষ্ট জায়গাকে কেন্দ্র করে হল্লাটা হচ্ছে: মনে হল হরেনের আত্মীয়রা গ্রামের যে জায়গাটায় থাকে ঠিক সেইখানটাতেই এসে জড়ো হচ্ছে সব লোকজন। ডাঙা যত কাছে আসতে থাকল ততই জোর হতে লাগল লোকের কথাবার্তা আর চিৎকার চেঁচামেচি, বাড়তে বাড়তে একসময় সমস্ত আওয়াজ মিশে গিয়ে শুধু ক্রুদ্ধ ধকধকে একটা শব্দে পরিণত হল।

আওয়াজটা শুনতে শুনতে কেমন একটা ভয় ধরে গেল কানাইয়ের। হঠাৎ একটা ঝোঁকের মাথায় বলল, "পিয়া, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আমাদের আর এগোনোটা উচিত

হবে কিনা।"

"কেন?"

"এই হইচই-টা শুনে আমার কী মনে হচ্ছে জানেন?" কানাই জিজ্ঞেস করল।

"কী, একটা জটলা-টটলা কিছু?"

"জটলা ঠিক নয়, বলা যেতে পারে 'মব'—উত্তেজিত জনতা।"

"মব? এইটুকু একটা গ্রামে মব?"

"ব্যাপারটা বিশ্বাস করা কঠিন, তবে আওয়াজ যা শোনা যাচ্ছে তাতে আমার মনে হচ্ছে বড় ধরনের কোনও দাঙ্গা-হাঙ্গামা হচ্ছে ওখানে, আর দাঙ্গা আমি সামনাসামনি দেখেছি, চোখের সামনে লোক মরতেও দেখেছি। আমার মন বলছে সেইরকমই কিছু একটা হাঙ্গামার মধ্যে গিয়ে পড়তে চলেছি আমরা।"

চোখের ওপর হাত আড়াল করে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে গ্রামটার দিকে দেখতে লাগল পিয়া। "ব্যাপারটা দেখাই যাক না গিয়ে।"

জোয়ার শেষ হয়ে ভাটা পড়ে গেছে বেশ কিছুক্ষণ হল, কিন্তু নদী এখনও টইটম্বুর। খুব সহজেই ফকির ডিঙির গলুইটা পাড়ের কাদার মধ্যে নিয়ে তুলল। সামনে থেকে উঠে গেছে ভেজা মাটির ঢাল, বাদাবনের অন্ধকারে ঢাকা, তাদের শ্বাসমূল আর ছোট ছোট চারায় ভর্তি চারদিক। ভিড়টা যেখানে জড়ো হয়েছে তার কাছাকাছি নৌকোটা নিয়ে গিয়ে ভিড়িয়েছে। ফকির, ডিঙি থেকে সামনে ছায়ার মতো দেখা যাচ্ছে বাঁধটা, তার ওপর জমাট কুয়াশা—লালচে আভা ধরেছে মশালের আলোয়।

কানাই আর পিয়া বনবাদাড়ের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে এগোচ্ছিল সামনের দিকে, হাত নেড়ে ওদের থামিয়ে দিল হরেন। কানাইয়ের হাত থেকে টর্চটা নিয়ে পায়ের কাছে মাটিতে একটা জায়গায় আলো ফেলল। কাছে গিয়ে কানাই আর পিয়া দেখল মাটির মধ্যে একটা দাগের ওপর গিয়ে পড়েছে আলোটা। মাটিটা এখানে একটু নরম, ঠিক ভেজাও নয়, আবার শুকনোও নয়। তার ওপর স্পষ্ট হয়ে বসে গেছে ছাপটা, স্টেনসিলে আঁকা ছবির মতো। ওটা কীসের দাগ সেটা বুঝতে একটুও সময় লাগল না কানাইয়ের আর পিয়ার। রান্নাঘরের মেঝেতে বেড়ালের পায়ের ছোপ যেরকম দেখতে লাগে, এই দাগটাও খানিকটা সেইরকম—শুধু তার চেয়ে বহুগুণ বড়। এত স্পষ্টভাবে ছাপটা পড়েছে যে তার মধ্যে থাবার গোলগোল মাংসল অংশের গড়ন আর গুটিয়ে নেওয়া নখের দাগ আলাদা করে দেখা যাচ্ছিল। টর্চের আলোটা সামনের দিকে ফেলল হরেন। হুবহু একরকম ছাপ পরপর নদীর পাড় থেকে সোজা চলে গেছে বাঁধের ওপর। দাগগুলো দেখে জানোয়ারটা কোন পথে এসেছে তার একটা আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছিল। ওপারের জঙ্গল থেকে নেমে সাঁতরে নদী পার হয়েছে, আর এদিকে এসে পাড়ে যেখানটায় উঠেছে, ঠিক সেই জায়গাটাতেই এখন ভাসছে ফকিরের নৌকো।

"যেখান দিয়ে ওটা নদী পেরিয়েছে সেই জায়গাটা মেঘার থেকে নিশ্চয়ই দেখা যাচ্ছিল," পিয়া বলল।

"খুব সম্ভবত। কিন্তু আমরা সবাই যেহেতু ঘুমিয়ে ছিলাম তাই কেউ দেখে ফেলার ভয়টা মনে হয় ছিল না ওর।"

বাঁধের মাথার কাছাকাছি পৌঁছে মাটিতে বড়সড় একটা ছাপের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল হরেন। ইশারায় বলল এখানে বসেই গ্রামটাকে পর্যবেক্ষণ করে ওর শিকার বেছে নিয়েছিল জানোয়ারটা। মাটিতে আরেকটা দাগের দিকে দেখিয়ে বলল খুব সম্ভবত এখান থেকেই লাফ দিয়ে পড়েছিল শিকারের ওপর। বলতে বলতে উদ্বেগে অধীর হয়ে সামনের দিকে ছুটতে শুরু করল বুড়ো মানুষটা। ফকিরও দৌড়ল সঙ্গে সঙ্গে। কয়েক পা পেছনেই চলল পিয়া আর কানাই। কিন্তু বাঁধের ওপরে পৌঁছতেই যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে সবাই থমকে থেমে গেল একসঙ্গে। মশালের আলোয় দেখা যাচ্ছিল গোটা গ্রামটা গায়ে গায়ে লাগা কতগুলি মাটির বাড়ির জটলার মতো। বাঁধের সমান্তরাল ভাবে পরপর চলে গেছে বাড়িগুলো। ওদের ঠিক সামনে, শখানেক মিটার দূরে, দেখা যাচ্ছিল একটা মাটির দেওয়ালওয়ালা ঘর, খোড়ো ছাউনি

দেওয়া। কুঁড়েটার চারদিকে ঘিরে প্রায় একশো লোক জড়ো হয়েছে। বেশিরভাগই পুরুষমানুষ, তাদের অনেকের হাতে লম্বা বাঁশের বল্লম, সামনের দিকটা চেঁছে ছুঁচোলো করা। সেই বল্লমগুলো ওরা বারবার গেঁথে দিচ্ছে মাটির ঘরটার মধ্যে। প্রচণ্ড ভয় আর ক্রোধে বিকৃত হয়ে গেছে লোকগুলোর মুখ। ভিড়ের মধ্যে যে ক'জন মহিলা আর বাচ্চা আছে সমস্বরে তারা চিৎকার করছে:

"মার! মার!"

ভিড়টার একধারে হরেনকে দেখতে পেয়ে কানাই আর পিয়া সেদিকে এগিয়ে গেল। "এখানেই আপনার আত্মীয়রা থাকেন?" জিজ্ঞেস করল কানাই।

"হ্যাঁ," বলল হরেন। "এখানেই থাকে ওরা।"

"কী হয়েছে? গণ্ডগোলটা কীসের?"

"সেই যে মোষের বাচ্চা হওয়ার আওয়াজ শুনেছিলাম আমরা মনে আছে?" হরেন বলল।

"সেই থেকেই শুরু হয়েছে ব্যাপারটা। নদীর ওপার থেকে বড়মিঞাও শুনেছে আওয়াজটা। তারপর জল পেরিয়ে চলে এসেছে এদিকে।"

সামনের কুঁড়েটা আসলে একটা গোয়ালঘর, বলল হরেন। কাছেই একটু বড় আরেকটা কুঁড়েতে থাকে ওর আত্মীয়রা। আধঘণ্টাখানেক আগে হঠাৎ হুড়মুড় করে একটা শব্দ আর গোরুমোষের চিৎকারে ওদের ঘুম ভেঙে যায়। বাইরে তখন ঘন অন্ধকার। কুয়াশাও ছিল বেশ। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তাই কিছুই দেখতে পায়নি ওরা, কিন্তু যেটুকু শুনতে পেয়েছে তাতেই পরিষ্কার বোঝা গেছে কী ঘটেছে ব্যাপারটা: বড় একটা জানোয়ার লাফ দিয়ে এসে পড়েছে গোয়ালঘরটার ওপর, আর নখ দিয়ে খড়ের চালে গর্ত করার চেষ্টা করছে। একটু পরেই আরেকটা ধড়মড় করে আওয়াজে বোঝা গেছে জানোয়ারটা ঢুকে পড়েছে গোয়ালের ভেতরে। বাড়িতে ছয় ছয়টা জোয়ান লোক। ওরা দেখল এরকম সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। বাঘটা এ গাঁয়ে নতুন নয়, আগেও এসেছে বেশ কয়েকবার। দু'বার দুটো লোককে মেরেছে, গোরু-ছাগলও খেয়েছে অনেকগুলো। এখন গোয়ালঘরের মধ্যে ওটা যতটুকু সময় আছে তার মধ্যে ওকে কবজা করা খুব একটা কঠিন হবে না। কারণ ওখান থেকে পালাতে হলে ওকে খাড়া লাফ দিয়ে চালের ওই ঘেঁদাটার মধ্যে দিয়ে বেরোতে হবে। একটা বাঘের পক্ষেও সেটা খুব একটা সোজা কাজ নয়। আর মুখে একটা বাছুর নিয়ে ওভাবে লাফিয়ে বেরোনো তো আরও কঠিন।

বাড়িতে যে ক'টা মাছ-ধরা জাল ছিল সবগুলো নিয়ে ওরা বেরিয়ে এল। একটার পর একটা সেগুলোকে ছুঁড়ে দিল গোয়ালঘরের চালের ওপর। তারপর কাঁকড়া ধরার নাইলন দড়ি দিয়ে শক্ত করে একসঙ্গে বাঁধল জালগুলোকে। এবার বাঘটা বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য যেই লাফ দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে গেছে জালে; আর ফের গিয়ে পড়েছে গোয়ালঘরের ভেতর। বেরোনোর জন্য ছটফট করছে ওটা তখন। সেই সময় ছেলেদের মধ্যে একজন একটা বাঁশের বল্লম জানালা দিয়ে সোজা ঢুকিয়ে দিয়েছে ওর চোখের মধ্যে।

হরেন যেমন যেমন বলে যাচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলি ইংরেজিতে অনুবাদ করে যাচ্ছিল কানাই পিয়ার জন্য। কিন্তু এই পর্যন্ত শুনেই ওকে থামিয়ে দিল পিয়া। কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "তার মানে আপনি বলতে চাইছেন বাঘটা এখনও এই চালাঘরটার মধ্যে রয়েছে?"

"হ্যাঁ," বলল কানাই। "এখানেই আটকে রয়েছে বাঘটা এখন, অন্ধ অবস্থায়।"

পিয়া একবার মাথাটা ঝাঁকাল, যেন একটা দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার চেষ্টা করছে। দুর্বোধ্য একটা দৃশ্য ঘটে যাচ্ছে চোখের সামনে, কিন্তু তার প্রতিটা খুঁটিনাটি এত স্পষ্ট, যে এতক্ষণে পিয়া বুঝতে পারল এই সব তীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এতগুলি লোক আসলে ওই আহত প্রাণীটাকে আক্রমণ করছে। পুরো ব্যাপারটা তখনও ও বোঝার চেষ্টা করছে, এমন সময় সাড়া দিল বাঘটা, এই প্রথম বার। মুহূর্তের মধ্যে গোয়ালঘরের থেকে দূরে সরে গেল লোকজন। বল্লম-উল্লম ফেলে হাত দিয়ে মুখ আড়াল করল সবাই, যেন প্রচণ্ড কোনও

বিস্ফোরণ থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে। এমন তীব্রতা সে আওয়াজের যে পায়ের নীচের মাটি পর্যন্ত কেঁপে কেঁপে উঠছিল তাতে, নিজের খালি পায়ের চেটোয় সেটা স্পষ্ট অনুভব করল পিয়া। এক মুহূর্তের জন্য সকলের সব নড়াচড়া থেমে গেল। তারপর যেই পরিষ্কার হল যে বাঘটা এখনও গোয়ালঘরের মধ্যেই অসহায় বন্দি অবস্থাতেই রয়েছে, অমনি বল্লম তুলে নিয়ে দ্বিগুণ ক্রোধে সেদিকে তেড়ে গেল সবাই।

কানাইয়ের হাতটা খামচে ধরে ওর কানের কাছে চিৎকার করে পিয়া বলল, "এক্ষুনি কিছু একটা করতে হবে, কানাই। এটা কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না।"

"কিছু করতে পারলে ভাল হত পিয়া, কিন্তু উপায় কিছু আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।"

"কিন্তু একটা চেষ্টা তো করে দেখা যেতে পারে, কানাই, করা যায় না কিছু?" পিয়ার গলায় অনুনয়ের সুর।

এর মধ্যে হরেন এসে ফিসফিস করে কী যেন বলল কানাইয়ের কানে কানে। সঙ্গে সঙ্গে পিয়ার হাতটা ধরে বাঁধের দিকে ফেরানোর চেষ্টা করল কানাই। "শুনুন পিয়া, আমাদের ফিরে যেতে হবে এখন।"

"ফিরে যেতে হবে? কোথায়?"

"লঞ্চে ফিরতে হবে," কানাই বলল।

"কেন?" জিজ্ঞেস করল পিয়া। "কী হবে এখন এখানে?"

পিয়ার হাতটা ধরে টানতে শুরু করল কানাই। "যাই হোক না কেন, এখানে দাঁড়িয়ে সেটা না দেখাই ভাল আপনার।"

মশালের আলোয় উজ্জ্বল ওর মুখের দিকে তাকাল পিয়া। "কী লুকোচ্ছেন আপনি আমার থেকে? কী করতে চাইছে এরা?"

মাটিতে থুতু ফেলল কানাই। একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করুন পিয়া—এই জানোয়ারটা বহুদিন ধরে বার বার এ গ্রামে হানা দিচ্ছে। দু-দুটো লোককে মেরেছে, গোরু-ছাগল যে কত মেরেছে তার ইয়ত্তা নেই—"

"কিন্তু ওটা তো জানোয়ার, কানাই," বলল পিয়া। "জানোয়ারের ওপর আপনি প্রতিশোধ নিতে পারেন না।"

চারিদিকে উন্মত্তের মতো চিৎকার করছে গ্রামের লোকেরা, মশালের দপদপে আলোয় চকচক করছে তাদের মুখগুলো: মার! মার! পিয়ার কনুইটা ধরে ওকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল কানাই। "দেরি হয়ে গেছে পিয়া, আর কিছু করার নেই। আমাদের চলে যেতে হবে এখন।"

"চলে যাব?" পিয়ার গলায় বিস্ময়। "কিছুতেই যাব না আমি। আমি এটা আটকাব।"

"পিয়া, এটা একটা উন্মত্ত মব, খেপে গেলে আমাদেরও অ্যাটাক করতে পারে ওরা। আমরা এখানে বাইরের লোক।"

"তা হলে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবেন?"

"আমাদের পক্ষে এখানে কিছু করা সম্ভব নয় পিয়া," প্রায় চিৎকার করে বলল কানাই। "ঠান্ডা মাথায় একটু বোঝার চেষ্টা করুন ব্যাপারটা। চলুন, চলে যাই এখান থেকে।"

এক ঝাঁকুনি দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল পিয়া। "আপনি যেতে চান তো চলে যান, কিন্তু আমি কিছুতেই এভাবে কাপুরুষের মতো পালাব না। আপনি যদি কিছু না করেন, তা হলে আমি করব। আর ফকির—আমি জানি ফকিরও করবে। ও কোথায় গেল?"

আঙুল তুলে দেখাল কানাই। "ওখানে। দেখুন।"

বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে ডিঙি মেরে পিয়া দেখল ভিড়টার একেবারে সামনের দিকে দেখা যাচ্ছে ফকিরকে, একটা বাঁশের বল্লম চেঁছে ছুঁচোলো করে দিচ্ছে একজনকে। এক ধাক্কায় কানাইকে সরিয়ে দিয়ে ভিড়টার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল পিয়া। ঠেলতে ঠেলতে চলে গেল ফকিরের কাছ পর্যন্ত। সঙ্গে সঙ্গে ওদের চারপাশের ভিড়টা বেড়ে উঠল, মানুষের চাপে ফকিরের পাশের লোকটার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ল পিয়া। মশালের

দপদপে আলোয় কাছ থেকে বল্লমটা দেখতে পেল পিয়া। ছুঁচোলো ডগাটায় রক্তের দাগ। আর বাঁশের চেঁাচের ফাঁকে ফাঁকে লেগে আছে কয়েকগুছি হলদে কালো লোম। হঠাৎ পিয়ার মনে হল ও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে জানোয়ারটাকে—ভয়ে গুটিসুটি মেরে এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে গোয়ালঘরটার ভেতরে, সরে সরে গিয়ে ছুঁচোলো বল্লমগুলোর থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করছে, গায়ের জায়গায় জায়গায় গর্ত হয়ে গেছে মাংসের মধ্যে, সেই ক্ষতস্থানগুলি চাটছে। হাত বাড়িয়ে একটানে বল্লমটা কেড়ে নিল ও, সামনের লোকটার কাছ থেকে। তারপর পায়ের চাপে সেটাকে ভেঙে ফেলল দু'টুকরো করে।

এক মুহূর্তের জন্য ভীষণ হতভম্ব হয়ে গেল লোকটা। তারপর হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে কী সব বলতে লাগল আর একটা হাত মুঠো করে ঝাঁকাতে থাকল পিয়ার মুখের সামনে। মিনিট খানেকের মধ্যে আরও জনা ছয়েক এসে জুটে গেল লোকটার সঙ্গে। বয়স কারওরই খুব একটা বেশি নয়, মাথায় একটা করে চাদর জড়ানো সবার। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কী যে বলতে লাগল একবর্ণও তার বুঝল না পিয়া। এমন সময় কার একটা হাত এসে ধরল ওর কনুইটা। ফিরে তাকিয়ে দেখল ফকির দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর পেছনে। ওকে দেখে ভরসা পেল পিয়া: আশায় আর স্বস্তিতে হঠাৎ যেন অবশ হয়ে গেল মনটা। মনে হল ফকির ঠিক জানবে কী করতে হবে, এই সব পাগলামি বন্ধ করার কিছু একটা উপায় ঠিক ও বের করবে। কিন্তু সেসব কিছু করার বদলে ফকির এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল ওকে, বুকের সঙ্গে চেপে ধরে সরিয়ে নিয়ে চলল ভিড় ঠেলে। দু'পায়ে ওর হাঁটুতে লাথি মারতে লাগল পিয়া, খামচে দিল হাতদুটো। তার মধ্যেই হঠাৎ দেখতে পেল ভিড়টার মধ্যে থেকে একটা আগুনের গোলা উড়ে গিয়ে পড়ল গোয়ালঘরটার ওপর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চালাটার ওপর গজিয়ে উঠতে শুরু করল লকলকে আগুনের শিখা। আরেকবার শোনা গেল গর্জন। তার এক মুহূর্ত পর ভিড়টা থেকে জবাব এল সে গর্জনের, উন্মত্ত রক্তলোলুপ চিৎকার—মার! মার! গোয়ালের ওপর লাফিয়ে বাড়তে লাগল আগুন, কাঠকুটো আর শুকনো খড় দিয়ে সেটাকে আরও উশকে দিতে থাকল লোকজন।

ফকিরের হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল পিয়া। চিৎকার করতে শুরু করল: "ছাড়ো আমাকে ছেড়ে দাও!"

কিন্তু ছেড়ে দেওয়ার বদলে ওকে ঘুরিয়ে ধরল ফকির, চেপে ধরল নিজের শরীরের সঙ্গে; তারপর খানিকটা হেঁচড়ে, খানিকটা পাঁজাকোলা করে বাঁধের ওপর নিয়ে গিয়ে তুলল। লাফিয়ে বাড়তে থাকা আগুনের আলোয় পিয়া দেখল কানাই আর হরেন সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চারপাশ থেকে ঘিরে ওকে বাঁধ থেকে নামিয়ে নৌকোর দিকে নিয়ে চলল ওরা।

বাঁধের গা বেয়ে হোঁচট খেতে খেতে নামতে নামতে কোনওরকমে নিজেকে সংযত করে খুব ঠান্ডা গলায় পিয়া শুধু বলতে পারল, "ফকির, আমাকে ছেড়ে দাও। কানাই, ওকে বলুন আমাকে ছেড়ে দিতে।"

হাতটা একটু আলগা করল ফকির, কিন্তু অনিচ্ছার সঙ্গে। পিয়া একটু সরে দাঁড়াতেই প্রায় লাফ দিয়ে উঠল ও, মনে হল গ্রামের দিকে ফের দৌড়তে চেষ্টা করলেই গিয়ে ধরে ফেলবে আবার।

বাঁধের এপার থেকে ধু ধু করে জ্বলা আগুনের শব্দ কানে আসছিল পিয়ার, হাওয়ায় ভেসে আসছিল পোড়া চামড়া আর মাংসের গন্ধ। ওর কানের কাছে মুখ এনে কী যেন একটা বলল ফকির। কানাইয়ের দিকে ফিরে পিয়া জিজ্ঞেস করল, "কী বলল ও?"

"ও আপনাকে এতটা আপসেট হতে বারণ করছে।"

"আপসেট হব না? কী বলছেন আপনি? এরকম ভয়ংকর ব্যাপার আমি জীবনে দেখিনি—জ্যান্ত একটা বাঘকে পুড়িয়ে মেরে ফেলল?"

"ও বলছে বাঘ যখন গ্রামে আসে তখন মরতে চায় বলেই আসে।"

হাত দিয়ে দু'কান চেপে ফকিরের দিকে ফিরল পিয়া, "স্টপ ইট। এই নিয়ে আর কোনও কথা আমি শুনতে চাই না। লেটস জাস্ট গো।"

জেরা

পিয়ারা যখন বোটে গিয়ে উঠল ততক্ষণে ভোর হয়ে এসেছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মেঘার নোঙর তুলে ইঞ্জিন চালু করে দিল হরেন। বলল, যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে পড়া যায় ততই মঙ্গল। বাঘ মারার খবর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কানে পৌঁছলেই সঙ্গে সঙ্গে ঝামেলা শুরু হয়ে যাবে। তারপর দাঙ্গা, গোলাগুলি, পাইকারি হারে গ্রেফতার—সবই হতে পারে। সেরকম অভিজ্ঞতা আগে হয়েছে হরেনের।

ভটভটির মুখ ঘুরতে শুরু করতেই জামাকাপড় পালটানোর জন্য নিজের কেবিনের দিকে চলল কানাই। আর পিয়া, খানিকটা যেন অভ্যাসের বশে, ওপরের ডেকের সামনে ওর নিজের জায়গার দিকে এগিয়ে গেল। কানাইয়ের মনে হল কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওর 'নজরদারি' ফের চালু হয়ে যাবে। কিন্তু কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে কানাই দেখল ডেকের ওপর কেমন যেন গা ছেড়ে দিয়ে বসে আছে পিয়া, মাথাটা হতাশ ভাবে রেলিঙের ওপর হেলানো। ভঙ্গিটা দেখে কানাই পরিষ্কার বুঝতে পারল এতক্ষণ এখানে বসে বসে কাঁদছিল পিয়া।

ওর পাশে গিয়ে বসল কানাই। বলল, "মিছিমিছি এভাবে কষ্ট পাওয়ার কোনও মানে হয় পিয়া। ওখানে আমাদের কিছুই করার ছিল না।"

"একবার চেষ্টা তো করতে পারতাম।"

"তাতে লাভ কিছুই হত না।"

"হয়তো হত না," হাতের পেছন দিয়ে চোখ মুছল পিয়া। "যাক গে। তবে আপনার কাছে মনে হয় একটা ব্যাপারে আমার ক্ষমা চাওয়ার আছে কানাই।"

"ওখানে যা সব বলেছিলেন সে জন্য?" হাসল কানাই। "তাতে কিছু মনে করিনি আমি—আপনার রাগ করার যথেষ্ট সংগত কারণ ছিল।"

মাথা নাড়ল পিয়া, "না—শুধু সে জন্যে নয়।"

"তা হলে?"

"গতকাল আপনি আমাকে কী বলছিলেন মনে আছে?" জিজ্ঞেস করল পিয়া। "ঠিকই বলেছিলেন আপনি। আমিই আসলে ভুল বুঝেছিলাম।"

"আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—কোন ব্যাপারে কথা বলছেন আপনি," কানাই বলল। "ওই যে আপনি বলছিলেন না—সেই যে, কোনও রকমের কোনও মিলই নেই.."

"আপনার আর ফকিরের মধ্যে?"

"হ্যাঁ," বলল পিয়া। "ঠিকই বলেছিলেন আপনি। আমিই আসলে বোকামি করছিলাম। মনে হয় এরকম কিছুর একটা দরকার ছিল আমার ভুলটা ভাঙার জন্য।"

জয়ের আনন্দে প্রথমেই যে কথাটা মুখে আসছিল একটু চেষ্টা করে সেটা গিলে ফেলল কানাই। গলার স্বর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে জিজ্ঞেস করল, "এই গভীর উপলব্ধি আপনার কীভাবে হল সেটা জানা যেতে পারে কি?"

"এইমাত্র যা ঘটে গেল তার থেকেই হল," বলল পিয়া। "ফকিরের এইরকম ব্যবহার আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না।"

"কিন্তু এ ছাড়া আর কী আশা করেছিলেন ওর কাছ থেকে আপনি, পিয়া?" কানাই জিজ্ঞেস করল। "আপনি কি ভেবেছিলেন ও আসলে মাটির থেকে উঠে আসা একজন পরিবেশবিদ? তাও নয়। ফকির একজন জেলে পেটের জন্য মাছ মারাই ওর কাজ।"

"সেটা বুঝতে পারি," পিয়া বলল। "ওকে দোষ দিচ্ছি না আমি। আমি জানি ছোটবেলা থেকে এই ভাবেই ও বেড়ে উঠেছে। আসলে আমি ভেবেছিলাম ও হয়তো ঠিক অন্য সকলের মতো নয়, একটু আলাদা।"

সহানুভূতির সঙ্গে পিয়ার হাটুতে আলতো করে হাত রাখল কানাই। "বাদ দিন এসব আলোচনা এখন। সামনে অনেক কাজ পড়ে আছে আপনার।"

মাথা তুলে তাকাল পিয়া। একটু চেষ্টার হাসি ফোঁটাল মুখে।

ঘণ্টাখানেকের পথ পেরিয়ে এসেছে মেঘা, এমন সময় ছাই-রঙা একটা মোটরবোট সশব্দে বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। পিয়া তখন দূরবিন চোখে ভটভটির সামনে দাঁড়িয়ে, আর কানাই বসে আছে ছাউনির নীচে। দুজনেই তাড়াতাড়ি পাশের দিকটায় গিয়ে উঁকি মেরে দেখল তিরবেগে ভাটির দিকে চলে যাচ্ছে বোটটা, তাতে ভর্তি খাকি পোশাক পরা ফরেস্ট গার্ড। যে গ্রাম থেকে ওরা খানিক আগে এসেছে সেইদিকেই যাচ্ছে মনে হল।

এর মধ্যে হরেনও এসে দাঁড়িয়েছে ওদের পাশে। ও কিছু একটা বলল, তাতে হো হো করে হেসে উঠল কানাই। পিয়াকে ব্যাখ্যা করে বলল, "হরেন বলছে কারও যদি কখনও এরকম অবস্থা হয় যে একদিকে গেলে জলদস্যুর হাতে পড়বে আর অন্য দিকে গেলে ফরেস্ট গার্ডের হাতে, তা হলে জলদস্যুর দিকে যাওয়াটাই ভাল। কম বিপজ্জনক।"

কাষ্ঠ হেসে ঘাড় নাড়ল পিয়া। ফরেস্ট গার্ডদের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ল ওর। জিজ্ঞেস করল, "ওরা কী করতে যাচ্ছে ওখানে?"

"ধরপাকড়, জরিমানা, মারধর—আরও কী কী করবে কে জানে," কানাই বলল।

আরও ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। একটা মোহনা পার হতে গিয়ে বেশ কয়েকটা ছাই-রঙা মোটরবোটের একটা দল চোখে পড়ল ওদের। আগের বোটটা যেদিকে গেছে মনে হল এগুলোও সেই একই দিকে যাচ্ছে।

"আরেব্বাস," বলে উঠল পিয়া। "এরা তো মনে হচ্ছে সহজে ছাড়বে না।"

"সেরকমই দেখা যাচ্ছে," বলল কানাই।

হঠাৎ একটা মোটরবোট মুখ ঘুরিয়ে দল ছেড়ে বেরিয়ে এল। স্পিড বাড়াতে বোঝা গেল সোজা মেঘার দিকেই আসছে ওটা।

হরেনও দেখতে পেয়েছে বোটটাকে। সারেঙের ঘরের ভেতর থেকে মুখ বের করে ব্যস্ত ভাবে কী যেন একটা বলল কানাইকে।

"পিয়া, আপনাকে এবার কেবিনে ঢুকে পড়তে হবে," কানাই বলল। "হরেন বলছে যদি আপনাকে ওরা লঞ্চে দেখতে পায় তা হলে ঝামেলা হতে পারে। মানে, আপনি বিদেশি আর ঠিকমতো পারমিট-টারমিট নেই, এসব বলে ঝাট করতে পারে।"

"ওকে।" পিঠব্যাগটা তুলে নিয়ে কেবিনে গিয়ে ঢুকল পিয়া। দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল ভেতর থেকে। বাঙ্কে শুয়ে পড়ে ক্রমশ জোরালো হতে থাকা মোটরবোটের ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে লাগল। শব্দটা যখন থেমে গেল, ও বুঝতে পারল বোটটা মেঘার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর শুনতে পেল লোকজনের কথাবার্তার আওয়াজ, বাংলায়। প্রথমটায় শান্ত ভদ্র সুরে কথা শুরু হল, তারপর সুর চড়তে আরম্ভ করল আস্তে আস্তে। অনেকের গলার মধ্যে থেকে কানাইয়ের গলাটা আলাদা করে শুনতে পেল পিয়া।

ঝাড়া একটা ঘণ্টা কেটে গেল এই করে। যুক্তি, পালটা যুক্তি চলতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে ওঠানামা করতে লাগল গলার স্বর। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গুমোট বাড়ছে কেবিনের ভেতর। ভাগ্যিস একটা জলের বোতল ছিল পিয়ার কাছে।

আরও বেশ খানিকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে থেমে গেল কথাবার্তার আওয়াজ। মোটরবোটটাও ফিরে চলে গেল তারপর। ধকধক শব্দ উঠল মেঘার ইঞ্জিনে, আর পিয়ার কেবিনের দরজায় কে এসে ঠকঠক আওয়াজ করল। দরজা খুলে কানাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল পিয়া।

"কী এত গোলমাল হচ্ছিল?"

মুখ বাঁকাল কানাই। "যা বোঝা গেল, ওরা শুনেছে কালকে যখন বাঘটাকে মারা হয়েছে তখন একজন বিদেশি ওই গ্রামে ছিল। তাই ওরা নাকি ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেছে।"

"কেন?"

"বলছে যে বর্ডারের এত কাছে গার্ড ছাড়া ঘুরে বেড়ানো নাকি একজন ফরেনারের পক্ষে খুব বিপজ্জনক। কিন্তু আমার মনে হয় ওরা আসলে খবরটা বাইরে ছড়াতে দিতে চায় না।"

"বাঘ মারার খবরটা?"

"হ্যাঁ," মাথা নাড়ল কানাই। "এতে করে ওদের সম্পর্কে লোকের ধারণা খারাপ হয়ে যাবে। কিন্তু একটা জিনিস যেটা বোঝা যাচ্ছে সেটা হল আপনি যে এই এলাকায় ঘোরাফেরা করছেন সেটা ওরা জানে, আর এটাও পরিষ্কার যে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা। বারবার জিজ্ঞেস করছিল আমরা আপনাকে দেখেছি কিনা।"

"কী বললেন আপনারা?"

হাসল কানাই। "হরেন আর আমি তো পুরো অস্বীকার করে গেলাম। মোটামুটি মানিয়েও ফেলেছিলাম, কিন্তু তারপর ওরা ফকিরকে দেখতে পেয়ে গেল। একজন গার্ড ওকে চিনে ফেলল। বলল, ওর নৌকোতেই শেষ দেখা গিয়েছিল আপনাকে।"

"ও মাই গড!" পিয়া বলল। "ছুঁচোমুখো একটা গার্ড?"

"হ্যাঁ। সেরকমই দেখতে। অন্যদের ও কী বলল জানি না, কিন্তু ফকিরকে তো নিয়ে জেলে পুরে দিয়েছিল আর একটু হলে। কোনও রকমে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শেষে ওদের নিরস্ত করলাম।"

"কী করে করলেন?"

খুব শুকনো গলায় কানাই বলল, "কী করে আর করব? আমার দু-একজন বন্ধুবান্ধবের নাম বললাম, আর তারপর একটু গল্পগুজব করে ওরা চলে গেল।"

পিয়া আন্দাজ করল ব্যাপারটার গুরুত্ব খানিকটা হালকা করার জন্যই এই শ্লেষের সুর কানাইয়ের গলায়। ধীর, নাগরিক স্বভাবের মানুষটার প্রতি হঠাৎ একটা কৃতজ্ঞতাবোধে ভরে উঠল ওর মন। আজকে যদি কানাই এখানে না থাকত কী হত তা হলে? খুব সম্ভবত ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের মোটরবোটে গিয়ে ওঠাই কপালে ছিল ওর।

কানাইয়ের হাতের ওপর একটা হাত রাখল পিয়া। "থ্যাঙ্ক ইউ। আপনি যা করলেন তার তুলনা নেই। এক বর্ণও বাড়িয়ে বলছি না। ফকিরও নিশ্চয়ই খুবই কৃতজ্ঞ।"

ঠাট্টা করে মাথা নোয়াল কানাই। "আপনাদের কৃতজ্ঞতা আমি মাথায় করে নিলাম।" তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "তবে একটা কথা আমি বলব পিয়া, ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু একবার সিরিয়াসলি ভেবে দেখবেন। যদি ওরা আপনাকে খুঁজে পেয়ে যায় তা হলে কিন্তু ভীষণ ঝামেলায় পড়বেন। জেলেও যেতে হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আর আমার বা অন্য কারও খুব একটা কিছু করার থাকবে না। বর্ডার এলাকার হিসাব কেতাব কিন্তু অন্য সব জায়গার থেকে আলাদা।"

দূর জলের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল পিয়া। ওর মনে পড়ল একশো বছর আগে যখন ব্লিথ কি রক্সবার্গের মতো প্রকৃতিবিদরা এই অঞ্চল চষে বেড়িয়েছেন তখন জলচর প্রাণীতে থিকথিক করত এখানকার নদীনালা। তারপরের এই এতগুলো বছরের কথা মনে পড়ল ওর কোনও না কোনও কারণে ওই সব প্রাণীদের প্রতি আর কেউ বিশেষ নজর দেয়নি; ফলে কীভাবে ওরা আস্তে আস্তে হারিয়ে গেল সে খোঁজও রাখা হয়নি। এতদিন পরে ওর ওপরই প্রথম দায়িত্ব পড়েছে সরেজমিনে দেখে রিপোর্ট তৈরি করার। সে দায়িত্ব ও কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারবে না।

"এখন ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না কানাই," পিয়া বলল। "আসলে, আমার কাজটা ঠিক কতটা ইম্পর্ট্যান্ট সেটা আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না। আমি যদি আজকে ফিরে চলে যাই, আবার কবে একজন সিটোলজিস্ট এখানে আসতে পারবে কে বলতে পারে? যতদিন সম্ভব হয় আমাকে থাকতেই হবে এখানে।"

ভুরু কোঁচকাল কানাই। "আর যদি ওরা আপনাকে জেলে পুরে দেয় তা হলে কী হবে?"

কাঁধ ঝাঁকাল পিয়া। "জেলে আর কতদিন রাখবে? আবার যখন ছেড়ে দেবে, যা যা দেখেছি সেগুলো তো আমার মাথায় রয়েই যাবে, তাই না?"

সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে এল। সূর্য গনগন করছে মাথার ওপর। কাজ থামিয়ে খানিকক্ষণের জন্য কানাইয়ের পাশে তেরপলের ছায়ায় এসে বসল পিয়া। চোখের দৃষ্টি একটু

যেন ক্লিষ্ট। সেটা লক্ষ করে কানাই বলল, "আপনি কি এখনও ওই ফরেস্ট গার্ডদের কথা ভাবছেন নাকি?"

কথাটা শুনে মনে হল যেন একটু চমকে উঠল পিয়া। "না না, সেসব কিছু নয়।"

"তা হলে?"

মাথা পেছনে হেলিয়ে পিয়া ওয়াটার বটল থেকে একটু জল খেল। মুখটা মুছে নিয়ে বলল, "ওই গ্রামটার কথা ভাবছি। কালকে রাত্রের কথা। কিছুতেই আমি ঘটনাটা বের করতে পারছি না মাথা থেকে—ঘুরে ফিরে ছবিগুলো চোখের সামনে ভেসে আসছে—ওই লোকগুলোর ছবি, আগুনের ছবি.. যেন অন্য কোনও যুগের একটা ঘটনা—ইতিহাস লেখা শুরু হওয়ার আগেকার কোনও সময়ের। মনে হচ্ছে কখনওই মন থেকে আমি দূর করতে পারব না ওই..."

মনে মনে ঠিক শব্দটা হাতড়াতে লাগল পিয়া। শূন্যস্থান পূরণ করার জন্যে কানাই বলল: "ওই বিভীষিকা?"

"বিভীষিকা। হ্যাঁ। জীবনে কখনও ভুলতে পারব কি না জানি না।"

"সম্ভবত না।"

"কিন্তু ফকির বা হরেন বা গ্রামের অন্য সব লোকেরা ওদের কাছে তো এটা রোজকার জীবনের অংশ, তাই না?"

"আমার মনে হয় পিয়া, এইভাবেই জীবনটাকে নিতে শিখেছে ওরা। তা ছাড়া ওরা বাঁচতে পারবে না।"

"সেই চিন্তাটাই তাড়া করে বেড়াচ্ছে আমাকে," বলল পিয়া। তার মানে ওরাও তো এই বিভীষিকারই অংশ হয়ে গেল, ঠিক না?"

হাতের নোটবইটা ঝপ করে বন্ধ করে দিল কানাই। "ফকির কিংবা হরেনের মতো মানুষদের প্রতি অবিচার না করে যদি পুরো ব্যাপারটা দেখতে চান পিয়া, হলে কিন্তু আমি বলব বিষয়টা ঠিক এতটা সহজ নয়। মানে, আমি বলতে চাইছি সেভাবে দেখতে গেলে আমরাও কি এক হিসেবে ওই বিভীষিকার অংশ নই? আপনি বা আমি বা আমাদের মতো লোকেরা?"

নিজের ছোট ছোট কোকড়া চুলে আঙুল বোলাল পিয়া। "ঠিক বুঝলাম না।"

"ওই বাঘটা দু-দুটো মানুষ মেরেছে, পিয়া, কানাই বলল। "আর সেটা শুধু একটা মাত্র গ্রামে। এই সুন্দরবনে প্রতি সপ্তাহে লোক মারা পড়ে বাঘের হাতে। সেই বিভীষিকাটার কথা একবার ভেবে দেখেছেন কি? পৃথিবীর অন্য কোথাও যদি এই হারে মানুষ মরত তা হলে সেটাকে তো গণহত্যা বলা হত। কিন্তু এখানে এই নিয়ে সেরকম কোনও কথাই ওঠে না। এইসব মৃত্যুগুলোর কথা কোথাও লেখা হয় না, খবরের কাগজওয়ালারাও এই নিয়ে কখনও হইচই ফেলে না। কারণটা কী? না, এই মানুষগুলো এতটাই গরিব যে এরা মরল কি বাঁচল তাতে কারওর কিছু এসে যায় না। এই কথাগুলো আমরা সবাই জানি, কিন্তু জেনেশুনেও চোখ বন্ধ করে থাকি। একটা জানোয়ারের কষ্ট হলে আমাদের গায়ে লাগে, কিন্তু মানুষের কষ্টে কিছু এসে যায় না সেটা বিভীষিকা নয়?"

"কিন্তু একটা কথা আমাকে বলুন কানাই, সারা পৃথিবীতে প্রতিদিনই তো ডজন ডজন মানুষ মরছে রাস্তাঘাটে, গাড়িতে, অ্যাক্সিডেন্টে। এটা তার চেয়ে বেশি ভয়াবহ কেন বলছেন?" পালটা প্রশ্ন করল পিয়া।

"কারণ এর পেছনে আমাদেরও হাত রয়েছে পিয়া, সেইজন্যে।"

অস্বীকারের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল পিয়া। এখানে আমার হাত কীভাবে রয়েছে বুঝতে পারলাম না।"

"কারণ আপনার মতো লোকেরাই এখানে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বার বার চাপ দিয়েছেন," কানাই বলল। "আর তার জন্য মানুষকে কী দাম দিতে হবে তার তোয়াক্কাও করেননি। আর আমিও দায়ী তার কারণ আমার মতো মানুষেরা মানে আমার শ্রেণীর

ভারতীয়রা—সেই দামের হিসেবটাকে কখনও প্রকাশ হতে দেয়নি, যাতে পশ্চিমি দেশগুলোর সুনজরে থাকতে পারে সেইজন্য। যে মানুষগুলো মরছে তাদের পাত্তা না দেওয়াটা খুব একটা কঠিন না, কারণ তারা গরিবস্য গরিব। একবার নিজেকেই জিজ্ঞেস করি দেখুন, পৃথিবীর আর কোনও জায়গায় কেউ এটা চলতে দেবে? মার্কিন দেশের কথা যদি ভাবেন, সেখানে বন্দি বাঘের সংখ্যা ভারতবর্ষে মোট যত বাঘ আছে তার থেকে বেশি। তারা যদি একবার মানুষ মারতে শুরু করে তা হলে কী হবে একবার বলুন দেখি?"

"কিন্তু কানাই, বন্দি অবস্থায় কোনও প্রজাতির সংরক্ষণ আর তাকে তার নিজের জায়গায় রেখে সংরক্ষণের মধ্যে একটা বড় তফাত আছে," পিয়া বলল।

"তফাতটা ঠিক কী শুনি?"

"তফাতটা হল," ধীরে ধীরে প্রতিটা শব্দের ওপর জোর দিয়ে পিয়া বলল, "প্রাণীগুলো যে এইভাবে বাঁচবে শুরু থেকে এটাই নির্দিষ্ট ছিল। আর সেটা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল প্রকৃতি—আপনি বা আমি নই। একবার ভাবুন তো, আমরা ছাড়া আর কোনও প্রজাতি জগতে রইল কি মরল তাতে কিছু যায় আসে না—এরকম একটা ভাবনার থেকে যে কাল্পনিক রেখাটা আমাদের ঠেকিয়ে রেখেছে, সেটা যদি একবার পেরিয়ে যাই তা হলে কী হবে? কতটুকু অবশিষ্ট থাকবে তা হলে? এই ব্রহ্মাণ্ডে আমরা তো যথেষ্টই একা, কানাই। আর সেখানেই কি সবকিছু থেমে থাকবে মনে করেছেন? একবার যদি আমরা স্থির করি যে অন্য সব জীবজন্তুকে মেরে সাফ করে দেওয়ার অধিকার আমাদের আছে, তারপরে তো শেষে মানুষ মারা শুরু হবে। যে মানুষগুলোর কথা আপনি বলছেন—গরিব অবহেলিত তারাই শিকার হবে তখন।"

"কথাগুলো বলেছেন ভালই পিয়া, কিন্তু আপনাকে তো আর প্রাণ দিয়ে তার দাম দিতে হচ্ছে না।"

"যদি দরকার হয় সে দাম আমি দিতে পারব না মনে করছেন?" চ্যালেঞ্জ করল পিয়া।

"মানে আপনি বলছেন আপনি মরতেও রাজি আছেন?" কানাই টিটকিরির সুরে প্রশ্ন করল। "কী যে বলেন পিয়া।"

খুব শান্ত গলায় পিয়া বলল, "আমি একবর্ণও মিথ্যে দাবি করছি না কানাই। যদি জানতাম আমার প্রাণের মূল্যে এই নদীগুলো আবার ইরাবড়ি ডলফিনদের জন্যে নিরাপদ হয়ে উঠবে, তা হলে আমার জবাব হল, হ্যাঁ। সেরকম ক্ষেত্রে মরতেও রাজি আছি আমি। কিন্তু সমস্যাটা হল আমি বা আপনি বা এরকম হাজারটা লোক মরলেও কোনওই সমাধান হবে না এ সমস্যার।"

"এসব কথা বলা তো খুবই সোজা—"

"সোজা?" শুকনো বিরক্তির সুর পিয়ার গলায়। "একটা কথা বলুন তো কানাই, যে কাজগুলো আমি করি তার কোনওটাই কি আপনার খুব সোজা মনে হয়? আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন তো আমার ঘরবাড়ি নেই, টাকাপয়সা নেই, জীবনে উন্নতি করার কোনও আশা নেই। আমার বন্ধুবান্ধবরা আমার থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে, কপাল যদি ভাল থাকে খুব বেশি হলে বছরে একবার তাদের সঙ্গে দেখা হয় আমার। আর সেটাও তো কিছুই না। তার চেয়েও বড় কথা হল, আমি ভাল করেই জানি যে কাজটা আমি করছি শেষ পর্যন্ত তার সবটাই মোটামুটি ব্যর্থ হবে।"

মুখ তুলে তাকাল পিয়া। কানাই দেখল ওর চোখে টলটল করছে জল।

"সোজা কাজ এটা আদৌ নয় কানাই। কথাটা আপনাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।"

একটা কড়া জবাব ঠোঁটের ডগায় চলে এসেছিল, কোনওরকমে সেটা গিলে ফেলল কানাই। তার বদলে পিয়ার একটা হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে ধরে বলল, "সরি পিয়া। এভাবে বলা উচিত হয়নি আমার। কথাটা ফিরিয়ে নিলাম।"

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল পিয়া। বলল, "যাই, কাজ করি গিয়ে।"

নিজের জায়গার দিকে এগিয়ে গেল পিয়া। পেছন থেকে ডেকে কানাই বলল, "আপনি কিন্তু খুব সাহসী মেয়ে, সেটা জানেন কি?"

অস্বস্তিতে কাঁধ ঝাঁকাল পিয়া। “আমি আমার নিজের কাজটা করছি শুধু।”

মিস্টার স্লোয়েন

দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল, ভাটাও শেষ হতে চলেছে, এমন সময় দূরে দেখা গেল গর্জনতলা। আস্তে আস্তে মেঘা এগিয়ে চলল দহটার দিকে। দূরবিন হাতে ডেকের ওপর দাঁড়িয়েছিল পিয়া। ডলফিনের দঙ্গলটা চোখে পড়তেই খুশিতে ওর মনটা নেচে উঠল। জোয়ার-ভাটার সময় মেনে ঠিক এসে হাজির হয়েছে ওরা। দহ থেকে মেঘা তখনও কিলোমিটার খানেক দূরে। কিন্তু ডলফিনগুলোর নিরাপত্তার কথা ভেবে সেখানেই নোঙর ফেলতে ইশারা করল পিয়া।

এর মধ্যে কখন কানাই এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। পিয়া জিজ্ঞেস করল, "কাছ থেকে দেখতে চান নাকি ডলফিনগুলোকে?"

"নিশ্চয়ই," জবাব দিল কানাই। "যে জানোয়ারদের কাছে মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছেন আপনি তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে তো আমি উদগ্রীব হয়ে আছি।"

"চলে আসুন তা হলে। আমরা ফকিরের নৌকোয় করে যাব।"

বোটের পেছন দিকটায় গিয়ে ওরা দেখল দাঁড় হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছে ফকির। ডিঙিতে উঠে পিয়া গিয়ে গলুইয়ের ওপর নিজের জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে পড়ল, আর কানাই বসল নৌকোর মাঝামাঝি একটা জায়গায়।

খানিকক্ষণ দাঁড় টেনে সোজা দহটার মধ্যে পৌঁছে গেল ফকির। আর খানিক পরেই দুটো ডলফিন দল ছেড়ে এগিয়ে এল নৌকোর দিকে। তারপর পাক খেতে লাগল ডিঙিটাকে ঘিরে। ডলফিনদুটোকে চিনতে পেরে খুশি হয়ে উঠল পিয়া। সেই মা আর তার ছানাটা। পিয়ার মনে হল—আগেও ওর এরকম মনে হয়েছে ওর্কায়েলাদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ওকেও যেন চিনতে পেরেছে ডলফিনগুলো। কারণ নৌকোর পাশে পাশে বারবার ভেসে উঠছিল ওরা। বড়টা তো মনে হল সোজাসুজি তাকাল ওর চোখের দিকে।

কানাই এদিকে খানিকটা অবাক হয়ে ভুরু কুঁচকে লক্ষ করছিল প্রাণীগুলোকে। শেষে খানিকটা অবিশ্বাসের সুরে প্রশ্ন করল, "এগুলোই আপনার সেই ডলফিন তো? ঠিক জানেন আপনি?"

"অবশ্যই। এক্কেবারে ঠিক জানি।"

"কিন্তু একবার দেখুন ওদের দিকে," কানাইয়ের গলায় পরিষ্কার অভিযোগের সুর। "খালি তো ভাসছে আর ডুবছে, আর ঘোঁতঘোঁত করছে।"

"এ ছাড়াও আরও অনেক কিছু ওরা করে কানাই," বলল পিয়া। "কিন্তু সেসবের বেশিরভাগটাই করে জলের তলায়।"

"আমি তো ভেবেছিলাম আপনি আমাকে আমার মবি ডিক দেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন," কানাই বলল। "কিন্তু এ তো দেখছি জলের শুয়োর কতগুলো।"

হেসে ফেলল পিয়া। "আপনি কাদের কথা বলছেন জানেন কানাই? এরা কিন্তু খুনে তিমির খুড়তুতো ভাই।"

"শুয়োরদেরও অনেক সময় বড় বড় সব আত্মীয়স্বজন থাকে জানেন তো?" কানাই বলল।

"কানাই, ওর্কায়েলাদের সঙ্গে শুয়োরের চেহারার একেবারেই কোনও মিল নেই।"

"তা বটে, এগুলোর পিঠের ওপর কী একটা যেন আছে।"

"ওটাকে বলে ফিন—পাখনা।"

"আর এগুলো শুয়োরের মতো অতটা সুস্বাদুও হবে না বোধহয়।"

"কানাই, স্টপ ইট।"

কানাই হাসল। "আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না, এই হাস্যকর শুয়োর প্যাটার্নের কতগুলো জন্তু দেখার জন্য এতদূর থেকে এত কষ্ট করে এসেছি আমরা। একটা জন্তুর জন্য যখন আপনি জেলে যেতেও রাজি আছেন, তখন আরেকটু সেক্স অ্যাপিল-ওয়ালা আর কিছু

খুঁজে পেলেন না? এদের তো কোনও রকমেরই কোনও অ্যাপিলই নেই দেখছি।”

“ওর্কায়েলাদের অ্যাপিল কিছু কম নেই কানাই,” বলল পিয়া। “আপনাকে শুধু একটু ধৈর্য ধরতে হবে সেটা আবিষ্কার করার জন্য।”

রসিকতার সুরে কথা বললেও, কানাইয়ের বিস্ময়টা কিন্তু নির্ভেজাল। ওর মনে যে ডলফিনের ছবি ছিল সে হল সিনেমা কি অ্যাকুয়ারিয়ামে দেখা চকচকে ধূসর রঙের একটা জন্তু। হ্যাঁ, তার প্রতি একটা আকর্ষণ তৈরি হলেও হতে পারে। কিন্তু এই নৌকোর চারপাশে ভেসে বেড়ানো বোতামচোখো হাঁসফঁসে জানোয়ারগুলোর মধ্যে ইন্টারেস্টিং তো কিছুই নেই। ভুরু কোঁচকাল কানাই। “আপনি কি গোড়া থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন যে এই জন্তুগুলোর পেছন পেছন সারা পৃথিবী চষে বেড়াবেন?”

“না। সেটা বলতে পারেন একটা অ্যাক্সিডেন্ট,” পিয়া বলল। “প্রথম যখন আমি ওর্কায়েলা ডলফিন দেখি, এদের সম্পর্কে তখন কিছুই জানতাম না আমি। সে প্রায় বছর তিনেক আগের কথা।”

দক্ষিণ চিন সাগরে স্তন্যপায়ী জলজন্তুদের ওপর সার্ভের কাজ করছিল একটা দল, তাদের সঙ্গে ইন্টার্ন হিসেবে গিয়েছিল পিয়া। সার্ভের শেষে ওদের জাহাজ গিয়ে থামল কম্বোডিয়ার পোর্ট সিহানুকে। সেখান থেকে দলের কয়েকজন চলে গেল নম পেন, সেখানে এক আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংস্থায় তাদের কিছু বন্ধু কাজ করে সেই বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে। সেই তখনই মধ্য কম্বোডিয়ার এক ছোট্ট গ্রামে আটকে পড়া একটা নদীচর ডলফিনের কথা ওরা জানতে পারল।

“ভাবলাম যাই, একবার দেখে আসি গিয়ে।”

জায়গাটা দেখা গেল নম পেন থেকে ঘণ্টা খানেকের দূরত্বে, মেকং নদী থেকে অনেকটা ভেতরে। একটা ভাড়া করা মোটর সাইকেলের পেছনে চড়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছল পিয়া। গ্রামটা দেখতে খানিকটা তালি দেওয়া কাপড়ের মতো—এখানে ওখানে কিছু কুঁড়েঘর, ধানক্ষেত, জলসেচের নালা, আর কয়েকটা অগভীর জলা। এরকমই একটা জলার মধ্যে—মাপে সেটা খুব বেশি হলে একটা সুইমিং পুলের মতো হবে—আটকে পড়েছিল ডলফিনটা। বর্ষার সময় বানের জলে যখন থইথই করছিল চারদিক সেই সময়েই এসে ঢুকেছিল, কিন্তু কোনও কারণে দলের বাকিদের সঙ্গে ফিরে যেতে পারেনি আর। বর্ষা কেটে যেতে এদিকে চাষের নালা-টালাও সব গেছে শুকিয়ে, ফলে বেরোনোর সব পথও বন্ধ হয়ে গেছে।

সেই প্রথম একটা ওর্কায়েলা ব্রেভিরোস্ট্রিস চোখে দেখল পিয়া। লম্বায় প্রায় মিটার খানেক, চওড়ায় তার অর্ধেক, ছাই ছাই রঙের শরীর, আর পিঠের ওপর একটা পাখনা। সাধারণত ডলফিনদের মুখের সামনের দিকটা যেমন হাঁসের ঠোঁটের মতো দেখতে হয়, সেরকম কোনও কিছুর কোনও বালাই নেই। গোল মাথা আর বড় বড় চোখের প্রাণীটাকে দেখে অদ্ভুত লাগল পিয়ার, মনে হল খানিকটা গোরু জাতীয় জাবর কাটা কোনও জন্তুর মতো দেখতে। ডলফিনটার নাম দিয়েছিল ও মিস্টার স্লোয়েন, ওর স্কুলের এক টিচারের নাম। ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে হালকা একটা সাদৃশ্য ছিল জন্তুটার।

খুবই ফ্যাসাদে পড়েছিল এই মিস্টার স্লোয়েন। ডোবাটার জল দ্রুত শুকিয়ে আসছে, সব মাছও গেছে ফুরিয়ে। মোটর সাইকেল ড্রাইভারের সঙ্গে পাশের কামপংটায় গিয়ে কিছু মাছ কিনে নিয়ে এল পিয়া বাজার থেকে। বাকি সারাটা দিন ধরে ওই ডোবার পারে বসে নিজের হাতে সবগুলো মাছ খাওয়াল ডলফিনটাকে। পরের দিন আবার গেল সেখানে, একটা কুলার ভর্তি মাছ সঙ্গে নিয়ে। আশ্চর্য ব্যাপার, গ্রামের অনেক চাষিবাসি বাচ্চাকাচ্চা সব ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল জলাটার ধারে, কিন্তু পিয়া যেই গেল, তাদের কাউকে পাত্তা না দিয়ে সোজা ওর দিকে চলে এল প্রাণীটা।

“বাজি রেখে বলতে পারি আমাকে চিনতে পেরেছিল ও।”

এদিকে তো নম পেনে যে কয়জন পশুপ্রেমী ছিল তারা খুবই চিন্তায় পড়ে গেছে। মেকং-এর ওর্কায়েলাদের সংখ্যা খুবই দ্রুত কমে আসছে, আর কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো হাতের

বাইরে চলে যাবে পরিস্থিতি। কম্বোডিয়ার দুর্দিনে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে মেকং ওর্কায়েলাদেরও। ১৯৭০-এর দশকে মার্কিনি কার্পেট বম্বিং-এর শিকার হয়েছে ওরা। আর তারপর খুমের রুজদের সময়ে ওর্কায়েলারাও হাজারে হাজারে মরেছে ওদের হাতে। পেট্রোলিয়ামের জোগান ক্রমশ কমে আসায় বিকল্প জ্বালানি হিসেবে ডলফিনের তেল ব্যবহার করতে শুরু করেছিল খুমেররা। কম্বোডিয়ার সবচেয়ে বড় মিঠে জলের হ্রদ টোনলে স্যাপের অগুন্তি ডলফিন একটা সময় প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল এভাবে। রাইফেল আর বোমা ছুঁড়ে ডলফিন মারা হত তখন, তারপর তাদের ঝুলিয়ে রাখা হত রোদের মধ্যে। সূর্যের তাপে তাদের চর্বি গলে গলে পড়ত নীচে রাখা বালতিতে। তারপর মোটর সাইকেল আর নৌকো চালানোর কাজে লাগত সেই চর্বি। ২৮৬

"মানে, আপনি বলতে চাইছেন ডলফিনের চর্বি গলিয়ে তাই দিয়ে ডিজেলের কাজ চালানো হত?" কানাই জিজ্ঞেস করল।

"ঠিক তাই।" গত কয়েক বছর ধরে নানা কারণে আরও বেশি করে বিপন্ন হয়ে পড়েছে কম্বোডিয়ার এই ওর্কায়েলারা। মেকং নদীর উজানে পাথর ফাটিয়ে খাত চওড়া করার একটা পরিকল্পনা হচ্ছে, যাতে করে সোজা চিন দেশ পর্যন্ত নৌ চলাচল সহজ হয়ে যাবে। সেই মতো কাজ যদি এগোতে থাকে, তা হলে এই ডলফিনদের কিছু কিছু স্বাভাবিক বসতি নষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ মিস্টার স্লোয়েনের এই দুর্দশা কোনও একটি প্রাণীর সমস্যা নয়—এ হল গোটা একটা প্রজাতির বিপর্যয়ের সংকেত।

ডলফিনটাকে নদীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করার সময়ে পিয়াকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল প্রাণীটার দেখাশোনা করার। ছ'দিন ধরে প্রত্যেক সকালে কুলার ভর্তি মাছ নিয়ে ও চলে যেত জলাটার ধারে। সাত দিনের দিন গিয়ে দেখল মিস্টার স্লোয়েনের কোনও চিহ্ন নেই সেখানে। শুনল আগের দিন রাত্রে নাকি মারা গেছে ডলফিনটা। কিন্তু সেই খবরের সমর্থনে কোনও প্রমাণ ও খুঁজে পেল না। জলার মধ্যে থেকে প্রাণীটার শেষ চিহ্ন পর্যন্ত কীভাবে লোপাট হয়ে গেল তারও কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। যেটা চোখে পড়ল তা হল জলার ধারের কাদায় ভারী কোনও গাড়ির—খুব সম্ভবত একটা ট্রাকের—টায়ারের দাগ। জলের একেবারে কাছাকাছি গিয়ে শেষ হয়েছে দাগটা। কী ঘটেছে সেটা বুঝতে ওদের একটুও অসুবিধা হয়নি—বেআইনি কোনও বন্যপ্রাণী পাচার চক্রের শিকার হয়েছে মিস্টার স্লোয়েন। পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় নতুন নতুন অ্যাকুয়ারিয়াম ভোলা হচ্ছে, সে জন্য নদীর ডলফিনের চাহিদা দিনে দিনে বাড়ছে। সে বাজারে মিস্টার স্লোয়েনের দাম অনেক। এই একটা ইরাবড়ি ডলফিন এক লাখ মার্কিন ডলারে পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে এরকমও শোনা গেছে।

"এক লাখ ডলার?" কানাইয়ের গলায় অবিশ্বাস। এই জন্তুগুলোর জন্যে?"

"হ্যাঁ।"

জানোয়ার নিয়ে আদিখ্যেতার স্বভাব পিয়ার কোনওকালে ছিল না, কিন্তু মিস্টার স্লোয়েন একটা দর্শনীয় সামগ্রী হিসেবে কোনও অ্যাকুয়ারিয়ামে বিক্রি হয়ে যাবে—কথাটা ভাবতেই ওর মাথার ভেতরে কেমন করতে লাগল। তারপর বেশ কয়েকদিন ধরে ওর স্বপ্নে ঘুরে ঘুরে আসতে লাগল একটা ছবি—একদল শিকারি জলাটার এক ধারে কোণঠাসা করে ফেলছে মিস্টার স্লোয়েনকে, তাদের হাতে মাছ ধরার জাল।

ব্যাপারটা মন থেকে মুছে ফেলার জন্য পিয়া ঠিক করল আবার আমেরিকায় ফিরে যাবে। সেখানে লা জোলার স্ক্রিপ্স ইন্সটিটিউটে ভর্তি হবে পি এইচ ডি করার জন্য। কিন্তু তার মধ্যেই একটা অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা ঘটে গেল : নম পেনের এক বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংস্থা মেকং ওর্কায়েলাদের ওপর সার্ভে করার জন্য একটা কন্ট্রাক্ট দিতে চাইল ওকে। সব দিক থেকেই ভাল ছিল অফারটা। যে টাকা ওরা দিতে চাইছিল সেটা বছর দুয়েক চালিয়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট, তা ছাড়া ও ভেবে দেখল এই সার্ভেটা করলে ওর পি এইচ ডি-র কাজটাও খানিকটা এগিয়ে যাবে। কাজটা নিয়েই নিল পিয়া। মেকং-এর উজানে ক্রেতি নামের এক আধঘুমন্ত শহরে গিয়ে আস্তানা গাড়ল। তারপর তিন বছরের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন ওর্কায়েলা

বিশেষজ্ঞদের একজন হয়ে উঠল ও। সারা পৃথিবীর যেখানে যেখানে ওর্কায়েলা ডলফিনদের দেখা পাওয়া যায় সেইসব জায়গায় গিয়ে সার্ভের কাজ করল পিয়া–বার্মা, উত্তর অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন্স, থাইল্যান্ড–সব জায়গায়। কেবল একটা জায়গা ছাড়া। প্রথম যেখানে এই ডলফিনরা প্রাণিতত্ত্ববিদদের রেকর্ড বইয়ে জায়গা পেয়েছিল, সেই ইন্ডিয়াতে এসে কাজ করা ওর হয়ে ওঠেনি।

কাহিনির একেবারে শেষের দিকে এসে পিয়ার খেয়াল হল নৌকোয় উঠে অবধি ফকিরের সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। সেটা মনে পড়ে একটু খারাপ লাগল ওর।

কানাইকে ডেকে বলল, "আচ্ছা, একটা ব্যাপার আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। দেখুন, ফকির তো এই এলাকাটাকে, এই গর্জনতলা দ্বীপটাকে মনে হয় খুব ভালভাবে চেনে। ডলফিনদের সম্পর্কেও অনেক কিছু জানে–ওরা কোথা থেকে আসে, কোথায় যায়… আমার জানতে ইচ্ছে করে প্রথম কীভাবে ও এই জায়গাটায় এল, এইসব কথা ও কীভাবে জানল। আপনি একটু জিজ্ঞেস করবেন ওকে?"

"নিশ্চয়ই।" ফকিরের দিকে ফিরে পিয়ার প্রশ্নটা ব্যাখ্যা করল কানাই। তারপর ফকির তার জবাব শুরু করতেই পিয়ার দিকে ঘুরে বসল ও। "ও যা বলছে সেটা শোনাচ্ছি আপনাকে।"

"প্রথম কবে এই জায়গার কথা জানলাম সেটা মনেই পড়ে না আমার। যখন খুব ছোট্ট ছিলাম, এইসব দ্বীপ নদী কিছু চোখেই দেখিনি, তখন থেকেই মায়ের কাছে গর্জনতলার গল্প শুনেছি। মা আমাকে গান গেয়ে গেয়ে শোনাত, এই দ্বীপটার গল্প বলত। মা বলেছিল যার মনে কোনও পাপ নেই এই দ্বীপে তার কোনও ভয় নেই।

"আর এই বড় শুশদের কথা জিজ্ঞেস করছেন? ওদের কথাও আমি জানতাম, এখানে আসার অনেক আগেই। শুশদের সব গল্পও মা বলত আমাকে। বলত ওরা হল বনবিবির দূত, এখানকার নদীনালার সব খবর ওরাই পৌঁছে দেয় বনবিবিকে। মা বলেছিল ওরা ভাটার সময় এখানে আসে, যাতে ভাল করে সব দেখে-টেখে গিয়ে বনবিবিকে বলতে পারে। আর জোয়ার এলেই বনের ধারে ধারে ছড়িয়ে গিয়ে বনবিবির চোখ-কান হয়ে যায়। এই গোপন খবরটা দাদু বলেছিল মাকে। বলেছিল শুশুকদের পেছন পেছন চলতে যদি শিখতে পার তা হলে মাছ পেতে কখনও কোনও অসুবিধা হবে না।

"এই ভাটির দেশে আসার অনেক আগেই আমি এসব গল্প শুনেছি। ছোটবেলা থেকেই আমার মনে তাই এই জায়গাটা দেখার খুব ইচ্ছে ছিল। তারপর আমরা যখন মরিচঝাঁপিতে থাকতে এলাম, আমি প্রায়ই মাকে বলতাম, কবে যাব মা? কবে আমরা গর্জনতলা যাব? কিন্তু সময়ই হত না–এত কাজ ছিল মা-র তখন। মারা যাওয়ার সপ্তাহ কয়েক আগে মা প্রথম আমাকে নিয়ে এসেছিল এখানে। সেজন্যেই হয়তো তারপর থেকে মা-র কথা মনে পড়লেই অমনি গর্জনতলার কথাও মনে পড়ে যেত আমার। পরে কতবার আমি এসেছি এখানে। আস্তে আস্তে এই শুশরাও আমার বন্ধুর মতো হয়ে গেল। ওরা যেখানে যেত আমিও ওদের পেছন পেছন গেছি কতবার।

"'সেদিন আপনি যখন ওই ফরেস্টের লোকেদের সঙ্গে লঞ্চে করে এসে আমার নৌকো থামালেন, তখনও আমি আমার ছেলেকে নিয়ে এখানেই আসছিলাম। তার আগের দিন রাত্রে আমার মা স্বপ্নে এসেছিল। বলল, আমি তোর ছেলেকে দেখতে চাই। ওকে কখনও গর্জনতলায় নিয়ে আসিস না কেন? তোর তো আর কিছুদিনের মধ্যেই আমার কাছে চলে আসার সময় হয়ে যাবে, তারপর ওকে আমি আবার কবে দেখতে পাব কে জানে? যত তাড়াতাড়ি পারিস ওকে নিয়ে আয়।'

"আমি আমার বউকে এসব কথা বলতে পারিনি। বিশ্বাসই করবে না আমাকে। মাঝখান থেকে খেপে যাবে। তাই পরের দিন টুটুলকে স্কুলে না নিয়ে গিয়ে নৌকোয় তুলে সোজা এখানে আসার জন্য বেরিয়ে পড়েছিলাম। পথে এক জায়গায় থেমেছিলাম কিছু মাছ ধরার জন্যে, সেই সময়েই আপনি এলেন লঞ্চে করে।"

"তারপর কী হল? তোমার মা কি ওকে দেখতে পেয়েছিলেন মনে হয়?" জিজ্ঞেস করল

পিয়া।

"হ্যাঁ। আগের দিন যখন এখানে রাতের বেলায় নৌকোয় ঘুমোচ্ছিলাম, আবার স্বপ্নে মাকে দেখতে পেলাম আমি। খুব খুশি হয়েছে। বলল, খুব ভাল লাগল তোর ছেলেকে দেখে। যা, এবার ওকে গিয়ে বাড়িতে রেখে আয়। তারপর আমরা আবার একসাথে হব।"

এতক্ষণ পর্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে যাচ্ছিল পিয়া। কানাইয়ের অস্তিত্বের কথা যেন ভুলেই গিয়েছিল প্রায়, কেমন একটা ঘোরের মধ্যে মনে হচ্ছিল যেন সরাসরি ফকিরের সঙ্গেই কথা বলছিল ও। কিন্তু হঠাৎ ঘোরটা ভেঙে গেল এবার, পিয়া যেন চমকে জেগে উঠল ঘুমের থেকে।

"এটা ও কী বলছে কানাই?" ও প্রশ্ন করল। "জিজ্ঞেস করুন না, এটা কী বলতে চাইছে ও?"

"ও বলছে এটা একটা স্বপ্ন দেখেছিল শুধু।"

পিয়ার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ফকিরকে কী যেন একটা বলল কানাই। আর তারপরেই হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে পিয়া শুনল ফকির একটা গান গাইতে শুরু করেছে, অথবা গানও ঠিক বলা যায় না সেটাকে, মনে হল যেন খুব দ্রুত লয়ে একটা কিছু মন্ত্র বলছে।

"ও কী বলছে ওটা?" কানাইকে জিজ্ঞেস করল পিয়া। "ইংরেজি করে বলে দিতে পারবেন আপনি?"

"সরি পিয়া," জবাব দিল কানাই। "এ আমার ক্ষমতার বাইরে। ফকির বনবিবির উপাখ্যান থেকে গাইছে–খুব জটিল ছন্দটা। এটা আমার দ্বারা হবে না।"

বেলা বাড়ার সাথে সাথে দিক বদলাল নদীর স্রোত। জল যেই বাড়তে আরম্ভ করল, শুশুকগুলোও সরে যেতে লাগল দহটা থেকে। আস্তে আস্তে শেষ ডলফিনটাও যখন চলে গেল, মেঘার দিকে ডিঙির মুখ ফিরিয়ে দাঁড় টানতে শুরু করল ফকির।

ইতিমধ্যে হরেন আর তার নাতি মিলে লঞ্চের পেছন দিকটায় কয়েকটা তেরপল খাঁটিয়ে স্নানের জন্য একটা ঘেরা জায়গা তৈরি করে ফেলেছে। সারাটা দিন রোদের মধ্যে কাটানোর পর ভাল করে স্নান করার এরকম সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইল না পিয়া। তোয়ালে সাবান নিয়ে চটপট ঢুকে পড়ল ঘেরাটোপের ভেতর। দুটো বালতি রাখা রয়েছে সেখানে, তার মধ্যে একটা ভর্তি, আর অন্যটার হাতলের সঙ্গে একটা লম্বা দড়ি বাঁধা রয়েছে জল তোলার জন্য। নদীতে ছুঁড়ে দিল সেটাকে পিয়া। জলটা তুলে পুরো বালতি উপুড় করে ঢালল মাথায়। শিরশিরে ঠান্ডায় গা-টা যেন জুড়িয়ে গেল একেবারে। অন্য বালতিটায় ভর্তি করে পরিষ্কার জল রাখা ছিল। একটা এনামেলের মগে করে তার থেকে একটু একটু করে নিয়ে গায়ের সাবানটা ধুয়ে নিল। স্নান হয়ে যাওয়ার পরেও অর্ধেকটা মতো জল রয়ে গেল বালতিতে।

কেবিনে ফেরার পথে কানাইয়ের সঙ্গে দেখা হল। কাঁধে একটা তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ডেকের একধারে।

"অনেকটা পরিষ্কার জল রেখে এসেছি আপনার জন্যে।"

"যাই, সেটার সদ্ব্যবহার করে আসি তা হলে।"

খানিক দূর থেকে ঝপাৎ ঝপাৎ করে আরেকটা কারও গায়ে জল ঢালার আওয়াজ কানে এল। নিশ্চয়ই ফকির, স্নান করছে নিজের ডিঙিতে।

একটু বাদে ধোয়া জামাকাপড় পরে ডেকের ওপর এসে দাঁড়াল পিয়া। ভরা জোয়ারে থই থই করছে নদী, নোঙর করা বোটের গায়ে ধাক্কা খেয়ে স্রোতের ঘূর্ণি নানা রকম নকশা তৈরি করছে। দূরে কয়েকটা দ্বীপ ছোট হয়ে সরু চড়ার মতো দেখা যাচ্ছে। খানিক আগে যে জায়গাটা ছিল জঙ্গল, সেখানে এখন গাছের কয়েকটা ডাল শুধু চোখে পড়ছে, নলখাগড়ার মতো দুলছে স্রোতের টানে।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে রেলিং-এর ধারে বসতে যাচ্ছে পিয়া, এমন সময় কানাই এসে পাশে দাঁড়াল। দু'হাতে ধোঁয়া ওঠা দুটো চায়ের কাপ। পিয়াকে একটা দিয়ে বলল, "হরেন পাঠাল নীচে থেকে।"

কানাইও একটা চেয়ার নিয়ে বসল পিয়ার পাশে। চারপাশের দ্বীপ-জঙ্গল আস্তে আস্তে কেমন তলিয়ে যাচ্ছে, দেখতে লাগল মগ্ন হয়ে। পিয়ার মনে হল এই বোধহয় কানাই কোনও ঠাট্টার কথা বলে উঠবে, কিংবা ট্যারাবাঁকা মন্তব্য করবে কিছু একটা; কিন্তু সেসব কিছুই করল না কানাই, চুপচাপ বসে রইল শান্ত হয়ে। তবে তার মধ্যেও একটা উষ্ণ আন্তরিকতা বেশ অনুভব করা যাচ্ছিল। নীরবতা ভেঙে শেষে পিয়াই শুরু করল কথা বলতে।

"মনে হয় আমি যেন সারা জীবন ধরে বসে বসে এই জোয়ার ভাটার খেলা দেখে যেতে পারি।"

"দ্যাটস ইন্টারেস্টিং," বলল কানাই। "আমি এক সময় একটি মেয়েকে জানতাম যে প্রায় এই একই রকমের একটা কথা বলত—সমুদ্র সম্পর্কে।"

"কোনও গার্লফ্রেন্ড?"

"হ্যাঁ।"

"অনেক গার্লফ্রেন্ড আছে বুঝি আপনার?"

মাথা ঝাঁকাল কানাই। তারপর হঠাৎ যেন আলোচনাটা ঘোরানোর জন্যই জিজ্ঞেস করল, "আর আপনার? সিটোলজিস্টদেরও কি ব্যক্তিগত জীবন-টিবন বলে কিছু থাকে?"

"জিজ্ঞেস করলেন যখন বলি," পিয়া বলল, "খুব কম সিটোলজিস্টেরই সেটা থাকে। বিশেষ করে মহিলাদের তো থাকেই না প্রায়। যে ধরনের রুটিনের মধ্যে দিয়ে আমাদের

চলতে হয় তাতে ব্যক্তিগত সম্পর্ক-টম্পর্ক গড়ে ওঠা খুবই কঠিন।"

"কেন?"

"এত ঘোরাঘুরি করতে হয় আমাদের"...বলল পিয়া। "কোনও একটা জায়গায় এক টানা বেশি দিন থাকাই হয়ে ওঠে না। ফলে, ব্যাপারটা খুব একটা সহজ নয়।"

ভুরুদুটো একটু তুলে কানাই জিজ্ঞেস করল, "এটা নিশ্চয়ই আপনি দাবি করবেন না যে আপনার কখনও কারও সঙ্গে কোনও সম্পর্ক তৈরি হয়নি—এমনকী কলেজে-টলেজেও নয়?"

"হ্যাঁ, সে কখনও কিছু হয়নি তা নয়," পিয়া স্বীকার করল, "কিন্তু সে সম্পর্কগুলি শেষ পর্যন্ত কোথাও গিয়ে পৌঁছয়নি।"

"কখনও না?"

"শুধু একবার," পিয়া বলল। "এই একবারই মাত্র আমার মনে হয়েছিল সম্পর্কটা সত্যি সত্যি কোথাও একটা যাচ্ছে।"

"তারপর?"

হেসে ফেলল পিয়া। তারপর আর কী? একদিন যাচ্ছেতাই ভাবে শেষ হয়ে গেল ব্যাপারটা। সেটা ঘটেছিল ক্রেতিতে।"

"ক্রেতি? সেটা আবার কোথায়?"

"পূর্ব কম্বোডিয়া," বলল পিয়া। "নম পেন থেকে কয়েকশো কিলোমিটার দূরে। সেখানে এক সময় থাকতাম আমি।"

মেকং নদীর ভেতর ঢুকে আসা খাড়াই একটা অন্তরীপ মতো জায়গার ওপর ক্রেতি শহরটা তৈরি হয়েছে। শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার উত্তরে নদীর মধ্যে একটা দহ আছে, গরমকালে জল কমে এলে গোটা ছয়েক ওর্কায়েলার একটা দল সেই দহটার মধ্যে থাকে। এখান থেকেই ওর রিসার্চের কাজ শুরু করেছিল পিয়া। শহরটা সুবিধাজনক জায়গাতেও বটে আর এমনিতে ছিমছাম সুন্দর, পিয়া তাই ঠিক করেছিল পরবর্তী দু-তিন বছর এখানে থেকেই রিসার্চের কাজ করবে। একটা কাঠের বাড়ির ওপরের তলাটা ভাড়া নিল ও। আরও একটা সুবিধা ছিল ক্রেতি শহরে। সরকারি মৎস্য বিভাগের একটা দফতর ছিল ওখানে। গবেষণার কাজে মাঝেমধ্যেই ওদের সাহায্য নিতে হত পিয়াকে।

সেখানে এক অল্প বয়স্ক সরকারি অফিসার ছিল সেই মৎস্যবিভাগের স্থানীয় প্রতিনিধি। দিব্যি ইংরেজি-টিংরেজি বলতে পারত। ছেলেটির নাম ছিল রথ, বাড়ি নম পেনে। ক্রেতিতে ওরও কোনও বন্ধুবান্ধব ছিল না, ফলে একা একা একটু মনমরা হয়ে থাকত। বিশেষ করে সন্ধেবেলাগুলো কাটানোই ওর কাছে ছিল এক সমস্যা। ক্রেতি ছোট্ট জায়গা, কয়েকটা পাড়া নিয়ে একটা গোটা শহর, ফলে মাঝে মধ্যেই পিয়ার দেখা হয়ে যেত রথের সঙ্গে। দেখা গেল নদীর পাড়ে যে কাফেটাতে সন্ধেবেলা পিয়া নুডল আর ওভালটিন খেতে যায়, প্রায়দিনই রথও যায় সেখানে ডিনার করতে। রোজ একই টেবিলে গিয়ে বসতে শুরু করল ওরা দু'জন, রোজকার টুকিটাকি খোশগল্প আস্তে আস্তে এক সময় সত্যিকারের কথোপকথনে মোড় নিল।

একদিন কথায় কথায় জানা গেল ছেলেবেলায় বেশ কিছুদিন রথকে পল পট জমানার এক ডেথ ক্যাম্পে কাটাতে হয়েছিল। খমের রুজ নম পেনের দখল নেওয়ার পর ওর মা-বাবাকে পাঠানো হয়েছিল সেখানে। যদিও এটা সেটা কথার মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে বিষয়টা একবার মাত্র উল্লেখ করেছিল রথ, কিন্তু পিয়া তাতে এমন নাড়া খেয়ে গেল যে হুড়মুড় করে নিজের ছেলেবেলার অনেক কথা ওকে বলে ফেলল। তার পরের কয়েকটা সপ্তাহে পিয়া দেখল এমনভাবে ও রথের সঙ্গে গল্প করছে যে ভাবে আগে আর কোনও পুরুষের সঙ্গে কখনও কথা বলেনি। রথকে ও নিজের মা-বাবার কথা বলল, তাদের বিয়ের কথা বলল, মায়ের ডিপ্রেশনের কথা, হাসপাতালে তার শেষ দিনগুলোর কথা—সব বলল।

ও যা যা বলেছিল তার কতটা বুঝতে পেরেছিল রথ? সত্যি বলতে কী, সেটা জানে না

পিয়া। রথ তার নিজের জীবনের একটা বড় তথ্য পিয়াকে বলে দিয়েছে, সেটা কি একটা ভ্রান্ত ধারণা মাত্র ছিল? হয়তো নিজের সেই অভিজ্ঞতার কথা খুব সাধারণভাবেই, উল্লেখ করেছিল ও। যে সময়টাতে রথ বড় হয়েছে এই রকম ঘটনা তো তখন বিরল কিছু ব্যাপার নয় কম্বোডিয়ায়। কে জানে? সত্যিটা কোনও দিনও আর জানতে পারবে না পিয়া।

একদিন পিয়া লক্ষ করল সমস্ত সময়ই ও কেবল রথের কথাই ভাবছে, এমনকী যখন ডলফিনগুলো তাদের ওই দহটার মধ্যে কী করছে তাতে ওর মন দেওয়া উচিত, তখনও। পিয়া বুঝতে পারছিল যে ও প্রেমে পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাতে চিন্তিত হয়নি একটুও। তার অন্যতম প্রধান কারণ রথের স্বভাব–পিয়ার মতো ও-ও একটু চাপা ধরনের, একটু অমিশুক প্রকৃতির। ওর দ্বিধাগ্রস্ত হাবভাবে স্বস্তি পেত পিয়া, মনে হত ও নিজে যেমন পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশার বিষয়ে অনভিজ্ঞ, রথেরও হয়তো সেরকম নারীসঙ্গ বিষয়ে কোনও অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও যথেষ্ট সতর্ক ছিল পিয়া। ঘনিষ্ঠতা খাবার-দাবার আর স্মৃতির আদানপ্রদানের পরের স্তরে গড়াতে প্রায় মাস চারেক লেগে গিয়েছিল। আর তার পরে মনের যে একটা হালকা ভাব আসে সে কারণেই হয়তো নিজের স্বাভাবিক সব সতর্কতা সহজে দূরে সরিয়ে দিতে পেরেছিল ও। মনে হয়েছিল এই তো, পাওয়া গেছে এবার। মহিলা ফিল্ড বায়োলজিস্টদের মধ্যে যে সৌভাগ্য বিরল, সেই সৌভাগ্যের অধিকারিণী হতে চলেছে ও; ঠিক জায়গাতে এসে খুঁজে পেয়েছে নিজের মনের মানুষকে।

সেবার গ্রীষ্মের শেষে ছয় সপ্তাহের জন্যে হংকং যেতে হয়েছিল পিয়াকে একটা কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে, আর তা ছাড়া একটা সার্ভে টিমের সঙ্গে কাজ করে কিছু পয়সা রোজগারের জন্যে। রওনা যখন হল, মনে হয়েছিল ঠিকঠাকই চলছে সব কিছু। পোচেনতং এয়ারপোর্টে ওকে প্লেনে তুলে দিয়ে গিয়েছিল রথ, তারপর প্রথম কয়েক সপ্তাহ ই-মেলের আদানপ্রদানও হত প্রতিদিন। তারপরেই আস্তে আস্তে কমতে থাকল মেলের জবাব আসা। শেষে একটা সময় কোনও জবাবই আর আসত না রথের কাছ থেকে। রথের অফিসে ফোন করেনি পিয়া, কারণ যতটা সম্ভব খরচ বাঁচানোর চেষ্টা করছিল ও। আর তা ছাড়া, ওর মনে হয়েছিল এই কয়েকটা মাত্র সপ্তাহে আর কীই বা হতে পারে?

ফেরার সময় বোট থেকে ক্রেতিতে নামার সঙ্গে সঙ্গেই পিয়া বুঝতে পেরেছিল একটা গোলমাল কিছু হয়েছে। হেঁটে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরতে ফিরতে সারাটা পথ যেন লোকজনের চাপা গলার কথা শুনতে পাচ্ছিল ও। ওর বাড়িওয়ালিই প্রথম দিল খবরটা, কুৎসিত একটা আনন্দের আভাস ফুটে উঠেছিল মহিলার গলায় রথ বিয়ে করেছে, ট্রান্সফার নিয়ে চলে গেছে নম পেনে।

পুরো বিষয়টা গোড়া থেকে ভাবতে গিয়ে প্রথমে পিয়ার মনে হল হয়তো বাড়ির চাপে বিয়েটা করে ফেলতে বাধ্য হয়েছে রথ—সেরকম কিছু একটা ঘটে থাকতেই পারে, সেটা বোঝাটা কঠিন নয় পিয়ার পক্ষে। আর ব্যাপারটার তিক্ততাও একটু হ্রাস পায় তাতে। প্রত্যাখ্যানটা অতটা সরাসরি এসে মনে ঘা দেয় না, একটু কম নিষ্ঠুর লাগে। কিন্তু সে সান্ত্বনাটাও রইল না যখন ও জানতে পারল নিজের অফিসেরই একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে রথ–একজন অ্যাকাউন্টান্টকে। পিয়া হংকং রওনা হওয়ার পরপরই মনে হল মেয়েটির কাছে যাতায়াত শুরু করেছিল রথ, আর মাত্র ছয় সপ্তাহ সময় লেগেছিল ওর মন স্থির করতে।

এইসব কিছু সত্ত্বেও মনে মনে রথকে ক্ষমা করতে পারত পিয়া। হয়তো ওর অনুপস্থিতিতে রথের মনে হয়ে থাকতে পারে এরকম একজন বিদেশি মেয়েকে বিয়ে করলে ভবিষ্যতে নানা রকম সমস্যা হতে পারে, তার ওপর যে বিদেশি একটানা বেশিদিন এক জায়গায় থাকেই না। সেই রকম কিছু ভেবে যদি রথ এই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তা হলে কি ওকে দোষ দেওয়া যায়?

এই সব ভেবে মনে মনে কিছু দিন একটু শান্তি পাওয়ার চেষ্টা করেছিল পিয়া। কিন্তু সে ভুল ভেঙে গেল যেদিন রথের জায়গায় নতুন যে লোকটি এসেছে তার সঙ্গে আলাপ হল ওর। লোকটি বিবাহিত, বছর তিরিশেক বয়স, মোটামুটি ইংরেজি বলে। আলাপ হওয়ার

খানিকক্ষণের মধ্যেই সে পিয়াকে নিয়ে গেল নদীপাড়ের সেই কাফেতে, যেখানে এক সময় নিয়মিত যেত রথ আর পিয়া। দূরে মেকঙের অন্য পাড়ে তখন সূর্য ডুবছে। লোকটি পিয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে ওর মা-র সম্পর্কে নানা সহানুভূতিসূচক প্রশ্ন করতে শুরু করল। পিয়া বুঝতে পারল রথ সবকিছু বলে দিয়েছে এই লোকটিকে, বুঝতে পারল এই শহরের প্রতিটি পুরুষ এখন জানে ওর জীবনের একান্ত সব কথা; আর ওর সামনে বসা জঘন্য ঘিনঘিনে চরিত্রের এই লোকটি সেই তথ্য ব্যবহার করে আনাড়ির মতো ওকে ভুলিয়ে দে ফেলার চেষ্টা করছে।

সেখানেই ইতি। পরের সপ্তাহেই জিনিসপত্র প্যাক করে নিয়ে পিয়া চলে গেল মেকং নদীর উজানের দিকে আরও একশো কিলোমিটার দূরে, স্টাং ত্রেং শহরে। রথের ব্যবহার থেকে যে কষ্ট ও পেয়েছিল সে কষ্টের যন্ত্রণা নয়, সারা শহরের কাছে নিজের জীবনটা উদোম হয়ে যাওয়ার গ্লানিই ওকে শেষে তাড়িয়ে ছাড়ল ক্রেতি থেকে।

"কিন্তু ধাক্কা খাওয়ার আরও বাকি ছিল আমার," পিয়া বলল।

"কী সে ধাক্কাটা?"

"সেটাও ঘটল আমি আমেরিকায় ফিরে যাওয়ার পর। কয়েকজন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল আমার। এরা সকলেই মহিলা, সকলেই ফিল্ড বায়োলজিস্ট। ওরা সবাই খুব হাসল আমার গল্পটা শুনে। ওদের প্রত্যেকের জীবনে কোথাও না কোথাও হুবহু এই একই রকম ঘটনা ঘটেছে। যে যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছে সে যেন আমার নিজের জীবনের ঘটনা নয়, যেন আগে থেকে লিখে রাখা কোনও কাহিনি, যে কাহিনির চরিত্রযাপন আমাদের সকলের নিয়তি। এটাই বাস্তব, ওরা বলল আমাকে। বলল : এই রকমই হবে তোমার জীবন, জেনে রেখো। সব সময়ই দেখবে কোনও না কোনও একটা ছোট শহরে গিয়ে তোমাকে থাকতে হচ্ছে, সেখানে কথা বলার কেউ নেই, শুধু এই একটা মাত্র লোক যে কিছুটা ইংরেজি জানে। তাকে তুমি কিছু বলা মাত্রই সারা শহরে চাউর হয়ে যাবে তা। কাজেই এখন থেকে আর মুখটি কোথাও খুলো না, আর একা একা থাকতে অভ্যেস করো।"

কাঁধ ঝাঁকাল পিয়া। "তো সেটাই আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি তার পর থেকে।"

"কী?"

"একা নিজের মনে থাকার অভ্যাস করা।" চুপ করে গেল কানাই। পিয়ার গল্পটার কথা ভাবতে লাগল মনে মনে। মনে হল এ পর্যন্ত পিয়ার মধ্যেকার মানুষটাকে দেখতেই পায়নি ও। পিয়ার সংযত আত্মস্থ ভাব আর কম কথা বলার অভ্যাস কানাইকে—এমনকী নিজের কাছেও— স্বীকার করতে দেয়নি পিয়ার সত্যিকারের অসাধারণত্ব; মনে আর কল্পনায় ও যে শুধু কানাইয়ের সমকক্ষ তাই নয়, ভেতরের শক্তিতে আর হৃদয়ে ও অনেক অনেক বড় কানাইয়ের চেয়ে। ২৯৪

বোটের রেলিঙের ওপর পা তুলে পেছনের দিকে একটু হেলে বসেছিল কানাই এতক্ষণ। চেয়ারটাকে সোজা করে নিয়ে একটু এগিয়ে বসল এবার। পিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "এভাবে আর আপনাকে থাকতে হবে না পিয়া। নিজের মনে একা একা কাটাতে হবে না আর।"

"কোনও সমাধান পেলেন নাকি?"

"পেয়েছি।" কিন্তু আর কিছু বলার আগেই নীচের ডেক থেকে হরেনের গলার আওয়াজ ভেসে এল। খেতে ডাকছে।

চিহ্ন

আজকেও তাড়াতাড়ি শুতে চলে গেল পিয়া। আগের রাতে ঘুম ভাল হয়নি, তাই কানাইও একটু আগেভাগেই শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম বিশেষ হল না। বেশ জোরে হাওয়া বইছিল বাইরে, আর ভটভটির দুলুনির সাথে সাথে যেন ছেলেবেলার একটা দুঃস্বপ্ন বার বার ফিরে আসছিল কানাইয়ের তন্দ্রায় একটানা একই পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে বার বার, সেই স্বপ্ন। তফাতটা শুধু পরীক্ষকদের চেহারায়। ইস্কুলের মাস্টারমশাইদের মুখগুলোর বদলে সেখানে ভেসে আসছিল কুসুম আর পিয়া, নীলিমা আর ময়না, হরেন আর নির্মলের ছবি। শেষ রাতের দিকে হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসল কানাই, ঘামে ভিজে গেছে সারা গা : ঠিক কোন ভাষায় স্বপ্ন দেখছিল মনে পড়ল না, কিন্তু একটা শব্দই খালি ঘুরছিল ওর মাথার মধ্যে—'পরীক্ষা'।

আধো ঘুমে কানাই বোঝার চেষ্টা করছিল কেন অপ্রচলিত পুরনো ইংরেজিতে ও অনুবাদ করতে চাইছিল শব্দটাকে : 'ট্রায়াল বাই অর্ডিয়াল'—যন্ত্রণাদায়ক কঠোর বিচার। একেবারে ভোর পর্যন্ত ফিরে ফিরে আসতে থাকল স্বপ্নটা। তারপর অবশেষে ঘুম হল খানিকটা—গাঢ় গভীর ঘুম। বাঙ্ক থেকে যখন নামল কানাই, সকালের কুয়াশা ততক্ষণে কেটে গেছে। আর খানিকক্ষণ পরেই অন্য দিকে ঘুরে যাবে নদীর স্রোত।

কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে কানাই দেখল একটুও হাওয়া বইছে না কোনওদিকে, নদীর জল একেবারে স্থির, পালিশ করা ধাতুর পাতের মতো বিছিয়ে রয়েছে। ভরা জোয়ারে থইথই করছে নদী, জলের স্রোত পূর্ণ ভারসাম্যের বিন্দুতে এসে পৌঁছেছে, মনে হচ্ছে নদীটা যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক জায়গায়। ডেক থেকে গর্জনতলা দ্বীপটাকে মনে হচ্ছিল বিশাল একটা রুপোর ঢালের ধার বরাবর খোদাই করে বসানো দামি পাথরের সাজের মতো। দৃশ্যটা একই সঙ্গে যার পর নাই পার্থিব এবং অত্যন্ত রকম একান্ত; বিস্তারে বিশাল, আবার এই নিস্তরঙ্গ শান্তির মুহূর্তে কেমন বেমানান কোমলতাময়।

কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল ডেকের ওপর। ফিরে তাকিয়ে কানাই দেখল পিয়া আসছে। হাতে ক্লিপবোর্ড আর ডেটাশিট। কেজো গলায় কানাইকে জিজ্ঞেস করল, "একটা কাজ করে দেবেন আমাকে? শুধু আজকে সকালটার জন্যে?"

"নিশ্চয়ই করে দেব। বলুন কী করতে হবে।"

"ডলফিনদের ওপর নজরদারির কাজ একটু করে দিতে হবে আমাকে," পিয়া বলল। আসলে জোয়ার-ভাটার সময়টা পালটে যাওয়ায় একটু সমস্যায় পড়েছে পিয়া। শুরুতে ওর প্ল্যান ছিল জোয়ার এলে ডলফিনগুলো যখন দহটা ছেড়ে চলে যায়, তখন ওদের পেছন পেছন যাবে। কিন্তু এখন জোয়ারের সময়টা পালটে গেছে। জল বাড়তে শুরু করছে খুব ভোরের দিকে আর একেবারে সন্ধেবেলায়। তার মানে কোনওবারই শুশুকগুলোর দহ ছেড়ে যাওয়ার সময়টায় দিনের আলো পাওয়া যাবে না। এমনিতেই ওদের আসা-যাওয়া বোঝা যথেষ্ট কঠিন, আলো কম থাকলে তো সেটা একেবারেই অসম্ভব। পিয়া তাই ঠিক করেছে আপাতত ডলফিনগুলোর ফিরে আসার পথের একটা হিসেব রাখবে ও। ওর প্ল্যান হল দহটায় ঢোকার দুটো মুখে নজরদারির ব্যবস্থা করবে—একটা উজানের দিকে, আরেকটা ভাটির দিকে। উজানের দিকে নজর রাখবে ও নিজে, মেঘার ডেক থেকে। নদী সেখানে অনেকটা চওড়া, দূরবিন ছাড়া ওদিকটায় লক্ষ রাখা কঠিন। আর অন্যদিকটায় ফকির নজর রাখতে পারে তার ডিঙি থেকে। কানাইও যদি তার সঙ্গে থাকতে পারে তা হলে খুবই ভাল হয়—দূরবিনের অভাব দু'জোড়া চোখ খানিকটা পূরণ করতে পারবে।

"তার মানে আপনাকে কয়েকটা ঘণ্টা ফকিরের সঙ্গে ওর নৌকোয় কাটাতে হবে," পিয়া বলল। "কিন্তু তাতে নিশ্চয়ই আপনার কোনও সমস্যা নেই?"

ফকিরের সঙ্গে ওর কোনও রকমের প্রতিযোগিতা আছে—এরকম একটা চিন্তা পিয়ার মনে এসেছে বলে আঁতে একটু ঘা লাগল কানাইয়ের। তাড়াতাড়ি বলল, "না না। ওর সঙ্গে কথা বলার একটা সুযোগ পাওয়া গেলে আমি তো খুশিই হব।"

“গুড। তাই ঠিক রইল তা হলে। আপনি কিছু খেয়ে-টেয়ে নিন, তারপরেই বেরিয়ে পড়া যাবে। ঘণ্টাখানেক পরে আমি ডেকে নেব আপনাকে।”

পিয়া যতক্ষণে ডাকতে এল তার মধ্যে ব্রেকফাস্ট সেরে বেরোনোর জন্যে একেবারে তৈরি হয়ে গেছে কানাই। সারাটা দিন রোদে রোদে কাটাতে হবে বলে হালকা রঙের ট্রাউজার্স পরেছে একটা, গায়ে সাদা জামা, আর পায়ে চপ্পল। একটা টুপি আর সানগ্লাসও সঙ্গে নিয়ে নেবে ঠিক করেছে। প্রস্তুতি দেখে সন্তুষ্ট হল পিয়া। দু'বোতল জল হাতে দিয়ে বলল, “এগুলোও রেখে দিন সঙ্গে। প্রচণ্ড গরম হবে কিন্তু ওখানে।”

একসঙ্গে বোটের পেছন দিকটায় গিয়ে ওরা দেখল ফকিরও বেরোনোর জন্যে তৈরি হয়ে বসে আছে, দাঁড়দুটো রাখা আছে নৌকোর ওপর, আড়াআড়ি ভাবে। কানাই ডিঙিতে গিয়ে ওঠার পরে পিয়া ফকিরকে দেখিয়ে দিল ঠিক কোন জায়গাটায় নৌকোটা নিয়ে গিয়ে রাখতে হবে। মেঘা এখন যেখানে আছে সেখান থেকে জায়গাটা দু' কিলোমিটার মতো দূরে, ভাটির দিকে। গর্জনতলা দ্বীপটা ওইখানটাতে বাইরের দিকে একটু বেঁকে গেছে, খানিকটা ঢুকে এসেছে নদীর ভেতর; ফলে খাতটা সরু হয়ে গেছে একটু। “মাত্র এক কিলোমিটারের মতো চওড়া হবে নদীটা ওই জায়গায়,”পিয়া বলল। “আমার মনে হয় ফকির যদি ঠিক মাঝনদীতে নোঙর করে, তা হলে ওদিক দিয়ে যে ডলফিনগুলো আসবে, আপনারা দুজনে মিলে সেগুলোর সবকটার ওপরেই নজর রাখতে পারবেন।

তারপর উজানের দিকে একটা জায়গা দেখিয়ে বলল, “আর আমি থাকব ওইখানটায়।” সেখানে বিশাল একটা মোহনায় গিয়ে মিশেছে নদীটা। “দেখতেই পাচ্ছেন ওখানে নদী অনেকটা চওড়া, কিন্তু লঞ্চে থাকব বলে খানিকটা উঁচু থেকে দেখতে পাব আমি। আর দূরবিনও থাকবে সঙ্গে, ফলে ওইদিকটা আমার পক্ষে সামলে নেওয়া কঠিন হবে না। আমরা মোটামুটি কিলোমিটার চারেক দূরে দূরে থাকব। আমি আপনাদের দেখতে পাব, কিন্তু আপনারা আমাকে দেখতে পাবেন বলে মনে হয় না।”

বোট থেকে কাছি খুলে নিল ফকির। পিয়া হাত নাড়ল ওদের দিকে। মুখের সামনে দুটো হাত জড়ো করে চেঁচিয়ে বলল, “যদি মনে হয় আর পারছেন না কানাই, ফকিরকে বলবেন, ও এসে বোটে দিয়ে যাবে আপনাকে।”

কানাইও হাত নাড়ল, “কিছু অসুবিধা হবে না। আমাকে নিয়ে কিছু ভাবতে হবে না আপনাকে।”

ডিঙি খানিক দূর এগোতে এগোতেই লঞ্চের চিমনি থেকে দমকে দমকে কালো ধোঁয়া বেরোতে শুরু করল। আস্তে আস্তে সরতে শুরু করল মেঘা, ইঞ্জিনের ধাক্কায় ঢেউ উঠল জলে। পরের কয়েক মিনিট ধরে সেই ঢেউয়ে ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগোতে লাগল ফকির আর কানাই। জল আবার শান্ত হল লঞ্চটা একেবারে চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার পর।

গোটা জায়গাটা জনমানবশূন্য হয়ে যাওয়ার পর এবার কানাইয়ের আর ফকিরের মধ্যে দূরত্ব যেন শতগুণে কমে গেল। তবুও, নৌকোটা যদি দু'কিলোমিটার লম্বা হত, ততটাই দূরে থাকত ওরা একে অপরের থেকে। ডিঙির একেবারে সামনের দিকে বসেছিল কানাই, আর ফকির ছিল পেছনে, ছইয়ের আড়ালে। মাঝখানে ছইয়ের বেড়াটা থাকার জন্য কেউ কাউকে দেখতেও পাচ্ছিল না। জলের ওপরে প্রথম ঘণ্টা কয়েক কোনও কথাও বিশেষ হয়নি দু'জনের মধ্যে। বার দুয়েক কানাই কথা বলার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু প্রতিবারই দায়সারা একটা দুটো হু হা ছাড়া বিশেষ কোনও জবাব পায়নি।

দুপুর নাগাদ, জল যখন নামতে শুরু করেছে, হঠাৎ খুব উত্তেজিত হয়ে লাফিয়ে উঠল ফকির। ভাটির দিকে ইশারা করে বলল, “ওই যে—ওইখানে।”

চোখের ওপর হাত আড়াল করে কানাই দেখল সরু খাঁজকাটা তেকোনা একটা পাখনা বাঁক খেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে জল কেটে।

“ছইটা ধরে উঠে দাঁড়ালে আরও ভাল করে দেখতে পাবেন।”

“ঠিক আছে।” প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে নৌকোর মাঝামাঝি জায়গাটায় গিয়ে পৌঁছল কানাই,

উঠে দাঁড়াল কোনওরকমে, ছইয়ের বাতায় হেলান দিয়ে টাল সামলে নিল।

"আরেকটা। ওই যে, ওইখানটায়।"

ফকিরের আঙুল বরাবর তাকিয়ে জল কেটে এগোনো আরও একটা পাখনা দেখতে পেল কানাই। সামান্য পরেই আরও দুটো ডলফিন দেখা গেল—ফকিরই দেখতে পেয়েছে সবগুলো।

হঠাৎ এই হুড়োহুড়িতে ফকিরের নীরবতার বেড়ায় ছোট্ট একটু ফাঁক তৈরি হয়েছে মনে হল, কানাই তাই আরেকবার চেষ্টা করল ওকে কথাবার্তায় টেনে আনতে। "আচ্ছা ফকির, একটা কথা বলো তো আমাকে," ছইয়ের ওপর দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল কানাই, "সারের কথা তোমার একটুও মনে আছে?"

চট করে কানাইয়ের দিকে একবার তাকিয়ে ফের অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিল ফকির। বলল, "না একটা সময় উনি খুব আসতেন আমাদের এখানে, কিন্তু তখন তো আমি খুব ছোট। মা মারা যাওয়ার পরে ওনাকে আর বিশেষ দেখিনি আমি। ওনার কথা কিছুই প্রায় মনে নেই আমার।"

"আর তোমার মা? তার কথা মনে আছে তোমার?"

"মা-কে কী করে ভুলব বলুন? মা-র মুখ তো সব জায়গায়।"

এমন সহজ সাধারণ ভাবে কথাটা ও বলল যে একটু হকচকিয়ে গেল কানাই।."কী বলছ ফকির? কোথায় মা-র মুখ দেখো তুমি?"

একটু হেসে ফকির সব দিকে ইশারা করে দেখাতে লাগল। কম্পাসের সবগুলো দিক ছাড়াও নিজের মাথার দিকে আর পায়ের দিকেও দেখাল : "এদিকে দেখি, এদিকে দেখি, এদিকে দেখি, এদিকে দেখি। সব জায়গায় দেখি।"

এত সরল বাক্যগঠন যে প্রায় শিশুর কথা বলার মতো শুনতে লাগল সেটা। কানাইয়ের মনে হল অবশেষে ও বুঝতে পেরেছে সব কিছু সত্ত্বেও ময়নার কেন এমন গভীর টান তার স্বামীর প্রতি। ফকিরের স্বভাবের মধ্যে কিছু একটা এখনও খুব কঁচা অবস্থায় রয়ে গেছে, আর সেটাই ময়নাকে টানে; নরম মাটির দলা সামনে পেলে কুমোরের হাত যেমন নিশপিশ করে, ফকিরের জন্য সেভাবেই নিশপিশ করে ময়নার মন।

"আচ্ছা ফকির, তোর শহরে যেতে ইচ্ছে করে না কখনও?"

কথাটা বলেই কানাইয়ের খেয়াল হল, নিজের অজান্তেই তুমি থেকে তুই-এ নেমে এসেছে ও, যেন সত্যি সত্যিই ফকির আসলে বাচ্চা একটা ছেলে। ফকির কিন্তু সেসব লক্ষ করেছে বলে মনে হল না। "এখানেই আমার ভাল," জবাব দিল ও। "শহরে গিয়ে আমি কী করব?" তারপরে, কথাবার্তা শেষ করার জন্যেই যেন দাঁড় তুলে নিল হাতে। "এবার লঞ্চে ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে।"

জলে দাঁড় ডোবাতেই দুলে উঠল নৌকো। তাড়াতাড়ি গলুইয়ের ওপর নিজের জায়গাটায় গিয়ে বসল কানাই। বসার পর তাকিয়ে দেখল ফকির জায়গা পালটেছে। এখন ও ডিঙির ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়; এমনভাবে বসেছে যাতে দাঁড় টানার সময় মুখটা কানাইয়ের দিকে ফেরানো থাকে। ঝলসানো গরমের ভাপ উঠছে নদী থেকে, মনে হচ্ছে যেন মরীচিকা নাচছে জলের ওপর। গরমে আর জল থেকে ওঠা ভাপে আস্তে আস্তে কেমন ঘোর লেগে গেল কানাইয়ের, যেন স্বপ্নের মধ্যে ফকিরের একটা ছবি ভেসে এল ওর চোখের সামনে ফকির যেন সিয়াটেল যাচ্ছে পিয়ার সঙ্গে। দেখতে পেল ওরা দু'জনে প্লেনে গিয়ে উঠছে, পিয়ার পরনে জিনস আর ফকির পরে আছে লুঙ্গি আর একটা ধুন্ধুড়ে টি-শার্ট দেখতে পেল একটা সিটের ওপর কুঁকড়ে বসে আছে ফকির জীবনে সেরকম সিট ও চোখে দেখেনি; হাঁ করে আইলের এপাশ থেকে ওপাশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। তারপর পশ্চিমের হিমঠান্ডা কোনও শহরে ফকিরকে কল্পনা করল কানাই, কাজের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায় রাস্তায়, ঘুরতে ঘুরতে পথ হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারছে না।

অপ্রীতিকর ছবিটা চোখের সামনে থেকে তাড়ানোর জন্যে মাথা ঝাঁকাল কানাই।

ওর মনে হল যে পথে ওরা এসেছিল তার তুলনায় গর্জনতলা দ্বীপের অনেক কাছ দিয়ে যাচ্ছে এখন। কিন্তু জল একেবারে নীচে নেমে গেছে বলে বোঝা মুশকিল যে ইচ্ছে করেই পথ পালটেছে ফকির, না ভাটার সময় নদী সরু হয়ে গেছে বলে চোখের ভুলে এরকম মনে হচ্ছে। দ্বীপের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হাতের তালুতে রোদ আড়াল করে বাঁদিকে তাকাল ফকির। পাড়টা ঢালু হয়ে সেখানে নেমে এসেছে জলে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ টানটান হয়ে গেল ওর পেশিগুলো, সোজা হয়ে একটু উঠে বসল। ডান হাতে যন্ত্রের মতো লুঙ্গির আলগা দিকটা তুলে কেঁচা মেরে নিল, ল্যাঙোটের মতো হয়ে গেল অত বড় কাপড়টা। আধা-হামাগুড়ি অবস্থায় নৌকোর ধারে হাতের ভর দিয়ে শরীরটা সামনে ঝুঁকিয়ে দিল— খেলার মাঠে দৌড় শুরু করার সময় লোকে যে ভাবে দাঁড়ায়, অনেকটা সেই ভঙ্গিতে। অল্প টলমল করে উঠল ডিঙি। হাত তুলে পাড়ের দিকে ইশারা করল ফকির : "দেখুন, ওই জায়গাটায় দেখুন।"

"কী ব্যাপার?" জিজ্ঞেস করল কানাই। "কী দেখছিস তুই ওখানে?"

হাত তুলে দেখাল ফকির : "দেখুন না।"

চোখ কুঁচকে ওর আঙুল বরাবর তাকাল কানাই, কিন্তু দেখার মতো কিছু চোখে পড়ল না। জিজ্ঞেস করল, "কী দেখব?"

"দাগ, চিহ্ন—কালকে যেমন দেখেছিলাম সেইরকম। সোজা চলে গেছে খোঁচগুলো, দেখতে পাচ্ছেন না? ওই ঝোঁপটার কাছ থেকে জল পর্যন্ত এসে আবার ফিরে গেছে।"

ভাল করে ফের একবার দেখল কানাই। মনে হল কয়েকটা জায়গায় মাটি যেন বসে বসে গেছে একটু। কিন্তু কাদা থেকে উঠে থাকা গর্জনগাছের ছুঁচোলো শ্বাসমূলে একেবারে ভর্তি জায়গাটা। মাটির তলার শেকড় থেকে বের হয়ে আসা এই মূলগুলো দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চালায় এ গাছ। খাড়া হয়ে থাকা বর্শার মতো সেই শুলোর ভিড়ে একটা দাগ থেকে আরেকটা দাগের তফাত করা একেবারে অসম্ভব।

মাটি দেবে যাওয়া যে দাগ এখানে ফকিরের চোখে পড়েছে, গতকালের দেখা স্পষ্ট ছোপগুলোর সঙ্গে তার কোনও মিলই নেই। কানাইয়ের মনে হল নির্দিষ্ট কোনও আকৃতিহীন এই দাগগুলো থেকে পরিষ্কার ভাবে কিছুই বলা যায় না; এগুলো এমনকী কঁকড়ার গর্ত বা জল নামার সময় স্রোতের টানে তৈরি খাতও হতে পারে।

"দেখছেন কেমন একটা লাইন ধরে গেছে খোঁচগুলো?" ফকির বলল। "একেবারে জলের ধার পর্যন্ত চলে গেছে। তার মানে জল নেমে যাওয়ার পরে হয়েছে—এগুলো হয়তো যখন আমরা এদিকে আসছিলাম, সেই সময়। জানোয়ারটা নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছে আমাদের। আরও ভাল করে দেখার জন্যে তাই নেমে এসেছিল।"

ওরা মোহনা পেরিয়ে এগোচ্ছে, সেটা ভাল করে দেখার জন্যে একটা বাঘ জলের ধার পর্যন্ত নেমে আসছে—এই পুরো ভাবনাটাই এত কষ্টকল্পিত, যে হাসি পেয়ে গেল কানাইয়ের।

"আমাদের কেন দেখতে চাইবে?" ফকিরকে জিজ্ঞেস করল ও।

"আপনার গন্ধ পেয়েছে হয়তো। নতুন লোকেদের চোখে চোখে রাখতে ভালবাসে এ জানোয়ার।"

ফকিরের হাবভাবের মধ্যে এমন কিছু একটা ছিল যাতে কানাইয়ের দৃঢ় ধারণা হল ও একটা খেলা খেলছে কানাইয়ের সঙ্গে, হয়তো নিজের অজান্তেই। কথাটা ভেবে বেশ মজা লাগল ওর। পরিস্থিতির পরিবর্তনই হয়তো ফকিরকে প্রলুব্ধ করেছে চারপাশের এই ভয়াল রূপকে আরও বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতে। ব্যাপারটা বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হল না কানাইয়ের। ওকেও অনেকবার ফকিরের মতো এভাবে নিরুপায় কোনও বিদেশির সামনে অচেনা জগতের জানালা খুলে দেওয়ার কাজ করতে হয়েছে। মনে পড়ল, সেসব সময়ে ওরও অনেকবার কেমন লোভ হয়েছে সূক্ষ্মভাবে চারপাশের জগৎকে একটু তির্যক করে দেখানোর, অচেনা জায়গাকে আরও রহস্যময় করে তোলার। মনের কোনায় কোনও বিদ্বেষই যে সব সময় মানুষকে দিয়ে এরকম করায় তা নয়, এটা আসলে বাইরের লোকের

সামনে ভেতরের লোকের অপরিহার্যতাকে চোখে আঙুল দিয়ে বোঝানোর একটা উপায়—প্রতিটি নতুন বিপদের সম্ভাবনায় প্রমাণ হয়ে যায় কতটা গুরুত্বপূর্ণ তার উপস্থিতি, প্রতিটি নতুন সমস্যা তার দাম বাড়িয়ে দেয় বিদেশির কাছে। গাইড আর অনুবাদকদের সামনে এ প্রলোভনের হাতছানি সব সময়ই থাকে—সে হাতছানি উপেক্ষা করলে নিজের অপরিহার্যতা বজায় রাখা কঠিন, আবার তার কাছে আত্মসমর্পণ করলে কথার দাম বলেও আর কিছু থাকে না, পুরো কাজটাই হয়ে যায় মূল্যহীন। আর এই দ্বিধার ব্যাপারটা কানাইয়ের কাছে অপরিচিত নয় বলেই এটাও ও জানে যে অনুবাদককে কখনও কখনও যাচাই করে নিতে হয়।

পাড়ের কাদার দিকে দেখিয়ে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কানাই। একটু হেসে বলল, “ধুর, এ তো এমনি গর্ত। দেখা যাচ্ছে কাঁকড়ারা মাটি খুঁড়ছে ওগুলোর মধ্যে। এ দাগগুলো বড় শেয়ালের তুই কী করে বুঝলি?”

ওর দিকে ফিরে হাসল ফকির। ঝকঝক করে উঠল সাদা দাঁতগুলো। “কী করে বুঝলাম দেখবেন?”

একটু ঝুঁকে কানাইয়ের একটা হাত টেনে নিয়ে নিজের ঘাড়ের ওপর রাখল ও। আচমকা এই স্পর্শের ঘনিষ্ঠতায় একটা যেন ঝটকা লাগল কানাইয়ের হাতে। একটানে হাতটা সরিয়ে নিতে নিতে কানাই টের পেল ফকিরের ভেজা চামড়ায় কাটা কাটা হয়ে ফুটে উঠেছে। রোমকূপগুলো।

আবার ওর দিকে তাকিয়ে হাসল ফকির। বলল, “দেখলেন তো কী করে বুঝলাম? ভয় দিয়েই বুঝতে পারি আমি।” তারপর উবু হয়ে একটু উঠে বসে সপ্রশ্ন চোখে তাকাল কানাইয়ের দিকে। জিজ্ঞেস করল, “আর আপনি? আপনি ভয় টের পাচ্ছেন না?”

কথাগুলো কানাইয়ের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া তৈরি করল স্বতস্ফূর্ততায় তার সঙ্গে ফকিরের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠার খুব একটা তফাত নেই। চেতনা থেকে হঠাৎ মুছে গেল এই বাদাবন, জল আর নৌকোর পারিপার্শ্বিক; এ মুহূর্তে ও কোথায় বসে আছে সে কথা ভুলে গেল কানাই। ওর মন যেন ফিরে যেতে চাইল নিজের চেনা কাজের বৃত্তে যে কাজের অভ্যাসে জড়িয়ে আছে দীর্ঘ দিনের অনুশীলন আর তিল তিল করে গড়ে ওঠা দক্ষতা। এই মুহূর্তে ওর ভাবনায় ভাষা ছাড়া আর কিছুরই কোনও অস্তিত্ব নেই, ফকিরের প্রশ্নের শুদ্ধ ধ্বনি-কাঠামোটুকুই এখন ওর চেতনার সবটা জুড়ে রয়েছে। মনকে যতটা সম্ভব একাগ্র করে প্রশ্নটা বিচার করল কানাই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরটা মনে এসে গেল : নেতিবাচক উত্তর। ফকিরের গায়ে যেরকম ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে, কানাইয়ের আদৌ সেরকম ভয় লাগছে না। এমনিতে যে ও অসাধারণ সাহসী সেরকম বলা যায় না—তা ও একেবারেই নয়। কিন্তু এটাও কানাই জানে যে সাধারণত যেরকম বলা হয়ে থাকে ভয় জিনিসটা আদৌ সেরকম জন্মগত কোনও প্রবৃত্তি নয়। মানুষ ভয় পেতে শেখে; পূর্বজ্ঞান, অভিজ্ঞতা আর আজন্ম শিক্ষার থেকেই আস্তে আস্তে ভয় জমে ওঠে মনের মধ্যে। ভয়ের অনুভূতি কারও সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার থেকে কঠিন কাজ আর কিছু হতে পারে না। আর এই মুহূর্তে যে ভীতির সঞ্চার ফকিরের মনের মধ্যে হয়েছে, সে ভীতি এতটুকুও অনুভব করতে পারছে না কানাই।

“জিজ্ঞেস করলি তাই বলছি,” কানাই জবাব দিল, “সত্যি কথাটা হল, না। আমার ভয় লাগছে না। তুই যেরকম ভয় পাচ্ছিস সেরকম তো পাচ্ছিই না।”

পুকুরের জলের ওপর যেমন বৃত্তাকার ঢেউ ছড়িয়ে যায়, সেরকম একটা হঠাৎ জেগে-ওঠা আগ্রহের ভাব ফকিরের সারা মুখে ছড়িয়ে গেল। সামনে একটু ঝুঁকে এসে জিজ্ঞেস করল, “ভয় যদি না পান, তা হলে আরও একটু কাছ থেকে গিয়ে দেখতেও আপনার নিশ্চয়ই কোনও অসুবিধা নেই? কী বলেন?”

একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ফকির, চোখের পলক পড়ছে না। কানাইও নিজেকে চোখ নামিয়ে নিতে দেবে না কিছুতেই। বাজি দ্বিগুণ করে দিয়েছে ফকির, ওকে এখন ঠিক করতে হবে কী করবে পিছিয়ে যাবে, না যাচাই করে নেবে ফকিরের কথাটা।

মনের মধ্যে একটু অনিচ্ছার ভাব যদিও ছিল, তা সত্ত্বেও কানাই বলল, “ঠিক আছে।

যাওয়া যাক তা হলে।”
মাথা নাড়ল ফকির। একটা দড়ে জল টেনে ঘুরিয়ে নিল ডিঙি। নৌকোর মুখ পাড়ের দিকে ফিরতে বাইতে শুরু করল তারপর। জলের দিকে একবার তাকাল কানাই : পালিশ করা পাথরের মেঝের মতো শান্ত নদী, তার ওপরে খোদাই করা স্রোতের নকশাগুলো মনে হচ্ছে যেন স্থির হয়ে আছে একেবারে, মার্বেলের ফলকের ওপর শির-টানা দাগের মতো।
“আচ্ছা ফকির, একটা কথা বল তো আমাকে, কানাই বলল।
“কী?”
“তুই তো বলছিস ভয় পেয়েছিস। তা হলে ওখানে কেন যেতে চাইছিস?”
“মা আমাকে বলেছিল এ জায়গাটায় এসে ভয় না পেতে শিখতে হবে। এখানে যদি কেউ একবার ভয় পায় তা হলে তার দফা রফা,” বলল ফকির।
“সেইজন্যে এসেছিস তুই এখানে?”
“কে জানে,” ঠোঁট ওলটাল ফকির। তারপর একটু হেসে বলল, “এবার আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব কানাইবাবু?”
বলতে বলতে মুখের হাসি চওড়া হল ফকিরের। দেখে কানাইয়ের মনে হল নিশ্চয়ই কিছু একটা রসিকতার কথা বলবে। “কী?”
“আপনার মনটা কি পরিষ্কার, কানাইবাবু?”
চমকে উঠে বসল কানাই। “মানে? কী বলতে চাস?”
ফকির কাঁধ ঝাঁকাল : “মানে, বলতে চাইছিলাম, আপনি মানুষটা কি ভাল?”
“আমার তো তাই মনে হয়,” কানাই বলল। “অন্তত আমি যা করি তা ভাল ভেবেই করি। বাকিটা—কে জানে।”
“কিন্তু আপনার কখনও সেটা জানতে ইচ্ছে করে না?”
“সে কি কখনও কেউ জানতে পারে?” ..
“আমার মা কী বলত জানেন? বলত, এই গর্জনতলায় এসে মানুষ যা জানতে চায়, বনবিবি তা-ই তাকে জানিয়ে দেন।”
“কী করে?”
আবার ঠোঁট ওলটাল ফকির। “মা এরকম বলত।”
নৌকোটা দ্বীপের কাছাকাছি পৌঁছতেই বনের চাঁদোয়া ছিঁড়ে এক ঝাঁক পাখি ডানা মেলল। বাতাসে ভাসা মেঘের মতো খানিক চক্কর কেটে আবার গিয়ে বসল গাছে। বাদাবনের গাছের পাতার মতো পান্না-সবুজ একটা টিয়ার ঝক। এক সঙ্গে দলটা যখন উড়ল, মুহূর্তের জন্যে মনে হয়েছিল হঠাৎ যেন গাছের মাথার সবুজ কেশর ফুলে উঠেছে, দমকা হাওয়ায় আলগা হয়ে গেছে জঙ্গলের পরচুলা।
পাড়ের কাছাকাছি এসে গতি বেড়ে গেল নৌকোর। দাঁড়ের শেষ টানের সাথে সাথে ডিঙির মাথাটা গিয়ে কাদার গভীরে গেঁথে গেল। মালকোঁচা মেরে পাশ দিয়ে নেমে পড়ল ফকির। তারপর পাড়ের দিকে দৌড় দিল, ছাপগুলোকে কাছ থেকে ভাল করে দেখার জন্যে।
“আমি ঠিকই বলেছিলাম,” কাদার ওপর হাঁটু গেড়ে বসতে বসতে বলল ও। গলার স্বরে জয়ের আনন্দ। “একেবারে টাটকা দাগ। এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হয়েছে।”
কানাইয়ের কিন্তু এখনও একই রকম আকৃতিহীন মনে হল গর্তের মতো ছাপগুলোকে। বলল, “আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।”
“দেখবেন কী করে?” নৌকোর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে হাসল ফকির। “অনেক দূরে আছেন তো আপনি। ডিঙি থেকে নেমে আসতে হবে। এখানে এসে একবার ভাল করে নজর করুন, দেখতে পাবেন কেমন সোজা জঙ্গলের দিকে উঠে গেছে খোঁচগুলো,” পাড়ের ঢাল বরাবর ইশারা করল ফকির। ঢালটার ওপরে খাড়া হয়ে আছে বাদাবনের পাঁচিল।
“ঠিক আছে, আমি আসছি।” লাফ দেওয়ার জন্য কানাইকে তৈরি হতে দেখে বারণ করল

ফকির : "দাঁড়ান দাঁড়ান। আগে প্যান্টটা গুটিয়ে ফেলুন, তারপর চটিটা খুলে রেখে নামুন। নইলে কাদায় চটি হারিয়ে যাবে। খালি পায়ে নামাই ভাল।"

চটিগুলো পা থেকে ছুঁড়ে ফেলে কানাই হাঁটু অবধি গুটিয়ে নিল প্যান্টটাকে। তারপর নৌকোর পাশ দিয়ে পা ঝুলিয়ে নেমে পড়েই ডুবে গেল কাদায়। শরীরের ওপরের অংশটা হুমড়ি খেয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে, ডিঙিটাকে ধরে কোনওরকমে টাল সামলাল কানাই : এই কাদার মধ্যে এখন পড়ে গেলে আর মুখ দেখানোর জায়গা থাকবে না। খুব সাবধানে ডান পা-টাকে কাদা থেকে বের করে এনে একটু সামনের দিকে ফেলল। এরকম করে বাচ্চাদের মতো পা ফেলতে ফেলতে কোনওরকম দুর্ঘটনা ছাড়াই শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল ফকিরের কাছে।

"দেখুন," মাটির দিকে ইশারা করল ফকির। "এই যে, এইগুলো নখের দাগ, আর এইখানটা থাবা।" তারপর মুখ ঘুরিয়ে ঢালটার দিকে দেখাল : "আর ওই দেখুন, এই দিকটা দিয়ে গেছে জানোয়ারটা, ওই গাছগুলোর পাশ দিয়ে। হয়তো এখনও দেখছে আপনাকে।"

ফকিরের গলার ঠাট্টার সুরটা গায়ে লাগল কানাইয়ের। ও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "তুই কী করতে চাইছিস ফকির? ভয় দেখাতে চাইছিস আমাকে?"

"আপনাকে ভয় দেখাব?" ফকির হাসল। "কিন্তু ভয় পাবেন কেন আপনি? বলেছি না আমার মা কী বলেছিল? মন যার পরিষ্কার তার এখানে কোনও ভয় নেই।"

তারপর হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কাদার ওপর দিয়ে নৌকোর দিকে চলল ফকির। ডিঙির কাছে গিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিল ছইয়ের মধ্যে। তারপর আবার যখন সোজা হয়ে দাঁড়াল, কানাই দেখল ফকির ওর দা-টা বের করে নিয়ে এসেছে ছইয়ের ভেতর থেকে।

দায়ের ধারালো দিকটা হাতে ধরে ফকির ওর দিকে এগোতে শুরু করতেই, নিজের অজান্তেই কেমন কুঁকড়ে গেল কানাই। চকচকে অস্ত্রটার দিক থেকে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল, "ওটা আবার কীসের জন্যে লাগবে?"

"ভয় পাস না," বলল ফকির। "জঙ্গলে ঢুকতে গেলে এটা লাগবে। এই পায়ের ছাপগুলো যার, তাকে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা সেটা একবার দেখবি না?"

পেশার অভ্যেস হল গিয়ে কঁঠালের আঠা। এই অস্বস্তিকর পরিবেশেও তাই লক্ষ না করে পারল না কানাই–ওকে আপনি ছেড়ে তুই বলতে শুরু করেছে ফকির। এতক্ষণ ও-ই ফকিরকে তুই বলে সম্বোধন করছিল, কিন্তু দ্বীপে পা দেওয়ার পর হঠাৎই যেন উলটে গেছে কর্তৃত্বের সব হিসাব কেতাব।

সামনে বাদাবনের জটপাকানো দুর্ভেদ্য দেওয়াল। সেদিকে তাকিয়ে কানাইয়ের মনে হল এর ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করাটা নিছক পাগলামি হবে। ফকিরের হাত থেকে দা-টা ফসকে যেতে পারে, যে-কোনও সময়ে যা খুশি হয়ে যেতে পারে। অকারণে এতটা ঝুঁকি নেওয়া আদৌ বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

"না ফকির, আর এই খেলা আমি খেলতে চাই না তোর সঙ্গে। এবার আমাকে ভটভটিতে নিয়ে চল," কানাই বলল।

"কেন রে?" ফকির হেসে উঠল। "ভয় কেন পাচ্ছিস? বলেছি না, এখানে তোর মতো লোকের ভয় পাওয়ার কিছু নেই?"

কাদার মধ্যে এগিয়ে গেল কানাই। মুখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে বলল, "বন্ধ কর তোর উলটোপালটা বুকনি। তুই কচি খোকা হতে পারিস, কিন্তু আমি–"

হঠাৎ কানাইয়ের মনে হল পায়ের নীচে যেন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে মাটি, টেনে ধরতে চাইছে ওর গোড়ালি। নীচে তাকিয়ে দেখল দড়ির মতো কী যেন জড়িয়ে ধরেছে দু'পায়ের গোড়ালিতে। বুঝতে পারল শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। টাল সামলানোর জন্যে মাটির ওপর পা ঘষড়ে একটু এগোতে গেল, কিন্তু মনে হল পা দুটো যেন বশে নেই। পড়ে যাওয়াটা আটকানোর জন্যে আর কোনও চেষ্টা করার আগেই থকথকে ভিজে কাদা সপাটে আছড়ে পড়ল মুখের ওপর।

পড়ে যাওয়ার পর প্রথমটায় নড়াচড়ার ক্ষমতা একেবারে লোপ পেয়ে গেল কানাইয়ের। মনে হল কেউ যেন ওর শরীরটাকে একটা ছাঁচ তৈরি করার প্লাস্টারের গামলার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। মুখ তুলে তাকানোর চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, সানগ্লাসের ওপর কাদা লেপ্টে গিয়ে কানামাছি খেলার পট্টির মতো হয়ে গেছে সেটা। হাতের পেছন দিক দিয়ে মুখ থেকে খানিক কাদা চেঁছে ফেলে মাথার ঝাঁকুনিতে খুলে ফেলে দিল সানগ্লাসটা। চোখের সামনে সেটা আস্তে আস্তে ডুবে গেল কাদার মধ্যে। কাঁধের ওপর ফকিরের হাতের ছোঁয়া লাগতে এক ঝটকায় সরিয়ে দিল হাতটাকে। তারপর পায়ে চাপ দিয়ে নিজে নিজে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। কিন্তু তলতলে মসৃণ কাদা শরীরটাকে চোষকের মতো টেনে ধরল, তার টান ছাড়িয়ে কিছুতেই উঠতে পারল না কানাই।

মুখ তুলে দেখল ফকির হাসছে ওর দিকে তাকিয়ে। "আগেই বলেছিলাম, সাবধান হতে।"

হঠাৎ যেন রক্ত চড়ে গেল কানাইয়ের মাথায়। স্রোতের মতো মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল অশ্রাব্য গালাগাল : "শালা বাঞ্চোৎ, শুয়োরের বাচ্চা।"

লুকিয়ে থাকা আদিম কোনও প্রবৃত্তির আগ্নেয়গিরি থেকে লাভাস্রোতের মতো বের হয়ে এল শব্দগুলো; যে উৎস থেকে সে স্রোতের উৎসারণ, কানাই নিজে কখনওই তার অস্তিত্ব স্বীকার করবে না : দাসের প্রতি প্রভুর সন্দেহ, জাত্যভিমান, গ্রামের মানুষের প্রতি শহুরে মানুষের অবিশ্বাস আর গ্রামের প্রতি শহরের বিদ্বেষ। কান্নাইয়ের ধারণা ছিল অতীতের এই সব তলানি থেকে নিজেকে মুক্ত করে ফেলেছে ও, কিন্তু যে উগ্রতায় এখন তার উৎক্ষেপণ ঘটল তাতে স্পষ্ট বোঝা গেল মুক্তি তো ঘটেইনি, তার বদলে আসলে আরও গাঢ় হয়ে জমে উঠেছে সে বিষ, জমাট বেঁধে পরিণত হয়েছে মারাত্মক বিস্ফোরকে।

কানাই নিজেও বহু বার দেখেছে এরকম, যখন ওর মক্কেলরা মেজাজ হারিয়ে ফেলেছে, প্রচণ্ড রাগের বশে লঙ্ঘন করে গেছে ব্যক্তিসত্তার সীমা, ক্রোধে আত্মহারা হয়ে ইংরেজিতে যাকে বলে 'বিসাইড দেমসেলভস', সেরকম হয়ে গেছে—আক্ষরিক ভাবেই। শব্দগুলোর অর্থটা একেবারে খাপে খাপে মিলে যেতে দেখেছে কানাই এই সব ক্ষেত্রে : আবেগের তীব্রতা যেন তাদের গায়ের চামড়ার শরীরী সীমা ছাপিয়ে উপচে পড়েছে বাইরে। এবং কারণ যাই হোক না কেন, প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাদের ক্রোধের লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে কানাই : দোভাষী কানাই, সংবাদবাহক কানাই, লিপিকর কানাই। দুর্বোধ্যতার খরস্রোতে ওই তাদের ভাসিয়ে রেখেছে রক্ষাকর্তা হয়ে, ফলে তাদের মনে হয়েছে চারপাশের সব কিছুর অর্থহীনতা যেন কানাইয়েরই ত্রুটি, কারণ তাদের সামনে ও-ই এক এবং একমাত্র বস্তু যার কোনও একটা নাম আছে। কানাই তখন নিজেকে বুঝিয়েছে যে এই ক্রোধোদগীরণের অধ্যায়গুলি প্রোফেশনাল হ্যাজার্ড ছাড়া কিছু নয়, সব পেশার সঙ্গেই যেমন কিছু কিছু অসুবিধা কি ঝঞ্ঝাট জড়িয়ে থাকে সেরকম; এর মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রোশের কিছু নেই, পেশার খাতিরেই শুধু দুজ্ঞেয় জীবনের হয়ে মাঝে মাঝে প্রক্সি দেওয়ার কাজ করতে হচ্ছে ওকে। তবুও, এই ঘটনার সম্পূর্ণ কার্যকারণ জানা থাকা সত্ত্বেও, কিছুতেই এখন নিজের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা কটুবাক্যের স্রোত রোধ করতে পারল না কানাই। কাদা থেকে উঠতে সাহায্য করার জন্য ফকির যখন হাত বাড়িয়ে দিল, এক ঝাঁপটায় ও সরিয়ে দিল হাতটাকে: "যা শুয়োরের বাচ্চা, বেরিয়ে যা এখান থেকে!"

"ঠিক আছে," ফকির বলল, "তাই হোক তা হলে।"

মাথাটা একটু তুলে ফকিরের চোখদুটো এক ঝলক দেখতে পেল কানাই; আর তারপরেই, হঠাৎ যেন মুখের কথা শুকিয়ে গেল ওর। পেশাগত জীবনে দোভাষীর কাজ করতে গিয়ে এক এক বার মুহূর্তের জন্যে কানাইয়ের মনে হয়েছে যেন ও নিজের শরীর ছেড়ে অন্য লোকের শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আর প্রত্যেক বারেই যেন অদ্ভুত ভাবে বদলে গেছে ভাষা নামের যন্ত্রটার ভূমিকা। যা ছিল একটা বেড়ার মতো, একটা আড়াল-করা পর্দার মতো, সেই ভাষাই যেন হঠাৎ হয়ে গেছে স্বচ্ছ একটা আবরণ, একটা কাঁচের প্রিজম। অন্য আরেক জোড়া চোখের ভেতর দিয়ে তখন ও দেখেছে বাইরেটাকে, অন্য আরেক জনের মনের

ভেতর দিয়ে জগৎটা এসে পৌঁছেছে ওর কাছে। এই অভিজ্ঞতাগুলি সব সময়েই হয়েছে খুব আকস্মিকভাবে, কোনও বারই আগে থেকে কিছু আঁচ করতে পারেনি কানাই; কোনও কার্যকারণ সম্পর্কও কিছু খুঁজে পায়নি। কেবল একটা বিষয় ছাড়া আর কোনও সাদৃশ্যের সূত্রও নেই ঘটনাগুলির মধ্যে সে সাদৃশ্য হল, এই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই কারও না কারও সঙ্গে দোভাষী হিসেবে কাজ করছিল কানাই। এখানে যদিও ও দোভাষীর কাজ করছে না এখন, তবুও ফকিরের দিকে তাকাতেই হঠাৎ সেই অনুভূতিটা আবার ফিরে এল কানাইয়ের মনে। মনে হল যেন ওই অস্বচ্ছ ভাবলেশহীন চোখদুটোর মধ্যে দিয়ে প্রতিসারিত হয়ে যাচ্ছে ওর দৃষ্টি, আর সামনে যাকে দেখতে পাচ্ছে সে ওর নিজের চেহারা নয়, তার বদলে সেখানে রয়েছে অনেকগুলো মানুষ–যারা বাইরের পৃথিবীর প্রতিভূ, যে মানুষগুলো একদিন ছারখার করে দিয়েছিল ফকিরের গ্রাম, ওর ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল, খুন করেছিল ওর মাকে। কানাই এখানে সেই মানুষগুলোর প্রতিনিধি যাদের ওপর এক কানাকড়িও বিশ্বাস নেই ফকিরের মতো লোকেদের, এরকম মানুষের মূল্য ওদের কাছে একটা জানোয়ারের চেয়েও কম। নিজেকে এ ভাবে দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারল কানাই কী কারণে ওর মৃত্যু কামনা করতে পারে ফকির, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝতে পারল যে ব্যাপারটা ঠিক সেরকম নয় আসলে। ওর মৃত্যু চায় বলে ফকির ওকে এখানে নিয়ে এসেছে তা নয়, ফকির ওকে এখানে এনেছে যাচাই করার জন্যে।

হাত দিয়ে চোখের থেকে কাদা মুছল কানাই। তারপর আবার যখন তাকাল, দেখল ওর দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে ফকির। হঠাৎ কী মনে হতে কানাই ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে দেখার চেষ্টা করল। কাদার মধ্যে হাঁকুপাকু করে কোনওরকমে মুখটা ফেরাতেই দেখতে পেল আস্তে আস্তে নদীর মধ্যে নেমে যাচ্ছে ফকিরের ডিঙি। এখান থেকে ফকিরের মুখ দেখতে পাচ্ছিল না কানাই, ওর পিঠের দিকটা শুধু দেখা যাচ্ছিল; প্রাণপণে দাঁড় টেনে চলেছে নৌকোর পেছন দিকে বসে।

"ফকির, দাঁড়া," চেঁচিয়ে ডাকল কানাই, "আমাকে এখানে ফেলে যাস না।"

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে, একটা বাঁকের মুখ ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেছে ফকিরের ডিঙি।

ডিঙির ধাক্কায় জেগে ওঠা ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল কানাই, দেখছিল আস্তে আস্তে নদীর বুক জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে জলের স্রোত। হঠাৎ ওর চোখে পড়ল একটা তিরতিরে দাগ, কোনাকুনি এগিয়ে আসছে জলের ওপর দিয়ে। দাগটার দিকে ভাল করে নজর করতেই পরিষ্কার বোঝা গেল জলের নীচে কিছু একটা আছে ওখানে। ঘোলা জলের আবছায়া অন্ধকারের আড়ালে সেটা সোজা এগিয়ে আসছে পাড় লক্ষ করে–কানাইয়ের দিকে।

হঠাৎ ভাটির দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা নানা মরণফঁদের কথা ভিড় করে এল কানাইয়ের মনে। লোকে বলে বাঘের হাতে পড়লে নাকি পলক ফেলতে না ফেলতে প্রাণ বের হয়ে যায়, থাবার এক ঝাঁপটে ঘাড় মটকে গিয়ে সাঙ্গ হয়ে যায় ভবলীলা। যন্ত্রণা হওয়ার কোনও সুযোগই থাকে না। অবশ্য থাবার ঘা-টা আসার আগেই নাকি প্রচণ্ড গর্জনে বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়ে প্রাণ হারায় মানুষ। এর মধ্যেও করুণার ছোঁয়া একটা রয়েছে, অস্বীকার করার উপায় নেই–অন্তত লোকে তো তাই ভাবে। আর সে জন্যেই তো যে মানুষগুলোকে জীবনভর বাঘের সাথে ঘর করতে হয়, তাদের কাছে বাঘ শুধু একটা জানোয়ার মাত্র নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু। পরভাষী এই দুনিয়ায় বাঘই তো একমাত্র প্রাণী দুর্বলের প্রতি যার কিছুটা হলেও একটু মায়াদয়া আছে।

নাকি কুমিরের হাতে প্রাণ যাওয়ার বীভৎস যন্ত্রণার কথা জানে বলেই এরকম মনে করে ভাটির দেশের মানুষ? কানাইয়ের মনে পড়ে গেল নদীর পাড়ের কাছাকাছিই থাকতে ভালবাসে কুমিরেরা। যে গতিতে মানুষ ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটতে পারে, কাদার ওপর তার চেয়ে বেশি গতিতে চলার ক্ষমতা রাখে এই সরীসৃপ। পায়ের পাতা চামড়ায় জোড়া আর বুক-পেট মসৃণ হওয়ার জন্যে তলতলে পাঁকের ওপর দৌড়তে কোনও অসুবিধাই হয় না ওদের।

লোকে বলে শিকার নিয়ে জলের নীচে তলিয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত তাকে নাকি বাঁচিয়ে রাখে কুমির। ডাঙার ওপর কাউকে মারে না এ জানোয়ার। শ্বাস প্রশ্বাস চালু থাকা অবস্থাতেই শিকারকে টেনে নিয়ে যায় জলের ভেতর। কুমিরে যাদের মারে তাদের শরীরের এতটুকু চিহ্নও পরে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

কানাইয়ের মন থেকে আর সমস্ত চিন্তা মুছে গেল। কোনওরকমে উবু হয়ে উঠে পিছু হঠতে লাগল আস্তে আস্তে। মাটি থেকে উঠে থাকা ছুঁচলো শেকড়ে ছড়ে গেল সারা গা, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে উঁচু পাড়ের দিকে পেছোতে থাকল কানাই। বেশ খানিকটা পিছিয়ে যাওয়ার পর কাদা কমে এল। শুলোগুলো এখানে বেশি লম্বা, সংখ্যায়ও অনেক বেশি। জলের ওপর সেই তিরতিরে দাগটা আর দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। নদী থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে চায় এখন ও।

খুব সাবধানে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল কানাই। এক পা সামনে এগোতেই তীব্র একটা যন্ত্রণায় প্রায় অবশ হয়ে গেল পায়ের পাতাটা। মনে হল যেন একটা পেরেকের ছুঁচোলো মুখের ওপর পা পড়েছে, কিংবা একটা ভাঙা কাঁচের টুকরো মাড়িয়ে দিয়েছে ভুল করে। পা টেনে তুলতেই চোখে পড়ল কাদার গভীর থেকে মাথা বের করে রয়েছে একটা শুলো। বর্শার মতো তীক্ষ্ণ তার ডগাটা। ঠিক তার ওপরেই পা-টা ফেলেছিল কানাই। ভাল করে তাকিয়ে দেখল চারপাশের সমস্ত জায়গাটা ভর্তি হয়ে আছে ছুচোলো শুলোয়। লুকোনো ফাঁদের মতো সব ছড়িয়ে রয়েছে চতুর্দিকে। যে শেকড়গুলো এদের জুড়ে রেখেছে, এই শ্বাসমূলগুলোকে, কাদার ওপরের স্তরের ঠিক নীচে বিছিয়ে রয়েছে সেগুলো—ফাঁদের সঙ্গে জোড়া লুকোনো সুতোর মতো।

সামনেই শুরু হয়েছে বাদাবনের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। নৌকো থেকে দেখে যেটাকে জটিল, দুর্গম মনে হচ্ছিল, সে বনকেই এখন মনে হল বিপদের আশ্রয়। এই অজস্র শুলোর মাইনফিল্ডের মধ্যে দিয়ে কোনও রকমে পথ করে সেই ঘন সবুজ জঙ্গলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল কানাই।

বাদাবনের গাছের ট্যারাব্যাঁকা সব ডালপালা এমনই লগবগে যে দু'হাতে ঠেলে সরালেও মচকে যায় না সেগুলো, ছেড়ে দিলেই চাবুকের মতো ছিটকে ফিরে আসে নিজের জায়গায়। কানাইকে যেন ঘিরে ধরল গাছগুলো, মনে হল যেন ছাল-বাকলে মোড়া শত শত হাতের আলিঙ্গনের ভেতরে এসে পড়েছে ও। গাছপালা এত ঘন যে সামনে এক মিটার দূরেও কিছু দেখতে পাচ্ছিল না কানাই। নদীটাও চোখের আড়ালে চলে গেছে। পায়ের তলায় মাটির ঢালটা না থাকলে জলের দিকে এগোচ্ছে না তার থেকে দূরে যাচ্ছে সেটা পর্যন্ত বুঝতে পারত না কানাই। এক সময় হঠাৎ করে যেন শেষ হয়ে গেল জঙ্গলের ঘন বেড়া। সামনে ঘাসে ঢাকা ভোলা একটা জায়গা। তার এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বড় বড় কিছু গাছ আর তাল জাতীয় গাছ কয়েকটা। কানাই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। সারা শরীর কেটে ছড়ে গেছে, জামাকাপড়গুলোও ছিঁড়ে প্রায় ফালাফালা। মাছি এসে বসছে গায়ে, মাথার ওপর ভনভন করছে এক ঝাক মশা।

ফাঁকা জায়গাটার চারদিকে ভাল করে চেয়ে দেখারও সাহস হল না কানাইয়ের। এটাই সেই জায়গা তা হলে? এই যদি সেই দ্বীপ হয়, তা হলে কি এখানেই কিন্তু কীসের কথা ভাবছে কানাই? শব্দটা কিছুতেই মাথায় আসছে না। এমনকী ফকির যে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কী একটা বলেছিল সেটাও এক্কেবারে মনেই পড়ছে না। ভয়ের চোটে কানাইয়ের মনটা যেন ভাষাহীন হয়ে গেছে। যে ধ্বনি আর চিহ্নগুলো এক সঙ্গে মন আর বোধের মধ্যে জলকপাটের মতো কাজ করে হঠাৎ যেন অচল হয়ে গেছে সেগুলো। মাথার ভেতরটা শুধু ভেসে যাচ্ছে নির্ভেজাল অনুভূতির বন্যায়। যে শব্দগুলোর জন্যে ও হাতড়ে বেড়াচ্ছে, যে কথাগুলো এই প্রচণ্ড ভয়ের উৎস, আসল জিনিসটাই যেন তাদের জায়গা নিয়ে নিয়েছে এখন। সমস্যাটা শুধু, ভাষা বা শব্দ ছাড়া তাকে বোঝা যাবে না, উপলব্ধি করা যাবে না তার তাৎপর্য। এ যেন শুদ্ধ চৈতন্যের হাতে গড়া এক মূর্তি, যার উপস্থিতি এমনকী আসলের চেয়েও বহুগুণে প্রবল,

অনেক বেশি অস্তিত্বময়।

কানাই চোখ খুলল। সামনে তাকাতেই দেখতে পেল ওটাকে। একেবারে ওর মুখোমুখি, একশো মিটারের মধ্যে। পেছনের পায়ের ওপর ভর দিয়ে বসে আছে, মাথা তুলে তাকিয়ে রয়েছে কানাইয়ের দিকে, জ্বলজ্বলে পাঙাশ চোখে ওকে দেখছে। শরীরের ওপরের দিকের লোমগুলো রোদের আলোয় সোনার মতো রং ধরেছে। পেটের দিকটা কিন্তু গাঢ়, কাদায় ঢাকা। আকারে বিশাল, কানাই যেরকম ভেবেছিল তার চেয়ে অনেকটাই বড়। চোখদুটো আর লেজের ডগাটা ছাড়া সারা শরীরে এতটুকু স্পন্দনের লক্ষণ নেই।

এতটাই ভয় পেয়ে গিয়েছিল কানাই প্রথমটায়, যে নড়াচড়া করারও শক্তি লোপ পেয়ে গিয়েছিল। একটু দম ফিরে পেয়ে কোনও রকমে উঠে বসল হাঁটুতে ভর দিয়ে, তারপর খুব ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল ওর কাছ থেকে। জানোয়ারটার দিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে পিছু হটে হটে জঙ্গলের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করতে লাগল। আর পুরোটা সময় জুড়ে মোচড় খেতে থাকল প্রাণীটার লেজের ডগা। জঙ্গলের আলিঙ্গনের ভেতর ঢুকে এসে অবশেষে খাড়া হল কানাই। তারপর কাটা-খোঁচার তোয়াক্কা না করে ঘুরে দাঁড়িয়ে দু'হাতে ডালপালা সরিয়ে এগোতে লাগল। শেষ পর্যন্ত বাদাবনের দেওয়াল ভেঙে যখন নদীর ধারে পৌঁছল, তখন হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল কানাই। হাতের পেছনে চোখ ঢেকে নিজেকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করল চরম আঘাতের মুহূর্তটার জন্য—যে প্রচণ্ড আঘাতে মট করে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে ঘাড়ের হাড়গুলি।

"কানাই!" চিৎকারটা শুনে মুহূর্তের জন্যে খুলে গেল চোখদুটো। এক পলক দেখতে পেল পিয়া, ফকির আর হরেন নদীর পাড় দিয়ে দৌড়ে আসছে ওর দিকে। তারপরেই ফের হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল কাদার ওপর, অন্ধকার হয়ে গেল মাথার ভেতরটা।

আবার যখন চোখ খুলল, তখন ও ডিঙির ওপর চিত হয়ে শোওয়া। দুপুরের রোদে ঝলসে যাচ্ছে আকাশ। একটা মুখের আদল খুব ধীরে ধীরে আকার নিচ্ছে চোখের সামনে। পিয়ার মুখ। আস্তে আস্তে বুঝতে পারছিল কানাই ওর কাঁধের নীচে হাত দিয়ে তুলে বসানোর চেষ্টা করছে পিয়া।

"কানাই? আর ইউ ও কে?"

"আপনি কোথায় ছিলেন পিয়া?" জবাবে বলল কানাই। "কতক্ষণ ওই দ্বীপটায় একা . একা ছিলাম আমি।"

"মাত্র দশ মিনিট আপনি একা ছিলেন ওখানে, কানাই। ফকিরকে নাকি আপনিই ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ও তো পড়িমরি করে এল আমাদের নিয়ে যেতে, আর আমরাও যত তাড়াতাড়ি পারি গিয়ে পৌঁছলাম।"

"আমি দেখেছি পিয়া। বাঘ দেখেছি আমি।" হরেন আর ফকিরও পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখতে পেয়ে বাংলায় বলল, "ওখানে ছিল। বড় শেয়াল—আমি দেখেছি।"

মাথা নাড়ল হরেন। বলল, "না কানাইবাবু, কিছু ছিল না ওখানে। আমি আর ফকির ভাল করে দেখেছি। কিছু দেখতে পাইনি। আর, যদি কিছু থাকত আপনি তা হলে আর এতক্ষণে এখানে থাকতেন না।"

"ছিল ওখানে, আমি বলছি।" এত কঁপছিল কানাইয়ের সারা গা যে কোনও রকমে কথাগুলি উচ্চারণ করতে পারল ও। শান্ত করার জন্যে এক হাতে ওর কবজিটা ধরল পিয়া। নরম গলায় বলল, "ঠিক আছে কানাই। আর ভয় নেই। আমরা সবাই তো এখন আছি। আপনার সঙ্গে।"

কানাই জবাব দেওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু দাতে দাঁত লেগে যাচ্ছিল বারবার, শ্বাসটা যেন খালি খালি আটকে যাচ্ছিল গলার মধ্যে।

"কথা বলবেন না," বলল পিয়া। "আমার ফার্স্ট এইড বক্সে ঘুমের ওষুধ আছে, লঞ্চে পৌঁছেই একটা দিয়ে দেব আপনাকে। আপনার এখন একটা ভাল বিশ্রাম দরকার। তারপর দেখবেন, ভাল লাগবে।"

আলো

ডেটাশিটগুলো সরিয়ে রেখে পিয়া যখন কেবিন থেকে বেরিয়ে এল, ততক্ষণে আলো বেশ কমে এসেছে। বোটের সামনের দিকে যাওয়ার পথে কানাইয়ের কেবিনের সামনে এসে একটু দাঁড়াল ও, বোঝার চেষ্টা করল ভেতর থেকে কোনও আওয়াজ আসছে কিনা। ওর দেওয়া ওষুধটা খেয়ে সারা দুপুর ঘুমিয়েছে কানাই, কিন্তু এখন মনে হল ঘুমটা ভেঙে গেছে। কেবিনের ভেতরে নড়াচড়ার শব্দ কানে এল পিয়ার। দরজায় টোকা মারার জন্যে ও একবার হাতটা তুলল, কিন্তু কী মনে হতে টোকাটা আর দিল না। আস্তে আস্তে ডেক পার হয়ে লঞ্চের সামনের দিকটায় গিয়ে দাঁড়াল।

সূর্য ডুবতে চলেছে। জোয়ারের জলে প্রায় তলিয়ে গেছে গর্জনতলা। অন্ধকার হয়ে আসা আকাশের গায়ে দ্বীপটাকে এখন ঝাপসা একটা দাগের মতো দেখতে লাগছে। সন্ধের মরা আলোয় মনে হচ্ছে দিনের শেষে পরম শান্তির ঘুমে আস্তে আস্তে তলিয়ে যাচ্ছে গর্জনতলা। কিন্তু হঠাৎ সবে মাত্র পিয়া গলুইটার কাছে উঠে দাঁড়াতে গেছে—ঝাপসা দ্বীপটার ওপর মিটমিট করে উঠল খুদে খুদে আলোর টিপ; মাত্র এক পলকের জন্যে। তারপরেই আবার অন্ধকার। পরমুহূর্তেই আবার জ্বলে উঠল আলোর বিন্দুগুলো, একসঙ্গে হাজার হাজার, হয়তো বা লক্ষ লক্ষ ছুঁচের ডগার মতো বিন্দু বিন্দু আলো। এত মৃদু, যে বোটের ওপর থেকে কোনওরকমে শুধু বোঝা যায়। জ্বলা-নেভার ছন্দে দৃষ্টি একটু অভ্যস্ত হয়ে আসতেই শেকড় আর ডালপালার আবছায়া একটা আদল ধরা পড়ল পিয়ার চোখে, গুঁড়ি গুঁড়ি আলোর দানায় ঢাকা।

তাড়াতাড়ি উলটোদিকে ফিরে পিয়া ছুটল কানাইয়ের কেবিনের দিকে। দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকল, "জেগে আছেন? একটা জিনিস দেখে যান একবার। তাড়াতাড়ি আসুন।"

দরজাটা খুলতেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে একটু পিছিয়ে গেল পিয়া। যাকে দেখতে পাবে আশা করছিল, ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা যেন সে নয়, অন্য কেউ। মুখ আর শরীর থেকে ঘষে সাফ করা হয়ে গেছে সমস্ত ময়লা, পরনে হরেনের কাছ থেকে ধার করা একটা গেঞ্জি আর লুঙ্গি। কানাইয়ের চেহারার মধ্যে সবসময়ে যে একটা স্পষ্ট আত্মবিশ্বাসের ছাপ থাকে, সেটার কোনও চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না। সব মিলিয়ে মানুষটাকে যেন চিনতেই অসুবিধা হচ্ছিল পিয়ার।

"কানাই, কী হয়েছে আপনার? আপনি ঠিক আছেন তো?"

"হ্যাঁ। ভালই আছি। একটু শুধু ক্লান্ত।"

"তা হলে আসুন আমার সঙ্গে। একটা জিনিস দেখাব।"

কানাইকে সঙ্গে করে বোটের সামনের দিকটায় নিয়ে গেল পিয়া। গর্জনতলার দিকে। ইশারা করে বলল, "ওই দেখুন।"

"কী দেখব?"

"অপেক্ষা করুন একটু।"

বলতে বলতেই হঠাৎ মিটমিট করে জ্বলে উঠল আলোর বিন্দুগুলো। "মাই গড!" বলে উঠল কানাই। "ওগুলো কী?"

"এমনি জোনাকি পোকা। একসঙ্গে তালে তালে জ্বলছে আর নিভছে," জবাব দিল পিয়া। "এই ব্যাপারটার কথা আমি কোথায় যেন পড়েছি। সাধারণত নাকি ম্যানগ্রোভ জঙ্গলেই এটা দেখা যায়।"

"জীবনে কখনও এরকম দেখিনি আমি।"

"আমিও না," পিয়া বলল।

মুগ্ধ হয়ে আলোর নাচ দেখতে লাগল পিয়া আর কানাই। বিন্দুগুলো আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল অন্ধকার ঘন হওয়ার সাথে সাথে। হঠাৎ কানাইয়ের চাপা গলা-খাঁকারির আওয়াজ কানে এল পিয়ার; মনে হল কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে ও। খানিক পরে শেষ পর্যন্ত যখন বলল কথাটা, আশ্চর্য হয়ে গেল পিয়া। "শুনুন পিয়া," কোনও ভূমিকা ছাড়াই শুরু

করল কানাই, "একটা কথা আপনাকে বলতে চাইছিলাম–আমি ভাবছি কাল সকালেই ফিরে যাব।"

"ফিরে যাবেন? কোথায়?"

"লুসিবাড়ি, তারপর সেখান থেকে দিল্লি।"

"আচ্ছা!" পিয়া বিস্ময়ের ভান করল। এখন ও বুঝতে পারছিল, কানাই কী বলতে যাচ্ছে সেটা প্রথম থেকেই মনে মনে জানত ও। "এত তাড়াতাড়ি ফিরে যাবেন?"

"হ্যাঁ, কানাই বলল। "আমার আসলে অফিসে ফিরে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। কালকের দিনটা গেলে এখানে আমার ন' দিন হয়ে যাবে। ওদিকে সবাইকে আমি বলে এসেছি যে দিন দশেকের মধ্যেই ফিরব। দেরি হলে আবার অফিসের লোকজন সব চিন্তা করতে শুরু করবে। কালকে যদি ভোর ভোর রওয়ানা হয়ে যাই তা হলে পরশুই পৌঁছে যাব দিল্লি।"

কানাইয়ের গলা শুনে পিয়া বুঝতে পারছিল একটা কিছু কথা ও চেপে যাচ্ছে। "সেটাই আপনার ফেরত যাওয়ার একমাত্র কারণ? শুধু অফিসের জন্যে?"

"না," শুকনো গলায় জবাব দিল কানাই। "আরেকটা কারণ হল, এখানে আমার থাকার আর কোনও প্রয়োজন নেই। মেসোর নোটবইটাও পড়া শেষ হয়ে গেছে। আর আপনারও যে খুব একটা কিছু কাজে আমি লাগছি এমনও নয়–আমার মনে হয় ট্রান্সলেটর ছাড়াও আপনি দিব্যি চালিয়ে নিতে পারবেন।"

"হ্যাঁ, আমার জন্যে আপনার থাকার সত্যিই কোনও প্রয়োজন নেই," পিয়া বলল। "কিন্তু কিছু যদি না মনে করেন তা হলে একটা কথা জিজ্ঞেস করব? আজকে ওই দ্বীপে যা ঘটেছে তার সঙ্গে কি আপনার এই সিদ্ধান্তের কোনও সম্পর্ক আছে?"

জবাব দিতে খানিকক্ষণ সময় নিল কানাই। তারপর কিছুটা যেন অনিচ্ছার সঙ্গে বলল, "এসব আমার ঠিক পোষাবে না পিয়া। আজকে ওখানে যা হয়েছে তাতে আমি বুঝে গেছি। যে এ আমার জায়গা নয়।"

"ওখানে হয়েছিলটা কী আমাকে বলুন তো ঠিক করে। আপনি দ্বীপটাতে গিয়ে পৌঁছলেন কী করে?"

"ফকিরই বলেছিল একবার গিয়ে ঘুরে আসা যাক দ্বীপটা থেকে। আর আমিও ভাবলাম দেখেই আসি একবার। না যাওয়ার কী আছে? এই হল ব্যাপার।"

বিষয়টা নিয়ে যে কানাইয়ের কথা বলার খুব একটা ইচ্ছে নেই সেটা বোঝা গেলেও আবার প্রশ্ন করল পিয়া, "দোষটা কি তা হলে ফকিরের? ও কি ইচ্ছে করে আপনাকে ওখানে রেখে চলে এসেছিল?"

"না," স্পষ্ট গলায় বলল কানাই। "আমিই আসলে কাদায় পড়ে গিয়ে মেজাজ হারিয়ে ফেলেছিলাম। ও আমাকে সাহায্যই করতে চেয়েছিল–কিন্তু আমিই ওকে গালাগাল করে বলেছিলাম চলে যেতে। ওকে দোষ দেওয়াটা ঠিক না।" কথাটা শেষ করেই ঠোঁটটা একটু ফাঁক করল কানাই, যেন পিয়াকে বলতে চায় এই নিয়ে আর কোনও আলোচনা করতে রাজি নয় ও।

"আপনি তো মনে হচ্ছে মন ঠিকই করে ফেলেছেন," পিয়া বলল। "তা হলে আর আটকানোর চেষ্টা করব না আমি। ক'টা নাগাদ রওয়ানা হওয়ার প্ল্যান করছেন?"

"ভোরবেলা," কানাই বলল। "হরেনের সঙ্গে কথা বলে নেব। ঠিক সময়ে যদি বেরিয়ে যেতে পারি তা হলে আমাকে লুসিবাড়িতে নামিয়ে দিয়ে ও সন্ধে নাগাদ ফিরে আসতে পারবে এখানে। আপনি তো বোধহয় এমনিতেই সারাটা দিন ফকিরের নৌকোতে ঘুরে ঘুরে কাটাবেন।"

"সেরকমই ইচ্ছে," বলল পিয়া।

"তা হলে তো দিনের বেলা বোটটা আপনার কোনও কাজে লাগবে না, কী বলেন? কিছু অসুবিধা নিশ্চয়ই হবে না।"

কানাইয়ের সঙ্গে এই ক'দিন যেটুকু সময় কাটিয়েছে সে কথা মনে পড়তে একটু খারাপ

লাগল পিয়ার। "না। অসুবিধা হবে না," বলল ও। "তবে আপনার সঙ্গে আড্ডাটা মিস করব। এই ক'দিন সময়টা বেশ ভাল কেটেছে আমার। খুব এনজয় করেছি।"

"আমারও আপনার সঙ্গে সময়টা ভাল কেটেছে, পিয়া।" কথাটা বলে নিজেকে খানিকটা গুছিয়ে নেওয়ার জন্যে যেন একটু চুপ করে গেল কানাই। "আসলে, আমি আশা করেছিলাম—"

"কী?"

"আমি ভেবেছিলাম আপনিও চলে আসবেন... মানে, দিল্লিতে।"

"দিল্লিতে?" কথাটা পিয়ার এত অদ্ভুত লাগল যে একটা হাসির দমক গুরগুরিয়ে উঠে এল পেটের ভেতর থেকে।

"কথাটা হাস্যকর মনে হচ্ছে আপনার?" জিজ্ঞেস করল কানাই।

"সরি কানাই," তাড়াতাড়ি বলল পিয়া। "আসলে এরকম কিছু একটা আপনি বলবেন আমি আশাই করতে পারিনি। এখান থেকে কত দূরে দিল্লি আর আমার তো এখানে এখন অনেক কাজ।"

"সে আমি জানি," বলল কানাই। "আমি তো আর আপনাকে এক্ষুনি যেতে বলছিলাম না। ভেবেছিলাম আপনার সার্ভে-টার্ভে শেষ হয়ে গেলে তারপর যদি আসেন।"

কানাইয়ের কথার সুরটা শুনে একটু অস্বস্তি লাগল পিয়ার। মনে পড়ল, প্রথম যখন দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে, ট্রেনে—কী আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রত্যেকটা কথা বলছিল, চলাফেরায় কেমন একটা কর্তৃত্বের ভাব ছিল। সেই স্মৃতির সঙ্গে ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আমতা আমতা করে কথা বলা, দ্বিধাগ্রস্ত এই মানুষটাকে কিছুতেই মেলানো যাচ্ছিল না। ফিরে দাঁড়িয়ে গর্জনতলার দিকে তাকাল পিয়া। দেখল দিগন্ত থেকে সেখানে আস্তে আস্তে উঠে আসছে চাঁদ।

"আপনি ঠিক কী চাইছেন একটু পরিষ্কার করে বলুন তো, কানাইকে জিজ্ঞেস করল পিয়া। "আমাকে দিল্লিতে কেন যেতে বলছেন?"

দু' চোখের মাঝখানে নাকের হাড়টাকে দু'আঙুলে চেপে ধরল কানাই। যেন ঠিক ঠিক

শব্দগুলো খুঁজে পেতে সুবিধে হবে তাতে। "আমি আপনাকে মিথ্যে কথা বলব না পিয়া ঠিক কী যে বলতে চাইছি সেটা আমি নিজেই জানি না। এইটুকু শুধু বলতে পারি, যে আমি আবার আপনাকে দেখতে চাই। আর আপনি আমাকে আমার নিজের জায়গায় দেখেন, যেখানে'আমি থাকি সেখানে দেখেন, সেটাও চাই।"

দিল্লিতে কানাইয়ের জীবনের একটা ছবি মনে মনে ভাবার চেষ্টা করল পিয়া। কল্পনায় দেখতে পেল বিশাল একটা বাড়ি, নানারকম কাজের লোক সেখানে একজন রান্নার লোক, একজন ড্রাইভার, একজন ফাইফরমাশ খাটার লোক। মনে হল নিজের জীবন থেকে বহু দূরের কোনও ছবি দেখছে, টিভির বা সিনেমার কোনও দৃশ্যের মতো। কল্পনার সেই ছবিকে সিরিয়াসলি নেওয়াটা ওর পক্ষে অসম্ভব। আর এটাও পিয়া জানে, যে মনের এই ভাব লুকোনোটাও ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

হাত বাড়িয়ে কানাইয়ের একটা হাত ছুঁল পিয়া। বলল, "শুনুন কানাই, আপনার কথা শুনলাম আমি। খুব ভাল লাগল, বিশ্বাস করুন। যা যা আপনি করেছেন আমার জন্যে, তাতে ভীষণ খুশি হয়েছি। আমি মন থেকে চাই আপনি ভাল থাকুন, আপনার ভাল থোক। দেখবেন, একদিন ঠিক আপনার মনের মতো কোনও মেয়েকে খুঁজে পাবেন আপনি। কিন্তু আমি সে মেয়ে নই।"

হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কানাই। বোঝা গেল জবাবটা অপ্রত্যাশিত ছিল, না ওর কাছে। বলল, "কত কী যে আপনাকে বলতে চাই পিয়া। মনে হয় এত কিছু না চাইলে হয়তো বলাটা অনেক সহজ হত। ময়না যেরকম বলে।"

কানাই নামটা উচ্চারণ করতেই যেন একটা ধাক্কা খেল পিয়া। "কী বলে?"

"বলে যে, কথা হল হাওয়ার মতো, শুধু জলের ওপরটায় ঢেউ তোলে, আসল নদীটা বয়ে

যায় নীচে তাকে দেখাও যায় না, শোনাও যায় না।”

“তার মানে কী?”

“ফকিরের ব্যাপারে কথা বলতে বলতেই বলেছিল ময়না এটা,” কানাই বলল।

“মানে?”

“ফকির ওর সব, বুঝলেন—মানে, আপনার যদিও সেরকম মনে নাও হতে পারে, কিন্তু ও যেন কীরকম একটা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে, ভাবছে ফকির ওকে ছেড়ে চলে যাবে।”

“কিন্তু ফকির সেরকম করবে কেন?”

গলা নিচু করল কানাই, “হয়তো আপনার জন্যে।”

“অদ্ভুত কথা বলছেন আপনি কানাই,” প্রতিবাদ করল পিয়া। “এরকম মনে হওয়ার তো কোনও কারণ নেই। ময়নারও না, অন্য কারওরই না।”

“কোনও কারণই কি নেই?”

পিয়া বুঝতে পারছিল আস্তে আস্তে মেজাজটা খারাপ হতে শুরু করেছে ওর। গলার স্বর যতটা সম্ভব শান্ত রেখে বলল, “ঠিক কী বলতে চাইছেন আপনি, কানাই?”

“ময়না কী মনে করে সেটাই বলছি,”নরম সুরে জবাব দিল কানাই। “ওর বিশ্বাস, আপনি ফকিরের প্রেমে পড়েছেন।”

“আর আপনি?” তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করল পিয়া। “আপনারও কি একই ধারণা?”

“তা হলে বলেই ফেলি, প্রেমে পড়েছেন নাকি?”

ধারালো, প্রায় কর্কশ গলায় পিয়া বলল, “কথাটা কি আপনি ওর হয়ে জানতে চাইছেন কানাই, না আপনার নিজের প্রয়োজনে জিজ্ঞেস করছেন?”

“কিছু কি এসে যায় তাতে?”

“সে আমি জানি না, কানাই। আপনাকে কী যে বলব আমি জানি না। ওকেও বা কী বলব। তাও বুঝতে পারছি না। আপনার কোনও প্রশ্নেরই উত্তর আমার জানা নেই।” হাত দিয়ে দুই কান চেপে ধরল পিয়া, যেন বাইরে সরিয়ে রাখতে চায় কানাইয়ের গলার আওয়াজ। “শুনুন, আমি দুঃখিত, এই নিয়ে আর একটা কথাও বলতে চাই না আমি।”

চাঁদ উঠে এসেছে গর্জনতলার ঠিক ওপরে। ফটফটে জ্যোৎস্নায় স্নান দেখাচ্ছে আলোর বিন্দুগুলো—আর চোখেই পড়ে না প্রায়। আবছা হয়ে আসা সেই আলোর টিপের দিকে চেয়েছিল পিয়া, মনে করতে চেষ্টা করছিল, মাত্র কয়েক মিনিট আগেও কেমন মোহময় মনে হচ্ছিল সেগুলোকে। “কী সুন্দর লাগছিল, তাই না?”

জবাবটা যখন এল, কানাইয়ের গলাও তখন পিয়ার মতোই আড়ষ্ট। “আমার মেসো থাকলে হয়তো বলত এ হল ভাটির দেশের জাদু।”

খোঁজ

ভোরবেলা কেবিন থেকে বেরিয়ে পিয়া দেখল ঘন কুয়াশা যেন মুড়ে রেখেছে মেঘাকে। কেবিনের সামনে থেকে বোটের দুই প্রান্ত দেখা যাচ্ছে না। ডেকের সামনের দিকে এগোতে গিয়ে আরেকটু হলেই কানাইয়ের গায়ের ওপর হুড়মুড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল ও। একটা চেয়ার নিয়ে বসেছিল কানাই, হাঁটুর ওপরে নোটবই, আর পাশে একটা লণ্ঠন।

"উঠে পড়েছেন এর মধ্যেই?"

"হ্যাঁ।" ক্লান্তভাবে হাসল কানাই। "ঘণ্টা কয়েক আগেই উঠে পড়েছি।"

"সে কী? কেন?"

"আসলে একটা কাজ করছিলাম," বলল কানাই।

"এত ভোরবেলা?" বিস্ময় গোপন করতে পারল না পিয়া। "এই ভোর রাত্তিরে বিছানা ছেড়ে এসে কাজ করছেন–নিশ্চয়ই খুব ইম্পর্ট্যান্ট কিছু?"

"ইম্পর্ট্যান্ট," জবাব দিল কানাই। "কাজটা আসলে আপনারই জন্যে। একটা উপহার। চলে যাওয়ার আগে এটা শেষ করে আপনাকে দিয়ে যেতে চাইছিলাম।"

"আমার জন্যে? কী উপহার?" জিজ্ঞেস করল পিয়া।

মাথা নেড়ে হাসল কানাই। মুখটা একটু বাঁকিয়ে বলল, "শেষ হলেই দেখতে পাবেন।"

"শেষ হয়নি এখনও?"

"না। তবে আমি যাওয়ার আগে শেষ হয়ে যাবে," বলল কানাই।

"ঠিক আছে। পরে কথা হবে তা হলে।" জামাকাপড় ছাড়ার জন্যে কেবিনের দিকে এগোল পিয়া। তারপর দাঁত-টাত মেজে কলা আর ওভালটিন দিয়ে হালকা ব্রেকফাস্ট সেরে যখন আবার বেরিয়ে এল, ততক্ষণে হরেন উঠে পড়ে সারেং-এর ঘরে গিয়ে বসেছে। ফকিরও চলে গেছে ওর ডিঙিতে, নোঙর তোলার তোড়জোড় করছে। হাত বাড়িয়ে ফকিরকে পিঠব্যাগটা দিয়ে দিল পিয়া। ব্যাগের মধ্যে রয়েছে ওর যন্ত্রপাতি, দুটো জলের বোতল আর কয়েকটা নিউট্রিশন বার। তারপর একবার গেল সামনের ডেকে। কানাই তখনও বসে রয়েছে সেই চেয়ারে।

"হয়েছে শেষ?" জিজ্ঞেস করল পিয়া।

"হ্যাঁ।" উঠে দাঁড়িয়ে মোটা ব্রাউনপেপারের একটা বড় এনভেলপ পিয়ার হাতে দিল কানাই। "এই নিন।"

খামটা কানাইয়ের হাত থেকে নিয়ে উলটে পালটে দেখল পিয়া। "এখনও বলবেন না এটার মধ্যে কী আছে?"

"সেটা একটা সারপ্রাইজ," চোখ নামিয়ে ডেকের দিকে তাকাল কানাই। পা ঘষল তক্তায়। "আর এটার ব্যাপারে আপনার মতামত যদি আমাকে জানাতে চান–খামের। পেছনে আমার ঠিকানা লেখা আছে। আশাকরি লিখবেন।"

"নিশ্চয়ই লিখব কানাই," বলল পিয়া। "আমরা তো বন্ধু, তাই না?"

"আশা করি।"

পেছন থেকে হরেনের চোখ ওর পিঠটা প্রায় ফুটো করে দিচ্ছে, বুঝতে পারছিল পিয়া। তা না হলে কানাইয়ের গালে আলতো করে একটা চুমু খেতে ইচ্ছে করছিল ওর। বলল, "ভাল থাকুন।"

"আপনিও ভাল থাকুন পিয়া। গুড লাক।"

.

ঘন কুয়াশার ভারী চাদর ঝুলে আছে জলের ওপর। স্রোতের গতি যেন ধীর হয়ে গেছে তার ওজনে। ফকির জলে বৈঠা ডোবাতেই তরতর করে এগিয়ে গেল ডিঙি, গলুইয়ের সামনে কুয়াশা যেন ফেনিয়ে উঠল উথলানো দুধের মতো। পাঁড়ের কয়েকটা টানেই দৃষ্টির আড়ালে • চলে গেল মেঘা, কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিলিয়ে গেল কুয়াশার ভেতর।

ডিঙি এগোতে লাগল ভাটির দিকে। কানাইয়ের দেওয়া খামটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল পিয়া। মাপ দেখেই বোঝা যাচ্ছে বেশ কয়েক পাতা কাগজ রয়েছে ভেতরে। পিয়া ঠিক করল এক্ষুনি খুলবে না খামটা। পিঠব্যাগটা নিয়ে ওটাকে তার মধ্যে রেখে পজিশনিং মনিটরটা বের করল। ডিঙিটা ঠিক কোন জায়গায় রয়েছে সেটা বুঝে নিয়ে তারপর কুয়াশাজড়ানো স্বপ্নিল শান্তির মধ্যে গা ভাসিয়ে দিল।

গত কয়েকদিন ধরেই ভটভটির কাঁপুনি আর ডিজেল ইঞ্জিনের ধকধক শব্দে কেমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে শরীর—সে তুলনায় এই শব্দহীন নৌকোযাত্রা অনেক আরামের। নিজের জায়গায় বসে ভাল করে ডিঙিটার দিকে চেয়ে দেখল পিয়া। খসখসে কাঠ আর ছাই-রঙা ছইয়ের দিকে তাকিয়ে মনে হল যেন এই প্রথম ও মন দিয়ে দেখছে ওগুলোকে। খোলের ওপরে পাতা প্লাইউডের তক্তায় আঙুল বোলাল। কাঠের ওপর ছাপা ঝাপসা হয়ে আসা লেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করল; মার্কিনি ডাকবিভাগের থলি কেটে তৈরি বুটিওয়ালা প্লাস্টিক শিটটার দিকে তাকিয়ে দেখল—মনে পড়ল প্লাস্টিকটা দেখে প্রথম যখন চিনতে পেরেছিল, কী ভীষণ অবাক লেগেছিল তখন। জলে ডুবতে ডুবতে বেঁচে যাওয়ার পর যখন এই ডিঙির তক্তার ওপর শুয়েছিল পিয়া, এই সাধারণ ছোটখাটো জিনিসগুলিকে কেমন অদ্ভুত মায়াময় বলে মনে হয়েছিল, কোনও জাদুকরের ভোজবাজির মতো। বাতিলের দল থেকে তুলে আনা এইসব টুকিটাকিগুলোকে সেদিনকার চোখে দেখতে দেখতে পিয়ার মনে হল, এই নৌকোটা নয়, আসলে ওর নিজের চোখই সেদিন জাদুকরি মায়ার সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছিল এদের গায়ে। এখন কিন্তু জিনিসগুলোকে ওরকম মায়াময় লাগছে না আর, মনে হচ্ছে খুবই সাধারণ সব টুকিটাকি, বহু পরিচিত ঘরোয়া আসবাবের মতো, স্বস্তিকর।

মন থেকে দিবাস্বপ্নের ভাবটা দূর করার জন্য মাথাটাকে একবার ঝাঁকিয়ে নিল পিয়া। উবু হয়ে উঠে বসে ইশারায় একজোড়া বৈঠা চেয়ে নিল ফকিরের কাছ থেকে। ডিঙিটাকে ফকির কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ঠিক বুঝতে পারছিল না, তবে আন্দাজ করল ডলফিনরা যেদিক দিয়ে খাবারের খোঁজে যায় সেইরকমই একটা পথের দিকে ওরা চলেছে এখন। জোয়ার পুরো হয়েছে প্রায় ঘণ্টাখানেক হল, ডলফিনগুলো গর্জনতলার দহে এখনও আসেনি। ঠিক কোন জায়গায় ওদের দেখা যাবে ফকির মনে হল সেটা জানে।

নৌকো এখন স্রোতের অনুকূলে চলেছে। দু'জোড়া বৈঠায় জল কেটে তরতর করে এগোচ্ছে সামনে। খানিকক্ষণ পরেই ফকির ইশারায় পিয়াকে জানাল যে গন্তব্যে পৌঁছে গেছে ওরা। দাঁড় তুলে নিয়ে মিনিট কয়েক ডিঙিটাকে বয়ে যেতে দিল ফকির, তারপর একপাশে ঝুঁকে নোঙরটা ছুঁড়ে ফেলল নদীতে। দড়িটাকে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিল জলের মধ্যে।

কুয়াশা পাতলা হয়ে এসেছে। পিয়া লক্ষ করল ডিঙিটাকে ফকির এমন একটা জায়গায় এনে পঁড় করিয়েছে যেখান থেকে একটা বড় খাড়ির পুরো মুখটা চোখে পড়ে। বেশ কয়েকবার সেদিকে ইশারা করল ফকির, যেন বোঝাতে চাইল শিগগিরই ওই পথ দিয়ে ঢুকে আসবে ডলফিনগুলো। দূরবিন চোখে লাগানোর আগে জিপিএস-এ আরেকবার জায়গাটার অবস্থান দেখে নিল পিয়া। দেখল গর্জনতলার কাছে দাঁড় করানো মেঘার থেকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে চলে এসেছে ওরা।

শুরুতে ফকির যেন খানিকটা গা-ছাড়া ভাবে তাকিয়েছিল খাড়িটার দিকে, প্রায় হেলাফেলার ভাব নিয়ে যেন ও নিশ্চিত জানে ওইদিক থেকেই আসবে ডলফিনগুলো। কিন্তু প্রায় দু'ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরও যখন একটা পাখনাও চোখে পড়ল না, একটু যেন দ্বিধায় পড়ে গেল ও। আস্তে আস্তে পালটাতে শুরু করল ওর হাবভাব, আত্মবিশ্বাস যেন চিড় খেয়ে গেল একটু, মুখেচোখে কেমন একটা ভ্যাবাচ্যাকা ভাব।

আরও ঘণ্টা দুয়েক ওই একই জায়গায় অপেক্ষা করল ওরা। দিন পরিষ্কার, বহুদূর পর্যন্ত চোখে পড়ছে, কিন্তু ডলফিনের কোনও চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। এর মধ্যে ভাটাও পড়ে গেছে, সূর্য উঠতে শুরু করেছে মাঝ আকাশের দিকে, চড়চড় করে বেড়ে উঠছে রোদ।

পিয়ার জামাটা ঘামে একেবারে চুপচুপে হয়ে গেছে। পিয়া খেয়াল করে দেখল ও এখানে আসার পর একদিনও এত সকাল সকাল এতটা গরম পড়েনি।

দুপুরের একটু পরে, জল তখন অনেকটা নেমে গেছে, ফকির নোঙর তুলে ফেলল। যেন বোঝাতে চাইছে এবার এ জায়গা থেকে যেতে হবে। প্রথমটায় পিয়ার মনে হল হাল ছেড়ে দিয়ে আবার গর্জনতলার দিকেই ফিরে যেতে চাইছে ও। কিন্তু পিয়া যখন বৈঠার জন্য হাত বাড়াল, মাথা নাড়ল ফকির। খাঁড়ির যে মুখটার দিকে ওরা সারা সকাল ধরে নজর রেখেছে, সেইদিকে ইঙ্গিত করে দেখাল। দূরবিন নিয়ে পিয়াকে সজাগ থাকতে বলল ইশারায়। ডিঙি ঘুরিয়ে নিয়ে এবার খাড়িটার ভেতর ঢুকে পড়ল ফকির। কয়েকশো মিটার যাওয়ার পর আবার নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে ঢুকল একটা সুতিখালের মধ্যে।

প্রায় ঘন্টাখানেক এভাবে এই খাল ওই খাল ধরে চলার পর একটা জায়গায় এসে ডিঙি থামাল ফকির। সামনে জলের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল একবার—ডলফিনের কোনও চিহ্নই নেই। অধৈর্য হয়ে টাকরায় একটা শব্দ তুলে আবার বৈঠা হাতে নিল ফকির, অন্য আরেকদিকে ঘুরিয়ে নিল নৌকোটাকে।

ডিঙি চলতে চলতে পিয়া আর একবার ওর জিপিএস মনিটরটা বের করে রিডিং নিল, দেখল গর্জনতলা থেকে ক্রমশ আরও দূরে সরে যাচ্ছে ওরা। সকাল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত পনেরো কিলোমিটারেরও বেশি চলে এসেছে, যদিও সোজা রাস্তায় আদৌ নয়: যে পথ বরাবর ওরা এসেছে, সেটাকে পুরনো মাফলার থেকে খুলে নেওয়া উলের সুতোর মতো দেখাচ্ছে মনিটরের পর্দায়।

বাতাস একেবারে স্থির, যেন ভারী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; নদীর জল কাঁচের মতো মসৃণ, হাওয়ার এতটুকু দাগ নেই তার ওপর। ঘামে একেবারে নেয়ে গেছে ফকির। সেই ভ্যাবাচ্যাকা-খাওয়া ভাবটার জায়গায় এখন একটা উদ্বেগের ছাপ ওর মুখে। সাত ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ঘোরাঘুরির পরও কিছুই চোখে পড়েনি এখনও। পিয়া ইশারা করে ফকিরকে বলল একটু থেমে খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে নিতে, কিন্তু কথাটাকে ও কোনও পাত্তাই দিল না। প্রাণপণে যেন নদী-খাঁড়ির গোলকধাঁধার আরও গভীরে ঢুকে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করে যেতে লাগল।

* * *

লুসিবাড়িতে ফেরার সময় প্রথমটায় বেশ খানিকক্ষণ যে পথ দিয়ে ওদের যেতে হল সেদিকটায় মানুষের যাতায়াত বিশেষ নেই। গর্জনতলা ছাড়ার পর কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত তাই ছোট বড় কোনও নৌকোই চোখে পড়েনি। কিন্তু তারপরে ভটভটিটা একটা সাগরমুখো নদীর কাছাকাছি এসে পড়তেই দৃশ্যটা একেবারে পালটে গেল। নদীর নাম জাহাজফোড়ন। তার ওপর থিকথিক করছে নানা মাপের নৌকো, ভটভটি আর লঞ্চ। নদীর প্রস্থটা মেঘার মুখের সঙ্গে সমকোণে থাকায় বেশ অনেকটা দূর থেকেও অগুন্তি নৌকো চোখে পড়ছিল জলের ওপর। দৃশ্যটার মধ্যে এমনিতে অস্বাভাবিক কিছু নেই, শুধু একটা ব্যাপার ছাড়া—সবগুলি নৌকোই চলেছে একই পথে—সাগর থেকে দূরে, মূল স্থলভূমির দিকে।

রাত্তিরটা পুরোটাই প্রায় জেগে কেটেছে, তাই গর্জনতলা ছেড়ে আসার খানিকক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিল কানাই। ঘুমটা ভেঙে গেল হরেনের গলার আওয়াজে। নীচের ডেক থেকে চেঁচিয়ে নাতিকে ডাকছে হরেন।

বাঙ্কের ওপর উঠে বসল কানাই। জামাকাপড় বিছানার চাদর সব একেবারে ভিজে গেছে। ঘামে। ভোরবেলা যখন শিরশিরে একটা বাতাস বইছিল তখন কেবিনের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল ও। দুপুর হতে এখনও কয়েক ঘণ্টা দেরি আছে, কিন্তু এর মধ্যেই কেবিনের দেয়াল-টেয়াল সব তেতে উঠেছে। বেরিয়ে এসে কানাই দেখল বোটের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে সামনের চওড়া নদীর দিকে চেয়ে আছে হরেন, আর ওপরে সারেং-এর ঘরে চাকা ধরে বসে আছে নগেন।

“কী ব্যাপার হরেনদা?” ডেকের সামনেটায় এগিয়ে গেল কানাই। “কী দেখছেন?”

“দেখুন ওই দিকে,” হাত দিয়ে সামনে ইশারা করে বলল হরেন।

চোখের ওপর হাত আড়াল করে সামনে তাকাল কানাই। জলের দেশের রাহান-সাহানে অনভ্যস্ত ওর চোখেও নৌকোগুলোর চলনটা যেন কেমন বেখাপ্পা মনে হল। কিন্তু খটকাটা কোথায় লাগছে সেটা ও ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। “ওদিকে তো অনেকগুলো নৌকো দেখতে পাচ্ছি শুধু।”

“সবগুলো একইদিকে যাচ্ছে সেটা দেখতে পাচ্ছেন না?” একটু রুক্ষ শোনাল হরেনের গলা। “যে যার গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছে সবাই।”

ঘড়ির দিকে একপলক তাকিয়ে কানাই দেখল সবেমাত্র দশটা বেজেছে। হঠাৎ ওর খেয়াল হল এত সকাল সকাল তো জেলেদের মাছ নিয়ে ঘরে ফেরার কথা নয়। “এত তাড়াতাড়ি কেন ফিরে আসছে ওরা?” জিজ্ঞেস করল কানাই। “এখনও কি ফেরার সময় হয়েছে?”

“না,” হরেন বলল। “সন্ধে নামার আগে জেলেরা এভাবে ফেরে না।”

“তা হলে?”

“তা হলে একটাই কারণ হতে পারে বছরের এই সময়টায়।”

“কী কারণ?”

ঠোঁট বাঁকাল হরেন। ওর বয়স্ক মুখের জটিল ভাজের আড়ালে যেন হারিয়ে গেল চোখদুটো। “দেখতে পাবেন শিগগিরই।” মুখ ঘুরিয়ে সারেং-এর ঘরের দিকে স্টিয়ারিং ধরতে চলে গেল হরেন।

নদীটা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে আরও মিনিট দশেক লাগল। খানিকটা যাওয়ার পর একটা বাঁক ঘুরে রায়মঙ্গলে এসে ইঞ্জিনটা প্রায় বন্ধ করে দিল হরেন। আস্তে আস্তে নিশ্চল হয়ে এল মেঘা। তারপর নগেনের হাতে স্টিয়ারিং দিয়ে হরেন চলে গেল বোটের পেছন দিকটায়। একটা মাছ-ধরা নৌকো কাছাকাছি আসার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

খানিক বাদেই একঝাঁক ডিঙি এসে জড়ো হল বোটটার পাশে। কানে এল চিৎকার করে মাঝিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে হরেন। তারপর দ্রুতপায়ে ও ফিরে গেল সারেং-এর ঘরে। মুখটা গম্ভীর, ভুরু দুটো কুঁচকে রয়েছে। বিড়বিড় করে নগেনকে কী যেন বলতেই একদৌড়ে নীচে নেমে গিয়ে ইঞ্জিন চালু করে দিল নগেন। হরেন স্টিয়ারিং ধরে বসল।

হরেনের মুখে ছায়া নেমে আসতে দেখে কানাইয়ের মনের মধ্যে কেমন একটা অজানা আশঙ্কার কাটা খচখচ করতে লাগল। জিজ্ঞেস করল, “ব্যাপারটা কী হরেনা? কিছু জানা গেল?”

“যা ভেবেছিলাম তাই। তা ছাড়া আর হবেটাই বা কী এই সময়ে?” একটু রূঢ় শোনাল হরেনের গলাটা।

ঝড় আসছে, জানাল হরেন। দিল্লির হাওয়া অফিস থেকে নাকি আগেরদিনই সতর্কবার্তা দিয়েছে। এমনকী সাইক্লোন পর্যন্ত হতে পারে। ভোর থেকে কোস্টগার্ডের বোট সাগরে ঘুরে ঘুরে সমস্ত মাছ-ধরা নৌকোগুলোকে ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছে। সেইজন্যেই সব ফিরে আসছে একসঙ্গে।

“কিন্তু তাহলে–” কানাইয়ের মাথায় প্রথমেই যে চিন্তাটা এল সেটা হল ফকির আর পিয়ার এখন কী হবে? ওরা তো গর্জনতলায় রয়ে গেছে।

প্রশ্নটার মাঝখানেই ওকে থামিয়ে দিল হরেন। “চিন্তার কিছু নেই। ঝড় কাল দুপুরের আগে আসছে না। মাঝে অনেকটা সময় আছে। আমরা গর্জনতলায় গিয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করব। এমনকী ওরা যদি সন্ধে পর্যন্তও না ফেরে তাতেও ভয়ের কিছু নেই। কাল খুব ভোরবেলা যদি ওখান থেকে রওয়ানা হয়ে যেতে পারি তা হলেও ঝড় আসার আগে আমরা লুসিবাড়িতে পৌঁছে যাব।”

ধকধক আওয়াজ উঠল ইঞ্জিনে। দু’ কাঁধের পেশি ফুলিয়ে স্টিয়ারিং ঘোরাল হরেন। চুলের কাটার মতো একটা বাঁক নিল মেঘা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা ফের গর্জনতলার

দিকে এগোতে লাগল। সকালে যে পথ ধরে এসেছিল সেই পথ দিয়েই ফিরতে লাগল আবার।

গর্জনতলায় গিয়ে যখন ওরা পৌঁছল তখন দুপুর প্রায় একটা বাজে। সেখানে কাউকেই দেখা গেল না। তাতে অবশ্য হরেন বা কানাই কেউই বিশেষ চিন্তিত হল না, কারণ সকালে ফকিরের ডিঙি ছাড়ার পর এতক্ষণে মাত্র সাতঘণ্টা মতো পেরিয়েছে। ওরা জানে যে লুসিবাড়ি ঘুরে মেঘার ফেরার সময়টা হিসেব করে নিশ্চয়ই আরও বেশ খানিকটা পরেই ফেরার প্ল্যান করেছে পিয়া আর ফকির। ফলে ওদের আসতে আসতে প্রায় সন্ধে হয়ে যাবে।

তবে একটা জিনিস কানাইয়ের বেশ অদ্ভুত লাগল। ভটভটিটা যেখানে নোঙর করেছে হরেন, সেখান থেকে গর্জনতলার দহটা পরিষ্কার দেখা যায়, তবুও, ভাটা পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও সেখানে একটা ডলফিনেরও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। কানাইয়ের মনে পড়ল ভাটার সময় ডলফিনের দলটা এখানে এসে জড়ো হয়, আর ভাটা যে পড়ে গেছে অনভ্যস্ত চোখেও সেটা দিব্যি বুঝতে পারছিল ও। নিঃসন্দিগ্ধ হওয়ার জন্য তবুও একবার হরেনকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল কানাই। হরেন বলল, "হ্যাঁ ভাটাই চলছে এখন। জোয়ার আসতে আরও দু-তিন ঘণ্টা অন্তত লাগবে।"

"কিন্তু হরেনদা, একটা জিনিস দেখুন," গর্জনতলার দিকে হাত দিয়ে ইশারা করল কানাই। "এতক্ষণ হল ভাটা পড়ে গেছে, কিন্তু জল তো তবুও খালি। কেন বলুন তো?"

প্রশ্নটা শুনতে শুনতে ভুরু কোঁচকাল হরেন। অবশেষে জবাব দিল, "কী করে বলব বলুন? দুনিয়া তো আর ঘড়ির কাটা ধরে চলে না। সবকিছুই একেবারে ঠিক ঠিক সময় মেনে হবে এরকম তাই সবসময় হয় না।"

এই যুক্তির জবাবে আর বলার কিছু থাকে না। তবুও কানাইয়ের পেটের ভেতরে কী যেন গুড়গুঁড়িয়ে উঠল, মনে হল কোথাও যেন কিছু একটা গড়বড় হয়েছে। হরেনকে বলল, "আচ্ছা হরেনদা, এখানে বসে না থেকে আমরা একটু এগিয়ে গিয়ে খুঁজে দেখি না, ফকিরের নৌকোটাকে দেখা যায় কিনা?"

হরেন যেন মজা পেল কথাটা শুনে। গলা দিয়ে ঘোঁত করে একটা আওয়াজ করে বলল, "এখানে একটা ডিঙি খুঁজে বের করা আর খড়ের গাদা থেকে একটা ছুঁচ খুঁজে বের করা একই ব্যাপার, বুঝলেন কানাইবাবু?"

"কিন্তু ক্ষতি তো কিছু নেই," কানাই নাছোড়বান্দা। "যদি আমরা সন্ধের মধ্যেই এখানে ফিরে আসি তবে আর অসুবিধা কী আছে? সব যদি ঠিকঠাক থাকে তা হলে তো এমনিতেই ওরা সন্ধেবেলা ফিরে চলে আসবেই এখানে।"

"কোনও লাভ নেই," গম্ভীর গলায় বলল হরেন। "শত শত খাল থাকে এইসব দ্বীপের মধ্যে। বেশিরভাগই এত অগভীর যে এ ভটভটি নিয়ে ঢোকাই যাবে না সেগুলোর মধ্যে।"

কানাই বুঝতে পারছিল আস্তে আস্তে নরম হয়ে আসছে হরেন। হালকা গলায় বলল, "আমরা তো এমনিতে কিছুই করছি না—একটু ঘুরে দেখেই এলাম না হয়।"

"ঠিক আছে তা হলে।" রেলিংয়ের পাশ দিয়ে ঝুঁকে পড়ে চেঁচিয়ে নগেনকে ইঞ্জিন স্টার্ট করতে বলল হরেন। তারপর নোঙর তুলল।

সারেং-এর ঘরটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল কানাই। গর্জনতলা ছাড়িয়ে ভটভটি আস্তে আস্তে এগোতে শুরু করল ভাটির দিকে। আকাশে কোথাও একটুকরো মেঘের চিহ্ন নেই। দুপুরের ঝিম-ধরানো রোদে কেমন চুপচাপ, শান্ত দেখাচ্ছে চারদিক। আবহাওয়া যে শিগগিরই খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেটা কল্পনা করাটাও এখন কঠিন।

হতাহত

স্রোত তখন ঘুরতে শুরু করেছে, এমন সময় অবশেষে জলের ওপর উঠে থাকা একটা তেকোনা পাখনা চোখে পড়ল পিয়ার। ডিঙি থেকে প্রায় কিলোমিটারখানেক সামনে, পাড়ের কাছ ঘেঁষে। যন্ত্রে ডলফিনটার অবস্থান মেপে দেখা গেল গর্জনতলা থেকে দক্ষিণ-পুবে প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে রয়েছে ওটা। দূরবিনটা ফের চোখে লাগিয়ে পিয়া আবিষ্কার করল ডলফিনটা একা নয়। আরও বেশ কয়েকটাকে আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে। নির্দিষ্ট একটা জায়গার মধ্যেই পাক খেয়ে যাচ্ছে প্রাণীগুলো—গর্জনতলার দহটাতে যেমন করে, সেরকম।

এখনও মোটামুটি মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে জলের স্তর। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে পিয়া দেখল বিকেল তিনটে। বুকের ভেতর একটা ধুকপুকুনি টের পাচ্ছিল ও। প্রথম যেদিন ফকির ওকে গর্জনতলায় ডলফিনের দলটাকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল সেদিনও ঠিক এরকমই অনুভূতি হয়েছিল পিয়ার। এই জায়গাটাতেও যদি ভাটার সময় শুশুকগুলো এসে জড়ো হয়, তার মানে এখানেও ওরকম আরেকটা দহ আছে। তা হলে এটা নিশ্চয়ই নতুন আরেকটা দল। এর থেকে ভাল খবর আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু ফকিরের দিক থেকে তো উৎসাহের কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কেমন একটা খটকা লাগল পিয়ার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। কীরকম যেন একটা সতর্ক দৃষ্টি ওর চোখে, যেন কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। পিয়ার একটু অস্বস্তি লাগল।

ডলফিনগুলো যখন নৌকো থেকে আর কয়েকশো মিটার মাত্র দূরে, এমন সময় কাদার ওপরে স্থির হয়ে পড়ে থাকা ইস্পাত-ধূসর একটা আকৃতি চোখে পড়ল। মুহূর্তে চোখ বন্ধ করে ফেলল পিয়া। জিনিসটা কী সেটা ও জানে। মনে মনে তবুও আশা করছিল যে হয়তো ভুল হলেও হতে পারে। চোখ যখন খুলল, ওটা তখনও পড়ে আছে একই জায়গায়। এবং ও যে ভয় করেছিল বস্তুটা তাই একটা ইরাবড়ি ডলফিন। মরা।

কাছ থেকে ভাল করে দেখতে গিয়ে আরও একটা ধাক্কা লাগল পিয়ার। প্রাণীটার শরীর অন্যদের তুলনায় মাপে একটু ছোট। দেখা মাত্র পিয়ার মনে হল এটা নিশ্চয়ই ওর চেনা সেই বাচ্চা ডলফিনটা, গত কয়েকদিন ধরে যেটাকে জুড়ি বেঁধে ঘুরতে দেখেছিল মায়ের সঙ্গে। ছোট্ট শরীরটা মনে হল কয়েক ঘণ্টা আগেই এসে ঠেকেছে ডাঙায়, জল নেমে যাওয়ায় পড়ে রয়ে গেছে কাদার ওপর। প্রাণহীন দেহটাকে এখন প্রায় ছুঁইছুঁই করছে জোয়ারের জল, মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে সেটা স্রোতের ধাক্কায়।

পিয়ার ষষ্ঠেন্দ্রিয় যেন ওকে বলে দিল ভাটার সময় ডলফিনদের যে দলটা গর্জনতলায় এসে জড়ো হয় এটা সেই একই দল। মরা শুশুকটা দেখে ওদের স্বাভাবিক চলনের পরিবর্তনের কারণটাও খানিকটা আন্দাজ করল ও চোখের সামনে মৃত সঙ্গীকে এভাবে ফেলে রেখে গর্জনতলার দহে ওরা ফিরে যেতে চাইছে না। পিয়ার মনে হল জোয়ারের জলে ডলফিনটা আবার ভেসে উঠবে, দলটা যেন সেই অপেক্ষাতেই আছে।

ফকিরও বোঝা গেল দেখতে পেয়েছে মরা ডলফিনটাকে। পিয়া লক্ষ করল নৌকোর মুখ আস্তে আস্তে ঘুরে যাচ্ছে পাড়ের দিকে। ডাঙার কাছাকাছি আসতেই ভক করে একটা দুর্গন্ধের ঝলক পিয়ার গলার ভেতর এসে লাগল। দুপুরের চড়চড়ে রোদ এসে পড়েছে মরা প্রাণীটার গায়ে; ফলে এত জোরালো গন্ধ বেরোচ্ছে যে পাড়ে নামার আগে দু' ফেরতা কাপড় মুখের চারিদিকে জড়িয়ে নিতে হল পিয়াকে।

কাছে গিয়ে পিয়া দেখল ডলফিনটার নাকের ঠিক পেছন থেকে বিশাল একটা ক্ষত। একটুকরো মাংস আর চর্বি কে যেন খুবলে বের করে নিয়েছে। ক্ষতটার আকার দেখে মনে হল প্রাণীটা কোনও দ্রুতগতির মোটরবোটের প্রপেলারে ধাক্কা খেয়েছিল। ব্যাপারটা লক্ষ করে একটু অবাকই হল পিয়া: এ অঞ্চলে সেরকম কোনও মোটরবোট চলাচল করতে তো ও এ যাবৎ দেখেনি। ফকিরই অবশেষে সমস্যাটার সমাধান করল। হাত দিয়ে কাদার ওপর

একটা টুপির ছবি আঁকল ও। পিয়া বুঝতে পারল উর্দিপরা সরকারি লোকেরা যে ধরনের বোট ব্যবহার করে সেইরকম কোনও বোটের কথা বোঝাতে চাইছে ফকির—কোস্টগার্ডের বা আর্মির বোট। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টেরও হতে পারে। সকালের দিকে হয়তো এরকম কোনও মোটরবোট এদিক দিয়ে গেছে, আর অনভিজ্ঞ ছানাটা নিশ্চয়ই ঠিক সময় মতো পথ থেকে সরে যেতে পারেনি।

পিঠব্যাগ থেকে একটা ফিতে বের করে নরিস প্রোটোকল অনুযায়ী ভাল করে ডলফিনটার মাপ নিল পিয়া। তারপর ছোট একটা ছুরি নিয়ে চামড়া, চর্বি আর কয়েকটা প্রত্যঙ্গের কিছু স্যাম্পল কেটে নিল। রাংতায় মুড়ে নিয়ে জিপলক ব্যাগের মধ্যে যত্ন করে রাখল সেগুলোকে। এর মধ্যেই দলে দলে কাঁকড়া আর নানা পোকামাকড় ঘেঁকে ধরেছে ছোট্ট শরীরটাকে, ক্ষতস্থানটা থেকে কুরে কুরে খেতে শুরু করেছে মাংস আর চর্বি।

পিয়ার মনে পড়ল প্রথমবার মায়ের পাশে পাশে সাঁতার কাটা ছানাটাকে দেখে ও কেমন খুশি হয়ে উঠেছিল। সেই প্রাণীটার মরা শরীরের পাশে বেশিক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না ও। ফকিরকে ইশারা করল ওটার লেজের দিকটা তুলে ধরতে, নিজে মুঠো করে ধরল পাখনাদুটো। তারপর দুজনে মিলে নিষ্প্রাণ শরীরটাকে শূন্যে কয়েকবার দুলিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিল নদীর মধ্যে। পিয়া ভেবেছিল জলের ওপরে ওটা ভেসে উঠবে আবার, কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে দেহটা দ্রুত তলিয়ে গেল নদীর গভীরে।

বেশিক্ষণ আর জায়গাটাতে থাকতে চাইছিল না পিয়া। ডিঙির কাছে গিয়ে যন্ত্রপাতিগুলো ছুঁড়ে দিল ভেতরে, তারপর ফকিরের সঙ্গে হাত লাগিয়ে নৌকোটাকে ঠেলে দিল জলের ভেতর।

স্রোতের টানে আস্তে আস্তে ভেসে যাচ্ছিল ডিঙি। হঠাৎ ফকির তার ওপর দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর উজান আর ভাটির দিকে, পুবে আর পশ্চিমে হাত দিয়ে ইশারা করে দেখাতে লাগল। আস্তে আস্তে সেই ইশারার অর্থ স্পষ্ট হল পিয়ার কাছে। মনে হল ফকির বলতে চাইছে যে এখানে ওরা যা দেখেছে এই অঞ্চলে সেরকম দৃশ্য প্রায়শই দেখা যায়। ফকির নিজেই তিনটে ডলফিনের মৃতদেহ দেখেছে বিভিন্ন জায়গায় জায়গাগুলোর একটা এখান থেকে খুবই কাছে, ভাটির দিকে। সেখানেও একটা মরা ডলফিন এরকম স্রোতের টানে পাড়ে গিয়ে ঠেকেছিল। সেটা মনে ছিল বলেই ফকির ওকে এইদিকে নিয়ে এসেছে।

ওরা যখন মাঝনদীতে গিয়ে পৌঁছল ততক্ষণে শুশুকগুলো আস্তে আস্তে সরে যেতে শুরু করেছে জায়গাটা থেকে। শুধু একটা ছাড়া। দহটা ছেড়ে সেটা যেন নড়তেই চাইছে না। পিয়া আন্দাজ করল ডুবে যাওয়া মৃতদেহটা স্রোতের টানে গড়িয়ে যাচ্ছে নদীর তলায়, আর সেটারই চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে ডলফিনটা। এটাই কি ওই ছানাটার মা? কোনও উপায় নেই সে প্রশ্নের জবাব পাওয়ার।

হঠাৎই কীসের যেন সংকেত পেয়ে এক সঙ্গে সমস্ত ডলফিনগুলো উধাও হয়ে গেল। ওদের পেছন পেছন যাওয়ার ইচ্ছে ছিল পিয়ার, কিন্তু সেটা এখন আর সম্ভব নয়। বিকেল চারটে বেজে গেছে। আর হুড়মুড় করে নদীতে ঢুকে আসছে জোয়ারের জল। সকালে যে জলের স্রোত ওদের সহায় হয়েছিল, এখন তা প্রতিকূলে। দুজনে মিলে দাঁড় বাইলেও খুব একটা বেশি এগোনো যাবে না।

প্রায় তিনঘণ্টা ধরে নিষ্ফল ঘোরাঘুরির পর অবশেষে হরেন বলল, "যথেষ্ট খোঁজা হয়েছে, এবার ফিরতে হবে আমাদের।" ওর রুক্ষ গলায় যেন একটা জয়ের সুর।

খাঁড়ি আর সুতিখালগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ ব্যথা হয়ে গেছে কানাইয়ের। সূর্য পশ্চিমের দিকে ঢলে পড়েছে, বিকেলের রোদটা সোজা চোখে এসে লাগছে। ফলে ভাল করে দেখাটা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মনের ভেতর থেকে অস্বস্তিটা কিছুতেই যাচ্ছে না। ওদের পক্ষে আর কিছুই করার নেই সেটা ঠিক যেন বিশ্বাসই করে উঠতে পারছিল না কানাই। "এক্ষুনি ফিরে যেতে হবে?" ও জিজ্ঞেস করল হরেনকে।

মাথা নাড়ল হরেন। "অনেকটা তেল খরচ করে ফেলেছি আমরা। আরও বাড়তি ঘোরাঘুরি

করলে কালকে লুসিবাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতেই পারব না। তা ছাড়া ওরা মনে হয় এতক্ষণে পৌঁছে গেছে গর্জনতলায়।"

"আর যদি না পৌঁছে থাকে?" তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করল কানাই। "ওদের ফেলে রেখে চলে যাব নাকি আমরা?"

চোখদুটো সরু করে ভুরু কুঁচকে কানাইয়ের দিকে তাকাল হরেন। বলল, "দেখুন, ফকির আমার ছেলের মতো। আর কিছু করা যদি আমার পক্ষে সম্ভব হত, সেটা আমি ঠিকই করতাম।"

হরেনের বকুনিটা যুক্তিযুক্ত, মেনে নিল কানাই। মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো ঠিকই।" ফকির আর পিয়াকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে হরেনের আগ্রহকে সন্দেহ করেছিল বলে মনে মনে একটু লজ্জাও লাগল ওর। বোটের মুখ ঘোরার পরে খানিকটা আপোশের সুরে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা হরেনদা, আপনার তো এসব ব্যাপারে অনেক অভিজ্ঞতা। সাইক্লোন যদি আসে তা হলে এসব জায়গায় কী অবস্থা হতে পারে একটু বলুন না আমাকে।"

গম্ভীরভাবে চারদিকে একবার চেয়ে দেখল হরেন। "একেবারে পালটে যাবে এ জায়গার চেহারা। কোনও মিলই পাবেন না। রাত আর দিনের যেমন তফাত, সেইরকম তফাত হয়ে যাবে।"

"আপনি তো একবার সাইক্লোনের মুখে পড়েছিলেন, তাই না।"

"হ্যাঁ, ধীর, সংক্ষিপ্ত জবাব হরেনের। "যে বছর আপনি এসেছিলেন, সেই বছরে, ১৯৭০।"

বর্ষা কেটে যাওয়ার বেশ কিছুদিন পরে ঘটেছিল ঘটনাটা। বলাইকাকার নৌকোয় সাগরে গিয়েছিল হরেন। সবসুদ্ধ মোটে তিনজন ছিল নৌকোটাতে: হরেন, বলাইকাকা, আর একজন কে যেন—তাকে আগে দেখেনি হরেন। সাগরের ভেতরে খুব বেশিদূরে ওরা যায়নি, রায়মঙ্গল নদীর মুখটা থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার এগিয়েছিল। সেখান থেকে ডাঙা পরিষ্কার চোখে পড়ছিল। সে সময়ে তো আর এরকম আগাম সতর্কবার্তা-টার্তা ছিল না, তাই ঝড় এসে একেবারে ঘাড়ের ওপর পড়ার আগে কিছুই আন্দাজ করতে পারেনি ওরা। চারদিকে ঝকঝকে রোদ্দুর, একটু জোরালো বাতাস দিচ্ছিল শুধু। আধঘণ্টার মধ্যে হঠাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে হুড়মুড় করে এসে পড়ল ঝড়টা। দেখতে-না-দেখতে চারপাশ একেবারে অন্ধকার হয়ে এল। দিশা ঠিক করাই দায়। সঙ্গে কম্পাস-টম্পাস কিছু নেই; কোন পথে যেতে হবে বোঝার জন্য চোখই একমাত্র ভরসা। এমনিতে ডাঙার থেকে খুব বেশি দূরে সাধারণত ওরা যেত না। তবে যন্ত্রপাতি কিছু সঙ্গে থাকলেও লাভ বিশেষ কিছু হত না। সে ঝড়ে ইচ্ছেমতো দিক ঠিক করে নৌকো চালানোর সুযোগই ছিল না কোনও। বাতাসের বেগ এত প্রচণ্ড যে কোনও বাধাই তার সামনে বাধা নয়। ওরা হাওয়ার মুখে কুটোর মতো ভেসে চলল, উত্তর-পুবে। শক্ত করে ডিঙির কাঠ আঁকড়ে ঝুলে থাকা ছাড়া ঘণ্টা কয়েক কিছুই করার কোনও ক্ষমতা ছিল না ওদের। তারপর হঠাৎই দেখা গেল নৌকোটা তিরবেগে এগিয়ে চলেছে জলে ভেসে যাওয়া একটা গ্রামের দিকে। কয়েকটা গাছের মাথা আর কিছু ঘরবাড়ির চাল চোখে পড়ল—বেশিরভাগই ছোট ছোট কুঁড়েঘর। ঝড়ের এমনই দাপট যে জলের ধারের গ্রামগুলো সব একেবারে ডুবে গিয়েছিল। জল এতটা উঠেছিল যে একটা গাছের গায়ে সটান গিয়ে ধাক্কা খাওয়ার আগে ওরা বুঝতেই পারেনি যে ডিঙিটা ডাঙাজমির ওপর গিয়ে পৌঁছেছে অবশেষে। ধাক্কাটা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল ডিঙি, কিন্তু হরেন আর ওর কাকা গাছটাকে আঁকড়ে ধরে প্রাণে বেঁচে গেল কোনওরকমে। দলের তিন নম্বর লোকটাও একটা ডাল হাতে ধরতে পেরেছিল, কিন্তু ওর ওজনে মট করে ভেঙে গেল সেটা। আর কখনও দেখা যায়নি লোকটাকে।

হরেনের তখন বছর কুড়ি মাত্র বয়েস, শরীরে মোষের মতো জোর। ফুঁসতে থাকা জলের ভেতর থেকে কাকাকে টেনে তুলে নিয়ে গাছের উঁচু একটা ডালে গিয়ে উঠল। দুজনে মিলে তারপর গামছা আর লুঙ্গি খুলে নিয়ে নিজেদের কষে বেঁধে নিল গাছটার সঙ্গে। শোঁ শোঁ করে বয়ে যাচ্ছে ঝড়, আর হরেন ওর কাকার দু হাত শক্ত করে ধরে বসে আছে গাছের ওপর।

মাঝে মাঝে এত জোরে হাওয়া দিচ্ছিল যে অতবড় গাছটা একটা বঁটার মতো দুলছিল এদিক ওদিক। কোনওরকমে সেটাকে আঁকড়ে ধরে বসে রইল হরেন আর বলাই।

ঝড়ের দাপট একটু কমলে দেখা গেল জলের তোড়ে এটা-ওটা নানা জিনিস এসে গাছের ডালপালার মধ্যে আটকে রয়েছে। আশেপাশের ঘরবাড়ি থেকে ভেসে আসা কিছু বাসন-কোসনও রয়েছে তার মধ্যে। সেখান থেকে একটা আস্ত মাটির হাঁড়ি খুঁজে বের করে নিয়ে তাতে খানিকটা বৃষ্টির জল ধরে রাখল হরেন। ভাগ্যিস বুদ্ধিটা মাথায় এসেছিল, তা না হলে পরের দিন তেষ্টার চোটেই গাছ থেকে নেমে পড়তে হত ওদের।

রাত কেটে অবশেষে সকাল হল। আকাশে আর মেঘের এতটুকু চিহ্ন নেই, চারিদিকে ঝকঝক করছে রোদ্দুর। পায়ের নীচে কিন্তু তোড়ে বয়ে চলেছে জলের স্রোত: ওদের গাছটার অর্ধেকের বেশি তখনও ডুবে আছে বানের জলে। আশেপাশে তাকিয়ে হরেন আর বলাই দেখল ওরা একা নয়, আরও বহু লোক ওদের মতো এভাবে গাছে উঠে প্রাণ বাঁচিয়েছে নিজেদের। ছেলেবুড়ো সুদ্ধ একেকটা গোটা পরিবার উঠে বসে আছে গাছের ডালে। এ গাছ থেকে ও গাছে চেঁচিয়ে কুশল জিজ্ঞাসার পর ওরা জানতে পারল ঝড়টা যখন উঠেছিল তখন ওরা যেখানে ছিল তার থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার মতো পুবে চলে এসেছে। বর্ডার-টর্ডার পেরিয়ে পৌঁছে গেছে গলাচিপার কাছে, একেবারে আগুনমুখা নদীর মুখে।

"সে জায়গাটা এখন বাংলাদেশে পড়ছে," বলল হরেন। "বোধহয় খুলনা জেলা।"

দু'দুটো দিন সেই গাছের ওপর কাটিয়ে দিল ওরা। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, হাঁড়িতে ধরে রাখা সেই বৃষ্টির জলটুকু শুধু সম্বল। জল নামতে অবশেষে গাছ থেকে নেমে কাছাকাছি কোনও শহরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করল হরেন আর বলাই। তবে বেশিদূর যেতে পারল না, খানিকটা এগোতেই মনে হল ওরা যেন একটা যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে এসে পড়েছে। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে আছে মানুষের লাশ; মরা মাছ আর গোরু-ছাগলে একেবারে ঢেকে গেছে চারিদিক। পরে জানা গেল প্রায় লাখ তিনেক লোকের প্রাণ গিয়েছিল সেই ঝড়ে।

"এ তো একেবারে হিরোশিমার মতো," প্রায় ফিসফিস করে বলল কানাই।

ভাগ্যক্রমে একদল জেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হরেন আর বলাইয়ের। তাদের ডিঙিটা মোটামুটি আস্তই ছিল। সেই ডিঙিতে করে এই খাল সেই খাল হয়ে কোনওরকমে বর্ডার পেরিয়ে অবশেষে ইন্ডিয়াতে এসে পৌঁছল ওরা।

এই হল হরেনের সাইক্লোন দেখার অভিজ্ঞতা। একটা জীবনে সে অভিজ্ঞতা ভোলা যায় না। আর কখনও এরকম ঝড়ের মুখে পড়তে চায় না হরেন।

গল্পটা যখন শেষ হল ততক্ষণে প্রায় গর্জনতলার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা।

লালচে আলোর একটা গালিচা যেন পাতা রয়েছে জলে ভেজা দ্বীপটার সামনে। দহটাকে ঢেকে দিয়ে সে গালিচা চলে গেছে দুর মোহনার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। সূর্য অস্ত যাচ্ছে সেখানে এখন। তেরছা হয়ে আলো যেভাবে এসে পড়েছে তাতে একটা কোনও নৌকো নদীতে থাকলেও জলের ওপর লম্বা ছায়া পড়বে তার, ছোট্ট একটা ডিঙি হলেও পরিষ্কার তা চোখে পড়বে। কিন্তু আশেপাশে একটা নৌকোরও কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। পিয়া আর ফকির এখনও ফেরেনি।

উপহার

সন্ধে নামার সময় জিপিএস-এ ডিঙির অবস্থান মেপে পিয়া দেখল গর্জনতলা তখনও প্রায় বারো কিলোমিটার দূরে। বোঝাই যাচ্ছিল রাতের মধ্যে ওখানে গিয়ে আর পৌঁছনো যাবে না। কিন্তু পিয়ার মনে হল তাতে ভাবনার কিছু নেই। হরেন মনে হয় না খুব একটা দুশ্চিন্তা করবে। ও নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে ফিল্ডে কাজ করতে করতে অনেকটা দূরে চলে গেছে পিয়ারা, রাতের মধ্যে তাই ফেরা সম্ভব হচ্ছে না।

ফকিরও মনে হল একই কথা ভাবছে। কারণ, খানিক বাদেই দেখা গেল রাতের জন্যে নোঙর ফেলার মতো একটা জায়গা খুঁজছে ও। দিনের শেষ আলোটা মিলিয়ে যাওয়ার ঠিক আগে অবশেষে মোটামুটি উপযুক্ত একটা জায়গা পাওয়া গেল—সরু একটা সুতিখাল প্রায় সমকোণে এসে একটা বড় খালে পড়েছে, ঠিক তার বাঁকে। শেষবেলার ভরা জোয়ারে ছোট নালাটাকেও একটা প্রমাণ মাপের নদী বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু পিয়া জানে যে জল একবার নেমে গেলেই ছোট্ট শান্ত পুঁতিখাল তার নিজের চেহারায় ফিরে আসবে। চারদিকে ডাঙা যেটুকু দেখা যাচ্ছে সবই ঘন জঙ্গলে ঢাকা। সন্ধের আবছা আলোয় নিরেট একটা সবুজ দেয়ালের চেহারা নিয়েছে সে জঙ্গল।

নালাটা ঠিক যেখানে বড় খালে এসে পড়েছে জল সে জায়গাটায় একটু শান্ত। সেইখানটাতেই এসে নোঙর ফেলল ফকির। নোঙরটা নামানোর আগে হাত দিয়ে চারিদিকে একবার ইশারা করে জায়গার নামটা বলল পিয়াকে: গেরাফিতলা।

ডিঙিটা থেমে যাওয়ার পর পিয়া লক্ষ করল থালার মতো বড় একটা চাঁদ উঠেছে আকাশে। প্রায় নিটোল গোল, একটা ধার শুধু যেন আলতো করে কেউ চেঁছে নিয়েছে। হালকা তামাটে রঙের একটা আভা ছড়িয়ে আছে চাঁদের চারদিকে। পিয়ার মনে হল এই বাদাবনের স্থির, ভেজা ভেজা হাওয়ায় যেন আতসকাঁচের গুণ আছে। এত বড় আর এত স্পষ্ট চাঁদ এর আগে ও কখনও দেখেনি।

মুগ্ধ হয়ে দেখছিল পিয়া, এমন সময় ডিঙির ছইয়ের ভেতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে ফকির এসে পাশে বসল। গাঢ় বেগুনি রং ধরেছে আকাশে, প্রতি মুহূর্তে তা গাঢ়তর হচ্ছে। একটা আঙুল তুলে সেই লালচে-বেগনি আকাশের গায়ে ধনুকের মতো একটা দাগ কাটল ফকির। কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে কিছুই দেখা গেল না। মাথা নেড়ে পিয়া বোঝাল ওর চোখে বিশেষ কিছু পড়ছে না। তখন আর একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখতে ইশারা করল ফকির। চাঁদের ওপর দিয়ে গোল করে ধনুকের মতো দাগ টানল আঙুলে। রুপোলি আলোয় ৩২৮

চোখ খানিকটা সয়ে আসতে হঠাৎ রঙিন আলোর আবছায়া একটা পট্টি নজরে এল পিয়ার। এক মুহূর্তের জন্যে যেন শূন্যে ভেসে রইল আলোটা, তারপরেই মিলিয়ে গেল আবার। ফকিরও আলোটা দেখতে পেয়েছে কি না বোঝার জন্যে ওর দিকে একবার তাকাল পিয়া, সেটা দেখে মাথা ঝাঁকাল ফকির। তারপর আঙুল দিয়ে আবার একটা ধনুকের মতো আঁক কাটল শুন্যে, এবার অনেক বড় মাপে—আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত। হঠাৎ পিয়ার মনে হল ও বোধহয় রামধনু জাতীয় কিছু একটা জিনিসের কথা বোঝানোর চেষ্টা করছে। সেটাই কি ওকে দেখাল ফকির এক্ষুনি—চাঁদের আলোয় রামধনু? সোৎসাহে মাথা ঝকাল ফকির, পিয়াও ঘাড় নাড়ল—ব্যাপারটা তো নিজের চোখে দেখেছে ও, মুহূর্তের জন্যে হলেও দেখেছে। জীবনে এরকম কিছুর কথা কখনও শোনেনি পিয়া, কিন্তু কীই বা এসে গেল তাতে?

চাঁদ আর বনের ছায়ার থেকে চোখ সরিয়ে স্রোতের আঁকিবুকির দিকে তাকাল পিয়া। মনে হল জলের গভীর থেকে একটা হাত এসে যেন নদীর বুকে চিঠি লিখে যাচ্ছে ওর জন্যে—ঢেউ আর ঘূর্ণির আঁকাবাঁকা অক্ষরে। একটা টুকরো কথা হঠাৎ ভেসে এল মনে, কানাই বলেছিল, ময়নার বিষয়ে না দেখা জলের স্রোত আর চোখে-পড়া হাওয়ার কারিকুরি নিয়ে কী যেন একটা কথা। আচ্ছা, ফকির কি বোঝে যে ও এমন একজন মানুষ, যার প্রেরণা

থেকে এত কিছু যন্ত্রণা আর অসুবিধা সত্ত্বেও উঠে আসতে পারে এরকম অবিচল আনুগত্য? যে সম্পদ ফকিরের আছে তার এক ভগ্নাংশের সমান মূল্যেরও কি কিছু ওকে কোনওদিন দিতে পারবে পিয়া নিজে?

নিশ্চল বসে রইল ওরা পরস্পরের অস্তিত্বের তীব্রতায় অবশ হয়ে থাকা দুটো বন্য প্রাণীর মতো। যখন চোখাচোখি হল, পিয়ার মনে হল ও এতক্ষণ ধরে যা ভাবছিল এক নজর তাকিয়েই তা যেন বুঝতে পেরে গেছে ফকির। ওর একটা হাত নিয়ে ফকির নিজের দুহাতে ধরল একবার, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে। পিয়ার দিকে আর না তাকিয়ে ডিঙির পেছনে চলে গিয়ে উনুন ধরাতে বসল।

রান্নাবান্না শেষ হওয়ার পর একটা থালায় করে খানিকটা খাবার পিয়ার জন্যে নিয়ে এল ফকির ভাত আর আলুর তরকারি। কিছুতেই ফেরাতে পারল না পিয়া। মনে হল খাবারের থালাটা যেন ওকে উৎসর্গ করছে ফকির, বিদায়ী প্রতাঁকের মতো। একসঙ্গে দেখা ওই জ্যোৎস্নার রামধনু যেন দু'জনের মধ্যেকার একটা আড়াল ভেঙে দিয়েছে, একটা কিছু যেন শেষ হয়ে গেছে, পড়ে রয়েছে শুধু তার বেদনার ছায়াটুকু। সে বেদনার রূপ বোঝা যায় না, কেননা কোনও নাম নেই তার। খানিক পরে, উনুন আর বাসনপত্র গুছিয়ে তুলে রাখা হয়ে গেলে ফকিরের একটা কথা মুড়ি দিয়ে ডিঙির সামনে নিজের জায়গাটায় এসে বসল পিয়া। ফকির গিয়ে ঢুকল ছইয়ের নীচে।

কানাইয়ের দেওয়া চিঠিটার কথা মনে পড়ল পিয়ার। সেটা বের করে নিল পিঠব্যাগ থেকে। মনটা একটু অন্যদিকে ঘোরাতে পারলে ভাল হয়, অন্য কিছু একটা চিন্তা করা দরকার এখন। চাঁদের আলোয় খামের ওপরের লেখাটা চোখ কুঁচকে পড়ার চেষ্টা করছে দেখে ফকির এসে একটা দেশলাই আর মোমবাতি দিয়ে গেল। সলতেটা জ্বালিয়ে দু'-এক ফোঁটা গলন্ত মোম ডিঙির আগার কাঠটার ওপর ফেলল পিয়া। তারপর বাতিটা চেপে বসিয়ে দিল তার ওপর। নিঝুম হয়ে আছে রাত্রি, বাতাস একেবারে স্থির, একটুও নড়ছে না মোমবাতির শিখা। আড়ালের কোনও দরকার নেই।

খাম ছিঁড়ে লেখাটা বের করে পড়তে শুরু করল পিয়া।

"ডিয়ার পিয়া,

"একজন পুরুষ যখন কোনও নারীকে কিছু দিতে চায়—যার দাম টাকায় মাপা যায় না, যে উপহারের মূল্য বুঝবে কেবল সেই নারী, সে ছাড়া আর কেউ নয়—তার মানেটা কী হতে পারে বলুন তো?

"আমাদের চিরকালের চেনা সেই একঘেয়ে পুরনো প্রশ্ন এ নয়। সত্যি বলছি, এক্কেবারে বোকা বনে গিয়েছি আমি—এই রকম আবেগ জীবনে কখনও অনুভব করিনি এর আগে। আমার মতো একজন লোক, যে সারা জীবন একেবারে খাঁটি বর্তমানটুকুকে নিয়ে কারবার করে এসেছে আর, স্বীকার করা ভাল, যে নিজের দিকে ছাড়া অন্য কোনওদিকে বিশেষ চেয়ে দেখেনি তার পক্ষে এ একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা, পুরোপুরি অচেনা একটা ক্ষেত্র। যে আবেগ থেকে অজানা এই অনুভূতির উৎসার, তা একেবারে ভিত পর্যন্ত নাড়িয়ে দিয়েছে আমাকে। তাই বলে এর আগে কি প্রেমে পড়িনি কখনও? জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতার গভীরতা আর বিস্তার নিয়ে সব সময় গর্ব করে এসেছি আমি: বুক ফুলিয়ে বলেছি, ছয়-ছয়টা ভাষায় প্রেম করেছি আমি। সেসব আজকে মনে হচ্ছে, যেন কত যুগ আগেকার কথা: গর্জনতলায় গিয়ে চোখ খুলে গেছে আমার। বুঝতে পেরেছি কত কম আমি চিনি এই জগৎটাকে। নিজেকেও।

"সুতরাং বলাই বাহুল্য, নিজে কষ্ট স্বীকার করেও অন্য আরেকটা মানুষকে খুশি করতে চাওয়ার যে কী অর্থ সে ধারণা আগে আমার কখনও ছিল না।

"কাল আমি উপলব্ধি করলাম যে আপনাকে এমন কিছু দেওয়ার ক্ষমতা আমার রয়েছে, যা আমি ছাড়া আর কেউ দিতে পারবে না। মনে আছে, আপনি কালকে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ফকির কী গান গাইছে, আর আমি বলেছিলাম ওই জিনিস অনুবাদ করা আমার

কর্ম নয়: খুবই কঠিন কাজ ওটা? ভুল বলিনি কিন্তু। কারণ ও যেটা গাইছিল সে গানের প্রতিটা কথার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ইতিহাস, সে শুধু ফকিরের নিজের জীবনের ইতিহাস নয়, এই গোটা জায়গাটার ইতিহাস, এই ভাটির দেশের ইতিহাস। আপনাকে একদিন বলেছিলাম না, কিছু মানুষ থাকে যারা কবিতার দুনিয়াতে বাস করে? আমার মেসো ছিল সেইরকম একজন লোক। নিজে তো স্বপ্ন দেখতই, আর নিজের মতো মানুষদেরও ঠিক ঠিক চিনে নিতে পারত। যে নোটবইটা আমি পড়েছিলাম তাতে এক জায়গায় একটা ঘটনার কথা লিখেছে মেসো, যেখানে পাঁচ বছর বয়সের ফকির এই ভাটির দেশের একটা গাথা থেকে মুখস্থ বলে যাচ্ছে একটার পর একটা শ্লোক। বাদাবনের রক্ষয়িত্রী বনবিবির কাহিনি নিয়ে তৈরি সেই গাথা। সে কাহিনির ঠিক কোন অংশটা ফকির আবৃত্তি করছিল সেটাও লিখে গেছে মেসো যেখানে একটা মূল চরিত্র, দুখে বলে একটি গরিব ছেলেকে বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়ের মুখে ফেলে দিয়ে চলে গেছে ধনা নামের এক নৌকোর মালিক, সেই জায়গাটা।

'ফকিরের ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল মেসো। কারণ, ও তো এখন যেরকম, তখনও তেমনই লিখতে পড়তে কিছু জানত না। সঙ্গে সঙ্গে মেসো এটাও বুঝতে পেরেছিল যে, যে শব্দগুলো গড়গড় করে বলে যাচ্ছে ওই বাচ্চা ছেলেটা, ওর কাছে সেগুলো শুধু একটা উপকথার অংশ মাত্র নয়, ওই কাহিনিই ওর চোখে জীবন্ত করে তুলেছে এই ভাটির দেশটাকে। সেই গানটাই কালকে ফকিরের গলায় শুনেছিলেন আপনিঃ ওর মজ্জার মধ্যে মিশে আছে ওই গান, আর, সম্ভবত এখনও ওর সত্তাটাকে তৈরি করে যাচ্ছে তিল তিল করে। আর এই উপহারই আপনাকে দিয়ে যাব আমি আজকে এই কাহিনি, যা আসলে একটা গান, এই কথাগুলো, যেগুলো ফকিরের সত্তার একটা অংশ। এই গল্প আপনাকে শোনাতে গিয়ে যদি ভুল কোথাও করি, তার জন্যে বিন্দুমাত্র আফশোস নেই আমার, কারণ আমার সেই ভুলগুলোই আপনাকে ভুলতে দেবে না আমার কথা, উঁচুদরের অনুবাদকদের মতো আড়ালে সরে যেতে দেবে না আমাকে। আর তা যদি হয়, তা হলে অন্তত এই একবারের মতো নিজেকে ভুলতে না-দেওয়া ভুল করতে পেরে ভাল লাগবে আমার।

"আবদুর রহিম প্রণীত ভাটির দেশের মহাকাব্য: বোন বিবির কেরামতি অর্থাৎ বোন বিবি জহুরানামা।

বোন-বিবি দুখেকে উদ্ধার করিবার বয়ান

দাড়ি মাঝিগণে ধোনা কহে ফজরেতে ॥ কেঁদোখালি যাব ডিঙা ছাড় সেতাবিতে * হুকুম পাইয়া দাড়ি মাঝি যত ছিল ॥ কেঁদোখালি তরফেতে রওয়ানা হইল * সাত ডিঙা বাহিয়া চলিল লোক জনে ॥ দেখিয়া দক্ষিণা দেও বলে মনে মনে * ধোনা মৌলে আসিতেছে সহদ লইতে ॥ বনে আমি যাই হাট মধু বসাইতে * কেঁদোখালি বিচে দেও আসিয়া পৌঁছিল ॥ যত মৌমাছি তরে হুকুম করিল * লক্ষ লক্ষ মৌমাছি হুকুমে দেওয়ের ॥ বসাইল হাট মধু ভিতরে বনের * থরেথরে খোনদাকে কোটরে ডালে পাতে ॥ বেশুমার মধু চাক লাগিল গড়িতে * খোসালিত হয়ে ধোনা তরণী লইয়া ॥ কয় রোজে কেঁদোখালি পৌঁছিল আসিয়া * মাঝিদিগে বলে কিস্তি বান্ধহ এইখানে ॥ চল মধু দেখিবারে যাই সবে বনে * ইহা বলে নৌকা বেন্ধে বাদা বনে যায় ॥ দেখিল মধুর চাক যেথায় সেথায় * ধোনা মৌলে দেখে ফিরে আইল খুসি হইয়া ॥ নায়ে এসে খেয়ে পিয়ে রহিল শুইয়া * দু প্রহর রাতে ধোনা স্বপন দেখিল ॥ আসিয়া দক্ষিণা দেও কহিতে লাগিল * চাক ভাঙ্গিবারে যবে যাইবে বনেতে । মেরা নাম লিবে ভাঙ্গিবার প্রথমেতে * তাহা বাদে দিবে হাত মধুর ভাণ্ডারে ॥ মৌমাছি উড়িয়া ভাগিয়া যাইবে দূরে * আর এক বাত আছে কহি তুঝে এবে ॥ একজনে সাথে লিয়া বনেতে যাইবে * নাহি দিব মোম মধু তোমাকে ভাঙ্গিতে ॥ তামাসা দেখিবে ঘুরেফিরে জঙ্গলেতে * আমার লস্কর দিয়া মধু ভাঙ্গাইব ॥ বেসেরবে তোমার ডিঙাতে পৌঁছাইব * কিন্তু সেই কথা মেরা ইয়াদ রাখিবে ॥ যাইবার সময় দুখেকে দিয়া যাবে * ওজর তাহার না করিবে খবরদার ॥ জান লিয়া টানাটানি হইবে তোমার * এ কথা বলিয়া দেও গায়েব হইল ॥ ফজরেতে ধোনা তবে জাগিয়া উঠিল * সবাকারে হুকুম

করিল ফজরেতে ॥ দুখেকে বসায়ে চল সবে জঙ্গলেতে * যায় মধু ভাঙ্গিবার হুকুমে ধোনার ॥ দুখে বলে চাচাজি গো কি কহিব আর * কান্দিয়া কান্দিয়া ফের কহিতে লাগিল ৷ তোমার মোকছেদ চাচা হাছেল হইল * দেওয়ের সহিত তেরা হয়েছে কারার ॥ আমারে দিয়া যে ঘরে যাবে আপনার * এ কথা শুনিয়া ধোনা হাসিয়া উঠিল ৷ যত সব বাজে কথা তোরে কে শুনাল * এতেক বলিয়া ধোনা চলিল বেবাক ৷ যাইয়া মধুর চাক দেখিয়া অবাক * যত লোক গিয়াছিল ধোনায়ের সাথ ॥ লইয়া দেওয়ের নাম চাকে দিল হাত * মাক্ষি সব তাড়া পেয়ে ভাগিল উড়িয়া ॥ রাক্ষস দক্ষিণা দেও জানিতে পারিয়া * ভূত প্রেত দেওয়ান লইয়া সঙ্গেতে ॥ আসিয়া পৌঁছিল ধোনা ছিল যে বনেতে * দেও বলে দেখ ধোনা তামাসা আমার ॥ পৌঁছইয়া দিব মধু নায়েতে তোমার * এই কথা বলিয়া দেও দান সবাকায় ॥ মোম মধু ভাংগিতে হুকুম দিল ঠাঁয় * দক্ষিণা দেওয়ের বাতে দান ছিল যত ॥ ভূত প্রেত ডাকিনী ধাইল শত শত * ভাংগিয়া তামাম মধু মহজার বিচেতে ॥ সাত ডিঙা বোঝাই করিল সহদেতে * ধোনাকে দক্ষিণা দেও কহে এ প্রকার ॥ দেখ আর জাগা নাই কিস্তিতে তোমার * ধাওয়াধাই ধোনা এসে নায়েতে পৌঁছিল ৷ বাকি নাহি আছে জাগা বোঝাই হইল * তখন আবার দেও কহে এ রূপেতে ৷ দেহ সাত ডিঙা মধু ফেলিয়া পানিতে * মোম দিব সাত ডিঙা বোঝাই করিয়া ॥ তাহাতে কিম্মত বেশি পাইবে বেচিয়া * মোম হৈতে খুব কম মধুর কিম্মত ॥ গাঙেতে ফেলিয়া দিল সহদ তারত * যে গাঙে ধোনাই মধু ফেলিল তামাম ॥ সেই হইতে সে গাঙের মধুখালি নাম * যে পানির মাঝে মধু ধোনাই ফেলিল ॥ চারিদিকে নোনা বিচখানে মিঠা হইল * আজ তক সেই গাঙে আছে মিঠা পানি। ৷ তাহা বাদে সাত ডিঙা মোম দেওমনি * ধোনার নায়েতে দিল বোঝাই করিয়া ॥ তা বাদে কহিল দেও শোন দেল দিয়া * তোমাকে দিলাম মোম বহুত কিম্মতি ॥ বেচিয়া পাইবে ধন করিবে রাজত্যি * যে কারণে দিনু মোম শোনো তার বেনা ৷ দুখেকে দিতে খবরদার ভুলিবে না * যদি হেলা ছাজি কর সাজা পাবে তার ॥ গাঙেতে তামাম নাও ডুবাব তোমার * বিদায় হইল এই ধোনাকে বলিয়া ॥ পাকাইতে ছিল দুখে নায়েতে বসিয়া * ভিজা কাট নাহি জ্বলে পাকাতে না পারে ॥ রন্ধন না হৈল তাই কান্দে জারে জারে * রশুই না হইলে গোশ্ব হইবে ধোনায় ॥ ভাবিয়া তাহার দিশা কিছু নাহি পায় * বন বিবির নাম শেষে ইয়াদ করিল ॥ ভুরকুণ্ডায় ছিল বিবি মালুম পাইল * পলক মারিতে দের না হইল আর ॥ দুখের নিকটে এসে কহে এ প্রকার * কেন ডাকিয়াছ কহে আসিয়া নিকটে ॥ দুখে কহে মা জননী পড়িনু সঙ্কটে * ধোনা চাচা বলে গেছে রশুই করিতে ॥ শুখা কাষ্ঠ অভাবে না পারি পাকাইতে *বন বিবি বলে বাছা না ভাবিও তুমি ॥ খোদার শুকুমে পাকাইয়া দিব আমি * বন বিবি তাহাকে যে ভরসা দিল । সকল হাড়ির পরে হাত ফেরাইল * কামালের ধনী বিবি বরকতের হাত ৷ বুজরগীতে পাকাইল ছালুন ও ভাত * বেগর আগুনে খানা হল তৈয়ার ॥ বিবি কহে সকলেতে খাও এইবার * আরজ করিয়া দুখে কহিল তখন ॥ শুন মা জননী আমার বিপদের বর্ণন * কাল বুঝি ধোনা চাচা যাবে ডিঙা লিয়া ॥ দক্ষিণা দেওয়ের তরে যাবে মোরে দিয়া * জগত জননী মাতা আসিয়া তরাবে ৷ বন বিবি বলে বাছা মনে না ভাবিবে * খাইতে তোমারে নাহি রায়ের ক্ষমতা ॥ আশা মেরে শা জঙলি উড়াইবে মাথা * বন বিবি ইহা বলে বিদায় হইল ৷ মহল থাকিয়া ধোনা আসিয়া পৌঁছিল * দুখেকে কহিল কোন ডিঙার উপর ॥ পাকাইয়া রাখিয়াছ কহ সে খবর * দুখে বলে চাচাজিগো এই ডিঙা পরে ॥ রান্ধিয়া রেখেছি আমি তোমাদের তরে * ধোনা যদি শোনে এয়ছা গিয়া সেই নায় ॥ সকলে একস্তরে বসে খানা খায় * সেরূপ অমৃত খানা কভু না খাইল ॥ সকলেতে কানাকানি করিতে লাগিল * সকলে মিলিয়া কহে ধোনার খাতের ॥ কভু এই খানা নহে দুখের হাতের * সকলেতে ঠারাঠারি কহিতে লাগিল ৷ দুখের উপরে সদয় বন বিবি হইল * ধোনা কহে হেগে বেটা পানি নাহি লয় ॥ দুখের উপর বন বিবি হইবে সদয় * এইরূপে বলা কওয়া করিতে লাগিল ৷ দিন গুজারিয়া রাত আসিয়া পৌঁছিল * যার যে ডিঙাতে গিয়া করিলা আরাম ॥ সারা রাত হৈল দুখের আরাম হারাম * ভাবিতে লাগিল এয়ছা কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ধোনা চাচা যাবে দেশে কাল ডিঙা লিয়া * দক্ষিণা দেওয়ের তরে আমারে দে যাবে ॥ বাঘ হয়ে আমাকে সে ধরিয়া খাইবে * মা বলিতে আমা বই কেহ আর নাই

৻ আমার ভাগ্যেতে আল্লা লিখি এয়ছাই ৻ এই কথা ভেবে দুখে দেলে আপনার ॥ আল্লাকে ইয়াদ করে কান্দে জারেজার * এক জারা চক্ষে তার নিন্দ না আইল ॥ কান্দিয়া কান্দিয়া সেই রাত পোহাইল * খানা পিনা খেয়ে সবে শুইয়া রহিল ৻ যেই রাত পোহাইয়া ফজর হইল * দাড়ি মাঝি সবাকারে কহিল ধোনাই ॥ খোলহ নায়ের কাছি আর দেরি নাই * ছয় ডিঙা খুলে দিল হুকুমে ধোনার ॥ নাহি খোলে এক ডিঙা ভেদ ছিল তার * কহে ধোনা দের করিতেছ কি কারণ ॥ মাঝি বলে কিসে হবে নায়েতে রন্ধন * নায়ের পরেতে কাঠ নাহি একখানা ॥ নায়ে এত লোক কিসে পাকাইবে খানা * মাঝির মুখেতে ধোনা শুনে এ বয়ান ॥ বলে বাবা দুখে থোড়া কাষ্ঠ কেটে আন * দুখে কহে মাফ কর চাচাজি আমায় ॥ দোছরাকে ভেজে দেহ না যাব চড়ায় * এত লোক আছে কর তাদের হুকুম ॥ আমার উপরে কর খামকা জুলুম * ধোনা মৌলে বলে বেটা নায়ে বসে খাবে । আদান ফরমাস করিলাম নাহি যাবে * ছুঙিন জবাব দিলে মুখের উপরে ॥ চড়াতে না যাব আমি কাষ্ঠ আনিবারে * কাটিয়া জবান দেব কুকুরে আমার ॥ দুখে বলে চাচাজিগো হেকমত তোমার * চেতনে আথিনু দেও কহিল তোমায় ॥ কেঁদোখালি চরে তুমি দে যাবে আমায় * বাঘ হৈয়া দেও এসে পরে খাবে মোরে ॥ মাল লিয়া বড়লোক হবে গিয়া ঘরে * দুখের মায়েরে কবে দেশেতে যাইয়া ॥ ছেলেকে খাইল বাঘে দিবে শোনাইয়া । কি বলে আনিয়া মোরে ছিলে ঘর হইতে ৻ মা আমাকে সুপে দিয়া ছিল তেরা হাতে * তাহার সরত শুধু আদায় করিয়া ॥ কেঁদোখালির চরে মোরে বাঘে খাওয়াইয়া * শুনিয়া আমার মাতা কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ আর কেহ নাহি শোকে যাইবে মরিয়া * ধোনা বলে পাজি বেটা ওস্তাদ ঠেটার ॥ একটা ফরমাস যদি শুনিলে আমার * ভালাই চাহ তো জলদি কাঠ আন গিয়া ॥ নাও হইতে কান ধরে দিব নামাইয়া * এই কাজের তরে মোরে নায়ে এনেছিলে ॥ দুখের জান গেল আর তুমি ধনী হইলে * আর কেন ফজিহত কর বার বার ॥ আমারে খাইলে বাঘে পরওয়া কি তোমার * দুখে বলে চাচাজিগো ছালাম চরণে ॥ বল কাঠ ভাঙিবারে যাব কোন বনে * এশারা করিয়া ধোনা বন দেখাইল ॥ দুঃখ মনে দুখে নাও হইতে নামিল ॥ গেল দুখে কেঁদোখালি চর পার হইয়া ॥ ধোনা ডিংগা খুলে গেল দুখেকে রাখিয়া * কহিতে লাগিল ধোনা মুখে আপনার ॥ দুখেকে দিলাম তোরে রাক্ষস এইবার * মেরা দোষ ঘাট মাফ কর দেওমণি ॥ রাখ মার যাহা ইচ্ছা আমি নাহি জানি ॥ কাঠ লিয়া আসে দুখে জংগল হইতে ॥ আসিয়া পৌঁছিল কেঁদোখালির চরেতে * দেখিল যে ধোনা মৌলে গেছে নাও লিয়া ॥ চরেতে বসিয়া কান্দে কাতর হইয়া * খাড়ি হতে দৈত্য তবে দেখিতে পাইল ॥ দুখেকে দিয়াছে ধোনা মালুম করিল * খাইতে রাক্ষস তবে এরাদা করিয়া ॥ আপনাকে বাঘের ছুরত বানাইয়া * মানুষের গোস্ত খাব বহুদিন বাদে ॥ দুখেকে খাইতে যায় মনের আনন্দে * চরে থেকে দুখে হেথা পাইল দেখিতে ॥ বাঘ হইয়া আসে দেও আমাকে খাইতে * প্রকাণ্ড শরীর আর দুম ঊর্ধ্বে তুলে ॥ হাওয়া ভরে আসে সেই বাঘ গাল মেলে * দেখিয়া দুখের গেল পরাণ উড়িয়া ৻ বলে বন বিবি মাগো লেহ উদ্ধারিয়া * এত বলে তরাসে গিরিয়া গেল ভূমে ॥ তামাম অজুদ তরতর হইল ঘামে * বলে মাগো বন বিবি কোথা আছে ছেড়ে ॥ এ সময় আইস মাগো দুখে মারা পড়ে * তরাবে বাঘের হাতে দিয়াছ কারার ॥ না তরাবে কলঙ্ক মা হইবে তোমার * এতেক বলিয়া তবে জ্ঞান হারাইল ॥ ভুরকুণ্ডে থাকিয়া বিবি জানিতে পারিল * সাজংলিকে কহে ভাই জলদি আইস সাথে ॥ বুঝি মারা গেল বাছা রাক্ষসের হাতে * চল জলদি গিয়া করি উহারে উদ্ধার ॥ আস্পর্ধা হয়েছে বড় রাক্ষস বেটার * খেয়ে যদি ফেলে তবে হবে মহা দায় ॥ পলকেতে ভাই বহিন পৌঁছিল সেথায় * দেখে দুখে পড়ে আছে হুস হারাইয়া ॥ দুখেকে লইল বিবি কোলে উঠাইয়া * ধুলা মুছ্যা কোলে নিল জগতের মাতা ॥ বাছা বাছা বলে ডাকে নাহি কহে কথা * বেহুস বেলাল ছিল না পায় শুনিতে ॥ জংগলিকে বলে ভাই দেখ কি চক্ষেতে * সা জংগলি কথা শুনে আসিয়া ত্বরায় ॥ এছম আজম পড়ে ফুক দিল গায় * পানি মুখে দিতে তবে হুস যে হৈল ॥ দেও দুরে বাঘ রূপে খাড়া হয়ে ছিল * সা জংগলিকে দেবি কহে গোশ্ব ভরে ॥ কিছু শিক্ষা দাও এই রাক্ষস বেটারে * ছের উড়াইয়া দেহ থাপ্পড় মারিয়া ॥ শুনিয়া সা জংগলি দৌড়ে আশা হাতে লিয়া * সা জংগলি হুকুম পেয়ে জানের গোশ্বায় ॥ খুব জোরে

চড়া মারে বাঘের মাথায় * নামাকুল চড় খেয়ে ফাফড় হইল ៲៲ জান লিয়া দক্ষিণা দেও দক্ষিণে চলিল ॥”

চিঠি পড়া শেষ হতে ডিঙির মাঝখানটায় গিয়ে বসল পিয়া। খানিক বাদে ফকিরও এসে বসল পাশে। পিয়ার অবশ্য কেমন যেন মনেই হচ্ছিল যে ও আসবে। ডিঙির ধারের কাঠের ওপর ভর দিয়ে বসেছিল ফকির। ওর কবজির ওপর একটা হাত রেখে পিয়া বলল, “সিং। বনবিবি–দুখে–দক্ষিণ রায়। সিং।” খানিক দ্বিধার পর শেষে রাজি হল ফকির। মাথাটা একটু পেছনে হেলিয়ে সুর করে গাইতে শুরু করল আস্তে আস্তে। হঠাৎ পিয়ার চারিদিকে যেন নদীর মতো বয়ে যেতে লাগল সে গানের সুর আর কথা। তার কোনও অংশ এতটুকু দুর্বোধ্য নয়; প্রতিটা শব্দ পরিষ্কার বুঝতে পারছিল পিয়া। যদিও যে গলাটা কানে শুনতে পাচ্ছে সেটা ফকিরের গলা, আর গানের মানেটা যে বুঝতে পারছে সেটা কানাইয়ের কল্যাণে, এবং অন্তরের গভীরে পিয়া জানে যে ওর মনের ভেতরে এই দু’জনকে নিয়ে টানা-পোড়েন কখনও শেষ হবে না।

কানাইয়ের চিঠির শেষ পাতাটা ওলটাল পিয়া। পেছনে ছোট্ট কয়েক লাইন লেখা। “এই লেখার মূল্য কী তা যদি সত্যিই কখনও জানতে চান, রিলকের এই কথাগুলো মনে করবেন:

‘শোনো: আমরা যে প্রেম করি, ফুলেদের মতো নয়, নয় এক বৎসরের জন্য শুধু প্রেমরত আমাদের বাহুতে উচ্ছিত হয় প্রাণরস অনন্ত স্মরণাতীত কাল থেকে। হায়, কন্যা, এ-ই তবে! অভ্যন্তরে আমরা বেসেছি ভাল–কোনো অনাগতা অনন্যাকে নয়, কিন্তু সব কিজাত অগণ্য উচ্ছ্বাস: শুধু নয় একটি শিশুকে, কিন্তু পিতৃপুরুষেও, যাঁরা ভগ্ন পর্বতের মতো আমাদেরই
গভীরে আছেন পড়ে; আর লুপ্ত মাতাদের শুষ্ক নদীগর্ভ– তাও; আর সেই শব্দহীন ভূদৃশ্যের সমগ্র বিস্তার, যার নিয়তি কখনও মেঘে আচ্ছন্ন, আর কখনও নির্মল;– কন্যা, এরা তোমার অগ্রিম।’

মিঠে জল, নোনা জল

রাতে এত গরম পড়েছিল যে মাঝখানে একবার উঠে গিয়ে কেবিনের দরজাটা খুলে দিল কানাই—যদি হাওয়া ঢোকে খানিকটা। তারপর দরজা খোলা রেখেই আবার গিয়ে শুল বাঙ্কের ওপর। পাল্লার ফাঁক দিয়ে বাইরের একটা ফালি চোখে পড়ছে। নরম জ্যোৎস্নায় গর্জনতলার গাছপালার হালকা ছায়া পড়েছে নদীর বুকে। রুপোলি জলের ওপর কালচে ছোপের মতো দেখাচ্ছে সেগুলোকে। কেবিনের ভেতরেও এসে পড়েছে এক চিলতে আলো। আগের দিন ছেড়ে রাখা কাদামাখা জামাকাপড়ের স্তূপটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সে আলোতে।

ঘুম আসতে দেরি হচ্ছিল কানাইয়ের। আধো তন্দ্রায় চোখদুটো মাঝে মাঝে জড়িয়ে এলেও একটানা গভীর ঘুম কিছুতেই হল না। স্বপ্নের মধ্যে চমক লেগে বারবার তন্দ্রা ভেঙে যাচ্ছিল। ভোর চারটে পর্যন্ত এইভাবে চেষ্টা করে অবশেষে হাল ছেড়ে দিল কানাই। উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। লুঙ্গির কষিটা শক্ত করে বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে এল ডেকের ওপর। আশ্চর্য হয়ে দেখল হরেনও উঠে পড়েছে ঘুম থেকে। পাশাপাশি রাখা দুটো আরাম-চেয়ারের একটায় বসে আছে। জড়ো করা দু'হাতের ওপর থুতনির ভর রেখে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে নদীর দিকে। কানাইয়ের পায়ের আওয়াজে মাথা তুলল হরেন। ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনারও ঘুম হল না?"

"নাঃ," জবাব দিল কানাই। "আপনি কখন উঠলেন?"

"এই ঘণ্টাখানেক হবে।"

"ওদের নৌকোটা ফিরে আসছে কিনা তাই দেখছিলেন?"

গলার ভেতরে ঘড়ঘড়ে একটা আওয়াজ করল হরেন। "হতেও পারে।"

"কিন্তু এখনও তো আলো ফোটেনি," কানাই বলল। "এই রাতের বেলায় কি রাস্তা চিনে আসতে পারবে ওরা?"

"চাঁদটা দেখেছেন তো?" জিজ্ঞেস করল হরেন। "একেবারে জ্বলজ্বল করছে আজকে। আর এ জায়গার নদীনালা ফকির ওর হাতের তেলোর মতো চেনে। ফিরতে চাইলে ফিরতে ঠিকই পারত।"

হরেনের কথার ইঙ্গিতটা ঠিক ধরতে পারল না কানাই। "তার মানে?"

"হয়তো ও ফিরতে চায় না আজকে রাতে।" পূর্ণ দৃষ্টিতে কানাইয়ের চোখের দিকে তাকাল হরেন। ধীরে ধীরে হালকা একটা হাসি ছড়িয়ে গেল ওর মুখে। বলল, "কানাইবাবু, আপনি তো অনেক জায়গা ঘুরেছেন, অনেক কিছু দেখেছেন। ভালবাসায় পড়লে মানুষের যে কী হয় সে কি আপনি জানেন না?"

বুকের ওপর জোরালো একটা ঘুষির মতো তীব্রতায় কানাইকে ধাক্কা দিল প্রশ্নটা—তক্ষুনি কোনও জবাব খুঁজে পেল না বলে শুধু নয়, এই রকম একটা কথা হরেনের স্বভাবের সঙ্গে কিছুতেই যেন মিল খায় না, তাই কেমন যেন অদ্ভুত লাগল কানাইয়ের।

জিজ্ঞেস করল, "সত্যি সত্যি এরকম কিছু হয়েছে বলে মনে হয় আপনার?"

হরেন হাসল। "আপনি কি জেনেশুনে অন্ধ সাজার চেষ্টা করছেন কানাইবাবু? নাকি ফকিরের মতো একটা অশিক্ষিত মানুষও যে প্রেমে পড়তে পারে সেটা বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না?"

বিরক্ত হল কানাই। "এ কথা কেন বলছেন হরেনদা? আর এরকম কিছু আমি ভাবতেই বা যাব কেন?"

"ভাবলে আশ্চর্য হব না," শান্ত গলায় বলল হরেন। "এরকম চিন্তা লোকের মনে আসতে আমি আগেও দেখেছি। সত্যি কথা বলতে কী, আপনার মেসোকেই দেখেছি।"

"মেসো? মানে নির্মল সারের কথা বলছেন আপনি?"

"আজ্ঞে। সেই যে রাতের বেলায় আমার নৌকোয় উনি আর আমি মরিচঝাঁপিতে গিয়ে উঠেছিলাম, সে কথা জানেন তো? আপনি কি ভেবেছেন শুধু ঝড়ের টানেই ওখানে গিয়ে

ঠেকেছিলাম আমরা? তা নয়।"

"তার মানে?"

"কুসুম আর আমি যে একই গাঁয়ের লোক সে কথা তো আপনি জানেন কানাইবাবু। আমার থেকে প্রায় বছর ছয় সাতের ছোট ছিল কুসুম। যখন আমার বিয়ে হয়, ও তখন একেবারে ছেলেমানুষ। আমার বয়স তখন ছিল চোদ্দো। আমাদের বিয়ে-শাদির সব কিছু তো বাড়ির বড়রাই ঠিক করে, আর এ ব্যাপারে আমার নিজের কোনও মতামতও ছিল না। তো, কুসুমের বাবাকে আমি ছোটবেলা থেকেই চিনতাম। মাঝে মধ্যেই ওদের ডিঙিতে টুকটাক কাজ করতে যেতাম। যেবার ওর বাবাকে বাঘে ধরল তখনও আমি ছিলাম ওখানে। কুসুমের সঙ্গে বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে চোখের সামনে দেখেছিলাম পুরো ঘটনাটা। সেই থেকেই কেমন যেন মনে হত ওর আর ওর মায়ের দেখাশোনা করাটা আমারই দায়িত্ব। অবশ্য খুব বিশেষ কিছু যে করতে পারতাম তাও নয়। আমার তখন কতই বা বয়েস? মেরেকেটে কুড়ি। নিজের একটা সংসার আছে, বৌ বাচ্চা আছে। এদিকে কুসুমের মা তখন দিলীপের কাছে কাজের খোঁজ করছে। আমাকে বলেছিল সে কথা। আমি তো শুনেই বুঝেছি ব্যাপার সুবিধের নয়। নানাভাবে সাবধান করার চেষ্টা করলাম। কী কাজ দিলীপ দিতে পারে সেটাও বোঝানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার কথা শুনলে তো। কতটুকুই বা খবর রাখত বেচারি এই দুনিয়াটার? এইসব ব্যাপার-স্যাপার ওর কল্পনারও বাইরে ছিল। তারপর চলে যখন গেল শেষ পর্যন্ত, আমার তখন আরও বেশি করে মনে হত লাগল কুসুমের দেখাশোনা আমাকেই করতে হবে। সেজন্যেই ওকে লুসিবাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম আমি—আপনার মাসির কাছে। সেখানেও যখন দেখলাম দিলীপের নাগাল পৌঁছেছে, তখন আমি ওকে লুসিবাড়ি থেকে বের করে নিয়ে গেলাম। একেবারে ভাটির দেশের বাইরে যাতে চলে যেতে পারে সে ব্যবস্থা করে দিলাম। তবে আমি তো আমার মতো করে ভেবেছিলাম ভেবেছিলাম কুসুমকে আমি আড়াল করে রাখছি, দূরে সরিয়ে রাখছি সব বিপদ আপদ থেকে; আসলে কিন্তু কুসুমের মনের জোর ছিল আমার থেকে অনেক বেশি। আমার কেন, কারওর পাহারাদারিরই কোনও দরকার ছিল না ওর। মাকে খুঁজতে যাওয়ার জন্য যেদিন ওকে ক্যানিং স্টেশনে নিয়ে গেলাম সেই দিনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম সেটা। ট্রেনে তুলে দেওয়ার আগে হঠাৎ আমার মনে হল আর হয়তো জীবনে কোনওদিন ওর সঙ্গে দেখা হবে না। ওকে যেতে বারণ করলাম আমি। বার বার করে বললাম ফিরে আসতে আমার সঙ্গে। সত্যি কথা বলব—আমার কেমন ভয় করছিল। একা একটা মেয়ে অজানা অচেনা জায়গায় কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, কখন কী বিপদ হবে কে বলতে পারে। অনেক করে মানা করলাম। এমনকী বললাম আমার বউ-বাচ্চাকে ছেড়ে দেব, ওকে বিয়ে করে একসঙ্গে থাকব। কিন্তু কে শোনে কার কথা। ওর মন যা চেয়েছে সে ও করবেই, কেউ আটকাতে পারবে না। করলও তাই শেষ পর্যন্ত। এখনও ওকে ট্রেনে তুলে দেওয়ার সময়কার ছবিটা আমার চোখে ভাসে। ফ্রক পরা, চুলগুলো তখনও ছোট ছোট বড় মেয়েমানুষ নয়, একটা বাচ্চার মতো চেহারা। ট্রেনটা চলে গেল, কিন্তু সে ছবিটা রয়ে গেল আমার মনের মধ্যে।

"তার প্রায় বছর আষ্টেক কেটে যাওয়ার পর ঘটল মরিচঝাঁপির ঘটনা। নানারকম গুজব কানে আসত তখন। শুনতে পেলাম রিফিউজিরা এসে উঠেছে ওখানে। দখল করে বসেছে দ্বীপটা। কানাঘুষোয় শুনলাম আমাদের কুসুমও নাকি আছে ওই রিফিউজিদের সঙ্গে। বিধবা হয়ে ফিরে এসেছে আবার ভাটির দেশে। সঙ্গে একটা বাচ্চা। ও কোথায় আছে সেটা খুঁজে বের করলাম আমি। ডিঙিতে করে ওর ঘরের পাশ দিয়ে কয়েকবার যাতায়াত করলাম, কিন্তু কিছুতেই সাহস করে গিয়ে দেখা করে উঠতে পারলাম না। যেদিন আপনার মেসোকে নিয়ে কুমিরমারি গেলাম, সেদিন ওর কথাই আমি ভাবছিলাম সর্বক্ষণ। কত কাছ থেকে এসে ঘুরে যাচ্ছি, বার বার সে কথাই মনে হচ্ছিল আমার। তারপর ফেরার পথে সেই ঝড় উঠল, বনবিবির আশীর্বাদের মতো।

"সেইদিন থেকে আমি ঘুরে ফিরে বারবার যেতে লাগলাম মরিচঝাঁপিতে। আপনার

মেসোকে ওখানে নিয়ে যাওয়ার অছিলায় চলে যেতাম, উনিও যেতেন বারবার, আমার অছিলায়। একটা জিনিস খেয়াল করলাম–আমি যেমন সবসময় কুসুমের কথা ভাবতাম, উনিও সেরকম ওর কথা না ভেবে থাকতে পারতেন না। আমার মতো ওনারও যেন রক্তের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল কুসুম। ওর নাম শুনলেই চঞ্চল হয়ে উঠতেন উনি, হাঁটাচলা বদলে যেত, মুখে যেন কথার খই ফুটত। খুব কথা বলতে ভালবাসতেন আপনার মেসো। আর আমার আবার মুখে বেশি কথা আসত না। আমি বুঝতে পারতাম এটা-ওটা নানারকমের গল্প-কাহিনি বলে ওকে বশ করার চেষ্টা করছেন উনি। আমার সেদিক থেকে দেওয়ার কিছুই ছিল না–শুধু চোখের দেখাটুকু ছাড়া। শেষ পর্যন্ত কিন্তু দু'জনের মধ্যে থেকে আমাকেই বেছে নিল কুসুম।

"হামলার আগের রাত্তিরে, বুঝলেন কানাইবাবু, আপনার মেসো যখন ওনার শেষ কথাগুলো লিখছিলেন ওই খাতাটায়, কুসুম আমাকে বলল, সারকে আরেকটু সময় দাও; চলো আমরা বাইরে যাই। ও আমাকে নিয়ে গেল আমার নৌকোয়। সেখানেই প্রমাণ দিল ওর ভালবাসার একটা পুরুষ মানুষ যা চাইতে পারে, সব চাহিদা পূরণ করে দিল ও। নদীতে ভরা জোয়ার তখন। ঢেউয়ের মুখে অল্প দোল খাচ্ছিল' বাদাবনের আড়ালে লুকিয়ে রাখা আমার ডিঙি। আমরা গিয়ে উঠলাম তার ওপর, আমার গামছা দিয়ে ওর গোড়ালি থেকে মুছিয়ে দিলাম কাদা। আমার পা দুটো কুসুম ওর দু'হাতের মধ্যে নিয়ে ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিল। তারপর যেন একটা বাঁধ ভেঙে গেল। জলের মতো গলে গিয়ে মিশে গেল আমাদের শরীরদুটো–নদী যেমন সাগরে গিয়ে মেশে, সেরকম। মুখ ফুটে কেউ কাউকেই বলিনি কিছুই, বলার কিছু ছিলও না। সব কথাই ঢাকা পড়ে গিয়েছিল আমাদের শরীরের ওমে। কথা কিছু ছিল না, শুধু মিশে যাওয়া ছিল–মিঠে জল আর লোনা জলের মতো। আর ছিল জোয়ার-ভাটার ঢেউয়ের মতো ওঠাপড়া। আর কিচ্ছু না।"

দিগন্তে

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতে পিয়া দেখল মুখ মাথা ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে রাতের শিশিরে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, সকালের দিকটায় জলের ওপর রোজ যেমন কুয়াশা থাকে আজকে তার চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না। আগের রাতে এত গরম ছিল, তার জন্যেই নিশ্চয়ই এরকম হয়েছে। এখন অবশ্য বেশ ভালই হাওয়া চলছে, এমনকী নদীতে ঢেউও উঠছে অল্প অল্প। মনে হচ্ছে কালকের অসহ্য গরমটা আজকে আর ভোগ করতে হবে না।

ফকির এখনও অঘোর ঘুমে। তাই চুপচাপ নিজের জায়গায় শুয়ে শুয়ে ভোরের শব্দ শুনতে লাগল পিয়া: দুরে কোথায় একটা পাখি ডাকছে, ঝরঝর করে হাওয়া বইছে জঙ্গলের ডালপাতার মধ্যে দিয়ে, ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ উঠছে জোয়ারের জলে। চারপাশের বিভিন্ন আওয়াজে কান খানিকটা অভ্যস্ত হয়ে আসার পর অন্যরকম একটা শব্দ শুনতে পেল পিয়া, যে সমস্ত আওয়াজগুলো এতক্ষণ ধরে কানে আসছিল সেগুলোর সঙ্গে এটা যেন ঠিক খাপ খায় না। ফোঁস করে হাঁফ ছাড়ার মতো ছোট্ট একটা শব্দ, অনেকটা যেন কেউ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে থেমে থেমে। কিন্তু ইরাবড়ি ডলফিনের আওয়াজের সঙ্গে কোনও মিল নেই এ শব্দের। চট করে উপুড় হয়ে গিয়ে দুরবিনটার দিকে হাত বাড়াল পিয়া। মাথার ভেতর থেকে কেউ যেন বলে উঠল আওয়াজটা গ্যাঞ্জেটিক ডলফিনের প্ল্যাটানিস্টা গ্যাঞ্জেটিকা। কয়েক সেকেন্ড পরেই জলের মধ্যে ডিগবাজি খাওয়া পাখনাবিহীন একটা মসৃণ পিঠ চোখে পড়ল পিয়ার নৌকো থেকে প্রায় দুশো মিটার সামনে। মিলে গেছে! এত তাড়াতাড়ি ধারণাটা সত্যি প্রমাণিত হতে উত্তেজিত হয়ে উঠল পিয়া। একটা নয়, অন্তত গোটা তিনেক ডলফিন চক্কর কেটে বেড়াচ্ছে ডিঙিটার আশেপাশে।

উত্তেজনায় উঠে বসল পিয়া। এই ক'দিনের মধ্যে গ্যাঞ্জেটিক ডলফিন চোখেই পড়েনি, মনটা তাই একটু খুঁতখুঁত করছিল ওর–আর আজকে এই সক্কাল সক্কাল, এ তো একেবারে মেঘ না চাইতেই জল। তাড়াতাড়ি জিপিএস-এ একটা রিডিং নিয়ে ডেটাশিট বের করার জন্যে পিয়া পিঠব্যাগটার দিকে হাত বাড়াল।

ডেটাশিটে কয়েকটা এন্ট্রি করার পর হঠাৎ কেমন যেন একটা ধন্দ লাগল পিয়ার; মনে হল কোথায় যেন গড়বড় হচ্ছে একটা। হিসেব করে দেখল অস্বাভাবিক রকম কম সময়ের ব্যবধানে ডলফিনগুলো ভেসে উঠছে জলের ওপর। খুব বেশি হলে দু'এক মিনিট পর পরই ভুস করে উঠে শ্বাস ছাড়ছে, আবার ডিগবাজি খেয়ে তলিয়ে যাচ্ছে নদীর মধ্যে। আর একাধিকবার, শ্বসের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে একটা কুঁইকুই শব্দও কানে এল পিয়ার।

নাঃ, একটা কিছু গন্ডগোল নিশ্চয়ই আছে। এমনিতে তো এই প্রাণী কখনও এরকম ব্যবহার করে না। ডেটাশিটটা পাশে সরিয়ে দূরবিনে চোখ রাখল পিয়া।

ডলফিনগুলোর অস্বাভাবিক ব্যবহারের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কয়েক বছর আগে পড়া একটা প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে গেল ওর। প্রফেসর জি পিলেরি নামের এক সুইস সিটোলজিস্টের লেখা। মিষ্টি জলের শুশুকদের বিষয়ে গবেষণায় অগ্রগণ্য সুইজারল্যান্ডের এই অধ্যাপক; অন্যতম পথিকৃৎ-ও বলা যায়। যতদূর মনে পড়ল সত্তরের দশকের কোনও এক সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল প্রবন্ধটা। পাকিস্তানের সিন্ধু নদে তার গবেণার কাজ করছিলেন পিলেরি। ওখানকার কয়েকজন জেলেকে কিছু টাকাপয়সা দিয়ে রাজি করিয়েছিলেন একজোড়া প্ল্যাটানিস্টা ধরে দেওয়ার জন্য একটা ছেলে শুশুক আর একটা মেয়ে শুশুক। ডলফিন ধরার সেই কাহিনি বিস্তারিতভাবে লিখেছিলেন অধ্যাপক তার ওই প্রবন্ধে। খুব একটা সহজ ছিল না কাজটা। কারণ গ্যাঞ্জেটিক ডলফিনদের শরীরের ধ্বনি-প্রতিক্ষেপক রাডার এতই নির্ভুল যে নদীতে জাল নামানো মাত্র ওরা সেটা টের পেয়ে যায়। শেষে অনেক মাথা খাঁটিয়ে জেলেরা শুশুকগুলোকে লোভ দেখিয়ে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেল যেখানে ওপর থেকে জাল ফেলে ওদের ধরা যায়।

জোড়া ডলফিন ধরা তো পড়ল। পিলেরির পরবর্তী কাজ হল পাকিস্তান থেকে তাদের

সুইজারল্যান্ডে নিজের গবেষণাগারে নিয়ে যাওয়া। সে প্রক্রিয়া এতই জটিল আর অদ্ভুত, যে পড়তে পড়তে হো হো করে হেসে উঠেছিল পিয়া। প্রথমে তো প্রাণীগুলোকে ভেজা কাপড় দিয়ে জড়ানো হল। তারপর মোটরবোটে করে নিয়ে যাওয়া হল এক গাড়ি-চলা পথের কাছে। সেখান থেকে একটা ট্রাক ভাড়া করে প্রথমে একটা রেলস্টেশনে যাওয়া হল, তারপর ট্রেনে করে করাচি। আর এই পুরো সময়টা ধরে কিছুক্ষণ পর পরই সিন্ধু নদের জল দিয়ে ভিজিয়ে দেওয়া হচ্ছিল শুশুকগুলোর সারা গা। করাচি স্টেশনে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল একটা ল্যান্ড-রোভার। তাতে করে প্রাণীগুলোকে নিয়ে যাওয়া হল একটা হোটেলে। সেখানে বিশেষভাবে তৈরি করা একটা সুইমিং পুলে রাখা হল ওদের। তারপর কয়েকদিনের বিশ্রাম। বিশ্রাম শেষে আবার ল্যান্ড-রোভারে চড়িয়ে ডলফিনযুগলকে নিয়ে যাওয়া হল করাচি এয়ারপোর্টে। সোজা টারম্যাক পর্যন্ত গাড়িতে করে নিয়ে গিয়ে একটা সুইসএয়ার প্লেনে উঠিয়ে দেওয়া হল ওদের। দুই শুশুককে নিয়ে সেই প্লেন পাকিস্তান থেকে সরাসরি বরফ-জমা সুইজারল্যান্ডে না গিয়ে মাঝপথে আথেন্সে থামল কিছুক্ষণ। সেখান থেকে অবশেষে জুরিখ। এয়ারপোর্ট থেকে হটওয়াটার বটল আর কম্বল চাপা দিয়ে গরম অ্যাম্বুলেন্সে করে ডলফিনদুটোকে নিয়ে যাওয়া হল বার্নের এক প্রাণিগবেষণাকেন্দ্রে। সেখানে বিশাল একটা চৌবাচ্চা আগে থেকে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত রাখা হয়েছিল ওদের জন্যে। এমন ব্যবস্থা করা ছিল যাতে সে চৌবাচ্চায় জলের উষ্ণতা মোটামুটি সিন্ধু নদের জলের তাপমাত্রার সমান থাকে সব সময়।

আল্পস পাহাড়ের এই সিন্ধু নদে গবেষণার সময়ই প্ল্যাটানিস্টাদের স্বভাবের একটা অদ্ভুত দিক লক্ষ করেন পিলেরি। যে অভ্যাসের কথা তার আগে কেউ জানত না। দেখা গেল এ জাতের ডলফিনরা আবহাওয়ার পরিবর্তনের প্রতি খুবই সংবেদনশীল। বায়ুর চাপের রদবদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় ওদের ব্যবহার। বার্ন এবং আশেপাশের অঞ্চলে ঝড় বাদলা হলেই কেমন অস্বাভাবিক হয়ে যায় ওদের আচরণ।

বহুদিন আগে পড়া প্রবন্ধ থেকে প্ল্যাটানিস্টাদের স্বভাবের এই খুঁটিনাটিগুলো মনে করার চেষ্টা করছিল পিয়া। হঠাৎ, দূরবিনটা একটু সরতেই নদী থেকে ওর নজর গিয়ে পড়ল দিগন্তের দিকে, দক্ষিণ-পুর্ব কোণে। অন্য কোথাও মেঘের কোনও চিহ্ন নেই, কিন্তু ঠিক ওই কোণ বরাবর গিয়ে রং পালটে গেছে আকাশের, অদ্ভুত ইস্পাত-ধূসর চেহারা নিয়েছে সেখানটায়।

চোখ থেকে দূরবিন নামিয়ে নিল পিয়া। আকাশ থেকে চোখ ফিরিয়ে ডলফিনগুলোর দিকে তাকাল, তারপর ফের দেখল আকাশের দিকে। হঠাৎ পুরো বিষয়টা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল ওর চোখের সামনে। কিছুনা ভেবেই চিৎকার করতে শুরু করল ও, "ঝড় আসছে, ফকির, ঝড় আসছে! এক্ষুনি মেঘার কাছে ফিরে যেতে হবে আমাদের।"

হরেনের আঙুল বরাবর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে তাকাল কানাই। সেখানে দিগন্তের কাছে স্পষ্ট চোখে পড়ছে একটা কালচে ছোপ, ধেবড়ে যাওয়া কাজলের মতো। "যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়িই এসে গেল," কবজি উলটে ঘড়ি দেখল হরেন। "সাড়ে পাঁচটা বাজে এখন। খুব বেশি হলে আর ঠিক আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে পারব আমরা। তার চেয়ে দেরি করলে লুসিবাড়িতে আর ফেরা হবে না।"

মানতে চাইল না কানাই। "এভাবে ওদের ঝড়ের মুখে ফেলে রেখে আমরা নিরাপদে ফিরে চলে যাব? তা কী করে হয় হরেনদা?"

"কিছু করার নেই কানাইবাবু," জবাব দিল হরেন। "হয় আধঘণ্টার মধ্যে ফিরে যেতে হবে, নয়তো এই ভটভটিসুদ্ধ এখানেই ডুবে মরতে হবে সবাই মিলে। শুধু আমার কি আপনার কথা আমি ভাবছিনা, আমার বাচ্চা নাতিটাও তো সঙ্গে আছে। আর নিরাপদে ফেরার কথা বলছেন? আমরাও যে ঝড় সামলে ঠিকমতো ফিরতে পারব কোনও গ্যারান্টি নেই তার।"

"কিন্তু এখানে কাছাকাছি কোনও আড়াল-টাড়াল নেই? যেখানে ঝড় থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যেতে পারে?"

দিগন্তের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত আঁক কেটে গেল হরেনের তর্জনী। "কানাইবাবু, তাকিয়ে দেখুন চারদিকে। কোথাও কোনও আড়াল চোখে পড়ছে আপনার? এই সব ছোট ছোট দ্বীপগুলো দেখছেন তো আশেপাশে? ঝড় এলে প্রত্যেক ক'টা কয়েক ফুট জলের তলায় চলে যাবে। যদি এখানে থাকি, হয় মাঝনদীতে ডুববে আমাদের ভটভটি, নয়তো গিয়ে আছড়ে পড়বে পাড়ের ওপর। একেবারে কোনও আশা থাকবে না বাঁচার। কাজেই, ফিরতে আমাদের হবেই।"

"আর ওদের কী হবে?" জিজ্ঞেস করল কানাই। "ওরা বাঁচবে কী করে?"

কানাইয়ের কাঁধে হাত রাখল হরেন। বলল, "শুনুন। খুব একটা সহজ হবে না ব্যাপারটা, কিন্তু এরকম সময় কী করতে হয় ফকির সেটা খুব ভাল করে জানে। এই ঝড়ের মুখ থেকে বেঁচে কেউ যদি ফিরতে পারে, তা হলে ও-ই পারবে। ওর দাদুও একবার গর্জনতলায় এরকম সাইক্লোনের মধ্যে থেকে বেঁচে এসেছিল। এ ছাড়া আর কী বলব বলুন? এখন সবটাই আমাদের হাতের বাইরে।"

ক্ষয়ক্ষতি

খাঁড়ির মুখ থেকে ফকির যখন ডিঙিটাকে ঠেলে বের করল, তখন সবে মাত্র সাড়ে পাঁচটা বেজেছে। বাতাসের বেগ বেড়েছে, কিন্তু আকাশের বেশিরভাগটাই পরিষ্কার দেখে একটু ভরসা পেল পিয়া। এমনকী শুরুর দিকে একটু সুবিধাই হল ওদের, যেদিকে ওরা যেতে চাইছিল ঢেউ আর হাওয়ার টানে সেই দিকেই তরতর করে এগোতে লাগল নৌকো। ফলে, মনে হচ্ছিল যেন একজোড়া বাড়তি দাঁড় কেউ জুড়ে দিয়েছে ডিঙিটার সঙ্গে।

নৌকোর মুখের দিকে পিঠ করে বসেছিল পিয়া, তাই প্রথম দিকটায়, হাওয়া যখন ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল ওদের, তখন পেছন থেকে আসা ঢেউগুলোকে ও দেখতে পাচ্ছিল। তখনও পর্যন্ত জলের ওপর উঁচু-নিচু ভাঁজের মতো মনে হচ্ছিল সেগুলোকে, ওপরে কোনও ফেনা টেনাও ছিল না। একটার পর একটা ঢেউ নিঃশব্দে গড়িয়ে এসে তুলে ধরছিল ডিঙির পেছনটা, তারপর আবার নামিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল সামনে।

আধঘণ্টাখানেক পর জিপিএস মনিটরে নিজেদের অবস্থানটা একবার দেখে নিল পিয়া। মনে হল দুশ্চিন্তার কিছু নেই। হিসেব করে দেখল এই গতিতে যদি এগোনো যায় তাহলে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই গর্জনতলায় পৌঁছে যাবে সম্ভবত ঝড় আসার আগেই।

কিন্তু এক একটা মিনিট যেতে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে লাগল হাওয়ার বেগ। আকাশের কোণের কালো দাগটাও দ্রুত ছড়িয়ে যেতে লাগল চারদিকে। এদিকে ওরা যেখানে আছে সেখান থেকে একটানা সোজা পথে গর্জনতলায় যাওয়া যাবে না। এ খড়ি সে খুঁড়ি হয়ে এঁকেবেঁকে চলতে হচ্ছে ওদের। আর প্রত্যেকটা বাঁক নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাচ্ছে হাওয়ার দিক। একেক সময় এমনভাবে ঝাঁপটা এসে লাগছে যে একপাশে একেবারে কাত হয়ে যাচ্ছে ডিঙিটা। বাতাসের বেগ বাড়ার সাথে সাথে ঢেউগুলোও উঁচু হতে শুরু করেছে। মাথায় এখন তাদের সাদা ফেনার ঝুঁটি। বৃষ্টি নামেনি, কিন্তু হাওয়ার তোড়ে গুঁড়ি গুঁড়ি জলের ছিটে এসে লাগছে সারা গায়ে। ভিজে চুপ্পুড় হয়ে গেছে পিয়ার জামাকাপড়। একটু পরে পরেই জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিতে হচ্ছে, না হলে খড়খড়ে নুনের পরত জমে যাচ্ছে ঠোঁটের ওপর।

প্রথম মোহনাটাতে গিয়ে পৌঁছতেই বিশাল বিশাল সব ঢেউয়ের মুখে গিয়ে পড়ল ওদের ডিঙি। এতক্ষণ যেসব ঢেউয়ের মোকাবিলা করে এসেছে সেগুলো এদের তুলনায় একেবারে শিশু। একেকটা ঢেউ ফণা তুলে এগিয়ে আসছে, আর দাঁড় টেনে ডিঙিটাকে তার ওপর দিয়ে নিয়ে যেতে দম বেরিয়ে যাচ্ছে ওদের। অর্ধেক রাস্তা পেরোতে এখন যেন দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন সমতলের সোজা একটা রাস্তাকে তুলে নিয়ে কেউ উঁচুনিচু পাহাড় আর উপত্যকার ওপর দিয়ে পেতে দিয়েছে।

মোহনাটা পেরোনোর পর জিপিএস-এ আরেকবার রিডিং নিল পিয়া। কাজটা করতে খুব বেশি সময় লাগেনি, কিন্তু তাতেই এত পরিশ্রম হল যে দম ফিরে পেতে ওর প্রায় মিনিটখানেক সময় লেগে গেল। হিসেব করে যা পাওয়া গেল সেটাও খুব একটা উৎসাহিত হওয়ার মতো কিছু না। গতি যে কমেছে সেটাই বোঝা গেল আরেকবার, দেখা গেল প্রায় শামুকের মতো বেগে এখন এগোচ্ছে ওদের নৌকো।

মনিটরটা জায়গায় রেখে সবে দাঁড়ের দিকে হাত বাড়িয়েছে পিয়া, এমন সময় কী যেন একটা জিনিস ওর গাল ঘেঁষে কোলের ওপর উড়ে এসে পড়ল। চোখ ফিরিয়ে দেখল জঙ্গলের গাছের একটা পাতা। বাঁদিক থেকে এসেছে পাতাটা। সেদিকে এক পলক তাকাল পিয়া। দেখল বিশাল একটা নদীর একেবারে মধ্যিখানে রয়েছে ওদের ডিঙি। মানে, পাড় থেকে নৌকো পর্যন্ত প্রায় দু'কিলোমিটার পথ পাতাটাকে উড়িয়ে নিয়ে এসেছে হাওয়ায়।

খানিক এগিয়ে আরও একটা বাঁক নিতে হল নৌকোটাকে। হাওয়ার দিকে পেছন ফিরে এখন দাঁড় টানতে হচ্ছে পিয়াকে। যেদিক থেকে ঢেউ আসছে সেদিকটা চোখে পড়ছে না বলে কেমন অদ্ভুত অস্বস্তিকর লাগছে ব্যাপারটা। কোনোক্রমে ঢেউয়ের মাথায় পৌঁছনোর

পর জলের গিরিশিরার ওপর টালমাটাল একটা গা-গোলানো মুহূর্ত, তারপরেই আবার টলমল করতে করতে প্রায় চিত হয়ে নেমে আসা—ব্যালান্স রাখতে পিয়াকে দুহাতে নৌকোর কাঠ আঁকড়ে থাকতে হচ্ছে। নীচের দিকে নামতে থাকা ডিঙির মুখের দিক থেকে হুড়হুড় করে উথলে আসছে জল, মনে হচ্ছে যেন ঝপাস করে বালতিভর্তি জল কেউ ঢেলে দিচ্ছে পিঠের ওপর।

ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ক্রমাগত এই ওঠানামার ধাক্কায় আস্তে আস্তে আলগা হতে শুরু করেছে ফকিরের ডিঙির প্লাইউডের পাটাতন। মচমচ খটখট আওয়াজ উঠছে সেগুলো থেকে। হঠাৎ বাতাসের একটা ঝাঁপটায় একটুকরো প্লাইউডকে যেন ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল নৌকোর গা থেকে। মুহূর্তের মধ্যে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল সেটা। কয়েক মিনিট পরে আরও একটা টুকরো পাক খেতে খেতে উড়ে চলে গেল, তারপরে আরও একটা। ডিঙির খোলের মধ্যেটা এখন পরিষ্কার চোখে পড়ছে। ফকির যেখানে ওর কাঁকড়াগুলো জড়ো করে রেখেছে সে জায়গাটাও এখন দেখতে পাচ্ছে পিয়া।

আরও একটা মোড়। এবার পাশ থেকে আসছে হাওয়ার ঝাঁপট। নৌকোটা একেবারে কেতরে যাচ্ছে একদিকে। পিয়ার ডানহাতের দড়টা প্রায় ফুটখানেক ওপরে উঠে গেছে অন্যটার থেকে। ডিঙির পাশ দিয়ে ঝুঁকে পড়ে জলের নাগাল পেতে হচ্ছে সেদিকটায়। নৌকো কাত হয়ে যাওয়ায় ছইয়ের নীচে গড়াগড়ি খাচ্ছে ওর পিঠব্যাগ। পিয়া ভেবেছিল ছইয়ের আড়ালে শুকনো থাকবে ওটা, কিন্তু এখন আর কিছুই যায় আসে না। সব দিক থেকে এমনভাবে জলের ছিটে আসছে যে ডিঙির ওপর সবকিছুই ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। ঢেউয়ের মাথায় নৌকো আরেকবার লাফিয়ে উঠতেই শূন্যে ছিটকে উঠল পিঠব্যাগটা। ছই না থাকলে এতক্ষণে তলিয়েই যেত নদীতে। হাত থেকে দাঁড়দুটো নামিয়ে রাখল পিয়া। কোনোক্রমে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্যাগটার ওপর। দূরবিন, ডেথ-সাউণ্ডার থেকে শুরু করে ওর সমস্ত যন্ত্রপাতি রয়েছে এর ভেতরে। শুধু জিপিএস মনিটরটা ছাড়া। সেটা ও আগেই প্যান্টের বেল্টের সঙ্গে লাগিয়ে নিয়েছিল। তা ছাড়াও ওর সমস্ত ডেটাশিটগুলোও রয়েছে ওই ব্যাগের মধ্যে। সেগুলোকে প্লাস্টিকে মুড়ে একটা ক্লিপবোর্ডের সঙ্গে লাগিয়ে রেখেছে পিয়া। ওগুলো গেলে গত নদিন ধরে নোট করা ওর সমস্ত তথ্য জলে যাবে।

ব্যাগটাকে কী করে বাঁচানো যায় তার একটা উপায় খুঁজছিল পিয়া, এমন সময় দাঁড় টানা থামিয়ে ফকির একটা দড়ি ছুঁড়ে দিল ওর দিকে। কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল পিয়ার মন। হাত বাড়িয়ে দড়িটা নিয়ে ব্যাগের স্ট্র্যাপের মধ্যে দিয়ে গলিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিল ছইয়ের বাঁশের সঙ্গে। যন্ত্রপাতিগুলো সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নেওয়ার জন্যে একটুখানি ফাঁক করল ব্যাগের মুখটা। মজবুত ওয়াটারপ্রুফ কাপড়ে তৈরি বলে ব্যাগের ভেতরের জিনিসপত্র মোটামুটি শুকনোই আছে দেখা গেল। নিশ্চিন্ত হয়ে ফ্ল্যাপটা বন্ধ করতে গিয়ে হঠাৎ ভেতরের একটা পকেটের দিকে নজর পড়ল পিয়ার। ওর সেলফোনটা রাখা আছে সেখানে। ইন্ডিয়ায় এসে ওটা ব্যবহার করার কথা ভাবেইনি ও, ফলে একবারও অন করাই হয়নি যন্ত্রটা। চার্জও দেওয়া হয়নি কখনও। এখন এই টালমাটাল ডিঙির ওপর বসে হঠাৎ কেমন একটা কৌতূহল পেয়ে বসল পিয়াকে। সুইচ টিপে অন করে দিল ফোনটা। চেনা সবজে আলোটা পর্দায় ফুটে উঠতেই উৎসাহিত হয়ে উঠল ও। কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই মিইয়ে গেল সমস্ত উৎসাহ। স্ক্রিনের ওপর ভেসে ওঠা লেখায় দেখা গেল কাভারেজ এরিয়ার বাইরে রয়েছে ফোনটা এখন। যন্ত্রটা ব্যাগের পকেটে রেখে দিয়ে ফ্ল্যাপটা বন্ধ করে দিল পিয়া। তারপর আবার নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে দাঁড় তুলে নিল হাতে।

হাওয়ার জোর আরও বেড়ে গেছে। নৌকোটা আরও একটু কাত হয়ে পড়েছে একপাশে। আবার প্রাণপণে দাঁড় টানতে লাগল পিয়া। কিন্তু তার মধ্যেও মোবাইল ফোনটার কথাই ঘুরে ফিরে আসতে লাগল ওর মাথায়। মনে পড়ল, বইয়ে কি খবরের কাগজে কত লোকের কথা পড়েছে নানা সময়, যারা উলটে যাওয়া ট্রেনের তলা থেকে, ভূমিকম্পে ভেঙে

পড়া বাড়ির নীচ থেকে, জ্বলন্ত ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ভেতর থেকে মোবাইল ফোনে। আত্মীয় পরিজনদের জানিয়েছে তাদের বিপদের কথা।

আচ্ছা, মোবাইলটা যদি চালু থাকত তাহলে কাকে ফোন করত ও এখন? ওয়েস্ট কোস্টের বন্ধুদের? নাঃ। ওরা বুঝতেই পারত না ও কোথায় রয়েছে এখন। জায়গাটা বুঝিয়ে বলতেই অনেকটা সময় লেগে যেত। তাহলে কানাইকে? পিয়ার মনে পড়ল, সেই 'উপহারের' খামটার পেছনে ঠিকানা ছাড়াও কতগুলো ফোন নাম্বার লিখে দিয়েছিল কানাই। একটা মোবাইল নাম্বারও ছিল তার মধ্যে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই দিল্লি ফেরার প্লেনে উঠে পড়েছে কানাই। হয়তো বা অফিসে পৌঁছেও গেছে। এখন ওকে ফোন করলে অদ্ভুত হত ব্যাপারটা। হয়তো এমন কিছু একটা ও বলত যে হাসিই পেয়ে যেত পিয়ার। ভাবনাটা মাথায় আসতেই ঠোঁট কামড়াল পিয়া। একটু হাসতে পারলে এখন মন্দ হত না। উথাল পাথাল ঢেউয়ের ওপর মোচার খোলার মতো দুলছে নৌকোটা। কাঠের জোড়গুলো থেকে কেমন একটা গোঙানির মতো শব্দ আসছে, যে-কোনও মুহূর্তে টুকরো টুকরো হয়ে ভেসে যেতে পারে তক্তাগুলো।

শক্ত করে চোখদুটো বন্ধ করল পিয়া, ছেলেবেলায় যেমন করত। প্রার্থনা করার মতো বিড়বিড় করে বলল, জলের মধ্যে নয়, প্লিজ। কিছু হলে শক্ত মাটির ওপরে হোক, জলে নয়; জলের মধ্যে যেন কিছু না হয়।

আরেকটা বাঁকের মুখে এসে পড়ল ওদের ডিঙি। বাঁকটা ঘুরতেই উবু হয়ে উঠে বসল ফকির। আঙুল তুলে দূরের এক চিলতে ডাঙার দিকে ইশারা করল : গর্জনতলা।

"মেঘা? হরেন?" জিজ্ঞেস করল পিয়া। ফকির মাথা নাড়ল। আরেকটু ভাল করে দেখার জন্যে পিয়া উঠে দাঁড়াল। কিন্তু এক নজরেই বোঝা গেল ফকির ভুল বলেনি—হরেনের লঞ্চটা ওখানে নেই। দ্বীপের চারপাশে ধু ধু করছে জল; ফুঁসে ওঠা ঢেউ আর তাদের মাথায় সাদা ফেনা ছাড়া আর কিচ্ছু চোখে পড়ছে না কোথাও।

ব্যাপারটা তখনও হজম করার চেষ্টা করছে পিয়া, এমন সময় ডিঙির ছইয়ের নীচে লাগানো পলিথিনটা হঠাৎ পটপট করে উঠল হাওয়ার টানে-সেই ছাই রঙের পলিথিনটা, মার্কিন মেলব্যাগের থেকে কেটে নেওয়া, প্রথম দিন ডিঙিতে পা দিয়েই যেটা চোখে পড়েছিল পিয়ার। ছইয়ের বাতার নীচ থেকে হঠাৎই খুলে বেরিয়ে এল প্লাস্টিকটা, হাওয়ার টানে ফুলে উঠল পালের মতো। সঙ্গে সঙ্গে মচমচ করে উঠল নৌকোর কাঠগুলো। দাঁত নখওয়ালা হিংস্র একটা জন্তুর মতো ঝড়টা যেন ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে চাইছে নৌকোটাকে।

হাওয়ার তোড়ে ফুলে ওঠা প্লাস্টিকের টুকরোটার বাঁধনে টান পড়তেই ডিঙির পেছনদিকটা উঁচু হয়ে উঠল। সামনের দিকটা নিচু হয়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল জলের ওপর। দাঁড়-টাড় ফেলে এক লাফ দিয়ে ফকির এগিয়ে গেল বাঁধন খুলে প্লাস্টিকটাকে আলগা করে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু দড়ি কাটতে কাটতেই হঠাৎ মড়মড় করে প্রচণ্ড একটা শব্দ শোনা গেল এক ঝটকায় ডিঙির গা থেকে ভেঙে বেরিয়ে গেল ছইটা, হাওয়ার তোড়ে উড়ে গেল শূন্যে। পেছন পেছন ঘুড়ির লেজের মতো উড়ে চলে গেল দড়িদড়ায় জড়ানো পিয়ার পিঠব্যাগ। দেখতে দেখতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্লাস্টিকের টুকরো, নৌকোর ছই, যন্ত্রপাতি ডেটাশিট আর কানাইয়ের উপহার সমেত পিয়ার ব্যাগ-ট্যাগ সমস্ত নিয়ে জবড়জং জিনিসটা এত দূরে চলে গেল যে কালো আকাশের গায়ে ছোট্ট একটা বিন্দুর মতো দেখাতে লাগল সেটাকে।

রায়মঙ্গলের মোহনা থেকে মেঘা যখন লুসিবাড়ির দিকে মোড় নিল, ঘড়ির কাঁটা তখন প্রায় এগারোটার ঘর ছুঁয়েছে। জল থইথই করছে চারদিকে—অদ্ভুত অর্ধস্বচ্ছ জল। সিসার মতো কালো আকাশের নীচে সেই বাদামি জল থেকে যেন নিয়নের মতো আভা বেরোচ্ছে, মনে হচ্ছে নদী যেন ভেতর থেকে জ্বলছে।

যে ক'টা মোহনা ওরা এখনও পর্যন্ত পার হয়ে এসেছে, তাদের সবার থেকে বেশি এই মোহনার বিস্তার; এত বড় বড় ঢেউও আগে দেখা যায়নি। সে ঢেউয়ের মুখে পড়তেই ভটভটির ইঞ্জিনের ছন্দ বদলে গেল—একটানা ঘ্যানঘ্যানে একটা আওয়াজ তুলে ফুলে ওঠা

জল কেটে এগোতে লাগল মেঘা। লঞ্চের মুখে ফেটে যাওয়া ঢেউ সমানে লাফিয়ে উঠতে লাগল শূন্যে, উড়ে আসা জলের কণায় ধুয়ে যেতে লাগল সারেঙের কেবিনের কাঁচের জানালা।

কানাই প্রায় সমস্ত সময়টাই সারেঙের কেবিনে হরেনের পাশের সিটটাতে বসেছিল। হাওয়ার জোর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কথা কমে আসছিল হরেনের, ক্রমশ আরও গম্ভীর হয়ে উঠছিল মুখটা। রায়মঙ্গলের বড় মোহনায় পড়ার পর কানাইয়ের দিকে তাকিয়ে ও বলল, "প্রচুর জল ঢুকছে লঞ্চে। ইঞ্জিনে একবার যদি ঢুকে যায় তাহলে কিন্তু আর কোনো আশা নেই। আপনি বরং একবার নীচে গিয়ে দেখুন কিছু করতে পারেন কিনা।"

ঘাড় নেড়ে উঠে দাঁড়াল কানাই। একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়াতে হচ্ছিল, যাতে নিচু ছাদে মাথা না ঠুকে যায়। দরজা খোলার আগে লুঙ্গির খুঁটটা কোমরে গুঁজে নিল ও।

"সাবধান," পেছন থেকে বলল হরেন। "ডেকটা কিন্তু ভীষণ পিছল হয়ে আছে।" হাতল ঘোরাতেই হাওয়ার তোড়ে হাত থেকে যেন ছিনিয়ে নিয়ে গেল পাল্লাটাকে; দড়াম করে খুলে গিয়ে সেটা ধাক্কা মারল কেবিনের দেওয়ালে। লাথি মেরে পা থেকে চটিগুলোকে সারেঙের ঘরের ভেতর ছুঁড়ে দিয়ে দরজাটার মোকাবিলা করার জন্যে তৈরি হল কানাই। পাশ থেকে ঘুরে গিয়ে কাঁধ দিয়ে ঠেলা মারতে হল হাওয়ার উলটোদিকে সেটাকে বন্ধ করার জন্যে। রেলিং-এ পিঠ ঠেকিয়ে এক পা এক পা করে তারপর নীচে নামার মইটার দিকে এগোতে লাগল ও। মইটা একেবারে খোলা হাওয়ার মুখোমুখি। তার প্রথম ধাপটায় পা রাখতেই কানাইয়ের ওপর যেন আছড়ে পড়ল ঝড়ের তাড়স। চটিদুটো না রেখে এলে নির্ঘাত পা থেকে খুলে নিয়ে চলে যেত হাওয়ায়। বাতাসের এমনি টান যে কানাইয়ের মনে হল মুহূর্তের জন্যে হাত আলগা হলেই হাওয়ায় মইয়ের থেকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে নীচের উথাল পাথাল জলের মধ্যে ফেলে দেবে ওকে। শেষ ধাপটা থেকে নেমে গুহার মতো খোলটার ভেতরে ঢুকতেই প্রায় তিন সেন্টিমিটার জলের মধ্যে ডুবে গেল কানাইয়ের পায়ের পাতা। অন্ধকার হয়ে আছে ভেতরটা। খোলের প্রায় শেষ বরাবর, যে খোপের মধ্যে ডিজেল ইঞ্জিনটা বসানো আছে, তার পাশে নগেনকে দেখতে পেল কানাই। একটা প্লাস্টিকের বালতি দিয়ে নগেন প্রাণপণে খোলের ভেতর থেকে জল তুলছে আর বাইরে ফেলছে।

গোড়ালি-ডোবা জলের মধ্যে দিয়ে কানাই আস্তে আস্তে এগোল সেদিকে। "আরেকটা বালতি আছে?"

জবাবে আঙুল তুলে একটা টিনের দিকে দেখাল নগেন। তেলতেলে জলের ওপরে ভাসছে টিনটা। সেটার হাতলটা ধরে জলে ডোবাতে যেতেই ভটভটিটা হঠাৎ একপাশে কাত হয়ে গেল। উলটে পড়ে যেতে যেতে কোনওরকমে সামলে নিল কানাই। কোনও রকমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ও দেখল টিনে করে জল তোলাটা যতটা সোজা হবে মনে করেছিল তত সহজ নয় ব্যাপারটা। মেঘার দুলুনিতে খোলের ভেতরে জমা জল এমনভাবে নড়ছে যে মনে হচ্ছে যেন ওদের সঙ্গে খেলা করছে জলটা। ওরা দুজনে মিলে সমানে এদিক ওদিক লাফ ঝপ করে যাচ্ছে, কিন্তু যতটা কসরত করছে বালতি ততটা ভরতে পারছে না। খানিক বাদে জল তোলা থামিয়ে পাড়ের দিকে ইশারা করল নগেন। বলল, "লুসিবাড়ির কাছাকাছি এসে গেছি আমরা। ওখানেই যাবেন তো আপনি?"

"হ্যাঁ। কিন্তু তোমরা যাবে না?"

"না। আমরা এর পরের দ্বীপটাতে নামব। এই এলাকায় ঝড়ের সময় ওখানেই একমাত্র নিশ্চিন্তে গিয়ে ওঠা যায়। আপনি বরং ওপরে গিয়ে একবার দাদুকে জিগ্যেস করুন কী করে লুসিবাড়িতে আপনাকে নামানো হবে। এই হাওয়ার মধ্যে ওখানে গিয়ে নামা কঠিন হবে।"

"ঠিক আছে।" এঁচোড়-পাচোড় করে মই বেয়ে আস্তে আস্তে আবার ওপরে গিয়ে উঠল কানাই। পিছল ডেকের ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে ফিরে গেল সারেঙের ঘরে।

"কী অবস্থা নীচে?" জিগ্যেস করল হরেন।

"মোহনার মাঝখানটায় যখন ছিলাম তখন বেশ খারাপই ছিল। এখন খানিকটা ভাল।"

বুড়ো আঙুল দিয়ে জানালার কাছে টোকা মারল হরেন। "ওই দেখুন, সামনে লুসিবাড়ি দেখা যাচ্ছে। আপনি কি ওখানেই নামবেন, না আমাদের সঙ্গে যাবেন?"

জবাবটা আগের থেকেই ভেবে রেখেছিল কানাই। "আমি লুসিবাড়িতেই নামব। মাসিমা একা আছেন। ওনার কাছে যাওয়া উচিত আমার।"

"ঠিক আছে। পাড়ের যতটা কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব আমি নিয়ে যাব ভটভটিটাকে। বাকিটা কিন্তু আপনাকে জলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়ে উঠতে হবে।"

"আর আমার সুটকেসটার কী হবে?"

"ওটা আপনি রেখেই যান। আমি পরে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসব।"

সুটকেসের মধ্যে একটা জিনিসের জন্যেই সবচেয়ে বেশি মায়া কানাইয়ের। বলল, "ঠিক আছে। ওই নোটবইটা ছাড়া বাকি আর যা আছে সব রেখে যাচ্ছি। কিন্তু নোটবইটা সঙ্গে নিয়ে যাব। প্লাস্টিক দিয়ে মুড়ে নেব, যাতে ভিজে না যায়। ওটা আমি নিয়ে যেতে চাই।"

"এই যে, এটা নিন।" স্টিয়ারিং-এর নিচ থেকে পলিথিনের একটা ব্যাগ বের করে কানাইয়ের হাতে দিল হরেন। "কিন্তু এবার তাড়াতাড়ি করুন। প্রায় পৌঁছে গেছি আমরা।"

সারেঙের ঘর থেকে ডেকের ওপর বেরিয়ে এল হরেন। দু-এক পা এগিয়েই কেবিন। কোনোরকমে গলে যাওয়ার মতো দরজাটা ফাঁক করে চট করে ভেতরে ঢুকে পড়ল কানাই। আধো অন্ধকারের মধ্যে সুটকেসটা খুলল, নির্মলের নোটবইটা বের করল, তারপর যত্ন করে সেটাকে মুড়ে নিল পলিথিনে। প্যাকেটটা সঙ্গে নিয়ে কেবিন থেকে বেরোতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল ভটভটির ইঞ্জিনটা।

ডেকের ওপরে হরেন অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে। "খুব বেশিদূর যেতে হবে না আপনাকে," মিটার তিরিশেক দূরে লুসিবাড়ির বাঁধের দিকে ইশারা করে বলল হরেন। বাঁধের গোড়ার দিকে ঠিক যেখানটায় মোহনার ঢেউগুলো এসে আছড়ে পড়ছে দ্বীপের ওপর, একটানা একটা সাদা ফেনার রেখা দেখা যাচ্ছে। "জল খুব একটা বেশি নয়," হরেন বলল। "কিন্তু খুব সাবধানে যাবেন।" তারপর কী মনে হতে বলল, "আর ময়নার সঙ্গে যদি আপনার দেখা হয় ওকে বলবেন ঝড়টা একটু কমলেই আমি গিয়ে ফকিরকে নিয়ে আসব।"

"আমিও তখন যাব আপনার সঙ্গে," বলল কানাই। "মনে করে লুসিবাড়ি হয়ে যাবেন কিন্তু।"

"ঠিক সময় মতো এসে আপনাকে তুলে নেব আমি,"হাত তুলে কানাইকে বিদায় জানাল হরেন। "আর ময়নাকে কথাটা বলতে ভুলবেন না যেন।"

"ভুলব না।"

লঞ্চের পেছনের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল কানাই। আগে থেকেই নগেন সেখানে একটা তক্তা লাগিয়ে রেখেছে। "পেছন ফিরে পা রাখুন তক্তাটার ওপরে," কানাইকে সাবধান করে দিল নগেন। "মই বেয়ে নামার মতো দু'হাতে কাঠটাকে ধরে ধরে নামুন। নইলে কিন্তু হাওয়ার টানে উলটে পড়ে যাবেন।"

"ঠিক আছে।" পলিথিনে মোড়া নোটবইটাকে লুঙ্গির কষিতে বেঁধে নামার জন্যে প্রস্তুত হল কানাই। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে নিচু হয়ে দু'হাতে তক্তার দুটো ধার চেপে ধরল শক্ত করে। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল নগেনের পরামর্শ না নিলে সত্যি সত্যিই হাওয়ার টানে জলের মধ্যে গিয়ে পড়ত ও। নামার সময় হাতদুটো ব্যবহার না করলে এ হাওয়ার ঝাঁপট সামলানো অসম্ভব। পেছন ফিরে চার হাতপায়ে হামাগুড়ি দিয়ে নামতে লাগল কানাই।

সোজা হয়ে দাঁড়াল একেবারে তক্তা থেকে নামার পর। জলে নামার পর নীচের নরম কাদায় আস্তে আস্তে ডুবে যেতে লাগল পায়ের পাতা। মুহূর্তের জন্য তক্তাটাকে আঁকড়ে ধরে টাল সামলাল কানাই। কোমরের একটু নীচ পর্যন্ত জল এখানটায়। প্রচণ্ড স্রোতের টানে সোজা হয়ে দাঁড়ানোই কঠিন। নোটবইটা প্রায় বুকের কাছে তুলে নিল কানাই। তারপর সামনের বাঁধের দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে খালি পায়ে খুব সাবধানে এক পা এক পা করে এগোতে লাগল জল ঠেলে। জল যখন হাঁটুর কাছাকাছি নেমে এল তখন অবশেষে একটু

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল—প্রায় চলে এসেছে এখন, বাকি জলটুকু পেরিয়ে পাড়ে গিয়ে ওঠা যাবে শেষ পর্যন্ত। পেছনে ভটভটির ইঞ্জিন চালু হল আবার। শব্দটা কানে আসতে ঘুরে তাকাল কানাই।

ঠিক এই অসতর্ক মুহূর্তটুকুর জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল হাওয়াটা। একপাক ঘুরিয়ে কাত করে কানাইকে ফেলে দিল জলের মধ্যে। হাবুডুবু খেতে খেতে দুটো হাত কাদার মধ্যে ঠেসে ধরল ও। তারপর টলমল করে কোনওরকমে দাঁড়িয়ে উঠেই দেখতে পেল মিটার দশেক দূরে স্রোতের টানে দুলতে দুলতে ভেসে যাচ্ছে নোটবইটা। কয়েক মিনিট ভেসে থাকার পর আস্তে আস্তে সেটা তলিয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে।

তরী থেকে তীরে

নৌকো যখন গর্জনতলায় পৌঁছল, এমনিতে তখন ভাটার সময়। কিন্তু ঝড়ের টানে এমন ফুলে উঠেছে নদী যে ভরা জোয়ারেও অতটা জল উঠতে কখনও দেখেনি পিয়া। হাওয়ার তোড়ে নদীটা যেন খানিকটা হেলে পড়েছে একদিকে। জলটাকে যেন ক্রমশ ঢালু হয়ে আসা একটা ঢিপির মতো করে এক জায়গায় জড়ো করে রেখেছে কেউ। সে ঢিপির মাথাটা দ্বীপের পাড়ের চেয়েও বেশ খানিকটা উঁচু।

জটপাকানো শেকড়-বাকড়ের ফাঁক দিয়ে ডিঙিটাকে কতগুলো ঘন হয়ে দাঁড়ানো গাছের একেবারে মাঝখানে নিয়ে চলে এল ফকির। পিয়া লক্ষ করল, অন্যান্যবার গর্জনতলায় এসে ফকির যেখানে ডিঙি রাখে এবার কিন্তু সেদিকটায় ও গেল না। তার বদলে জলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে থাকা দ্বীপের সবচেয়ে উঁচু জায়গাটার দিকে নিয়ে গেল নৌকোটাকে।

ডিঙির মাথাটা যখন গাছগুলোর একদম কাছাকাছি এসে গেছে, পাশ দিয়ে এক লাফ মেরে ফকির নেমে গেল জলের মধ্যে। তারপর নৌকোটাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল দ্বীপের আরও ভেতরে। গলুইয়ের একদম সামনে থেকে টানছিল ফকির, যাতে সহজে নৌকোর দিক বদলানো যায় দরকার মতো। আর পিয়া চলে গেল একেবারে পেছনে, যেখান থেকে সর্বশক্তিতে ঠেলা মারা যায়। ঠেলতে ঠেলতে নৌকোটাকে কতগুলো গুঁড়ির ফাঁকে ঢুকিয়ে দিল দু'জনে। তারপর এক লাফ মেরে ফকির উঠে পড়ল তার ওপর। আস্তে আস্তে নৌকোর পেছন দিকে গিয়ে খুলে ফেলল খোলের পাটাতনটা। পিয়াও উঠে এসেছে ততক্ষণে। ফকিরের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে আশ্চর্য হয়ে দেখল এত ঝড়-ঝাঁপটা সত্ত্বেও নৌকোর খোলটা আর তার ভেতরের জিনিসপত্র কিন্তু মোটামুটি ঠিকঠাকই আছে। ফকিরের উনুন আর বাসনপত্রের সঙ্গে কয়েকটা নিউট্রিশন বারও দেখা যাচ্ছে সেখানে। তার মধ্যে গড়াগড়ি যাচ্ছে গোটা দুই জলের বোতল। নিউট্রিশন বারগুলোকে জিনসের পকেটে পুরে নিল পিয়া, আর এক বোতল জল নিয়ে ফকিরের হাতে দিল। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে এলেও খুব সাবধানে সামান্য একটু জল নিজের গলায় ঢালল। এই দু' বোতল দিয়েই কতক্ষণ যে চালাতে হবে কে জানে।

খোলের মধ্যে থেকে ফকির তারপর পুরনো একটা শাড়ি বের করে আনল। পিয়ার মনে পড়ল কদিন আগেই ওটাকে একদিন মাথার বালিশ করে শুয়েছিল ও। কাপড়টাকে শরীর দিয়ে আড়াল করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে একটা দড়ি বানিয়ে ফেলল ফকির; ইশারায় পিয়াকে বলল সেটাকে কোমরে বেঁধে নিতে। কারণটা বুঝতে না-পারলেও ফকিরের কথামতো দড়িটা কোমরে জড়িয়ে নিল পিয়া। ফকির ততক্ষণে আবার খোলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে গোল করে গুটিয়ে রাখা কাঁকড়া ধরার সুতোটা বের করে এনেছে। নাইলন সুতোর বান্ডিলটা পিয়ার হাতে দিয়ে দিল ও। ইশারায় বলল সাবধানে ধরতে। একটু অসতর্ক হলেই সুতোয় বাঁধা খোলামকুচি কি মাছের কাটায় কেটেকুটে যেতে পারে হাত-পা। এরপর ডিঙি থেকে নেমে এসে পিয়াকে দেখিয়ে দিল কী করে বান্ডিলটাকে বুক দিয়ে হাওয়া থেকে আড়াল করে সুতো ছাড়তে হয়। নৌকোটাকে উলটে দিয়ে তার তক্তার ফঁকফোকরের মধ্যে দিয়ে সুতো গলিয়ে সুতোর বাকি অংশটা চারপাশের গাছগুলোর চারদিকে জড়িয়ে দিতে লাগল ফকির তারপর। পিয়া বুঝতে পারল ওর কাজ হচ্ছে সুতোটার দিকে নজর রাখা, যাতে সেটা টানটান থেকে সব জায়গায়। কারণ কোথাও একটু আলগা হলেই হাওয়ার টানে উড়ে যাবে সুতো, তাতে বাঁধা কঁকড়ার চার আর খোলামকুচি গুলিগোলার মতো এসে লাগবে গায়ে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘন মাকড়শার জালের মতো নাইলনের সেই সুতোর বুনোনে চারপাশের গাছগুলোর সঙ্গে বাঁধা হয়ে গেল ডিঙিটা। কিন্তু যতটা সম্ভব সতর্ক থাকা সত্ত্বেও সুতোয় বাঁধা শক্ত জিনিসগুলোর থেকে পুরোপুরি গা বাঁচাতে পারেনি ফকির। কাজ শেষ হওয়ার পর দেখা গেল ছোট ছোট কাটা-ছড়ার দাগে ভর্তি হয়ে গেছে ওর সারাটা মুখ আর বুক।

তারপর পিয়ার হাত ধরে দ্বীপের আরও গভীরে এগিয়ে চলল ফকির। হাওয়ার উলটোদিকে চলার জন্যে নিচু হয়ে প্রায় গুঁড়ি মেরে এগোতে হচ্ছিল ওদের। চলতে চলতে একসময় লম্বা একটা গাছের কাছে এসে পৌঁছল দু'জন। গাছটা সাধারণ বাদাবনের গাছের তুলনায় অস্বাভাবিকরকম উঁচু, গুঁড়িটাও অনেকটা মোটা। ইশারায় ফকির সেই গাছের ওপরে উঠে পড়তে বলল পিয়াকে। তারপর নিজেও উঠতে লাগল পেছন পেছন। মাটি থেকে মিটার তিনেক ওপরে ওঠার পর একটা মোটা ডাল বেছে নিয়ে তার ওপরে বসতে বলল পিয়াকে। ইশারায় দেখিয়ে দিল কীভাবে গুঁড়ির দিকে মুখ করে দু'পা দু'দিকে ঝুলিয়ে বসতে হবে। তারপর মোটর সাইকেলের পেছনের সিটে যেভাবে বসে, সেইভাবে পিয়ার পেছনে বসে পড়ল নিজে। ঠিকমতো বসার পর হাতের ইশারায় পিয়ার কোমরে বাঁধা পেঁচানো শাড়িটা চাইল ফকির। এতক্ষণে পিয়া বুঝতে পারল ফকির কেন ওটা সঙ্গে নিয়ে এসেছে—গাছের গুঁড়ির সঙ্গে শাড়িটা দিয়ে নিজেদের বাঁধতে চাইছে ও। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে পেঁচানো কাপড়টার একটা প্রান্ত ফকিরের হাতে দিল পিয়া। গাছের চারদিকে সেটাকে বেড় দিয়ে আনতে হাত লাগাল নিজেও। শাড়িটা দিয়ে দু'বার বেড় দেওয়া গেল গাছটাকে। তারপর তার দুটো প্রান্ত একসঙ্গে এনে কষে একটা গিট বেঁধে ফেলল ফকির।

এক মুহূর্তের জন্যেও বিরাম নেই ঝড়ের, উলটে বরং সমানে বেড়েই চলেছে হাওয়ার তেজ। ঝড়ের শব্দ একটা সময় এত জোরালো হয়ে উঠল যে পিয়ার কানে একেবারে অন্যরকম শোনাতে লাগল সেটা। যেন তা বাতাসের আওয়াজ নয়, অন্য কোনও নৈসর্গিক শক্তির গর্জন। শোঁ শোঁ সড়সড় খসখস আওয়াজের জায়গা নিল বুক কাঁপানো একটা গম্ভীর গুমগুম শব্দ—মনে হল যেন নড়েচড়ে উঠছে গোটা পৃথিবীটা। তীব্র হাওয়ার সঙ্গে ঘন কুয়াশার মতো উঠে আসছে ধুলো, জলের কণা, কাঠকুটো, গাছের ঘেঁড়া পাতা, ডালপালা। ফলে কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছে না কোনওদিকে। এমনিতেও অন্ধকার হয়ে এসেছে চারদিক; ঘড়ির কাটায় সবেমাত্র দুপুর একটা, কিন্তু আলো এত কমে গেছে যে মনে হচ্ছে যেন রাত নেমে এসেছে প্রায়। বাতাসের তেজ যে এর থেকেও বেশি হতে পারে, আরও ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে ঝড়ের তাণ্ডব, এই মুহূর্তে সেটা কল্পনা করাও কঠিন। কিন্তু পিয়া মনে মনে পরিষ্কার বুঝতে পারছিল যে এ ঝড় আরও বাড়বে বই কমবে না।

সারা শরীর, গায়ের জামাকাপড় সব মাখামাখি হয়ে গেছে কাদায়। খালি পায়ে প্রায় হামাগুড়ি দিতে দিতে উঁচু পাড়িটা পেরিয়ে এল কানাই, হাওয়ার ঝাঁপটা থেকে বাঁচার জন্য গুটিসুটি মেরে বসে রইল বাঁধের গোড়ায়। ভিজে সপসপ করছে মাথার চুল থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত, তার ওপরে ঝড়ের তেজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা হয়ে আসছে বাতাস। দু'হাতে নিজেকে জড়িয়ে ধরে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে কানাই আকাশের দিকে তাকাল।

নীলের কোনও চিহ্ন নেই আকাশে, কিন্তু কালো রংটাও টানা একরকম নয় সব জায়গায়। কোথাও গাঢ়, কোথাও হালকা—নানারকম শেডের কালো মেঘে ছেয়ে আছে সমস্ত আকাশ। কোথাও সে মেঘ ছাইয়ের মতো ধূসর, কোথাও সিসার মতো নীলচে কালো। গোটা আকাশ জুড়ে নানা স্তরে যেন ছড়িয়ে রয়েছে নানারকম মেঘ। তাদের প্রত্যেকের রং আলাদা, গতি আলাদা। কানাইয়ের মনে হল আকাশটা যেন কালো কাঁচের একটা আয়না, ভাটির দেশের জলের ছায়া পড়েছে তাতে। সে জলের নানারকম স্রোত, ছোট বড় ঘূর্ণি—সবকিছু দেখা যাচ্ছে ওই আয়নায়। রঙের তফাত সামান্য হলেও আয়নার গায়ে নদী নালা ঘূর্ণিগুলোকে চিনে নিতে অসুবিধা হচ্ছে না একটুও।

বাঁধ বরাবর টানা সারি দেওয়া ঝাউগাছগুলো হাওয়ার দাপটে নুয়ে প্রায় দু' ভাঁজ হয়ে গেছে। আশেপাশে নারকেলগাছ যে ক'টা আছে তাদের পাতাগুলো সব মুচড়ে পাকিয়ে গিয়ে আগুনের শিখার মতো চেহারা নিয়েছে। ফলে এমনিতে বাঁধের কাছ থেকে দ্বীপের ভেতরে যতটা দেখা যায় তার থেকে অনেক বেশিদূর পর্যন্ত চোখ চলে যাচ্ছে এখন। লুসিবাড়ির সবচেয়ে উঁচু বাড়িগুলির একটা হল হাসপাতালটা, সেটা খুব সহজেই চোখে পড়ছে এখান থেকে।

হাসপাতালের দিকে দৌড়তে শুরু করল কানাই, কিন্তু কয়েক পা গিয়েই গতি কমাতে হল। পিছল হয়ে আছে ভেজা রাস্তা, কাদার মধ্যে বারবার হড়কে যাচ্ছে খালি পা। বেশ খানিকটা এগোনোর পরও কোনও লোকজন চোখে পড়ল না পথে—বেশিরভাগই বোধহয় পালিয়েছে ঘরবাড়ি ছেড়ে। যারা রয়ে গেছে, তারাও মনে হল শক্ত করে খিল এঁটে বসে রয়েছে নিজের নিজের নিরাপদ আশ্রয়ে। কিন্তু হাসপাতাল চত্বরের গেটটা যখন চোখে পড়ল, কানাই দেখল দলে দলে মানুষ সার বেঁধে এগিয়ে চলেছে সেদিকে—সবাই হাসপাতাল বাড়িতে গিয়ে উঠতে চায়। কারণটা বোঝা খুব একটা কঠিন নয়। বেশ শক্তপোক্ত গড়ন বাড়িটার, দেখলেই বেশ ভরসা পাওয়া যায় মনে। বেশিরভাগ মানুষই আসছে পায়ে হেঁটে। কেউ কেউ আবার রিকশা ভ্যানে চড়ে বসেছে— বিশেষ করে বুড়োবুড়ি আর কচি বাচ্চারা। কানাইও পায়ে পায়ে এগোল ভিড়ের সঙ্গে। দালানে পা দিয়েই দেখল পুরোদস্তুর উদ্বাসনের কাজ শুরু হয়ে গেছে সেখানে। দলে দলে নার্স আর ভলান্টিয়াররা ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে, করিডোর ধরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পেশেন্টদের, সিঁড়ি দিয়ে ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে তুলছে ওপরের সাইক্লোন শেল্টারে।

একতলার লম্বা বারান্দার একপ্রান্তে দাঁড়িয়েছিল ছোট্টখাট্ট চেহারার একটা বাচ্চা ছেলে। ভিড় কাটিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল কানাই—"টুটুল?"

ছেলেটা চিনতে পারল না ওকে। জবাবও দিল না কোনও। কানাই উবু হয়ে ওর সামনে বসে আবার জিজ্ঞেস করল, "টুটুল, তোমার মা কোথায়?"

মাথা নেড়ে সামনের একটা ওয়ার্ডের দিকে ইশারা করল টুটুল। সেদিকে যাবে বলে কানাই যেই উঠে দাঁড়াতে গেছে, ঝড়ের মতো সেখান থেকে বেরিয়ে এল ময়না—তার পরনে নার্সের সাদা ইউনিফর্ম। কানাইয়ের ভেজা লুঙ্গি আর কাদামাখা জামার দিকে তাকাল একবার; চিনতে পারল না।

"ময়না, আমি কানাই।"

বিস্ময়ে মুখে হাত চাপা দিল ময়না। "কানাইবাবু! এ কী অবস্থা হয়েছে আপনার?"

"সে কথা পরে হবে," বলল কানাই। "শোনো, একটা জরুরি কথা বলার আছে। তোমাকে—"

কথার মাঝখানেতে ওকে থামিয়ে দিল ময়না। "ওরা কোথায়? আমার বর আর ওই আমেরিকান মেয়েটা?"

"সেটাই বলতে যাচ্ছি তোমাকে, ময়না," জবাব দিল কানাই। "ওরা গর্জনতলায় রয়ে গেছে। ওদের ওখানে রেখেই চলে আসতে হয়েছে আমাদের।"

"ওদের ফেলে রেখে চলে এলেন আপনি?" ঘৃণা আর ক্রোধ ঝরে পড়ছে ময়নার দু'চোখে। "এই প্রচণ্ড সাইক্লোন আসছে—তার মধ্যে জঙ্গলে ফেলে রেখে চলে এলেন ওদের?"

"আমার নিজের ইচ্ছায় আসিনি ময়না। ফিরে আসার ব্যাপারটা হরেনই ঠিক করেছিল। ও-ই বলল ফিরতে হবে, তা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।"

"আচ্ছা?" হরেনের নামটা শুনে একটু যেন ঠান্ডা হল ময়না। কিন্তু ওরা এখন কী করবে? ওই জঙ্গলের মধ্যে—একটুও আড়াল নেই কোথাও..."

"কিছু হবে না, ময়না," বলল কানাই। "ফকির সব জানে, কীভাবে কী করতে হয় এরকম অবস্থায়। তোমার কোনও চিন্তা নেই। আগেও তো ওই দ্বীপে কত লোক ঝড়ের মুখ থেকে ফিরে এসেছে। ফকিরের দাদুই তো একবার ঝড়ে পড়েছিলেন ওখানে, তাই না?"

খানিকটা যেন হাল ছেড়ে দিয়ে মাথা নাড়ল ময়না। "এখন তো আর কিছুই করার নেই, শুধু ভগবানকে ডাকা ছাড়া।"

"হরেন তোমাকে বলতে বলে দিয়েছে যে ঝড়টা থামলেই ও ফিরে যাবে ওখানে। আমিও যাব বলেছি। যাওয়ার পথে হরেন তুলে নিয়ে যাবে আমাকে।"

"বলবেন আমিও যাব," এক হাতে টুটুলের হাত ধরে বলল ময়না। "মনে করে বলবেন

কিন্তু।”

“নিশ্চয়ই বলব,” গেস্ট হাউসটার দিকে এক নজর তাকিয়ে জবাব দিল কানাই। “আমি বরং একবার গিয়ে দেখি মাসিমা কোথায় আছেন?”

“মাসিমাকে নিয়ে গেস্ট হাউসের দোতলায় উঠে যান,” ময়না বলল। “আমি জানালাগুলো সব বন্ধ করে দিয়ে এসেছি। কোনও অসুবিধা হবে না।”

ঢেউ

একটা একটা করে মিনিট যাচ্ছে আর ক্রমশ বড় হচ্ছে উড়ে আসা জঞ্জালের মাপ। শুরুতে শুধু ছোট ছোট ডালপালা আর কাঠকুটো উড়ে আসছিল হাওয়ার মুখে, তাদের জায়গায় এখন পাক খেতে খেতে ধেয়ে আসছে গোটা গোটা নারকেল গাছ আর আস্ত সব গাছের গুঁড়ি। ঝড়ের তেজ বাড়তে বাড়তে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে, যে এক সময় পিয়া দেখল গোটা একটা দ্বীপ যেন উড়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে। বস্তুটা আসলে আর কিছুই না, জঙ্গলের একগোছা গাছ, জটপাকানো শেকড়-বাকড়ে একসঙ্গে জড়ানো। হঠাৎ ফকিরের হাত শক্ত হয়ে চেপে বসল ওর কাঁধের ওপর। এক নজর তাকিয়ে পিয়া দেখল মাথার ওপর বনবন করে পাক খাচ্ছে একটা চালাঘর। চালাটাকে দেখেই চিনতে পারল পিয়া। গর্জনতলার জঙ্গলের ভেতরে যে মন্দিরের কাছে ফকির একবার ওকে নিয়ে গিয়েছিল, ওটা সেই মন্দিরটা। ওদের চোখের সামনে টুকরো টুকরো হয়ে গেল বাঁশের কাঠামোটা, মূর্তিগুলো ছিটকে উড়ে গেল হাওয়ার সঙ্গে।

ঝড়ের তাণ্ডব বাড়ার সাথে সাথে সামনের গাছ আর পেছনে ফকিরের মাঝখানে আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে যেতে থাকল পিয়ার শরীর। যে ডালের ওপর ওরা বসেছিল সেটা গাছের গুঁড়ির আড়াল করা দিকটায়, হাওয়া যেদিক থেকে আসছে তার উলটোদিকে। মানে, ডালের ওপর দু'দিকে দুই পা ছড়িয়ে হাওয়ার দিকে মুখ করে বসেছিল পিয়া আর ফকির গুঁড়ির ছায়ার' আড়ালে। এভাবে না বসলে এতক্ষণে ঝড়ের সাথে উড়ে আসা আবর্জনার ধাক্কায় থেঁতলে যেত ওরা দু'জন। যতবার একটা করে ডাল ভাঙছে অথবা উড়ন্ত কোনও কাঠকুটো এসে ধাক্কা খাচ্ছে গাছের গায়ে, সারাটা শরীর ঝনঝন করে উঠছে পিয়ার। মাঝে মাঝে একেকটা ধাক্কায় মড়মড় করে কেঁপে উঠছে গাছটা, আর কোমরে বাঁধা পাকানো শাড়িটা চামড়ার মধ্যে যেন কেটে বসে যাচ্ছে। কাপড়টা না থাকলে অনেক আগেই হাওয়ায় ওদের উড়িয়ে ফেলে দিত গাছের ডাল থেকে।

পিয়ার পেটের কাছটায় দু'হাতে ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রেখেছে ফকির। মুখটা রেখেছে ওর ঘাড়ের ওপর। ঘাড়ের কাছে ফকিরের দাড়ির ঘষা টের পাচ্ছে পিয়া। খানিক বাদে পিয়ার শ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দ মিলে গেল ওর বুকের ছন্দের সঙ্গে, ফকিরের পেটের ওঠা-নামার চাপের সাথে সাথে উঠতে নামতে লাগল পিয়ার পিঠের নীচের দিকের গড়ানে জায়গাটা। দু'জনের গায়ের খোলা অংশ যেখানে যেখানে পরস্পরকে ছুঁয়েছে, দুটো শরীরকে সেখানে জুড়ে রেখেছে পাতলা একটা ঘামের পর্দা।

হঠাৎ যেন আরও বেড়ে গেল ঝড়ের আওয়াজ; তার ঠিক পরেই বাতাসের গোঁ গোঁ শব্দকে ছাপিয়ে কানে এল অন্য একটা গর্জন—খানিকটা জলপ্রপাতের গর্জনের মতো। আঙুলের ফাঁক দিয়ে এক ঝলক তাকিয়ে পিয়া দেখল নদীর ভাটির দিক থেকে বিশাল দেওয়ালের মতো কী যেন একটা প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে আসছে ওদের দিকে। ঠিক যেন শহরের একটা ব্লক হঠাৎ নড়েচড়ে উঠে চলতে শুরু করে দিয়েছে-নদীটা যেন তার পায়ের কাছে শুয়ে থাকা ফুটপাথ, আর তার মাথাটা জঙ্গলের সবচেয়ে বড় গাছগুলোকেও ছাড়িয়ে উঠে গেছে অনেক উঁচুতে। জলোচ্ছ্বাস! জলোচ্ছ্বাস আসছে সমুদ্র থেকে, ভয়ানক গর্জন করতে করতে সামনের সমস্ত কিছুকে আড়াল করে ধেয়ে আসছে ওদের দিকে। চোখের সামনে অবিশ্বাস্য ঘটনাটা দেখতে দেখতে হঠাৎ এক ঝলকে ব্যাপারটা যেই বুঝতে পারল পিয়া, সঙ্গে সঙ্গে মাথার ভেতরটা যেন খালি হয়ে হয়ে গেল। এতক্ষণ পর্যন্ত ভয় পাওয়ারই কোনও সময় পায়নি ও, কোনওরকমে প্রাণটা বাঁচিয়ে রাখার জন্যই এত ব্যস্ত ছিল যে ঝড়ের বাস্তবতাটাকে উপলব্ধি পর্যন্ত করে উঠতে পারেনি, কিন্তু এবার যেন মৃত্যু স্পষ্ট ঘোষণা করে দিল তার আগমনবার্তা, সে অমোঘ পরিণতির জন্য শুধু অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার নেই এখন। ভয়ে অসাড় হয়ে গেল পিয়ার আঙুলগুলো। ফকির ওর হাতদুটো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে গাছের গায়ে শক্ত করে চেপে না ধরলে গুঁড়িটা ও হয়তো ধরেই থাকতে

পারত না। পিয়া টের পেল ফকিরের বুকটা ফুলে উঠছে—লম্বা একটা শ্বাস টেনে নিচ্ছে ফকির। দেখাদেখি পিয়াও যতটা পারে বাতাস টেনে নিল বুকের মধ্যে।

তারপর একটা বাঁধ যেন ভেঙে পড়ল ওদের মাথার ওপর। তীব্র গতিতে নেমে আসা জলের চাপে বেঁকে প্রায় দু'ভঁজ হয়ে গেল গাছের গুঁড়িটা। ফকিরের দু'হাতের বেষ্টনীতে আটকা অবস্থায় পিয়া টের পেল ওদের দু'জনকে সুদ্ধ নুয়ে পড়ছে গাছটা; বাঁকতে বাঁকতে মাটি ছুঁয়ে ফেলল গাছের মাথা ওরা দু'জনে পা ওপরে মাথা নীচে অবস্থায় কোনওরকমে লেগে রইল তার গায়ে। ভয়ংকর ঘূর্ণি তুলে প্রচণ্ড গতিতে জল বয়ে চলেছে শরীরের চারপাশ দিয়ে; এমন তার টান, মনে হচ্ছে যেন টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে ওদের। একেকবার মড়মড় করে উঠছে গাছটার শেকড়, মনে হচ্ছে উথাল পাথাল ঢেউয়ের টানে যে-কোনও সময় উপড়ে চলে যাবে মাটি থেকে।

বুকের ওপর যে চাপ পড়ছিল তার থেকে পিয়া আন্দাজ করল অন্তত মিটার তিনেক জলের নীচে রয়েছে ওরা। যে শাড়ির বাঁধনকে একটু আগে ভগবানের আশীর্বাদের মতো মনে হচ্ছিল, সেটাই এখন যেন নোঙরের মতো নদীর তলায় আটকে রেখেছে ওদের। বাঁধন থেকে আলগা হয়ে জলের ওপরে উঠে একটু দম নেওয়ার জন্যে ফকিরের বজ্রমুষ্টি থেকে হাত ছাড়িয়ে নিল পিয়া, কাপড়ের গিটটা খোলার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল প্রাণপণে। কিন্তু ওকে সাহায্য করার বদলে টান মেরে বাঁধন থেকে ওর হাতদুটো সরিয়ে দিল ফকির। ফকিরের সমস্ত শরীরের ওজন এখন পিয়ার ওপর, পিয়া যেখানে আছে সেখানেই ওকে আটকে রাখার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে যেন ও লড়ে যাচ্ছে। কিন্তু পিয়াও হাল ছেড়ে দিতে পারছে না কিছুতেই বুকের মধ্যে হাওয়া ফুরিয়ে এলে কারও পক্ষে স্থির হয়ে থাকা সম্ভব নয়।

তারপরেই হঠাৎ, ফকিরের হাতের বাঁধনের মধ্যে হাঁকুপাকু করতে করতেই, পিয়া টের পেল আস্তে আস্তে হালকা হয়ে আসছে জলের চাপ। ঢেউয়ের চূড়াটা পেরিয়ে গেছে ওদের, গাছটাও সোজা হতে শুরু করেছে। চোখ খুলে পিয়া দেখল ওপরে আলো দেখা যাচ্ছে, আবছা হলেও বোঝা যাচ্ছে। কাছে, আরও কাছে ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল আলোটা, তারপর হঠাৎ, যখন পিয়ার মনে হচ্ছে বুকটা প্রায় ফেটে যাবে এবার, এক ঝটকায় সোজা হয়ে গেল গাছটা। সঙ্গে সঙ্গে ফকির আর পিয়ার মাথা উঠে এল জলের ওপরে। ঢেউয়ের মাথাটা ওদের পেরিয়ে যাওয়ার পর হাওয়ার চাপে জল খানিকটা নেমেছে, যদিও আগের জায়গায় পৌঁছয়নি এখনও। ওদের পায়ের সামান্য নীচ দিয়ে এখন বয়ে যাচ্ছে স্রোত।

বৃষ্টির ধারা তিরের মতো নেমে আসছে আকাশ থেকে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে গেস্ট হাউসের দিকে ছুটতে শুরু করল কানাই। জলের ফোঁটাগুলো যেন ছিটেগুলির মতো এসে লাগছে, গলন্ত ধাতুর মতো আছড়ে পড়ছে গায়ের ওপর। একেকটা ফোঁটা যেখানে মাটিতে এসে পড়ছে, ছোট্ট গর্ত হয়ে যাচ্ছে সে জায়গাটায়।

নীলিমার জানালায় কোনও আলো দেখা যাচ্ছে না। তাতে অবশ্য খুব একটা আশ্চর্য হল । কানাই; কারণ ট্রাস্টের জেনারেটরটা চালানো হয়নি সারাদিন, আর এই ঝড়ের হাওয়ায় লণ্ঠন জ্বালানো খুব একটা সোজা কাজ নয়।

দরজায় ধাক্কা দিল কানাই—"মাসিমা! ঘরে আছ নাকি?"

মিনিটখানেক কেটে গেল, কারও সাড়া নেই।

দুম দুম করে আবার দরজায় ঘা দিল কানাই—"মাসিমা! আমি এসেছি গো, আমি কানাই।" দরজার ওপারে হাতড়ে হাতড়ে নীলিমা ছিটকিনি খোলার চেষ্টা করছে, শুনতে পেল কানাই। চেঁচিয়ে বলল, "সাবধানে, খুব সাবধানে খুলবে কিন্তু।"

খুব একটা লাভ হল না কানাইয়ের সাবধানবাণীতে। ছিটকিনি ভোলা মাত্রই হাওয়ার টানে ছিটকে খুলে গেল পাল্লাটা, দড়াম করে গিয়ে ধাক্কা মারল দেওয়ালে। একগাদা ফাইল হুড়মুড় করে পড়ে গেল তাকের ওপর থেকে, আর একরাশ কাগজপত্র পাক খেয়ে উড়তে লাগল ঘরের মধ্যে। একটু টাল খেয়ে পিছিয়ে গিয়ে মচকে যাওয়া হাতটা ঝাড়তে লাগল নীলিমা। কানাই তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে নীলিমাকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে বিছানায় বসাল।

“খুব জোরে লেগেছে? ব্যথা করছে খুব?”

“তেমন কিছু না রে। ঠিক হয়ে যাবে এক্ষুনি,” কোলের ওপর হাতদুটো জড়ো করে বসল নীলিমা। “তোকে দেখে আমার কী যে শান্তি হল না রে কানাই... ভীষণ চিন্তা হচ্ছিল তোর জন্যে।”

“কিন্তু তুমি এখনও এখানে বসে রয়েছ কেন?” কানাইয়ের গলায় উদ্বেগের সুর। “এক্ষুনি গেস্ট হাউসের দোতলায় উঠে যাওয়া উচিত তোমার।”

“কেন রে?”

“নদী একেবারে টাপুস-টুপুস ভরে রয়েছে। যে-কোনও সময়ে সব ভাসিয়ে দেবে,” কানাই বলল। “তখন তো আটকে যাবে তুমি এখানে। জল সেরকম বাড়লে তো এখানেও এসে উঠবে, তাই না?” চারপাশে তাকিয়ে ঘরের জিনিসপত্রগুলি একবার ভাল করে দেখে নিল কানাই। “তোমার সবচেয়ে জরুরি জিনিসপত্র এখানে কী কী আছে বলো দেখি, সব জড়ো করি এক জায়গায়। কিছু আমরা ওপরে নিয়ে চলে যাব, আর বাকি যা থাকবে খাটের ওপরে রেখে দেব। খাটটা উঁচুই আছে, এতদূর জল উঠবে বলে মনে হয় না।”

গোটা দুই সুটকেস টেনে বের করল নীলিমা। দুজনে মিলে হাত লাগিয়ে ফাইল-টাইল আর কাগজপত্রগুলো একটার মধ্যে ভরে ফেলল। আর অন্যটার মধ্যে নিল কয়েকটা জামাকাপড় আর কিছু চাল, ডাল, চিনি, তেল আর চা।

“এবার তোয়ালে-টোয়ালেগুলো ভাল করে গায়ে মাথায় মুড়ে নাও দেখি,”কানাই বলল। “প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে। দরজা থেকে বেরিয়ে ওপাশের সিঁড়ি পর্যন্ত যেতে যেতেই পুরো ভিজে যাব আমরা।”

তৈরি-টৈরি হয়ে সুটকেস দুটো প্রথমে বের করে দিল নীলিমা, তারপর নিজে বেরিয়ে এল। আরও কালো হয়ে গেছে আকাশটা, প্রচণ্ড বৃষ্টির তোড়ে কাদা কাদা হয়ে গেছে মাটি। দরজাটা টেনে বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল কানাই। সুটকেস দুটো তুলে নিল দু'হাতে। এক হাতে ওর কনুইটা ধরে আস্তে আস্তে নীলিমা এগোতে লাগল সিঁড়ির দিকে।

সিঁড়িঘর পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতেই কাকভেজা হয়ে গেল দুজনে। তবে তোয়ালে জড়ানো থাকায় নীলিমার গা-মাথা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি বৃষ্টির জল। তোয়ালেগুলো গা থেকে খুলে ভাল করে নিংড়ে নিয়ে তারপর সিঁড়িতে পা দিল নীলিমা। গেস্ট হাউসে গিয়ে ঢুকতেই মনে হল হঠাৎ করে যেন কমে গেছে ঝড়টা। জানালা-টানালাগুলো শক্ত করে বন্ধ থাকায় ঝড়ের আওয়াজ কানে আসছে, কিন্তু বাতাসের ঝাঁপটাটা আর টের পাওয়া যাচ্ছে না। শক্তপোক্ত চার দেওয়ালের আড়াল থেকে সে আওয়াজ শুনতে কিন্তু মন্দ লাগছে না খুব একটা।

সুটকেসগুলো মেঝেতে রেখে নীলিমার কাছ থেকে একটা নিংড়ানো তোয়ালে নিয়ে নিল কানাই। মাথাটা ভাল করে মুছে নিয়ে গা থেকে টেনে খুলে ফেলল কাদামাখা শার্টটা। তোয়ালেটা জড়িয়ে নিল খালি গায়ের ওপর।

নীলিমা এর মধ্যে ডাইনিং টেবিলের একটা চেয়ারে গিয়ে বসে পড়েছে। জিজ্ঞেস করল, “বাকিরা সব কোথায় গেল রে কানাই? পিয়া, ফকির ওরা সব?”

গম্ভীর হয়ে গেল কানাই। বলল, “পিয়া আর ফকিরকে আমরা খুঁজে পাইনি মাসি। ওদের ছেড়েই চলে আসতে হয়েছে আমাদের। যতক্ষণ পারা যায় আমরা অপেক্ষা করেছিলাম, কিন্তু তারপর হরেন বলল এবার রওয়ানা হতেই হবে। কালকে আবার ফিরে গিয়ে ওদের খোঁজ করব।”

“তার মানে ওরা বাইরেই রয়ে গেছে এখনও?” নীলিমা জিজ্ঞেস করল। “এই ঝড়ের মধ্যে?”

মাথা নাড়ল কানাই। “হ্যাঁ। কিছুই করা গেল না।”

“আশা করি–” কথাটা আর শেষ করল না নীলিমা। মাঝখান থেকে কানাই বলল, “আরও একটা খারাপ খবর তোমাকে দেওয়ার আছে।”

“কী খবর?”

“নোটবইটা।”

“মানে? কী হয়েছে নোটবইটার?” অজানা আশঙ্কায় নীলিমা সোজা হয়ে বসল।

টেবিলটা ঘুরে মাসির পাশে গিয়ে বসল কানাই। বলল, “আজকে সকালে পর্যন্ত ওটা সঙ্গে ছিল আমার। ভাল করে প্লাস্টিক দিয়ে মুড়ে এখানে নিয়ে আসছিলাম। কিন্তু জলের মধ্যে পিছলে পড়ে গেলাম একবার, আর আমার হাত ফসকে ভেসে চলে গেল ওটা।”

হাঁ করে রইল নীলিমা। মুখ দিয়ে কথা সরল না।

“আমার যে কী খারাপ লাগছে তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না মাসি,” বলল কানাই। “যদি পারতাম কিছুতেই ওটাকে ভেসে যেতে দিতাম না, বিশ্বাস করো।”

মাথা নাড়ল নীলিমা। সংযত করে নিল নিজেকে। শান্ত গলায় বলল, “জানি। এর জন্য দোষ দিস না নিজেকে। কিন্তু নোটবইটা কি পড়া হয়ে গিয়েছিল তোর?”

“হ্যাঁ।” মাথা নাড়ল কানাই।

ওর দিকে চেয়ে রইল নীলিমা। বলল, “কী লেখা ছিল রে?”

“নানা বিষয়ে অনেকরকম কথা,” জবাব দিল কানাই। “ইতিহাস, কবিতা, জিওলজি—বিভিন্ন বিষয়। তবে প্রধানত ছিল মরিচঝাঁপির কথা। গোটা নোটবইটা একটানা দেড়দিনে লিখেছিল মেসো—গোটা একটা দিন আর একটা রাতের অর্ধেকের বেশি সময় ধরে। মনে হয় হামলা শুরু হওয়ার জাস্ট ঘণ্টা কয়েক আগে শেষ করেছিল লেখাটা।”

“হামলার কথা তার মানে কিছু ছিল না?”

“না,” বলল কানাই। “ততক্ষণে ওটা হরেনকে দিয়ে দিয়েছিল মেসো। হরেন তার পরে পরেই ফকিরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল মরিচঝাঁপি ছেড়ে। ভাগ্যিস চলে এসেছিল ওরা; নোটবইটাও বেঁচে গিয়েছিল তাই।”

“কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, জানিস? ওর স্টাডিতে ওটা এল কী করে?”

“সে আরেক অদ্ভুত গল্প,” কানাই বলল। “হরেন নাকি আমাকে পাঠাবে বলে ভাল করে প্লাস্টিকে মুড়ে যত্ন করে রেখেছিল নোটবইটা। কিন্তু একদিন হঠাৎ কী করে ওটা হারিয়ে গেল। তারপর এই কদিন আগে নাকি আবার পাওয়া গিয়েছিল। হরেন প্যাকেটটা ময়নার হাতে দিয়ে দিয়েছিল, আর ময়না নাকি চুপিচুপি গিয়ে রেখে এসেছিল স্টাডিতে।”

চুপ করে গেল নীলিমা। ভাবতে লাগল। খানিক পরে বলল, “একটা কথা আমাকে বল তো কানাই, নোটবইটা আমাকে কেন দেয়নি সে বিষয়ে কিছু লিখেছিল নির্মল?”

“সেরকম স্পষ্ট করে কিছু লেখেনি। তবে আমার মনে হয়, মেসো ভেবেছিল এ ব্যাপারে তোমার সহানুভূতি বিশেষ পাবে না,” জবাব দিল কানাই।

“সহানুভূতি?’ রেগেমেগে চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করল নীলিমা। “কানাই, সহানুভূতি ছিল না ব্যাপারটা তা ঠিক নয়। ঘটনা হল আমার সহানুভূতির লক্ষ্যটা ছিল অনেকটা ছোট। আমি জানি, সারা পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা মোচনের ক্ষমতা আমার নেই। একটা ছোট জায়গার ছোট ছোট কিছু সমস্যার সমাধান যদি করতে পারি সেই আমার কাছে অনেক। আমার জন্য সেই ছোট জায়গাটা হল লুসিবাড়ি। আমার পক্ষে যতটা দেওয়া সম্ভব আমি এই লুসিবাড়িকে দিয়েছি, আর এতগুলি বছর পরে তার কিছু ফল তো ফলেছে কিছুটা তো সাহায্য হয়েছে মানুষের; সামান্য কয়েকটা হলেও, কিছু পরিবারের একটু ভাল তো করা গেছে। কিন্তু নির্মলের কাছে সেটা যথেষ্ট ছিল না। ওর কথা ছিল হয় পুরোটা পালটাতে হবে, নয়তো কিছুই না। শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াল নিজে—সেই ‘কিছুই না’-তেই।”

“সে তুমি যদি নোটবইটার কথা বাদ দাও তা হলে,” মাসিকে সংশোধন করে দিল কানাই। “এই একটা কাজের কাজ তো করে যেতে পেরেছিল মেসো।”

“সেটাও তো রইল না আর,” বলল নীলিমা।

“না,” বলল কানাই। “পুরোটা রইল না। তবে বেশ খানিকটাই থেকে গেছে আমার মাথার

মধ্যে। যতটা পারি সেটাকে গুছিয়ে লিখে ফেলার চেষ্টা করব আমি।"

কানাইয়ের চেয়ারের পেছনে হাত রেখে ওর চোখের দিকে তাকাল নীলিমা। আস্তে আস্তে বলল, "এই লেখাটা লেখার সময় আমার কথাগুলোও তাতে রাখবি তো কানাই?"

মানেটা বুঝে উঠতে পারল না কানাই। বলল, "বুঝতে পারলাম না ঠিক।"

"কানাই, স্বপ্ন যারা দেখে তাদের হয়ে কথা বলার জন্যে লোকের অভাব হয় না," নীলিমা বলল। "কিন্তু যারা ধৈর্য ধরতে জানে, যারা মনকে শক্ত করে কাজ করতে পারে, যারা কোনও একটা জিনিস গড়ে তোলার চেষ্টা করে—তাদের কাজের মধ্যে কি আর কাব্য কবিতা খুঁজে পাওয়া যায়, কী বল?"

কেমন নরম হয়ে এল কানাইয়ের মনটা নীলিমার এই সরাসরি অনুরোধ শুনে। বলল, "আমি পাই মাসি। তোমার মধ্যে আমি..." ডাইনিং টেবিলটা হঠাৎ খটখট করে নড়ে উঠতে কথাটা শেষ না করেই থেমে গেল কানাই। ঝড়ের শব্দকে ছাপিয়ে দূরে কোথাও থেকে শোঁ শোঁ করে একটা আওয়াজ ভেসে এল সঙ্গে সঙ্গে।

জানালার কাছে গিয়ে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকাল কানাই। "জলোচ্ছ্বাস! নদীর খাত ধরে এইদিকেই আসছে সোজা।"

জলের একটা দেওয়াল প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে আসছে ওদের দিকে। বাঁধের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সে দেওয়ালের পাশ বরাবর জলকণার একটা বিশাল মেঘ ছিটকে উঠছে শূন্যে। গোটা দ্বীপটা কাত হয়ে যাওয়া প্লেটের মতো আস্তে আস্তে জলে ভরে উঠছে, চোখের সামনে বিশাল ঢেউটা ক্রমশ ঘিরে ফেলেছে লুসিবাড়িকে। আতঙ্ক বিস্ফারিত চোখে কানাই আর নীলিমা দেখতে লাগল জল বাড়ছে, বেড়েই চলেছে সমানে—একটা একটা করে ডুবে যাচ্ছে নীলিমার ঘরে ওঠার সিঁড়ির ধাপগুলো। অবশেষে ঘরের দরজার ঠিক নীচে পৌঁছনোর পর বন্ধ হল জল বাড়া।

"এই জল জমি থেকে হেঁচে বের করতে তো অনেকদিন লেগে যাবে, তাইনা?" জিজ্ঞেস করল কানাই।

"তা যাবে, কিন্তু তার থেকেও জরুরি হল মানুষের প্রাণ।" ঘাড় কাত করে হসপিটালটা দেখার চেষ্টা করল নীলিমা। বানের জল দেখার জন্যে ঝড় উপেক্ষা করে লোকে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিনতলার বারান্দায়।

"সাইক্লোন শেল্টারটার জন্যে কত লোক প্রাণে বেঁচে গেল বল তো?" নীলিমা বলল। "নির্মল প্রায় জোর করে আমাদের দিয়ে বানিয়েছিল ওটা। জিওলজি আর আবহাওয়ার ব্যাপারে অদ্ভুত একটা ইন্টারেস্ট ছিল তো ওর; নির্মল না-বললে ওটা বানানোর কথা মাথায়ই আসত না আমাদের।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ," বলল নীলিমা। "সারা জীবনে ও যা যা করেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট হল এই কাজটা আমাদের দিয়ে এই সাইক্লোন শেল্টারটা বানানো। তার প্রমাণ তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছিস এখন। কিন্তু এই কথাটা যদি নির্মলকে বলা হত, হেসেই উড়িয়ে দিত ও। বলত এ তো এমনি সমাজসেবা, বিপ্লব তো আর নয়।"

ঝড়ের কেন্দ্রটা যে মাথার ওপর এসে পড়েছে তার প্রথম সংকেত পাওয়া গেল যখন বাতাসের আওয়াজটা কমে গেল হঠাৎ করে। শব্দটা কিন্তু থেমে যায়নি একেবারে, একটু পিছিয়ে গেছে মাত্র। আর তার সঙ্গে সঙ্গে কমে গেছে হাওয়ার তেজ। একটা সময় মনে হল পুরোপুরি স্থির হয়ে গেছে বাতাস। চোখ মেলল পিয়া। যা দেখল তাতে একেবারে অভিভূত হয়ে গেল। পাক খেয়ে আকাশে উঠে যাওয়া কুয়োর মতো একটা ঘূর্ণায়মান সুড়ঙ্গের ঠিক ওপরে ঝকঝক করছে থালার মতো গোল চাঁদ। ঘুরন্ত সেই পাইপের ভেতরের দিকটা চকচক করছে চাঁদের আলো পড়ে, জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে উথাল পাথাল ঝড়ের স্থির কেন্দ্রবিন্দু।

চারপাশে যতদূর চোখ যায়, পুরু হয়ে বিছিয়ে আছে ঝরা পাতার গালিচা, তার নীচে নদী প্রায় চোখেই পড়ে না। জলের ঢেউ, ঘূর্ণি, স্রোত—সবকিছু ঢাকা পড়ে গেছে সেই সবুজ

আস্তরণে। পুরো দ্বীপটাই প্রায় তলিয়ে গেছে জলের নীচে; কিছু গাছের সবচেয়ে উঁচু যে কয়েকটা ডালপালা জলের ওপরে জেগে আছে, তাই দেখে কোনওরকমে আন্দাজ করা যাচ্ছে দ্বীপের সীমানা। গাছগুলোকেও কেমন যেন কঙ্কালের মতো দেখাচ্ছে, বেশিরভাগেরই শাখা-প্রশাখা আর কিছু অবশিষ্ট নেই। ডালের সঙ্গে লেগে থাকা পাতা তো চোখেই পড়ে না প্রায়। বহু গাছ আধখানা হয়ে ভেঙে গেছে; মুচড়ে যাওয়া খোঁটার মতো দেখাচ্ছে তাদের।

একখানা সাদা মেঘ ভাসতে ভাসতে এসে জলের ওপর জেগে থাকা ডালপালাগুলির ওপরে নামল। মেঘটা আসলে এক ঝাক সাদা পাখি—এত ক্লান্ত, যে পিয়া আর ফকিরকে দেখে ভয় পাওয়ার শক্তিটুকু পর্যন্ত চলে গেছে ওদের। শাড়ির বাঁধনটা আলগা করে দু'হাতে গুঁড়িটার গায়ে চাপ দিয়ে হাত-পা ছাড়িয়ে নিল পিয়া। তারপর সামনে বসে-থাকা একটা পাখিকে ধরে ফেলল হাত বাড়িয়ে। থরথর করে কাঁপছিল পাখিটা, ছোট্ট বুকের ধুকপুকটুকু হাতে টের পাচ্ছিল পিয়া। বোঝা যাচ্ছে পাখিগুলো ঝড়ের চোখটার মধ্যেই থাকতে চাইছে। কত দূর থেকে উড়ে এসেছে ওরা? কল্পনাও করতে পারল না পিয়া। পাখিটাকে ছেড়ে দিয়ে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসল ও।

ফকির দেখা গেল এর মধ্যে ডালটার ওপর ব্যালান্স করে দাঁড়িয়ে পড়েছে, সোজা হয়ে খিল ছাড়াচ্ছে পায়ের। কেমন যেন একটু ব্যস্ত ভাব ওর চোখেমুখে, মনে হচ্ছে যেন অন্য কোনও ডালে গিয়ে ওঠা যায় নাকি চারদিকে তাকিয়ে সেটা দেখার চেষ্টা করছে। কিন্তু সেরকম ডাল কোথায়? এখন যেটার ওপর ওরা রয়েছে সেটা ছাড়া এ গাছের একটা ডালও আস্ত নেই আর।

হঠাৎ উবু হয়ে বসে পড়ল ফকির। পিয়ার হাঁটু ছুঁয়ে, প্রায় বোঝাই যায় না এরকম ছোট্ট একটা ইশারা করল। ওর আঙুল বরাবর তাকিয়ে পিয়া দেখল দ্বীপের অন্যদিকে, দূরে আরেকটা ঝোঁপড়ার কাছে, একটা বাঘ হেঁচড়ে হেঁচড়ে জল থেকে উঠে গাছে চড়ার চেষ্টা করছে। বাঘটাও মনে হল পাখিগুলোর মতোই ঝড়ের চোখটার সঙ্গে সঙ্গে চলছে, আর যখনই সুযোগ পাচ্ছে বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছে একটু। ফকির আর পিয়া যখন বাঘটাকে দেখল, ঠিক সেই মুহূর্তেই ও-ও নজর করল ওদের। কয়েকশো মিটার দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছিল জানোয়ারটা কী বিশাল; গাছটা যে ওর ভারে ভেঙে পড়ে যাচ্ছে না সেটাই আশ্চর্যের। একবারও চোখের পলক না ফেলে মিনিট কয়েক ওদের দিকে তাকিয়ে রইল বাঘটা—সমস্ত শরীর স্থির, শুধু লেজের ডগাটা একটু একটু নড়ছে। পিয়ার মনে হল লোমশ শরীরটার ওপর যদি হাত রাখা যেত, তা হলে বাঘটার বুকের ধকধকও নিশ্চয়ই হাতে টের পেত ও।

ঝড়টা আবার ফিরে আসছে কি? বাঘটা মনে হল সেরকমই কিছু একটা আন্দাজ করেছে। কারণ একবার ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকিয়েই ও গাছ থেকে আবার নেমে পড়ল জলে। হাঁড়ির মতো মাথাটা কয়েক মিনিট জলের ওপর ভাসতে ভাসতে চলল, আর তারপরেই আস্তে আস্তে কমে এল চাঁদের আলো, সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের গর্জনে সব আওয়াজ ঢাকা পড়ে গেল আবার।

তাড়াতাড়ি ঘুরে গিয়ে ডালের দু'দিকে পা ঝুলিয়ে আবার আগের জায়গায় ফিরে গেল পিয়া। গুঁড়ির দিকে মুখ করে বসার পর দু'জনে মিলে পাকানো শাড়িটা দিয়ে আবার বেড় দিল গাছটাকে। তারপর শাড়ির দু' মুখ এক জায়গায় এনে শক্ত করে গিট বাঁধল ফকির। কোনওরকমে গুছিয়ে বসতে না বসতেই ঝড়টা ফের এসে পড়ল ওদের ওপর। হঠাৎই আবার ছিটকে আসা ডালপালা আর কাঠকুটোয় ভরে উঠল চারদিক।

কিন্তু কিছু একটা মনে হচ্ছে পালটে গেছে। পরিবর্তনটা কী সেটা ধরতে কয়েক মিনিট সময় লাগল পিয়ার। হাওয়ার দিক বদলে গেছে। এবারে উলটো দিক থেকে আসছে ঝড়। আগেরবার যেখানে গাছের গুঁড়িটা পিয়াকে আড়াল করে রেখেছিল, এবার তার জায়গায় আড়াল বলতে শুধু ফকিরের শরীরটা। এইজন্যেই কি ফকির অন্য কোনও গাছে অন্য ডাল খুঁজছিল তখন? ও কি তা হলে বুঝতে পেরেছিল যে ঝড়ের চোখটা পেরিয়ে গেলে এই ডালের ওপর ওর শরীর দিয়েই আড়াল করতে হবে পিয়াকে? ফকিরের আলিঙ্গন থেকে

নিজেকে ছাড়িয়ে ওকে টেনে নিজের সামনের দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করল পিয়া, যাতে এবার ঝড়ের মুখ থেকে ও-ই আড়াল করতে পারে ফকিরকে। কিন্তু এতটুকু নড়ানো গেল না ওকে। ফকিরের নিজের শক্তি ছাড়াও এখন হাওয়ার চাপটাও আছে পেছন থেকে, ফলে ওর হাত থেকে পিয়া ছাড়াতেই পারল না নিজেকে। এত কাছাকাছি, প্রায় একসঙ্গে মিশে আছে ওদের শরীরদুটো যে ফকিরের গায়ে প্রত্যেকটা আঘাতের ধাক্কা নিজের শরীরে টের পাচ্ছে পিয়া–ধুপধাপ করে ফকিরের পিঠে এসে লাগা প্রতিটা চোট বুঝতে পারছে ও। ফকিরের গালের হাড়গুলোর ছোঁয়া স্পষ্ট অনুভব করা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে কেউ যেন সুপারইম্পোজ করে সেগুলো লাগিয়ে দিয়েছে পিয়ার নিজের গালের ওপর। জীবন যা দিতে পারেনি, সেটাই যেন ওদের দিয়ে গেল এই ঝড়–একসঙ্গে দু'জনকে মিলিয়ে দিয়ে এক করে দিল ওদের।

পরদিন

খুবই ধীর গতিতে চলছিল মেঘা। গর্জনতলার দিকে দু'ভাগ পথ এগোনোর পর দূরে একটা ডিঙি চোখে পড়ল—গত কয়েক ঘণ্টায় এই প্রথম।

ঝকঝকে পরিষ্কার দিন; একটু ঠান্ডা আছে, তবে হাওয়া নেই। ঝড় কেটে যাওয়ার পর জল আস্তে আস্তে নামতে শুরু করেছে, কিন্তু জঙ্গলের বেশিরভাগটাই ডুবে রয়েছে এখনও। যতদূর চোখ চলে একটানা একটা সবুজ গালিচায় ঢেকে রয়েছে নদীর বুক, আর জঙ্গলের যে কয়টা গাছ জলের ওপর জেগে রয়েছে একটা পাতাও লেগে নেই তাদের গায়ে—উলঙ্গ গুঁড়িগুলো শুধু দাঁড়িয়ে আছে ভিড় করে। পুরো জায়গাটা ডুবে যাওয়ায় নদীর পাড়গুলো আর দেখা যাচ্ছে না, ফলে দিক ঠিক করে বোট চালানো দ্বিগুণ কঠিন হয়ে গেছে। তাই ভোরবেলা লুসিবাড়ি ছেড়ে বেরোনোর পর থেকেই প্রায় শামুকের গতিতে এগোচ্ছে মেঘা।

দিগন্তের কাছে ভেসে থাকা নৌকোটাকে হরেনই চিনতে পারল প্রথম। ছইটা উড়ে যাওয়ার ফলে নৌকোর চেহারাটা এতই পালটে গেছে যে কানাই বা ময়না কেউই ওটাকে ফকিরের ডিঙি বলে বুঝতেই পারেনি। কিন্তু এই ডিঙি হরেনের নিজের হাতে বানানো, ফকিরকে দিয়ে দেওয়ার আগে নিজে বহু বছর চালিয়েছে হরেন; এক নজর দেখেই নৌকোটাকে চিনতে ওর কোনও অসুবিধা হয়নি তাই। "ওটা ফকিরের নৌকো," হরেন বলল। "আমি পরিষ্কার চিনতে পারছি। ঝড়ে ছইটা উড়িয়ে নিয়েছে, কিন্তু ওইটাই ফকিরের নৌকোটা।"

"কে আছে নৌকোর মধ্যে?" কানাই জিজ্ঞেস করল। কোনও জবাব এল না হরেনের কাছ থেকে।

লঞ্চের একেবারে গলুইটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল কানাই আর ময়না। ইঞ্চি ইঞ্চি করে ডিঙি আর বোট এগোচ্ছে পরস্পরের দিকে; মনে হচ্ছে যেন জমাট বেঁধে গেছে মাঝখানের জলটুকু। খানিকক্ষণ যাওয়ার পর কানাই বুঝতে পারল একটাই মানুষ বসে রয়েছে নৌকোর ওপর, সে পুরুষ কি মহিলা বোঝার কোনও উপায় নেই, কারণ পা থেকে মাথা পর্যন্ত তার পুরো শরীরটাই ঢেকে রয়েছে কাদায়।

বোটের রেলিং-এর গায়ে শক্ত করে এঁটে বসে আছে ময়নার হাত। কানাইয়েরও তাই। ময়নার হাতের গাঁটগুলোও ওর নিজের হাতের গাঁটগুলোর মতো ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, লক্ষ করল কানাই। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে ওরা, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন একটা গভীর ফাটল দু'জনকে দু'জনের থেকে আলাদা করে রেখেছে। তীক্ষ্ণ চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে দু'জনেই বোঝার চেষ্টা করছে কে আছে ডিঙির ওপরে।

"ওই মেয়েটা," অবশেষে বলল ময়না। ফিসফিস করে বলতে শুরু করা কথাগুলো চিৎকার হয়ে ছড়িয়ে গেল তারপর—"আমি দেখতে পেয়েছি—ফকির নেই নৌকোতে।" দু'হাত মুঠো করে শাখাগুলো কপালে আছড়ে আছড়ে ভাঙতে লাগল ময়না। ভাঙা শাখার টুকরোয় কেটে গিয়ে একফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল কপাল বেয়ে।

আরও আঘাত থেকে বাঁচাতে ওর হাত দুটোকে শক্ত করে টেনে ধরল কানাই। বলল, "ময়না, দাঁড়াও! একটু অপেক্ষা করে দেখো..."

স্থির হয়ে গেল ময়না। ভূতগ্রস্তের মতো চেয়ে রইল সামনের দিকে। এগিয়ে আসা নৌকোটা যেন মায়াবলে বেঁধে রেখেছে ওকে।

"ও নৌকোতে নেই! ও নেই... ও আর নেই." হঠাৎ দুমড়ে গেল ময়নার পা দুটো, ডেকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ও। একটা হুলুস্থুলু পড়ে গেল লঞ্চে, চেঁচিয়ে নগেনকে ইঞ্জিন বন্ধ করতে বলে সারেঙ-এর ঘর থেকে দৌড়ে নেমে এল হরেন। কানাই আর হরেন দু'জনে ধরাধরি করে ময়নাকে একটা কেবিনে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল বাঙ্কের ওপর।

কেবিন থেকে ডেকে বেরিয়ে এসে কানাই দেখল ডিঙিটাকে মেঘার পাশে নিয়ে চলে

এসেছে পিয়া। টলমলে ডিঙিটার ওপর কোনওরকমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও, হাতে জিপিএস মনিটরটা, যেটা দেখে দেখে দিক ঠিক রেখে এতটা এসে পৌঁছেছে। বোটের পেছনদিকটায় গিয়ে ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল কানাই। দুজনের কেউই কোনও কথা বলল না, কিন্তু বোটে পা রাখতে রাখতেই দুমড়ে মুচড়ে গেল পিয়ার মুখটা, মনে হল ও যেন পড়ে যাবে এক্ষুনি। ধরার জন্য কানাই দু'হাত বাড়াতেই হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ল পিয়া, মাথাটা রাখল কানাইয়ের বুকের ওপর। আস্তে আস্তে নরম গলায় কানাই জিজ্ঞেস করল, "ফকির?"

একেবারে যেন শোনাই গেল না পিয়ার গলা: "পারল না, ও পারল না..."

ঝড় প্রায় শেষ হওয়ার সময় ঘটল ঘটনাটা, পিয়া জানাল। প্রচণ্ড ভারী, বিরাট একটা গাছের গুঁড়ি উড়ে এসে লেগেছিল ফকিরের গায়ে। এত জোরে আঘাতটা এসেছিল যে পিয়ার মনে হচ্ছিল ও-ও যেন চেপটে যাচ্ছে গাছের গায়ে। শাড়ির বাঁধনটা থাকায় মারা যাওয়ার সময়ও ডাল থেকে পড়ে যায়নি ফকির। ফকিরের মুখটা প্রায় লেগে ছিল পিয়ার কানের সঙ্গে, তাই ওর শেষ কথা ক'টা শুনতে পেয়েছিল পিয়া। নিশ্বাস ফুরিয়ে যাওয়ার আগে শুধু একবার ময়না আর টুটুলের নাম করেছিল ফকির। জন্তু জানোয়ারদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ওর শরীরটাকে ময়নার শাড়িটা দিয়ে বেঁধে গাছের ওপরেই রেখে এসেছে পিয়া। বাঁধন কেটে নামানোর জন্যে আবার গর্জনতলায় ফিরে যেতে হবে ওদের।

* * *

ফকিরের প্রাণহীন শরীরটা বোটে করে লুসিবাড়িতে নিয়ে এল ওরা। সেই সন্ধ্যাতেই সারা হয়ে গেল দাহকার্য।

ঝড়ে লুসিবাড়ির মানুষদের ক্ষয়ক্ষতি খুব বেশি হয়নি। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি যাদের হতে পারত, আগাম সতর্কবার্তা পাওয়ার দরুন আগেভাগেই তারা হাসপাতালে এসে আশ্রয় নিতে পেরেছিল। ফলে খানিকক্ষণের মধ্যেই গোটা দ্বীপ জেনে গেল খবরটা। অনেক লোক এসেছিল ফকিরের শেষ কাজে।

দাহকার্যের সময় এবং তারপরেও সারাদিন ময়নার সঙ্গে ওর ঘরেই ছিল পিয়া; চেনাশোনা আত্মীয়-পড়শিরা অনেকে ভিড় করেছিল সেখানে। মেয়েদের মধ্যে একজন জল এনে দিল পিয়াকে, গা-হাত পা ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নেওয়ার জন্যে। আরেকজন একটা শাড়ি নিয়ে এল ওর জন্যে, সাহায্য করল সেটা পরে নিতে। সকলের বসার জন্যে মাদুর পেতে দেওয়া হল ঘরের মেঝেতে। পিয়া গিয়ে তাতে বসতেই কোত্থেকে টুটুল এসে হাজির হল পাশে। ওর কোলের ওপর দুটো কলা রেখে চুপ করে পাশটিতে এসে বসল, মুখে কোনও কথা নেই। টুটুলকে জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে নিল পিয়া, এত কাছে যে ওর বুকের ধুকপুকটুকুও টের পাচ্ছিল নিজের পাঁজরের পাশে। পিয়ার মনে পড়ল উড়ে আসা গাছের গুঁড়িটা কী প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মেরেছিল ফকিরের খোলা পিঠের ওপর, মনে পড়ল কাঁধের ওপর ফকিরের থুতনির ভার, ফকিরের ঠোঁটদুটো ওর কানের কত কাছে ছিল সে কথা মনে পড়ল—এত কাছে যে যতটা না কথার শব্দ, তার চেয়ে বেশি ঠোঁটের নড়াচড়া থেকেই ও বুঝতে পেরেছিল যে নিশ্বাসের সঙ্গে বিড়বিড় করে বউ আর ছেলের নাম করছে ফকির।

পিয়ার মনে পড়ল নিজের বুকের নিস্তব্ধতায় মনে মনে কী কথা দিয়েছিল ও ফকিরকে, কেমন করে ওই প্রচণ্ড ঝড় বাদলের মধ্যে মুখের কাছে জলের বোতলটা শুধু এগিয়ে ধরতে পেরেছিল ও, তা ছাড়া শেষ মুহূর্তটাতে আর কিছুই করতে পারেনি ফকিরের জন্যে। মনে পড়ল গভীর ভালবাসার কথা ক'টা মনে করিয়ে দেবে বলে মনে মনে কেমন হাতড়াচ্ছিল ও এবং আগেও বহুবার যেমন হয়েছে তেমনই, মুখে কিছু বলা হলেও, কেমন করে যেন ফকির জেনে গেছে পিয়া কী বলতে চেয়েছিল ওকে।

বাড়ি : একটি উপসংহার

মাসখানেক কেটে গেছে ঝড়ের পর। একদিন দুপুরে নিজের ডেস্কে বসে কাজ করছে নীলিমা, এমন সময় হাসপাতাল থেকে একজন নার্স ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল বাসন্তীর লঞ্চ থেকে 'পিয়াদিদিকে' নামতে দেখেছে ও, এই ট্রাস্টের অফিসের দিকেই এখন আসছে 'পিয়াদিদি'।

বিস্ময় গোপন করতে পারল না নীলিমা। জিজ্ঞেস করল, "পিয়া? মানে সায়েন্টিস্ট পিয়া? তুই ঠিক দেখেছিস?"

"হ্যাঁ গো মাসিমা, পিয়াদিদিই। ভুল দেখিনি আমি।"

চেয়ারে গা এলিয়ে দিল নীলিমা, মনে মনে খবরটা হজম করার চেষ্টা করতে লাগল। প্রায় হপ্তাদুয়েক হয়ে গেল এখান থেকে চলে গেছে পিয়া। সত্যি বলতে কী ওকে বিদায় জানানোর সময় নীলিমা ভাবেইনি আবার কখনও দেখা হবে ওর সঙ্গে। ঝড়ের পর কয়েকদিন লুসিবাড়িতেই থেকে গিয়েছিল মেয়েটা। গেস্ট হাউসে ওর উপস্থিতিটা কেমন যেন অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল তখন যেন একটা ছায়া পড়েছিল ওর ওপর, ভূতের মতো থাকত সারাদিন নিজের মনে, মুখখানা সব সময় গোমড়া, কথাবার্তাও বিশেষ বলত না কারও সঙ্গে। একা নীলিমার পক্ষে ওকে সামলানো তখন হয়তো কঠিন হত, কিন্তু ভাগ্যক্রমে সেই সময়টায় ময়নার সঙ্গে অদ্ভুত একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল পিয়ার। বেশ কয়েকবার ওদের একসঙ্গে দেখেছে নীলিমা, গেস্ট হাউসের ভেতরে কিংবা আশেপাশে, চুপ করে পাশাপাশি বসে আছে দু'জন। এমনকী মাঝে মাঝে পিয়াকে ময়না বা ময়নাকে পিয়া ভেবে ভুলও করেছে নীলিমা। নিজের জামাকাপড় সব নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়েই তখন শাড়ি পরতে হচ্ছিল পিয়াকে উজ্জ্বল লাল, হলুদ, সবুজ রং-এর সব শাড়ি। ময়না যে কাপড়গুলো আর কোনওদিন পরবে না, সেগুলো দিয়ে দিয়েছিল পিয়াকে। বৈধব্যের রীতি মেনে নিজের চুলগুলো কেটে ফেলেছিল ময়না, পিয়ার চুলের মতো ছোট ছোট করে। তাতে আরও এক রকম লাগত দু'জনকে। মিল বলতে অবশ্য শুধু এইটুকুই। স্বভাবে আর মনের ভাব প্রকাশের ভঙ্গিতে কিন্তু দু'জনে একেবারেই দু'রকম। ময়নার শোক চোখে দেখে বোঝা যেত, সব সময় লাল হয়ে ফুলে থাকত ওর চোখদুটো; পিয়ার মুখ কিন্তু পাথরের মতো, ভাবলেশহীন, দেখে মনে হত যেন নিজের ভেতরে গুটিয়ে গেছে মেয়েটা।

"পিয়া আসলে একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে," দিল্লি ফিরে যাওয়ার আগে নীলিমাকে একদিন বলেছিল কানাই। "সেটা অবশ্য স্বাভাবিক। কল্পনা করতে পারো, ঝড়ের শেষটায় ওই গাছের ওপর বসে থাকার সময় কী মনের অবস্থাটা হয়েছিল ওর? ফকিরের মরা শরীরটা যখন ঝড় থেকে আড়াল করে রেখেছে ওকে? সেই ভয়ংকর স্মৃতির কথা যদি বাদও দাও, তাহলেও ওর অপরাধবোধ আর দায়ভারের কথাটা একবার ভাব।"

"সেসব আমি বুঝতে পেরেছি রে কানাই," নীলিমা জবাব দিয়েছিল। "সেইজন্যেই আরও আমার মনে হয় এখান থেকে ফিরে গিয়ে নিজের চেনা কোনও জায়গায় থাকলেই আঘাতটা কাটিয়ে ওঠা সহজ হবে ওর পক্ষে। তুই কী বলিস, আমেরিকাতেই ফিরে গেলে ভাল হয় না ওর এখন? না হলে অন্তত নিজের আত্মীয়স্বজনদের কাছে কলকাতাতেও গিয়ে থাকতে পারে।"

"সে কথা আমি ওকে বলেছিলাম মাসি, কানাই বলেছিল। "এমনকী ওর আমেরিকা যাওয়ার টিকিটের ব্যবস্থাও করে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মনে হল ও যেন শুনতেই পেল

আমার কথাগুলো, সত্যি বলছি। আমার ধারণা ময়না আর টুটুলের কী হবে সেটাই সব সময় ভেবে যাচ্ছে ও। একটা অপরাধবোধও হয়তো কাজ করছে মনের মধ্যে। আসলে, নিজেকে সামলানোর জন্যে একটু সময় দিতে হবে ওকে, কিছুদিন একটু নিজের মতো থাকতে দিতে হবে।"

"তার মানে ওকে এখানে এইভাবে রেখেই তুই চলে যাবি? আমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে?" আশঙ্কার সুর নীলিমার গলায়।

"তোমার কোনও অসুবিধা ও করবে বলে মনে হয় না আমার", জবাব দিয়েছিল কানাই। "ওকে নিয়ে কোনও ঝামেলাই হবে না তোমার, দেখো। ওর আসলে একটু সময় লাগবে নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার জন্যে। আমি এখানে থাকলে তার কোনও সুবিধা হবে বলে মনে হয় না, বরং উলটোটাই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।"

আর আপত্তি করেনি নীলিমা। কানাইকে আটকাতেও চেষ্টা করেনি আর। "জানি রে কানাই, তোরও তো কাজকর্ম সব পড়ে আছে..."

মাসিকে এক হাতে জড়িয়ে ধরেছিল কানাই। বলেছিল, "কিছু চিন্তা কোরো না গো মাসি। দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি আবার আসব কিছুদিন পরে।"

কানাইয়ের শেষ কথাটাকে খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি নীলিমা। মাথা নেড়ে বলেছিল, "সে আসিস। তোর জন্যে তো এখানকার দরজা সব সময়ই খোলা..."

পরের দিনই দিল্লি ফিরে গিয়েছিল কানাই—ঝড়ের ঠিক এক সপ্তাহ পর। তার দিন কয়েক পরেই পিয়া একদিন এসে নীলিমাকে বলল ও-ও চলে যাবে।

"হ্যাঁ বাছা, যাবে তো নিশ্চয়ই। কী আর বলব।" মনের স্বস্তিটুকু যাতে ধরা না পড়ে যায়, তার জন্যে খানিকটা জোর করেই নিরুত্তাপ ভাব আনতে হল গলায়। গত কয়েকদিন ধরেই একটা কথা নীলিমার মনের মধ্যে খোঁচা দিচ্ছিল : পিয়া লুসিবাড়িতে আছে বলে সরকারি লোকেরা কোনও ঝামেলা করবে না তো? ভিসা-টিসা কি আছে ওর? ঠিকঠাক পারমিট নিয়ে এসেছে কি? জানে না নীলিমা। জিজ্ঞেসও করতে চায় না। "এই ক'দিন যা গেছে তোমার ওপর দিয়ে..." নীলিমার গলায় স্নেহের সুর। "ঝড়টা কাটিয়ে ওঠার জন্যে নিজেকে একটু সময় দাও এবার।"

"কিছুদিন পরেই আবার ফিরে আসব আমি," পিয়া বলেছিল। অকৃত্রিম স্নেহে নীলিমা জবাব দিয়েছিল, "হ্যাঁ মা, নিশ্চয়ই আসবে।"

এই ধরনের কথাগুলি নীলিমার খুব চেনা। অনেক সহৃদয় বিদেশির মুখে হুবহু এই শব্দগুলোই এর আগে বহুবার শুনেছে ও। তাদের একজনও আর ফিরে আসেনি কখনও। যোগাযোগও করেনি। পিয়ার বেলাতেও তাই তার অন্যথা হবে বলে আশা করেনি নীলিমা। কিন্তু সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়ে গেল এখন। সত্যি সত্যিই কথা রেখেছে পিয়া।

ভাল করে গুছিয়ে বসার আগেই টক টক আওয়াজ শোনা গেল দরজায়। কী বলবে ভেবে উঠতে না পেরে শেষে নীলিমা বলল, "আরে পিয়া! তুমি ফিরে এসেছ!"

"হ্যাঁ," শুকনো গলায় জবাব দিল পিয়া। "আপনি কি ভেবেছিলেন আর আসব না?"

সত্যি কথা বলতে কী, মনে মনে সেইরকমই ভেবেছিল নীলিমা। তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে তাই বলল, "তারপর? এখান থেকে যাওয়ার পর কোথায় কোথায় ঘুরলে?" এর মধ্যে নতুন জামাকাপড় কিনে নিয়েছে মেয়েটা, লক্ষ করল নীলিমা। আগের মতোই সেই সাদা শার্ট আর সুতির প্যান্ট পরেছে।

"কলকাতায় গিয়েছিলাম," বলল পিয়া। "ওখানে আমার মাসির কাছে ছিলাম কয়েকদিন। বেশিরভাগ সময়টাই ইন্টারনেট দেখে কাটিয়েছি। যা রেসপন্স পেয়েছি না—জানলে খুব খুশি হবেন আপনি।"

"রেসপন্স? কীসের?"

"ঝড়ের সময় কী কী হয়েছিল আর ফকির কীভাবে মারা গেল সেসব বিস্তারিতভাবে লিখে বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটা চিঠি পাঠিয়েছিলাম আমি। সেই চিঠিগুলোকে আবার আমার কয়েকজন বন্ধু আর সহকর্মী সারা পৃথিবীর বহু মানুষকে পাঠিয়েছে; পরিচিত লোকেদের কাছে সাহায্য চেয়েছি ময়না আর টুটুলের জন্যে। আমরা যতটা আশা করেছিলাম তার থেকে অনেক অনেক বেশি রেসপন্স এসেছে মাসিমা। অবশ্য টাকা যতটা হলে ভাল হত ততটা ওঠেনি, তবে খানিকটা উঠেছে। যা জোগাড় হয়েছে তাতে মাথার ওপরে একটা ছাদের ব্যবস্থা হয়ে যাবে ওদের, আর কলেজ পর্যন্ত টুটুলের পড়াশোনার খরচও হয়তো চলে যাবে।"

“আচ্ছা!” সোজা হয়ে উঠে বসল নীলিমা। “খুব খুশি হয়েছি আমি, খুব খুশি হয়েছি। ময়নাও নিশ্চয়ই খুশি হবে খুব।”

“তা ছাড়াও আরও আছে–”

“সত্যি? ভুরুদুটো ওপরে তুলে বলল নীলিমা। “আর কী কী করেছ তুমি শুনি?”

“একটা রিপোর্ট লিখেছি,” জবাব দিল পিয়া। “এখানে ডলফিনদের ওপর যতটুকু স্টাডি করতে পেরেছি তার ওপর। খুবই ভাসা ভাসা হয়েছে রিপোর্টটা, কারণ ডেটা যা জোগাড় করতে পেরেছিলাম সবই তো নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু ওইটুকু দেখেই খুব উৎসাহিত হয়েছেন অনেকে। বেশ কয়েকটা সংরক্ষণ সংস্থা এবং পরিবেশ নিয়ে যারা কাজকর্ম করে এরকম কয়েকটা অর্গানাইজেশন এই বিষয়ে গবেষণা করার জন্য খরচ অফার করেছে আমাকে। কিন্তু আপনার সঙ্গে আগে কথা না বলে ওদের কিছু জানাতে চাইনি আমি।”

“আমার সঙ্গে?” বিস্ময় ধরে রাখতে পারল না নীলিমা। “আমি এসবের কী জানি?”

“আপনি এখানকার মানুষদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন মাসিমা,” পিয়া বলল। “আর আমার দিক থেকে আমি এইটুকু বলতে পারি যে পরিবেশ সংরক্ষণের ভার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে সাধারণ গরিব-গুর্বো মানুষকে নাজেহাল করার মতো কোনও কাজ আমি করতে চাই না। যদি কোনও প্রজেক্ট আমি এখানে করি, সেটা আমি করতে চাই বাদাবন ট্রাস্টের সাহায্য নিয়ে, যাতে যে সমস্ত জেলেরা এখানে মাছ-কাঁকড়া ধরে খায়, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এগোনো যায়। ট্রাস্টেরও তাতে উপকার হবে। ফান্ড যা আসবে তা আমরা ভাগ করে নেব।”

ফান্ডের কথা উঠতেই সচেতন হয়ে উঠল নীলিমার বাস্তববাদী মন। ঠোঁট কামড়ে বলল, “বেশ। নিশ্চয়ই ভাবা যেতে পারে ব্যাপারটা। কিন্তু পিয়া, এর মধ্যে প্র্যাকটিকাল সমস্যা যা যা হতে পারে সেগুলো কি ভাল করে ভেবে দেখেছ তুমি? যেমন ধরো, তুমি নিজে কোথায় থাকবে?”

মাথা নাড়ল পিয়া। বলল, “সেটাও ভেবেছি। আইডিয়াটা আপনার পছন্দ হয় কিনা দেখুন।”

“বলো।”

“আমি ভাবছিলাম, আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে এ বাড়ির দোতলাটা, মানে গেস্ট হাউসটা, আমি ভাড়া নিয়ে নিতে পারি। ওখানে থেকেই দিব্যি চালিয়ে নিতে পারব। ছোট একটা অফিস করব, আর একটা ডেটাব্যাঙ্ক। অফিস একটা দরকার হবেই, কারণ খুঁটিনাটি প্রত্যেকটা খরচ-খরচার সব হিসেব দেখাতে হবে।”

প্রশ্রয়ের হাসি হাসল নীলিমা। যে কাজ হাতে নিতে যাচ্ছে তার ঝামেলা যে কত সে ব্যাপারে কোনও ধারণাই নেই মেয়েটার। ফাইলপত্র ঘাঁটাঘাঁটির কাজ তো খুব কম দিন করছে না নীলিমা। নরম গলায় আস্তে আস্তে তাই পিয়াকে বলল, “শোনো মেয়ে, এত বড় মাপের একটা কাজ করতে গেলে একা হাতে তো তুমি পুরোটা সামলাতে পারবে না। তোমাকে লোক রাখতে হবে।”

“জানি মাসিমা, জবাব দিল পিয়া। “সেটাও আমি ভেবে রেখেছি। আমার মনে হয় ওই হিসেব কেতাবের ব্যাপারগুলো ময়নাই সামলে দিতে পারবে। তার জন্যে ওকে পুরো সময় কাজ করতেও হবে না; হাসপাতালের কাজ সেরে হাতে যেটুকু সময় থাকবে তাতেই হয়ে যাবে। এতে কিছু বাড়তি রোজগারও হবে ওর। আমার মনে হয় না ময়নার খুব একটা অসুবিধা হবে। আর আমার তো খুবই সুবিধা হবে। ও খানিকটা বাংলাও শিখিয়ে দিতে পারবে আমাকে; তার বদলে ওকে আমি ইংরেজি শেখাব।”

নিজের ডান হাতের চেটোটা বাঁ হাতের মধ্যে নিয়ে মোচড়াতে লাগল নীলিমা। ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগল পিয়া এখানে থেকে কাজ করতে গেলে কোন কোন দিক থেকে সমস্যা আসতে পারে। অবশেষে জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা, একটা কথা বলো, তোমার ভিসা আর পারমিট-টারমিট সব কিছু আছে? তুমি কিন্তু বিদেশি, সেটা ভুলে যেয়ো না। লম্বা সময়ের জন্যে তোমার এখানে থাকাটা বে-আইনি হবে কিনা আমি জানি না।”

এই সমস্যাটাও সমাধানের ব্যবস্থা করে ফেলেছে পিয়া। বলল, "আমি আমার কাকার সঙ্গে কথা বলেছি এই নিয়ে। কাকা বলেছেন কী একটা কার্ড আমি নাকি পেতে পারি যাতে যতদিন ইচ্ছা থাকা যেতে পারে এখানে। আমার বাবা-মা ইন্ডিয়ান ছিলেন বলেই নাকি এই সুবিধাটা পেতে পারি আমি। আর পারমিটের ব্যাপারে কাকা বললেন বাদাবন ট্রাস্ট যদি আমার রিসার্চের কাজ স্পনসর করতে রাজি হয় তাহলে বাকিটুকু উনি সামলে দিতে পারবেন। পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করে দিল্লির এরকম কিছু অর্গানাইজেশনের লোকজনদের কাকা চেনেন, তাদের বললে তারাই সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে সব ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।"

"বাপরে বাপ! তুমি তো দেখছি একেবারে সব আটঘাট বেঁধেই এসেছ," হোহো করে হেসে উঠল নীলিমা। "তোমার প্রোজেক্টের একটা নামও নিশ্চয়ই ঠিক করে ফেলেছ, তাই না?" ঠাট্টা করে বলা কথাটা শুনে একটু গম্ভীর হয়ে গেল পিয়া। নীলিমা বুঝতে পারল এই মেয়ের কাছে এটা কোনও রসিকতার বিষয় নয়। "সত্যি সত্যিই নাম ঠিক করা হয়ে গেছে? এর মধ্যেই?"

"ফাইনাল কিছু করিনি, তবে মোটামুটি একটা ভাবছিলাম," পিয়া বলল। "ফকিরের নামে নাম দেওয়া যেতে পারে। ওর দেওয়া ডেটাগুলোর তো একটা বড় ভূমিকা থাকবে এই প্রোজেক্টে।"

"ফকিরের দেওয়া ডেটা?" চোখ প্রায় কপালে উঠে গেল নীলিমার। " কিন্তু তুমি যে বললে ডেটাগুলো সব ঝড়ে হারিয়ে গেছে?"

হঠাৎ চকচক করে উঠল পিয়ার চোখ। বলল, "সবটা হারায়নি মাসিমা। এই জিনিসটা রয়ে গেছে আমার সঙ্গে।" পকেট থেকে জিপিএস মনিটরটা বের করে নীলিমাকে দেখাল পিয়া। "এই দেখুন, গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমে থাকা স্যাটেলাইটগুলোর সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ থাকে এই যন্ত্রের। ঝড়ের দিন এটা আমার পকেটে ছিল। ফলে যন্ত্রপাতির মধ্যে এটাই একমাত্র বেঁচে গেছে।" পিয়া একটা বোতাম টিপতেই জ্বলে উঠল স্ক্রিনের আলো। তারপর যন্ত্রের মেমরিতে পৌঁছনোর জন্য অন্য আর একটা বোম টিপল কয়েকবার। "যে যে পথ দিয়ে ফকির আমাকে নিয়ে গিয়েছিল সেগুলো সব স্টোর করা আছে এতে। দেখুন।" পর্দার ওপর ফুটে ওঠা একটা আঁকাবাঁকা রেখার দিকে ইশারা করল পিয়া। "ঝড়ের আগের দিন এই পথটা দিয়ে গিয়েছিলাম আমরা। সরু সরু সুঁতিখাল, খাঁড়ি—যেখানে যেখানে ডলফিন ওর চোখে পড়েছে তার প্রত্যেকটা জায়গায় সেদিন ডিঙি নিয়ে গিয়েছিল ফকির। বহু বছর ধরে সঞ্চয় করা জ্ঞানের ভাণ্ডার লুকিয়ে আছে এই একখানা ম্যাপের মধ্যে। এটার ওপর ভিত্তি করেই দাঁড় করাতে হবে আমার প্রোজেক্টকে। আর সেই জন্যেই আমার মনে হয় ফকিরের নামেই হওয়া উচিত এই প্রোজেক্টের নাম।"

"আরিব্বাস!" বলে উঠল নীলিমা। সামনের জানালার ফাঁক দিয়ে নজরে আসা এক চিলতে আকাশের দিকে চোখ চলে গেল ওর। "তার মানে তুমি বলছ এই সব কিছু ওইখানে ধরা রয়ে গেছে?"

"ঠিক তাই।"

চুপ করে গেল নীলিমা। মনে মনে ভাবতে লাগল ফকিরের কথা, ওর ডিঙিটার কথা, যে রহস্যময় পথে একদিন যাত্রা করেছিল ফকির কেমন দূর আকাশের তারার ভাষাতে লেখা হয়ে রয়ে গেছে সেই পথের ঠিকানা, সেই কথা। পিয়ার ডান হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আলতো করে চাপ দিল ও। বলল, "ঠিক বলেছ। ফকিরের একটা স্মৃতিচিহ্ন থাকুক। এই পৃথিবীতেও থাকুক, ওই আকাশেও থাকুক। কিন্তু কাজে হাত দেওয়ার আগে পুরো ব্যাপারটা একবার ভাল করে ভেবে নেওয়ার জন্য একটু সময় দিতে হবে আমাকে।" লম্বা একটা শ্বাস ফেলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল নীলিমা। "তবে তারও আগে সবচেয়ে জরুরি কাজটা কী জান? গরম গরম এক কাপ চা খাওয়া। কী বলো?"

"নিশ্চয় খাব মাসিমা। থ্যাঙ্ক ইউ।"

রান্নাঘরে গিয়ে ফিল্টার থেকে কেটলিতে জল ভরল নীলিমা। তারপর কেরোসিন স্টোভটা যখন পাম্প করছে, সেই সময় দরজা দিয়ে মাথা বাড়াল পিয়া।

"আচ্ছা মাসিমা, কানাইয়ের কী খবর?" ও জিজ্ঞেস করল। "এর মধ্যে আর যোগাযোগ করেছে?"

একটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে স্টোভটা ধরাল নীলিমা। লোহার জালিটা বসাল তার ওপর। বলল, "হ্যাঁ করেছে। এই তো কালকেই একটা চিঠি পেয়েছি ওর কাছ থেকে।"

"কেমন আছে?" জিজ্ঞেস করল পিয়া। কেটলিটা স্টোভের ওপর বসাতে বসাতে একগাল হাসল নীলিমা। "কী বলব রে মা, ওরও তো তোমারই মতো অবস্থা। ভয়ানক ব্যস্ত সব সময়।"

"তাই নাকি? কী করছে ও এখন?"

"বলছি দাঁড়াও," টিপটটার দিকে হাত বাড়াতে বাড়াতে বলল নীলিমা। "কোত্থেকে শুরু করি বলো তো? সবচেয়ে ভাল কাজ যেটা করেছে কানাই, সেটা হল নিজের কোম্পানিটাকে একেবারে ঢেলে সাজিয়েছে। ফলে এখন দরকার মতো একটু ছুটি নিতে পারে মাঝে মাঝে। কিছুদিন কলকাতাতেও এসে থাকার ইচ্ছে আছে ওর।"

"সত্যি?" পিয়ার চোখে বিস্ময়। "কী করবে ও কলকাতায়?"

"সেটা ঠিক বলতে পরব না," অনেক দিন ধরে জমিয়ে রাখা দার্জিলিং চায়ের পাতা চামচে করে টিপটের মধ্যে ঢালল নীলিমা। "তবে আমাকে ও একদিন বলেছিল যে নির্মলের নোটবইয়ের কাহিনিটা ও গুছিয়ে লিখতে চায়: কী করে নোটবইটা ওর হাতে এল, কী ছিল ওর মধ্যে, কী করে আবার ওটা হারিয়ে গেল—এই সব। কিন্তু এই কাজটা ঠিক কীভাবে ও করতে চায় সেটা বরং তুমিই জিজ্ঞেস করে নিয়ে ওকে। দু-এক দিনের মধ্যেই ও আসবে এখানে।"

"দু-এক দিনের মধ্যে?"

মাথা নাড়ল নীলিমা। টক টক করে আওয়াজ উঠছে কেটলির ঢাকনায়; স্টোভ থেকে কেটলিটাকে নামিয়ে নিল ও। ফুটন্ত জলটা টিপটে ঢেলে দিয়ে বলল, "কানাই যখন আসবে তখন যদি কয়েকদিন ও ওপরের গেস্ট হাউসটাতে থাকে, তাতে তোমার কোনও আপত্তি নেই তো?"

হাসল পিয়া। "না। কোনওই আপত্তি নেই। সত্যি কথা বলতে কী, ও বাড়িতে থাকলে আমার ভালই লাগবে।"

পিয়ার শব্দ ব্যবহারে এত আশ্চর্য হয়ে গেল নীলিমা যে ঠং করে চায়ের চামচটা পড়ে গেল হাত থেকে। অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি ঠিক শুনলাম তো? 'বাড়িতে' বললে কি তুমি?"

নিজের অজান্তেই কথাটা বেরিয়ে এসেছিল পিয়ার মুখ দিয়ে। এখন খেয়াল হতে কপালে ভাঁজ পড়ল ওর।

অবশেষে বলল, "জানেন মাসিমা, এই ওর্কায়েলা ডলফিনগুলো যেখানে থাকে সেটাই আমার বাড়ি। তাহলে এই জায়গাটাই বা হবে না কেন?" চোখদুটো বড় বড় হয়ে উঠল নীলিমার। তারপর হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়ে বলল, "দেখো পিয়া, এইখানে তোমার আর আমার মধ্যে একটা তফাত আছে। আমি 'বাড়ি' বলতে কী বুঝি জানো? যেখানে শান্তিতে এক কাপ চা বানিয়ে খেতে পারি সেটাই আমার বাড়ি।"

অমিতাভ ঘোষের জন্ম ১৯৫৬ সালে, কলকাতায়। শৈশব কেটেছে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা আর উত্তর ভারতে। শিক্ষা: দেরাদুন, নতুন দিল্লি, আলেকজান্দ্রিয়া এবং অক্সফোর্ড। কর্মজীবন শুরু হয় দিল্লিতে, *The Indian Express* পত্রিকার সাংবাদিক হিসাবে। ১৯৮৬ সালে প্রথম উপন্যাস *The Circle of Reason* প্রকাশিত হওয়ার আগেই ডক্টরেট ডিগ্রি পান অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে। অন্যান্য গ্রন্থ: সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত *The Shadow Lines, In an Antique Land, The Calcutta Chromosome, Dancing in Cambodia and Other Essays, Countdown, The Glass Palace, The Imam and the Indian* এবং *The Sea of Poppies.*

সম্মান: আকাদেমি পুরস্কার ছাড়াও পেয়েছেন *Prix Medici Etranger Award; Arthur C. Clarke Award; Grand Prize for Fiction, Frankfurt International e-Book Awards; Hutch Crossword Book Award* এবং *Pushcart Prize* ।

শিক্ষকতা করেছেন ভারত এবং আমেরিকার বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

স্ত্রী ডেবোরা বেকার, কন্যা লীলা এবং পুত্র নয়ন।

আবাস : ব্রুকলিন, গোয়া এবং কলকাতা।

প্রচ্ছদ সুব্রত চৌধুরী

লেখকের আলোকচিত্র : অশোক মজুমদার

জল-জঙ্গলের দেশ সুন্দরবন। সে দেশে

জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ। আর আছে

বাঘ-কুমিরের সঙ্গে লড়াই করে টিকে

থাকা সর্বহারানো কিছু মানুষ। মহাকাব্যপ্রতিম

এই উপন্যাসে আঠারো ভাটির দেশের জীবন

আর প্রকৃতি, ইতিহাস আর লোকপুরাণকে

জীবন্ত চেহারায় উপস্থিত করেছেন

অমিতাভ ঘোষ।